মুখতাসার

যাদুল মা'আদ

মূল: আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী (রহ.)

সংক্ষেপণে: বিপ্লবী সংস্কারক মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.)

সম্পাদক মণ্ডলী

- শাইখ আব্দুল খালেক সালাফী
- শাইখ মুহাম্মাদ শফীকুর রহমান আল-মাদানী
- শাইখ আব্দুন নূর আব্দুল জাব্বার
- শাইখ আকমাল হোসাইন আব্দুন নূর

অনুবাদ

আবদুল্লাহ্ শাহেদ আল-মাদানী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
রাণীবাজার, রাজশাহী।

مختصر زاد المعاد

মুখতাসার যাদুল মা'আদ

للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى

মূলঃ আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ আলাইহি)

اختصره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

সংক্ষেপণেঃ বিপ্লবী সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহিমাহুল্লাহ আলাইহি)

অনুবাদ

আবদুল্লাহ্ শাহেদ আল-মাদানী

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফার্স্ট ক্লাশ)
দাঈ, জুবাইল দা'ওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব।

সম্পাদনায়

শাইখ আব্দুন্ নূর আব্দুল জাব্বার
শাইখ আজমাল হোসাইন আব্দুন্ নূর

প্রকাশনায়

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ
কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
রাণীবাজার, (মাদরাসা মার্কেটের সামনে), রাজশাহী।
০১৭৩০৯৩৪৩২৫, ০১৯২২৫৮৯৬৪৫

আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম. এম. ফার্স্ট ক্লাশ

দাঈ, জুবাইল দা'ওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব।

তথ্যসুত্র ও বিন্যাস

যায়নুল আবেদীন বিন নুমান

সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ, রাণীবাজার, রাজশাহী।

দাওরায়ে হাদীস (মুমতায), বি.এ. অনার্স, ইসলামিক স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশনায়

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ
কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, (মাদরাসা মার্কেটের সামনে), রাজশাহী।

০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

ওয়েবঃ http:// wahidiyalibrary.blogspot.com

ইমেইলঃ wahidiyalibrary@gmail.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ২০১৪ ঈসায়ী।

ISBN 978-984-91017-8-9

নির্ধারিত মূল্যঃ ২৫৫ টাকা।

মূদ্রণ : দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী। ☏ ০৭২১-৭৭৭৭৪৬১২

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

বাংলাদেশে প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থের সংকলনগুলোতে এক প্রকাশনীর হাদীস নম্বরের সাথে অপর প্রকাশনীর হাদীস নম্বরের সাথে মিল নেই বললেই চলে। ফলে পাঠকেরা হাদীস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়ে। পাঠকদের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে আমাদের প্রকাশনীর অন্যান্য বই এর ন্যায় সহীহ-যঈফ তাহক্বীক্বসহ এই বইয়েও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশ্ববিখ্যাত বহু গ্রন্থসম্ভার কুরআন-হাদীসের সার্চ সফ্‌টয়্যার "আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা" প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর অনুসরণ করা হয়েছে। আর কুরআনুল কারীমের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম, তারপর সূরা নম্বর, ও শেষে আয়াত নম্বর দেওয়া হয়েছে (যেমন- সূরা আন-নিসা-০৩:৯৯)।

পাশাপাশি আমাদের দেশে প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থের প্রকাশনীর নামসহ হাদীস নম্বর উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। যেমন-

- মাশা.= আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা,
- ইফা. = ইসলামিক ফাউন্ডেশন,
- তাও. = তাওহীদ পাবলিকেশন্স,
- আপ্র. = আধুনিক প্রকাশনী,
- মাপ্র. = মাদানী প্রকাশনী,
- হাএ. = হাদীস একাডেমী,
- আলএ. = আলবানী একাডেমী
- ইসে= ইসলামিক সেন্টার প্রভৃতি।

উদাহরণস্বরুপ- বুখারী, তাও, হা/৩২০৭, ইফা. হা/২৯৭৭, আপ্র. হা/২৯৬৭, মুসলিম, মাশা. হা/৪৫০, হাএ. হা/৫৮৯, ইফা. হা/৫৯৮, ইসে. হা/৫৬৯, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩২৭৭, নাসাঈ, মাপ্র. হা/২৫৪২, মিশকাত, হাএ. হা/১২১২, ইত্যাদি।

Contents

প্রকাশকের বাণী

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ قَالَ اللهُ تَعَالٰى : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾ سورة الاحزاب–٣٣:٢١

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার। অতঃপর অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্ব নেতা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি, যাঁর সিরাত ও সুন্নাহ্ প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেক মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

আমরা এতদিন শুনতাম ও দেখতাম অনেক সহীহ ফাতাওয়া-মাসাইলের কিতাবে **"যাদুল মা'আদ"** গ্রন্থ থেকে বহু তথ্য ও রেফারেন্স ব্যবহার করতে। এমনকি সিরাতের প্রসিদ্ধ কিতাব "আর-রাহীকুল মাখতূম" গ্রন্থেও বহু রেফারেন্স উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। উক্ত **"যাদুল মা'আদ"** মুসলিমদের জন্য অসাধারণ একটি সীরাত গ্রন্থ। বইটির খ্যাতিনামা বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে আছে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বইটির সম্মানিত অনুবাদকের অনুমতি ও পরামর্শক্রমে বইখানা প্রকাশের কাজ করতে গিয়ে পড়ার সুযোগ হওয়ায় এতটুকু বলব যে, আমরা যদি উক্ত বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যায়ন করি, তাহলে দেখবো রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনের আমল-আখলাক, ইবাদাত-বন্দেগী, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাসহ নিত্য দিনের যিক্র-আযকারের দু'আ-দরুদ, এক কথায় রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াতী জীবনের বাস্তব একটি চিত্র প্রতিটি মূহুর্ত কেমন ছিল?

সম্মানিত লেখক শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর সুযোগ্য ছাত্র, মুহাক্কিক আলিম ও তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জীবনের সার্বক্ষণিক সাথী **আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী** (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অত্র গ্রন্থখানা সংক্ষেপ করেছেন বিপ্লবী সংস্কারক **শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব** (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)। আর উক্ত মূল্যবান গ্রন্থখানা অনুবাদ করেছেন দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদিম, সৌদী আরব, আল-জুবাইল দাওয়া সেন্টারের বিশিষ্ট গবেষক ও দাঈ **শাইখ আবদুল্লাহ্ শাহেদ আল-মাদানী** (হাফিযাহুল্লাহ্)।

অনূদিত **"মুখতাসার যাদুল মা'আদ"** গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর পরক্ষণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি অনুবাদকের, যার সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের অন্যতম সহীহ সুন্নাহর আলোকে বই প্রকাশে সচেষ্ট **ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** রাজশাহী, হতে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। তিনি গ্রন্থখানা প্রকাশ করার ব্যাপারে আমাদেরকে সার্বক্ষণিক বিশেষ উৎসাহ-সাহস যোগিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, সম্মানিত সম্পাদক মণ্ডলী শাইখ আব্দুন্ নূর আব্দুল জাব্বার, শাইখ আজমাল হোসাইন আব্দুন্ নূর, শাইখ আব্দুল খালেক সালাফী, শাইখ মুহাম্মাদ শফিকুর রহমান আল-মাদানী, শাইখ সাইদুর রহমান রিয়াদী, শাইখ হোসাইন আহমাদ, যায়নুল আবেদীন বিন নুমান। আর গ্রন্থখানা প্রকাশ করার ব্যাপারে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগিয়েছেন, আমি তাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভুল ত্রুটি উল্লেখ পূর্বক যে কোন পরামর্শ দিলে তা সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশেষে দু'আ করছি আল্লাহ তা'আলা মূল গ্রন্থকার, অনুবাদক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও শান্তি দান করুন। আমীন।

বিনীত
আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস

অভিমত

বাংলাদেশের অন্যতম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়্যাহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকার সাবেক প্রিন্সিপাল শাইখ আব্দুল খালেক সালাফী বলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ وَ بَعْدُ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! মোদ্দা কথা হচ্ছে, আদম জাতির ইহ-পরকালীন কল্যাণের যাবতীয় দিক ও বিভাগ নির্ভর করছে মহানাবীর ﷺ আদর্শের একনিষ্ঠ অনুকরণের উপর। কেননা তিনি ﷺ আল্লাহর তরফ থেকে সে আদর্শ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং আদম সন্তানের জন্য এমন একখানা কিতাবের প্রয়োজন যাতে মহানাবীর ﷺ আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শ সমূহ বিষয়ভিত্তিক আলোচিত হয়। আমি আশা করি তাদের এ অভাব পূরণ হবে কুরআন-হাদীস মহা পণ্ডিত শাইখ ইবনুল কাইয়্যিম (আল-জাওযী) সংকলিত **"যাদুল মা'আদ"** (আখিরাতের পাথেয়) কিতাবে। কেননা কিতাব খানায় মহানাবী ﷺ এর আদর্শের আনুমানিক ২৭৬৪টি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে সে বিষয়ের কোন দিক ছাড়া পড়েনি। কিছুদিন হলো আল্লাহর মেহের বাণীতে উক্ত কিতাব খানা পড়ার সুভাগ্য আমার হয়েছে। তবে আমি অবগত হয়েছি সত্যিকার অর্থে সম্মানিত লেখকের কিতাব খানা আদম সন্তানের জন্য আখিরাতের পাথেয় হিসেবে প্রয়োজন। এখানে সব বিষয়ের উপর কুরআন-হাদীসের আলোকপাত করেছেন। তাই তো কিতাব খানার নাম করণ **"যাদুল মা'আদ"** যথার্থ হয়েছে। فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

কিন্তু কিতাব খানা আরবী ভাষায় লিখিত। একারণে আরবী জানেনা এমন পাঠক-পাঠিকাগণের এর দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয় বলে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে তা প্রকাশের অতি প্রয়োজন মনে করছিলাম। এমতাবস্থায় নযর পড়ল আমার এক দ্বীনি ভাই **"আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী"** এর বাংলা ভাষায় অনূদিত ও মুদ্রিত করা গ্রন্থটি **ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** রাজশাহীর পরিচালক আমার স্নেহভাজন আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস প্রকাশের চরম আগ্রহে যা শিঘ্রই প্রকাশ হতে যাচ্ছে। فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

তাই অনুবাদক ও প্রকাশকারীকে লাখো মুবারকবাদ। পরিশেষে দু'আ করি, হে আল্লাহ মূল লেখকসহ অনুবাদক ও প্রকাশক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই খেদমতের উত্তম বিনিময় দান করত: কিয়ামত দিবসে তাদের নেকীর পাল্লা ভারী করে দাও। আমীন।।।

১৬/০৬/২০১৪

শাইখ আব্দুল খালেক সালাফী

মুহাম্মাদ শফীকুর রহমান এম. এম.

লিসান্স, ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় মদীনা

মুহাদ্দিস, শাহ্ সুলতান (রহ.) কামিল মাদরাসা

ইমাম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফাকীহ শামসুদ্দীন আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে আবি বক্র ওরফে ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যা রচিত **"যাদুল মা'আদ মিন হাদয়ি খায়রিল ইবাদ"** গ্রন্থখানি একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনন্য গ্রন্থ। রসূল ﷺ এর পুরো জীবনটা ছিল একটি জীবন্ত কুরআন তথা আল-কুরআনের বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা। আল্লামাহ্ ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যা তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে রসূল ﷺ এর জীবনের যাবতীয় দিক তুলে ধরে কুরআন-সুন্নাহ এর আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা থেকে ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি ফকীহ ইমামদের মতামত বর্ণনা করে কুরআন-সুন্নাহ এর আলোকে বিশুদ্ধ ও অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমতটি বর্ণনা করে দিয়েছেন। **"যাদুল মা'আদ"** গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্তরুপ দান করেছেন দ্বাদশ শতাব্দির মহান সংস্কারক শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, যা **"মুখতাসার যাদুল মা'আদ"** নামে পরিচিত। বইটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমার স্নেহবাজন, প্রতিভাবান ও আদর্শবান ছাত্র শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী **"মুখতাসার যাদুল মা'আদ"** গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপদান করেছেন। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের জন্য তাঁর এ ধরণের উদ্যোগকে আমি আন্তরিক ভাবে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর দীর্ঘায়ূ ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি। আর মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করছি তাঁর এ খিদমত আল্লাহ তাঁর সৎ আমল ও সাদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবূল করেন। সেই সাথে প্রত্যাশা করছি বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম সমাজে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে এবং উপকৃত হবে। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

পরিশেষে গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে পৌঁছার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তাওফীক ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করছি।

মুহাম্মাদ শফীকুর রহমান এম. এম.

সূচীপত্র

Contents

অনুবাদকের বাণী

সায়্যিদুল মুরসালীন ও রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ এর সীরাতে তাইয়্যিবা এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় প্রায় লক্ষাধিক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই মহৎ কর্মের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। এটি এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে ছোট-বড় একাধিক পুস্তক পড়েও কোন নাবী ভক্তের জ্ঞান পিপাসা মিটবেনা। যে যতই পাঠ করুক, এটি দাবী করতে পারবেনা যে, সে এর হক আদায় করতে সক্ষম হয়েছে এবং পবিত্র জীবনীর সাগরের মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে নিয়েছে। কেননা তাঁর জীবনী সম্পর্কে এত পুস্তক লেখা হয়েছে যে, ইতিহাসে তার নযীর পাওয়া যাবে না।

নাবী ﷺ এর জীবনী সম্পর্কে অগণিত কিতাব বিদ্যমান থাকার পরও এ বিষয়ে এমন লেখনী খুব কমই পাওয়া যায়, যাতে তাঁর হায়াতে তাইয়্যিবাকে একজন মুসলিমের জন্য উত্তম নমুনা এবং জীবন চলার দিশারী হবে। কেননা তাঁর পবিত্র জীবনী প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির আদর্শ, তাঁর গৃহের প্রদ্বীপ, পথের আলো এবং হিদায়াতের এক পরিপূর্ণ রূপ। যে পর্যন্ত কোন মুসলিমের সামনে রসূল ﷺ এর পবিত্র জীবনী পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট না হবে, ততক্ষণ সে ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম হবেনা এবং দ্বীন ইসলামের হুকুম-আহকাম মেনে চলাও তার দ্বারা অসম্ভব। তাঁর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিমের পক্ষে হিদায়াত ও দু'জাহানের কামিয়াবী হাসিল করে মঞ্জিলে মাকসুদ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র জীবনী অনুসরণের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন-

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তার জন্যে রসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"।[১]

রসূল ﷺ এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান না থাকলে কখনই আমরা তাঁকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারবনা। তাঁর পবিত্র জীবনীর সাগরকে **আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম** (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) **'যাদুল মা'আদ ফী হাদ্য়ী খাইরিল ইবাদ'** নামে এমন একটি কিতাব দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, যাতে রসূল ﷺ এর জীবনীকে একটি উত্তম নমুনা ও আদর্শ হিসাবে পেশ করার অক্লান্ত পরিশ্রম করা হয়েছে। এতে তিনি পূর্ণ সতর্কতার সাথে রসূল ﷺ এর জীবনীর প্রায় সকল দিকই উল্লেখ করেছেন। এটিকে তাঁর পবিত্র ও বরকতময় জীবনী, অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ, দিবা-রাত্রির আমল, আচার-আচরণ, পবিত্র অভ্যাস ও স্বভাব, চারিত্রিক গুণাবলী এবং যুদ্ধ ও জিহাদসমূহের উপর একটি বিশাল সংকলন হিসাবে গণ্য করা হয়। সেই সাথে এতে আরও রয়েছে, কুরআনের তাফসীর, হাদীছের ব্যাখ্যা, হাদীছের রাবীগণের সমালোচনা ও পর্যালোচনা এবং বের করা হয়েছে রসূল ﷺ এর হাদীস ও নবুওয়াতী জীবনকালে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহ থেকে বিভিন্ন ফিকহী মাসায়েল। তাই যুগে যুগে বিজ্ঞ আলেমগণ এই কিতাবটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছেন। বিজ্ঞ আলেম ও দ্বীনের দাঈ-গণ তাদের বক্তৃতা এবং লেখনীতে যাদুল মা'আদকে একটি নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবেও ব্যবহার করে থাকেন। আলেমদের কেউ এটির উপর টীকা লাগিয়েছেন, কেউ এতে বর্ণিত হাদীসগুলোর তাখরীজ ও তাহকীক করেছেন আবার কেউ বা এটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় **যুগশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব** (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) **এই কিতাবটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। নাম দিয়েছেন**

---

১. সূরা আহযাব-৩৩:২১

'মুখতাসার যাদুল মা'আদ'। (مختصر زاد المعاد) মূল কিতাবটির ন্যায় এটিও মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছে। কারণ মূল কিতাবটি অত্যন্ত বিশাল হওয়ার কারণে প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে সহজভাবে তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এ জন্যই কিতাবটিকে সংক্ষিপ্ত করে এক খন্ডে প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই ইসলামের অন্যতম এক খাদেম ও যুগ শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দেদ শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মুসলিম সমাজের সেই প্রাণের দাবীটিও পূরণ করে দিয়েছেন।

'যাদুল মা'আদ' পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হলেও বাংলা ভাষায় এর নির্ভরযোগ্য কোন অনুবাদ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ বাংলাভাষী কোটি কোটি মুসলিমের রয়েছে নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অগাধ ভালবাসা, তাঁর সুন্নাতে তাইয়্যিবা সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ এবং তাঁকে অনুসরণ করে দু'জাহানের কামীয়াবী হাসিল করার একান্ত কামনা ও বাসনা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণকারী বাংলায় নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের অভাব থাকায় জাতির অধিকাংশ লোকের মধ্যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী সম্পর্কে নানা কল্পিত কাহিনী মিথ্যা ও বানোয়াট ঘটনাসমূহ তাঁর পবিত্র জীবনীকে হোলাটে করে ফেলেছে এবং বিকৃত অবস্থায় তাঁর পবিত্র সীরাতকে সমাজে তুলে ধরা হচ্ছে। তাঁর সুন্নাতের যথাযথ প্রচার ও প্রসারের অভাবে সমাজ ছেয়ে গেছে শিরক ও বিদআতে। চতুর্দিকে চলছে ইসলামের নামে অনৈসলামিক কর্মকান্ড, কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি, নাবী প্রেমের দাবীদারদের রবীউল আওয়ালের গান, আশেকে রসূলদের শিরক-বিদআতী নানা আয়োজন, পীর তন্ত্রের আজব লীলা এবং সীরাত ও মিলাদ মাহফিলের নামে অগণিত অনুষ্ঠান।

বাংলাভাষী মুসলিম সমাজে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জীবনী ও সুন্নাতে তাইয়্যিবার জ্ঞান যে অপর্যাপ্ত, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাই বাংলা ভাষায় যাদুল মা'আদ বা এ জাতীয় কিতাব অনেক আগেই অনুবাদ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। বাংলার যমীনে তাওহীদ ও সুন্নাত ভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস দীর্ঘ দিন যাবৎ বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতির মুকাবেলা করে বাংলার মুসলিম জনগণকে তাওহীদ ও সুন্নাতে রসূলের অনুসরণের প্রতি আহবান জানিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় জমঈয়তের সৌদি আরব শাখার পক্ষ হতে মুখতাসার যাদুল মাআদের অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী সম্পর্কে এবং ইসলামের সকল বিষয়ে আমার যথেষ্ট অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এই বিশাল কাজটির দায়িত্ব অর্পিত হয় আমার উপর। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জীবনী ও সীরাতে নববীর খেদমতে অংশ নেওয়ার বাসনায় আমি এই পবিত্র কাজে হাত দেই। অল্প সময়ের মধ্যে কাজটি সমাধা হওয়াতে দয়াময় আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমার এই খিদমাত কবুল কর এবং পরকালে এটিকে আমার নাজাতের উসীলা বানাও। আমীন!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَسَلَّم

আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

মোবাইল: +৮৮০১৭৩২৩২২১৫৯, +৯৬৬৫০৩০৭৬৩৯০,

ashahed1975@gmail.com

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখুল ইসলাম আল্লামা হাফিয ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এর জীবনী কয়েক পৃষ্ঠায় লিখা সম্ভব নয়। তাঁর পূর্ণ জীবনী লিখতে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। আমরা সেদিকে না গিয়ে অতি সংক্ষেপে তাঁর বরকতময় জীবনীর বেশ কিছু দিক উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

❖ শাইখের পূর্ণ নাম ও পরিচয়

তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে, আবু আব্দুল্লাহ্ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন আইয়্যুব ....আদ দিমাশকী। তিনি সংক্ষেপে 'ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযীয়া' বলেই মুসলিম উম্মার মাঝে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর পিতা দীর্ঘ দিন দামেস্কের আল জাওযীয়া মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বলেই তাঁর পিতা আবু বকরকে قيم الجوزيــة কাইয়্যিমুল জাওযীয়া অর্থাৎ মাদরাসাতুল জাওযীয়ার তত্ত্বাবধায়ক বলা হয়। পরবর্তীতে তাঁর বংশের লোকেরা এই উপাধীতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

❖ জন্ম প্রতিপালন ও শিক্ষা গ্রহণ

তিনি ৬৯১ হিজরী সালের সফর মাসের ৭ তারিখে দামেস্কে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এক ইলমী পরিবেশ ও ভদ্র পরিবারে প্রতিপালিত হন। মাদরাসাতুল জাওযীয়ায় তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পান্ডিত্য অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি স্বীয় যামানার অন্যান্য আলেমে দ্বীন থেকেও জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ সর্বাধিক উল্লেখ্য। ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ এর ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র ইবনুল কাইয়্যিমই ছিলেন তাঁর জীবনের সার্বক্ষণিক সাথী। ঐতিহাসিকদের ঐক্যমতে তিনি ৭১২ হিজরী সালে শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়ার সাথে সাক্ষাত করেন। এর পর থেকে শাইখের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথেই ছিলেন। এমনকি জিহাদের ময়দান থেকে শুরু করে জেলখানাতেও তিনি তাঁর থেকে আলাদা হননি। এভাবে দীর্ঘ দিন স্বীয় উস্তাদের সাহচর্যে থেকে যোগ্য উস্তাদের যোগ্য শিষ্য এবং শাইখের ইলম এবং দার্‌স-তাদরীসের সঠিক ওয়ারিছ হিসাবে গড়ে উঠেন। সেই সাথে স্বীয় পান্ডিত্য বলে এক অভিনব পদ্ধতিতে ইসলামী আকীদাহ ও তাওহীদের ব্যাখ্যা দানে পারদর্শিতা লাভ করেন।

তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি সুফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অতঃপর শাইখের সাহচর্য পেয়ে এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সুফীবাদ বর্জন করেন এবং তাওবা করে হিদায়াতের পথে চলে আসেন। তবে এ তথ্যটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয় বলে কতিপয় আলেম উল্লেখ করেছেন। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তিনি প্রথম জীবনে সুফী তরীকার অনুসারী ছিলেন, তবে এমনটি নয় যে, তিনি বর্তমান কালের পঁচা, নিকৃষ্ট ও শিরক-বিদআতে পরিপূর্ণ সুফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন; বরং তিনি পূর্ব কালের সেই সমস্ত সম্মানিত মনীষির পথ অনুসরণ করতেন, যারা পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস বর্জন করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আত্মশুদ্ধি, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন, ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকতেন এবং সহজ-সরল ও সাধারণ জীবন যাপন করতেন। আর এটি কোন দোষণীয় বিষয় নয়।

আল্লামা ইবনে তাইমীয়ার পর ইবনুল কাইয়্যিমের মত দ্বিতীয় কোন মুহাক্কিক আলেম পৃথিবীতে আগমন করেছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন তাফসীর শাস্ত্রে বিশেষ পান্ডিত্যের অধিকারী, উসূলে দ্বীন তথা আকীদাহর বিষয়ে পর্বত সদৃশ, হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং নুসূসে শরঈয়া থেকে বিভিন্ন হুকুম-আহকাম বের করার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়।

সুতরাং একদিকে তিনি যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়ার ইলমী খিদমাতসমূহকে একত্রিত করেছেন, এগুলোর অসাধারণ প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন, শাইখের দাওয়াত ও জিহাদের সমর্থন করেছেন, তাঁর দাওয়াতের বিরোধীদের জবাব দিয়েছেন এবং তাঁর ফতোয়া ও মাসায়েলের সাথে কুরআন ও সুন্নাহ্-এর দলীল যুক্ত করেছেন, সেই সাথে তিনি নিজেও এক বিরাট ইলমী খেদমত মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন।

ডাক্তারী বিজ্ঞানের আলেমগণ বলেন- আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর লিখিত কিতাব 'তিব্বে নববী'তে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে সমস্ত বিরল অভিজ্ঞতা ও উপকারী তথ্য পেশ করেছেন এবং চিকিৎসা জগতে যে সমস্ত বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, তা চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসাবেও পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন।

কাযী বুরহান উদ্দীন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- আকাশের নীচে তার চেয়ে অধিক প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী সে সময় অন্য কেউ ছিল না।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর কিতাবগুলো পাঠ করলে ইসলামের সকল বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী ভাষা জ্ঞানে ও শব্দ প্রয়োগে তিনি অত্যন্ত নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তার লেখনীর ভাষা খুব সহজ। তাঁর উস্তাদের কিছু কিছু লিখা বুঝতে অসুবিধা হলেও তাঁর কিতাবসমূহের ভাষা খুব সহজ ও বোধগম্য।

তার অধিকাংশ কিতাবেই দ্বীনের মৌলিক বিষয় তথা আকীদাহ ও তাওহীদের বিষয়টি অতি সাবলীল, প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় ফুটে উঠেছে। সুন্নাতে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা। বিদআত ও বিদআতীদের প্রতিবাদে তিনি ছিলেন স্বীয় উস্তাদের মতই অত্যন্ত কঠোর। লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সুন্নাত বিরোধী কথা ও আমলের মূলোৎপাটনে তিনি তাঁর সর্বোচ্চ সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেন নি। তাওহীদের উপর তিনি মজবুত ও একনিষ্ঠ থাকার কারণে এবং শিরক ও বিদআতের জোরালো প্রতিবাদের কারণে তাঁর শত্রুরা তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। তাকে গৃহবন্দী, দেশান্তর এবং জেলখানায় ঢুকানোসহ বিভিন্ন প্রকার মসীবতে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এত নির্যাতনের পরও তিনি স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়াননি।

❖ কর্মজীবন

জওযীয়া নামক মহল্লার ইমামতি, শিক্ষকতা, ফতোয়া দান, দাওয়াতে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং লেখালেখির মাধ্যমেই তিনি তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। যে সমস্ত মাসআলার কারণে তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তার মধ্যে এক সাথে তিন তালাকের মাসআলা, আল্লাহর নাবী ইবরাহীম খলীল (আলায়হিস সালাম) এর কবরে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার মাসআলা এবং শাফা'আত এবং নাবী-রসূলদের উসীলার মাসআলা অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর রহম করুন। এটিই

নাবী-রাসূলের পথ। যে মুসলিম আল্লাহর পথে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তাঁর জেনে রাখা উচিৎ যে, তিনি ইমামুল মুওয়াহ্হিদীন ইবরাহীম খলীল (আলায়হিস সালাম) এবং বনী আদমের সরদার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পথেই রয়েছেন। মুসলিম উম্মার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশাল দ্বীনি খেদমত রেখে গেছেন। তাঁর বেশ কিছু ইলমী খেদমত নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. الصواعق المرسلة (আস্ সাওয়ায়েকুল মুরসালাহ)

২. زاد المعاد في هدي خير العباد (যাদুল মা'আদ ফী হাদ্য়ী খাইরিল ইবাদ)

৩. مفتاح دار السعادة (মিফতাহু দারিস সাআদাহ)

৪. مدارج السالكين (মাদারিজুস্ সালিকীন)

৫. الكافية الشافية في النحو (আল-কাফীয়াতুশ শাফিয়া ফীন্ নাহু)

৬. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة (আল-কাফীয়াতুশ শাফীয়া ফীল ইনতিসার লিলফিরকাতিন নাজীয়াহ)

৭. الكلم الطيب والعمل الصالح (আল-কালিমুত তায়্যিবু ওয়াল আমালুস সালিহু)

৮. الكلام على مسألة السماع (আল-কালামু আলা মাসআলাতিস্ সামাঈ)

৯. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (হিদায়াতুল হায়ারা ফী আজভিবাতিল ইয়াহুদ ওয়ান্ নাসারা)

১০. المنار المنيف في الصحيح والضعيف (আলমানারুল মুনীফ ফীস্ সহীহ ওয়ায্ যঈফ)

১১ أعلام الموقعين عن رب العالمين (ইলামুল মআক্কীয়িন)

১২. الفروسية (আল-ফুরুসীয়াহ)

১৩. طريق الهجرتين وباب السعادتين (তরীকুল হিজরাতাইন ও বাবুস্ সাআদাতাইন)

১৪. الطرق الحكمية (আত্ তুরুকুল হুকামিয়াহ)

১৫. الفوائد (আল-ফাওয়ায়েদ)

১৬. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (হাদীল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ)

১৭. الوابل الصيب (আল-ওয়াবিলুস্ সাইয়্যিব)

১৮. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (উদ্দাতুস সাবিরীন ও যাখীরাতুশ্ শাকিরীন)

১৯. تهذيب سنن أبي داود (তাহ্যীবু সুনানে আবী দাউদ)

২০. الصراط المستقيم (আস্ সিরাতুল মুসতাকীম)

২১. شفاء العليل (শিফাউল আলীল)

২২. كتاب الروح (কিতাবুর রূহ্)

◈ এ ছাড়াও তাঁর আরও কিতাব রয়েছে, যা এখনও আমাদের নযরে পড়েনি।

তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও আখলাক-চরিত্র

আল্লামা ইবনে রজব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে বলেন- তিনি ছিলেন ইবাদতকারী, তাহাজ্জুদ গোজার, সলাতে দীর্ঘ কিরাআত পাঠকারী, সদা যিকির-আযকারে মশগুল, আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবা-ইসতেগফারকারী, আল্লাহর সামনে এবং তাঁর দরবারে কাকুতি-মিনতি পেশকারী। তিনি আরও বলেন- আমি তাঁর মত ইবাদত গোজার অন্য কাউকে দেখিনি, তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী অন্য কাউকে পাইনি, কুরআন, সুন্নাহ্ এবং তাওহীদের মাসআলা সমূহের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁর চেয়ে অধিক পারদর্শী অন্য কেউ ছিলনা। তবে তিনি মা'সুম তথা সকল প্রকার ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন না। দ্বীনের পথে তিনি একাধিকবার বিপদাপদ ও ফিতনার সম্মুখীন হয়েছেন। এ সব তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বরদাশত করেছেন। সর্বশেষে তিনি দামেস্কের দূর্গে শাইখ তকীউদ্দীনের সাথে বন্দী ছিলেন। শাইখের মৃত্যুর পর তিনি জেলখানা থেকে বের হন। জেল খানায় থাকা অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত থাকতেন।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর সম্পর্কে বলেন- আমাদের যামানায় ইবনুল কাইয়্যিমের চেয়ে অধিক ইবাদতকারী অন্য কেউ ছিলেন বলে জানিনা, তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ সলাত পড়তেন এবং রুকূ ও সিজদাহ লম্বা করতেন। এ জন্য অনেক সময় তাঁর সাথীগণ তাঁকে দোষারোপ করতেন। তথাপিও তিনি স্বীয় অবস্থানে অটল থাকতেন।

❖ তাঁর উস্তাদ বৃন্দ

- আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) যে সমস্ত আলেম-উলামার কাছ থেকে তালীম ও তারবীয়াত হাসিল করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেনঃ
- শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- আহমাদ বিন আব্দুদ্ দায়িম আল-মাকদেসী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- তাঁর পিতা কাইয়্যিমুল জাওযীয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আন্ নাবলেসী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- ইবনুস্ সিরাজী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- আল-মাজদ্ আল হাররানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- আবুল ফিদা বিন ইউসুফ বিন মাকতুম আলকায়সী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- হাফিয ইমাম আয-যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়ার ভাই শরফুদ্দীন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়াহ্ আন্ নুমাইরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- তকীউদ্দীন সুলায়মান বিন হামজাহ আদ্ দিমাস্কী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং আরও অনেকেই।

❖ তাঁর ছাত্রসমূহ

- ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর হাতে যে সমস্ত মনীষী জ্ঞান আহরণে ধন্য হয়েছিলেন, তাদের তালিকা অতি বিশাল। তাদের কতিপয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।
- বুরহান উদ্দীন ইবরাহীম বিন ইবনুল কাইয়্যিম।
- ইমাম ইবনে রজব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- হাফিয ইমাম ইবনে কাছীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- আলী বিন আব্দুল কাফী আস্ সুবকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবনে কুদামা আলমাকদেসী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।
- মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আলফাইরুযাবাদী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।

❖ মৃত্যু

মুসলিম উম্মার জন্য অসাধারণ ইলমী খেদমত রেখে এবং ইসলামী লাইব্রেরীর বিরাট এক অংশ দখল করে হিজরী ৭৫১ সালের রজব মাসের ১৩ তারিখে এই মহা মনীষী এ নশ্বর ইহধাম ত্যাগ করেন। দামেস্কের বাবে সাগীরের গোরস্থানে তাঁর পিতার পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। হে আল্লাহ্! তুমি তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান কর এবং তোমার রহমত দিয়ে তাঁকে ঘিরে নাও। আমীন!

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ:

আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আর তিনিই মাখলুক হতে যা ইচ্ছা নির্বাচন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"হে রসূল! তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং ইখতিয়ার (বাছাই) করেন। এ ব্যাপারে তাদের কোন ইখতিয়ার নেই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে"।[২]

এই আয়াতে ইখতিয়ার দ্বারা নির্বাচন, বাছাই ও চয়ন করা উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- ما كان لهم الخيرة অর্থাৎ (আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ার বা নির্বাচনে) বান্দার কোন অধিকার নেই। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন একাই সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি একাই সৃষ্টি থেকে যা ইচ্ছা বাছাই ও পছন্দ করেছেন। সুতরাং নির্বাচন, বাছাই ও চয়ন করার ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে তিনিই অধিক অবগত আছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾

"আল্লাহ্ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় রিসালাত প্রেরণ করতে হবে"।[৩] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾

"তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হল না? তারা কি তোমার পালনকর্তার রহমত বণ্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, তোমার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম"।[৪]

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের ইখতিয়ারের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র পছন্দ ও বাছাইয়ে তাদের কোন দখল নেই। এ বিষয়টি শুধু সেই সত্তার অধিকারে, যিনি তাদের রিযিক বণ্টন করেছেন এবং বয়স নির্ধারণ করেছেন। আর তিনিই সম্মানিত বান্দাদের মাঝে স্বীয় অনুগ্রহ ও রহমত ভাগ করেন। তিনি ভাল করেই জানেন কে নবুওয়াত, রিসালাত এবং অনুগ্রহ পাওয়ার হকদার আর কে এগুলো পাওয়ার হকদার নয়। তিনি স্বীয় বান্দাদের কাউকে

---

২. সূরা কাসাস-২৮:৬৮
৩. সূরা আনআম-৬:১২৪
৪. সূরা যুখরুফ-৪৩:৩১-৩২

অন্য কারও উপর মর্যাদা দিয়েছেন। মুশরিকরা যে শিরক ও যে প্রস্তাব ইখতিয়ার করেছিল, আল্লাহ্ তা‘আলা তার অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-

﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"আল্লাহর ইখতিয়ারে (বাছাইয়ে) তাদের কোন দখল নেই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি তার উর্ধ্বে"।[৫] যেহেতু মুশরিকদের শিরকের দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়না, তাই উপরোক্ত আয়াতে শুধু অন্য সৃষ্টিকর্তা থাকার প্রতিবাদ করা হয়নি; বরং তাদের শিরকী প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে। মোট কথা, মক্কার মুশরিকরা এটি দাবী করতনা যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে; বরং তারা বিশ্বাস করত, সৃষ্টিকর্তা এবং রিযিক দাতা একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলা। এই অর্থেই আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

"তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবেনা, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবেনা। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশীল"।[৬] আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেনা। তবে যে তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আশা করা যায়, সে সফলকাম হবে" আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। এ ব্যাপারে তাদের কোন ইখতিয়ার নেই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি তার অনেক উর্ধ্বে।"[৭] সুতরাং আল্লাহ্ তা‘আলা যেমন একাই সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাঁর সৃষ্ট বান্দাদের মধ্য হতে যারা তাওবা করে, ঈমান আনয়ন করে এবং সৎ আমল করে আল্লাহ্ তা‘আলার সর্বোত্তম বান্দায় পরিণত হয় এবং সফলকাম হয়, আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে পছন্দ ও নির্বাচন করেন। এই পছন্দ ও বাছাই করার বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর

---

৫. সূরা কাসাস-২৮:৬৮
৬. সূরা হাজ্জ-২২:৭৩-৭৪
৭. সূরা কাসাস-২৮:৬৭

হাতে। তিনি স্বীয় হিকমত ও ইলম অনুপাতে যাকে যোগ্য পান, তাকেই পছন্দ করেন ও নির্বাচন করেন। এই সমস্ত মুশরিকদের ইচ্ছা ও প্রস্তাব মোতাবেক তিনি কাউকে বাছাই করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শিরক ও শরীকসমূহ থেকে পবিত্র এবং এগুলোর অনেক উর্ধ্বে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাদের থেকে নাবী-রসূলদেরকে বাছাই ও নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার মহান হিকমতের দাবী অনুযায়ী এবং বনী আদমের স্বার্থেই এই বাছাই ও নির্বাচন। এতে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও পরামর্শ, প্রস্তাব এবং বাছাইয়ের কোন দখল নেই। আল্লাহ্ তা'আলার এই বাছাই, পছন্দ ও নির্বাচন পৃথিবীতে তাঁর রুবূবীয়াতের বিরাট এক নিদর্শন, তাঁর একত্বের সর্ব বৃহৎ দলীল, তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রমাণ এবং রসূলদের সত্যায়নের সুস্পষ্ট দলীল।

আল্লাহ্ তা'আলা সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মধ্যে হতে সর্বশেষ ও উপরেরটিকে তাঁর নিকটবর্তী ফিরিস্তাদের অবস্থানের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। এটিকে তাঁর কুরসী ও আরশের নিকটে রেখেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হতে যাকে ইচ্ছা এখানে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং অন্যান্য আকাশের উপর এই আকাশের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট ও ফযীলত। তা ছাড়া আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়াই সপ্তম আকাশের ফযীলতের জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলার মাখলুক সমূহের কোনটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়ার ধারাবাহিকতায় সমস্ত জান্নাতের উপর জান্নাতুল ফেরদাউসকে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আরশকে এর ছাদ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

এই নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিস্তাদের থেকে কতিপয়কে বাছাই ও পছন্দ করেছেন। যেমন জিবরীল, মিকাঈল এবং ইসরাফীল (আলায়হিস সালাম) কে ফিরিস্তাদের থেকে বাছাই করেছেন এবং অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

«اللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

"হে আল্লাহ্! তুমি জিবরীল, মিকাঈল এবং ইসরাফীলের প্রভু, আসমান-যমিনের সৃষ্টিকারী, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত, তুমি তোমার বান্দাদের মতভেদের বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী। যে হকের ব্যাপারে লোকেরা মতভেদে লিপ্ত রয়েছে, তোমার তাওফীকে আমাকে তাতে দৃঢ়পদ রাখ। তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করে থাক।[৮]

---

৮. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ রাতের সলাতের দুআ, মুসলিম, হাএ. হা/১৬৯৬ ইফা. হা/১৬৮১, আপ্র. হা/১৬৮৮ আবু দাউদ, আলএ. হা/৭৬৭,নাসাঈ, মাপ্র. হা/১৬২৫ সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪২০

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আদমের সন্তানদের থেকে আম্বীয়ায়ে কেরামদেরকে মুন্তাখাব (চয়ন) করেছেন। তাদের থেকেও আবার কতককে রসূল হিসাবে নির্বাচন করেছেন।

রসূলদের মধ্য হতে আবার পাঁচজন উলুল আয্মকে (সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন রসূলকে) বাছাই করেছেন। এই পাঁচ জনের আলোচনা সূরা আহযাব ও সূরা শুরায় করা হয়েছে। এই পাঁচজন থেকে আবার ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ﷺ কে খলীল (খাস বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এই নির্বাচন ও বাছাইয়ের ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্ তা'আলা আদমের সকল সন্তান থেকে ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) এর বংশধরকে বাছাই করেছেন। তাদের থেকে বাছাই করেছেন বনী কেনানার সন্তানদেরকে। বনী কেনানার সন্তানদের থেকে বাছাই করেছেন কুরাইশ সম্প্রদায়কে এবং কুরাইশ থেকে বনী হাশেমকে। সর্বশেষে বনী হাশেম থেকে আদমের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মুহাম্মাদ ﷺ কে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম দেশকে তাঁর আবাসস্থল বানিয়েছেন এবং তাঁর উম্মাতকে অন্যান্য সকল উম্মাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন।

এই উম্মাতের প্রথম সারির লোকদেরকে মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথী নির্বাচন ও নির্ধারণ করেছেন। তাদের মধ্যে আবার বদর যুদ্ধে ও বায়আতুর রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীগণ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বীন পালনে তারা ছিলেন অগ্রগামী, শরীয়তের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নে তারা ছিলেন সর্বাধিক অগ্রসর এবং তাদের আখলাক-চরিত্র ছিল সর্বাধিক পবিত্র ও উন্নত।

মুসনাদে আহমাদে মুআবীয়া বিন হায়দাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ﷺ বলেন- তোমাদের দ্বারা সত্তরটি উম্মাত পূর্ণ হবে। তার মধ্যে তোমরাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক সম্মানিত।

উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার লোকদের আখলাক, আমল এবং তাওহীদের প্রভাব তাদের প্রাধান্য ও ফযীলতের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জান্নাতে ও হাশরের ময়দানেও তাদের মর্যাদা হবে সুস্পষ্ট। রসূল ﷺ বলেন- কিয়ামতের দিন আমার সমস্ত উম্মাতকে একটি উঁচু স্থানে রাখা হবে। আর বাকী উম্মাতদের রাখা হবে অন্য একটি টিলায়। তবে আমার উম্মাতের স্থানটি অধিকতর উঁচু হবে। তারা আমার উম্মাতের দিকে মাথা উঠিয়ে তাকাবে। তিরমিযী শরীফে বুরায়দা বিন হুসাইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ﷺ বলেন-

«أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَة صف ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ»

"জান্নাতবাসীগণ একশত বিশ কাতার হবে। এই উম্মাত (উম্মাতে মুহাম্মাদী) থেকে আশি কাতার। আর বাকী সমস্ত উম্মাত থেকে হবে চল্লিশ কাতার"।[৯] ইমাম তিরমিযী বলেন- এই হাদীসটি হাসান। অন্য হাদীছে রয়েছে, নাবী ﷺ বলেন- আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি, তোমরা হবে জান্নাত বাসীদের অর্ধেক। এই হিসাবে ষাট কাতার হওয়ার কথা। এর বেশী নয়। উভয় বর্ণনার মধ্যকার দ্বন্ধের সমাধানে একাধিক কথা রয়েছে। অর্ধেকের বর্ণনাটিই অধিকতর সঠিক। অথবা বলা যায় যে, প্রথমে নাবী ﷺ চেয়েছিলেন, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তাঁর উম্মাত থেকে হোক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর

---

৯. মিশকাতুল মাসাবীহ, অধ্যায়ঃ জান্নাত ও জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য হাএ. হা/৫৬৪৪। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৫৪৬, সহীহ ইবনে মাজাহ,তাও.হা/৪২৮৯

প্রিয় খলীলকে জানিয়ে দিলেন যে, জান্নাত বাসীদের একশত বিশ কাতারের মধ্যে হতে তাঁর উম্মাত হবে আশি কাতার। সুতরাং উভয় হাদীছের মধ্যে কোন দ্বন্দ অবশিষ্ট রইলনা। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য কেবল পবিত্র বস্তুই পছন্দ করেন

সুতরাং উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে জানা গেল, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু হতে কেবল পবিত্র বস্তুই পছন্দ করেছেন এবং নিজের জন্য তা নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছুকেই ভালবাসেন না। আল্লাহর দরবারে পবিত্র কথা, পবিত্র আমল এবং পবিত্র দান-খয়রাতই পৌঁছে।

পবিত্র বস্তু সংগ্রহ ও নির্বাচন করা বা না করার মধ্যেই বান্দার সৌভাগ্যবান হওয়া বা দুর্ভাগা হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে। পবিত্র ব্যক্তির জন্য কেবল পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করা শোভনীয়। পবিত্র বান্দা কেবল পবিত্র জিনিষ পেয়েই সন্তুষ্ট হয়, তা পেয়েই স্থির হয় এবং মানুষের আত্মা তা পেয়েই প্রশান্তি লাভ করে।

বনী আদমের কথা-বার্তার মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল পবিত্র ও উত্তম কথাগুলোকেই পছন্দ করেন। পবিত্র কথা ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অন্য কোন কথা উর্ধ্বমূখী হয়না। তিনি অশ্লীল বাক্য, মিথ্যা কথা, গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং প্রত্যেক অপবিত্র কথাকে ঘৃণা করেন।

বান্দার আমলসমূহের ক্ষেত্রেও একই কথা। তা থেকে পবিত্র ও উত্তম ছাড়া অন্য কিছুকেই আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন না। পবিত্র আমল বলতে তাকেই বুঝায়, যাকে অবিকৃত স্বভাব ও রুচি সুন্দর বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, শরীয়তে মুহাম্মাদী যার উপর জোর দিয়েছে এবং সুস্থ বিবেক যাকে পবিত্র বলেছে। আর তা হচ্ছে, বান্দা এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করবেনা, নিজের প্রবৃত্তি ও মর্জীর উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পছন্দকে প্রাধান্য দিবে, আল্লাহর রেযামন্দি হাসিলের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাবে, সাধ্যানুসারে আল্লাহর বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করবে এবং মানুষের সাথে কেবল সে রকম আচরণই করবে, যা নিজের সাথে করাকে পছন্দ করে।

সেই সাথে স্বভাব-চরিত্রও পবিত্র এবং সুউচ্চ হওয়া আবশ্যক। আল্লাহর প্রিয় ও পবিত্র বান্দা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আখলাক-চরিত্র ছিল পুত-পবিত্র। সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, ধৈর্যশীলতা, দয়া, ওয়াদা-অঙ্গিকার পূর্ণ করা, সত্য বলা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, বিনয়-নম্রতা, নরম-ভদ্র ব্যবহার, মানুষের কাছে কিছু চাওয়া থেকে চেহারাকে হেফাজত করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে নত হওয়া থেকে বিরত থাকা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। এই পবিত্র স্বভাব ও চারিত্রিক গুণাবলী আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়।

এমনি বান্দার উচিৎ কেবল পবিত্র খাদ্যই গ্রহণ করা। আর পবিত্র খাদ্যই হালাল, সুস্বাদু এবং শরীর এবং 'রূহের জন্য সর্বাধিক উপকারী। সেই সাথে বান্দার ইবাদত-বন্দেগীর জন্যও নিরাপদ।

পবিত্র মুমিন বান্দার উচিৎ বিবাহ-সাদীর ক্ষেত্রেও কেবল পবিত্রকেই বেছে নেওয়া, সুগন্ধির মধ্যে হতে কেবল সর্বোত্তম সুঘ্রাণকেই নির্বাচন করা এবং পবিত্র সাথীকেই নিজের জন্য চয়ন করা। সুতরাং এমন বন্ধু গ্রহণ করা উচিৎ, যার আত্মা পবিত্র, যার শরীর পবিত্র, যার চরিত্র উত্তম, যার আমল ভাল, যার কথা পবিত্র, যার খাদ্য হালাল, যার পানীয় উত্তম, যার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র, যার বিবাহশাদী

পবিত্র, যার ভিতর-বাহির পবিত্র, যার প্রস্থান পবিত্র এবং আশ্রয়স্থলসহ সবকিছুই পবিত্র। এমন পবিত্র লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায় এই বলে যে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যে আমল করতে, তার প্রতিদান হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ কর"।[১০] কিয়ামতের দিন আল্লাহর ফিরিস্তাগণ এই প্রকার লোকদেরকেই স্বাগত জানিয়ে বলবেনঃ

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উম্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনত কারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার"।[১১] উপরের আয়াতে فادخلوها এর মধ্যে যে ف অক্ষরটি রয়েছে, তা সাবাবীয়া তথা 'কারণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র জিনিষ নির্বাচন ও গ্রহণ করার কারণেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

"দুঃশ্চরিত্র (অপবিত্র) নারীরা দুশ্চরিত্র (অপবিত্র) পুরুষদের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র (অপবিত্র) পুরুষরা দুশ্চরিত্র (অপবিত্র) নারীদের জন্যে। সচ্চরিত্র (পবিত্র) নারীগণ সচ্চরিত্র (পবিত্র) পুরুষদের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষগণ সচ্চরিত্র নারীদের জন্যে। তাদের সম্পর্কে লোকেরা যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মান জনক জীবিকা"।[১২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'টি মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) অপবিত্র কথা-বার্তা কেবল অপবিত্র লোকদের জন্যই। আর পবিত্র লোকগণই পবিত্র কথা-বার্তা বলে থাকে। (২) পবিত্র নারীগণ শুধু পবিত্র পুরুষদের জন্যই হালাল ও শোভনীয়। আর অপবিত্র নারীরা কেবল অপবিত্র পুরুষদের জন্যই। উপরোক্ত আয়াতটি উল্লেখিত দুই অর্থ ছাড়া অধিকতর আম (ব্যাপক) অর্থে ব্যবহার করতে কোন মানা নেই। কোন খাস (বিশেষ) অর্থে ব্যবহার করার সুযোগ নেই।

---

১০. সূরা নাহল-১৬:৩২
১১. সূরা যুমার-৩৯:৭৩-৭৪
১২. সূরা নূর-২৪:২৬

সুতরাং পবিত্র কথা, পবিত্র আমল এবং পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র কথা, পবিত্র আমল এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের জন্য। অপর পক্ষে অপবিত্র কথা, অপবিত্র কাজ ও অপবিত্র নারীগণ অপবিত্র পুরুষদের জন্য। এমনি অপবিত্র কথা, অপবিত্র কাজ এবং অপবিত্র পুরুষগণ অপবিত্র নারীদের জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত পবিত্র মানুষ ও সকল পবিত্র বস্তুকে জান্নাতের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং সকল অপবিত্র বনী আদম ও অপবিত্র জিনিষকে জাহান্নামে রাখবেন।

সুতরাং ঘর বা বাসস্থান মোট তিনটি। (১) এমন একটি ঘর, যা কেবল পবিত্র লোকদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। অপবিত্র লোকদের জন্য এখানে প্রবেশাধিকার নেই। এটি সকল পবিত্র মানুষ ও বস্তুকেই নিজের মধ্যে একত্রিত করবে। আর সেটি হচ্ছে জান্নাত। (২) এমন একটি ঘর, যাকে প্রস্তুত করা হয়েছে অপবিত্র নারী-পুরুষ ও অপবিত্র বস্তুর জন্যে। নিকৃষ্ট লোকেরাই সেখানে প্রবেশ করবে। সেটি হচ্ছে জাহান্নাম। (৩) এমন একটি ঘর, যেখানে পবিত্র-অপবিত্র নর-নারী এবং ভাল-মন্দ সকল জিনিষ এক সাথে মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে এই পার্থিব জগত তথা দুনিয়ার ঘর। ভাল-মন্দের মিশ্রণ ও মিলন ঘটিয়েই দয়াময় আল্লাহ্ এখানে বান্দাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। কিন্তু যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অপবিত্রকে পবিত্র থেকে আলাদা করে ফেলবেন। পবিত্র নিয়ামাত ও নিয়ামাতপ্রাপ্ত লোকদেরকে একটি ঘরে (জান্নাতে) আলাদা করবেন। এতে তাদের সাথে অন্য কেউ থাকবেনা। আরেকটি ঘরে অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তু এবং খবীছ (নিকৃষ্ট) লোকদেরকে একত্রিত করবেন। সেখানে তারা ব্যতীত অন্যরা থাকবেনা। পরিশেষে শুধু দু'টি ঠিকানাই অবশিষ্ট থাকবে। প্রথম ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত। পবিত্র লোকেরাই সেখানে প্রবেশ করবে। আর দ্বিতীয় ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। অপবিত্র ও পাপিষ্ঠরাই সেখানে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যবান এবং হতভাগ্যের জন্য বেশ কিছু আলামত নির্ধারণ করেছেন। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ। সৌভাগ্যবান পবিত্র লোক কেবল পবিত্র আমলই করবে এবং পবিত্র কাজ করাই তার জন্য শোভনীয়। তার থেকে পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু বের হয়না, পবিত্র পোশাক ছাড়া সে অন্য পোশাক পরিধান করেনা।

আর হতভাগ্য অপবিত্র লোক কেবল অপবিত্র কাজ করে থাকে এবং অপবিত্র কাজই তার জন্য শোভনীয়। অপবিত্র আমল ব্যতীত তার থেকে অন্য কিছু প্রকাশ পায়না। নিকৃষ্ট এবং অপবিত্র লোকের অন্তর, জবান এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে কেবল নিকৃষ্ট বস্তুই বিস্ফোরিত হয়। আর পবিত্র লোকের অন্তর, জবান এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে কেবল পবিত্র বস্তুই বিকশিত হয় ও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কখনও কখনও একই ব্যক্তির মধ্যে উভয় প্রকার অভ্যাসই পাওয়া যায়। এই উভয় প্রকার অভ্যাসের যেটি বান্দার উপর জয়লাভ করে, বান্দা সেই প্রকার লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে। অর্থাৎ যার মধ্যে উত্তম ও পবিত্র গুণাবলী বেশী পাওয়া যাবে, তাকে পবিত্র লোকদের ঠিকানায় স্থান দেয়া হবে। আর যার মধ্যে এর বিপরীত গুণাবলী পাওয়া যাবে, তাকে অপবিত্র লোকদের ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান, তাহলে তিনি তার মৃত্যুর পূর্বেই তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করে দেন। দোযখের আগুন দিয়ে তাকে পবিত্র করার প্রয়োজন পড়েনা। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাওবায়ে নাসুহ তথা খাঁটি তাওবা করার তাওফীক দেন, পাপ কাজসমূহ মোচনকারী সৎ

আমল করার সুযোগ করে দেন এবং এমন মসীবতে ফেলেন, যা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। পরিশেষে এমন অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে যে, তার কোন গুনাহ্ থাকেনা।

আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতের অন্যতম দাবী হচ্ছে, কোন বান্দা অপবিত্র আমল নিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে আগমণ করবেনা। এই জন্যই যাদের মধ্যে পাক-নাপাক উভয়ের মিশ্রণ ঘটেছে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করিয়ে পবিত্র ও পরিষ্কার করা হবে। যখন সে দোষ-ত্রুটি হতে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার পাশে এবং তাঁর পবিত্র বান্দাদের জন্য নির্ধারিত বাসস্থানে বসবাসের উপযোগী হবে। এই প্রকার লোকদের জাহান্নামে অবস্থান এবং তা থেকে দ্রুত বা দেরীতে বের হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে তাদের দ্রুত বা দেরীতে পরিষ্কার হওয়ার উপর। তাদের মধ্যে যে দ্রুত পরিষ্কার হতে পারবে, সে অতি দ্রুত জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। আর যার পরিষ্কার হতে দেরী হবে, সে দেরীতে বের হবে।

মুশরিকরা যেহেতু মূলতই নাপাক, তাই আগুন তাদের নাপাকী দূর করবে না। আগুন থেকে তারা যদি বেরও হয়, তথাপিও পুনরায় তাতে অপবিত্র হয়েই প্রবেশ করবে। যেমন কুকুর সমুদ্রে প্রবেশ করে তাতে ডুব দিয়ে বের হয়ে আসলেও সে নাপাকই থেকে যায়। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের উপর জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।

আর পবিত্র মুমিনগণ যখন অপবিত্র আমল ও আখলাক হতে মুক্ত থাকবে, তখন তাদের উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে। কেননা তাদের মধ্যে এমন কোন খারাপ বিষয় থাকবেনা, যা থেকে তাদেরকে পবিত্র করার প্রয়োজন হতে পারে। সেই সত্তা অতীব পবিত্র, যার হিকমত মানবীয় বিবেক-বুদ্ধিকে ধাঁধায় নিপতিত করে এবং হতবুদ্ধি করে ফেলে।

নাবী ﷺ এর হিদায়াত সম্পর্কে জানা আবশ্যক

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল, রসূল ﷺ এবং তিনি যেই সুন্নাত ও দ্বীন নিয়ে আগমণ করেছেন, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তাঁর আনুগত্য করার প্রয়োজন হচ্ছে সকল প্রকার প্রয়োজনের উর্ধ্বে। কেননা রসূল ﷺ-এর মাধ্যম ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্র বস্তুকে পার্থক্য করা এবং আল্লাহর রেযামন্দি অর্জন করা সম্ভব নয়। নাবী ﷺ যে বাণী, আমল, আখলাক ও হিদায়াত নিয়ে এসেছেন, তার সবই পবিত্র। সুতরাং তাঁর কথা, কাজ এবং আখলাক দিয়ে উম্মাতের সকল কথা, আমল ও আখলাকসমূহ ওজন করা হবে। তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই হিদায়াত প্রাপ্তগণ পথভ্রষ্টদের থেকে আলাদা হবেন। বান্দার যত প্রয়োজন রয়েছে, তার চেয়ে নাবী ﷺ-এর হিদায়াত সম্পর্কে জানা ও তাঁর অনুসরণের প্রয়োজন সর্বাধিক। কেননা তিনি যে পবিত্র সুন্নাত ও হিদায়াত নিয়ে এসেছেন, সে সম্পর্কে যে ব্যক্তি অজ্ঞ থাকবে, তার জীবনে বিভ্রান্তি শুরু হবে এবং সে ঐ মাছের মতই হবে, যাকে পানি থেকে উঠিয়ে ডাঙ্গায় ফেলে রাখা হয়েছে। সুতরাং যে বান্দা নাবী-রসূলের হিদায়াত থেকে দূরে থাকবে, তার অবস্থা এই মাছের ন্যায়ই হবে। শুধু তাই নয়; বরং তার অবস্থা এর চেয়েও অধিক ভয়াবহ হবে। জীবন্ত ও সতেজ আত্মার অধিকারী ব্যতীত অন্য কেউ এই মহান সত্যটি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। যাদের অন্তর মৃত, তারা এ বিষয়টি অনুভবই করতে পারেনা।

যেহেতু উভয় জগতের (ইহ-পরকালের) সফলতা নাবী ﷺ-এর বরকতময় জীবনী এবং তাঁর সুন্নাতে তাইয়্যিবাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও তা বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল, তাই প্রত্যেক নাজাত ও সৌভাগ্যকামী লোকের জন্য জরুরী হচ্ছে, নাবী ﷺ , তাঁর পবিত্র সীরাত, তাঁর সুন্নাতে তাইয়্যিবা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। যাতে করে সে জাহেল ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর পবিত্র অনুসারী ও সাথীদের কাতারে শামিল হতে পারে।

কিছু লোক এমন রয়েছে, যে নাবী ﷺ এর পবিত্র জীবনী, তাঁর সুন্নাত ও হিদায়াতের আলো থেকে সম্পূর্ণ মাহরূম (বঞ্চিত), কেউ বা তা থেকে খুব সামান্য গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছে। আবার কতিপয় লোক এ থেকে পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। বস্তুতঃ সকল প্রকার ফজল ও করম (অনুগ্রহ ও নিয়ামাত) আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা অফুরন্ত কল্যাণের মালিক।

ওযূর ক্ষেত্রে রসূল ﷺ এর হিদায়াত

অধিকাংশ সময় তিনি প্রত্যেক সলাতের জন্য নতুন করে ওযূ করতেন। কখনও এক ওযূ দিয়ে একাধিক সলাত পড়তেন। তিনি এক মুদ (আনুমানিক ৫০০ গ্রাম) পানি দিয়ে ওযূ করতেন। কখনও তার চেয়ে কম বা বেশী পরিমাণ পানি ব্যবহার করতেন। মূলতঃ তিনি ওযূতে সামান্য পানি খরচ করতেন এবং উম্মাতকে ওযূর মধ্যে পানি অপচয় করতে নিষেধ করতেন।

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কখনও ওযূর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করেছেন। আবার কখনও দুইবার করে আবার কখনও তিনবার করেও ধৌত করেছেন।

আরও প্রমাণিত আছে যে, তিনি কোন কোন অঙ্গ দুইবার আবার কোনটি তিনবার ধৌত করেছেন। কখনও তিনি এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করতেন এবং নাক পরিষ্কার করতেন। কখনও দুই অঞ্জলি দিয়ে আবার কখনও তিন অঞ্জলি দিয়েও অনুরূপ করতেন। এক অঞ্জলি পানি দিয়ে তা করার সময় অর্ধেক মুখে দিতেন আর বাকী অর্ধেক নাকে প্রবেশ করাতেন। দুই বা তিন অঞ্জলি পানির মাধ্যমে কুলি করলে এবং নাক ঝাড়লেও প্রত্যেক অঞ্জলির একাংশ মুখে এবং অন্যাংশ নাকে দেয়াও সম্ভব। আর আলাদাভাবে মুখে পানি দিয়ে কুলি করা এবং তারপর আরেক অঞ্জলি পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করাও বৈধ। তিনি ডান হাতের অঞ্জলি থেকে নাকে পানি প্রবেশ করাতেন এবং বাম হাত দিয়ে নাক ঝাড়তেন ও পরিষ্কার করতেন।

ওযূ করার সময় তিনি পূর্ণ মাথা মাসাহ করতেন। দুই হাত দিয়ে মাথার প্রথম থেকে শেষ ভাগ পর্যন্ত মাসাহ করতেন। মাথার শুধু একাংশ মাসাহ করে অন্যান্য অংশ ছেড়ে দেয়ার কথা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর মাথায় যখন পাগড়ি থাকতো, তখন তিনি মাথার প্রথমাংশ মাসাহ করতেন আর পাগড়ির উপর দিয়ে মাসাহ পূর্ণ করতেন।

কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ব্যতীত তিনি কখনই ওযূ সমাপ্ত করেন নি। প্রত্যেক ওযূতেই তিনি তা করতেন। জীবনে একবারও এই কাজ দুইটিতে ত্রুটি করেছেন বলে প্রমাণিত হয় নি।

ওযূর মধ্যে কুরআনে বর্ণিত নিয়মে ধারাবাহিকভাবে অঙ্গগুলোকে ধৌত করতেন। অর্থাৎ প্রথমে মুখ, তারপর হাত, অতঃপর মাথা মাসাহ এবং সবশেষে পা ধৌত করতেন। অনুরূপভাবে তিনি অঙ্গগুলো পরপর অর্থাৎ একটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই অন্যটি ধৌত করতেন। কখনও তিনি এর ব্যতিক্রম করেন নি। পায়ে চামড়ার বা সাধারণ মোজা না থাকলে তিনি তা ধৌত করতেন। মাথা মাসাহ করার সময় তিনি কানের ভিতর ও বাহিরের অংশও মাসাহ করতেন। নতুন করে পানি নিয়ে কান মাসাহ করার কথা সহীহ লিষ্টসূত্রে প্রমাণিত নয়। ঘাড় মাসাহ করার ক্ষেত্রে কোন সহীহ হাদীস নেই। ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার দু'আর ক্ষেত্রে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই বানোয়াট। ওযূর শুরুতে নাবী ﷺ শুধু বিসমিল্লাহ্ বলতেন। আর শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।'[১৩] সুনানে নাসাঈ এ ব্যাপারে আরেকটি দু'আ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

ওযূর শুরুতে তিনি কখনই نَوَيْتُ বলেন নি অর্থাৎ ওযূর নিয়ত মুখে উচ্চারণ করেন নি। তাঁর কোন সাহাবী থেকেও এমনটি করার কথা প্রমাণিত নেই। তিনবারের বেশী কখনই তিনি ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করেন নি। অনুরূপ কনুই এবং টাখনুর সীমানা ছেড়ে উপরের দিকে পানি ঢেলেছেন বলে প্রমাণিত হয় নি। ওযূ করার পর কাপড় দিয়ে ভিজা অঙ্গগুলো মুছে ফেলাও তাঁর অভ্যাস ছিলনা। কখনও কখনও তিনি দাঁড়ি খেলাল করতেন, তবে সব সময় তিনি তা করতেন না। আঙ্গুল খেলালের ক্ষেত্রেও অনুরূপ করতেন। সর্বদা তা করতেন না। হাতে পরিহিত আংটিকে নাড়ানোর বিষয়ে একটি যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

১৩. সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৫৫, ইফা. হা/৫৫, মাশা. হা/৫৫, মিশকাত, হাএ. হা/২৮৯সহীহ, আলবানী রহ.

মোজার উপর মাসাহ্ করা ও তার সময়সীমা

সফর ও নিজ বাড়ীতে অবস্থান করার সময় মোজার উপর মাসাহ করার হাদীস সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত সময় নির্ধারণ করেছেন। তিনি মোজার উপরের অংশ মাসাহ করতেন। কাপড়ের মোজার উপরও তিনি মাসাহ করতেন। এমনকি জুতার উপর মাসাহ করার হাদীসও সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি শুধু পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন এবং মাথার প্রথমাংশ মাসাহ করে বাকী অংশের উপর পরিহিত পাগড়ির উপর দিয়েও মাসাহ করেছেন। তবে সম্ভবতঃ বিশেষ প্রয়োজনে তা করেছেন। এও হতে পারে যে মোজার উপর মাসাহ করার ন্যায় সকল অবস্থাতেই তা জায়েয। এটিই অধিক সুস্পষ্ট। আল্লাহই ভাল জানেন।

তাঁর পা দু'টি যখন মোজা দ্বারা ঢাকা থাকত তখন তিনি তার উপর মাসাহ করতেন এবং খালি থাকলে তা ধৌত করতেন।

তায়াম্মুম করার বিধান ও পদ্ধতি

তায়াম্মুম করার সময় তিনি মাটিতে একবার হাত লাগিয়েই মুখমন্ডল এবং উভয় হাত মাসাহ করতেন। যেই যমীনের উপর তিনি সলাত পড়তেন তাতেই তিনি তায়াম্মুম করতেন। শুকনো মাটি, বা বেলে মাটি এবং কাদাসহ সকল শ্রেণীর মাটি দিয়েই তায়াম্মুম করা বৈধ। সহীহ সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তির নিকট যখনই সলাতের সময় উপস্থিত হবে তখন তার সাথেই রয়েছে মাসজিদ ও সলাতের জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ তথা তায়াম্মুমের জন্য মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু। রসূল ﷺ এবং তাঁর সাথীগণ যখন তাবুক যুদ্ধে বের হলেন তখন মরুভূমির বালুময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। তাদের সাথে অতি সামান্য পরিমাণ পানি ছিল। তিনি এই সফরে সাথে মাটি নিয়েছিলেন বা মাটি সাথে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন বলে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। তাঁর কোন সাহাবীও এমনটি করেন নি। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে চিন্তা করবে সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, নাবী ﷺ বালি দিয়েই তায়াম্মুম করতেন।

প্রত্যেক সলাতের জন্য নতুনভাবে তায়াম্মুম করেন নি বা তা করার আদেশ দেন নি। বরং তিনি সাধারণতঃ তায়াম্মুম করেছেন এবং তাকে ওযূর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে ওযূর হুকুম-আহকাম তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যতিক্রম কিছু থাকলে অবশ্যই তা বর্ণিত হত।

নাবী ﷺ এর সলাতের পদ্ধতি

সলাতে দাঁড়ানোর সময় রসূল ﷺ 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এর পূর্বে তিনি কোন কিছুই পাঠ করেন নি। সলাতের শুরুতে তিনি মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেন নি। সাহাবী, তাবেঈ এবং চার মাজহাবের ইমামদের কেউ এটিকে মুস্তাহাব বলেননি।

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় তিনি اَللهُ أَكْبَر 'আল্লাহু আকবার' বাক্যটি পাঠ করতেন। এ ছাড়া তিনি অন্য কিছুই পাঠ করতেন না। তাকবীর পাঠ করার সময় তিনি উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ খোলা রেখে এবং কিবলামুখী করে কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন। কাঁধ পর্যন্ত উঠানোর কথাও বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ডান হাতের কব্জি ও বাহুকে বাম হাতের কবজি ও বাহুর উপর স্থাপন করতেন। উভয় হাত রাখার স্থান সম্পর্কে রসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে ইমাম আবু দাউদ আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সলাতে এক হাতের কব্জিকে অন্য হাতের কব্জির উপর রাখা সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত।[১৪] তাকবীরে তাহরীমার পর কখনও তিনি এই দু'আটি (ছানাটি) পড়ে সলাত শুরু করতেনঃ

---

১৪. আবু দাউদ, আলএ. হা/৭৫৬, মূল কিতাব যাদুল মাআদে শুধু ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার কথা আছে। সেখানে এই হাদীসটি নেই। আর মুখতাসার যাদুল মাআদের কোন কোন ছাপায় ব্র্যাকেট দিয়ে আটকিয়ে হাদীসটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার হাদীসটির তাখরীজ ও তাহকীক প্রসংঙ্গে আসি। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেনঃ মুহাদ্দিছদের সর্বসম্মতিক্রমে হাদীসটি যঈফ। সুতরাং যেখানে ইমামগণ হাদীছকে যঈফ বলেছেন, তাই ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তা বর্ণনা করে যদি চুপ থাকতেন তারপরও তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করার কোন সুযোগ ছিল না। কেননা তিনি এ রকম অনেক হাদীসের ব্যাপারেও নিরবতা অবলম্বন করেছেন। পরবর্তীতে অন্যান্য আলেমগণ সেগুলোকে যঈফ বা বানোয়াট বলেছেন। তারপরও তিনি এই হাদীসের বিষয়ে চুপ থাকেন নি। বরং ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন- আমি আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ এই হাদীসের অন্যতম রাবী আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক আল-কুফী যঈফ। বিস্তারিত দেখুনঃ আউনুল মাবুদ (২/৩২৩)।

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেনঃ সলাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা সুন্নাত। যেমন-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِى الصَّلَاةِ

" অর্থ: সাহাল ইবন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদেরকে স্বলাতে ডান হাত বাম হাতের যিরার উপর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হত।"। (বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদ- ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা, তাও. হা/৭৪০, আপ্র. হা/৬৯৬, ইফা.হা/৭০৪, মুয়াত্তা মালেক, মাশা. হা/৫৪৬, মিশকাত, হাএ. হা/৭৯৮)। কিন্তু হাত দু'টিকে কোন স্থানে রাখবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, হাত দু'টি বুকের উপর রাখবে। ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى صَدْرِهِ

"নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করতেন"। (দেখুনঃ ইবনে খুযায়মা মাশা. হা/৪৭৯) হাদীসটিতে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও এক্ষেত্রে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের তুলনায় এটিই সর্বাধিক শক্তিশালী। আর বুকের বাম সাইডে অন্তরের উপর হাত বাঁধা একটি ভিত্তিহীন বিদআত। নাভীর নীচে হাত বাঁধার ব্যাপারে আলী থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তা দুর্বল। ওয়ায়েল বিন হুজর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অধিক শক্তিশালী। বুকের উপর হাত রাখার ব্যাপারে ওয়ায়েল বিন হুজর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত সহীহ ইবনে খুযায়মাতে অন্য একটি হাদীছ রয়েছে। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ

صَلَّيْت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدْره

আমি রসূল ﷺ এর সাথে সলাত পড়েছি। তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করেছেন। সুতরাং এই হাদীসটিও বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নাত হওয়ার একটি শক্তিশালী দলীল। আরও বিস্তারিত জানার জন্য ভারত বর্ষের

أَللّٰهُـمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّـنِيْ مِـنَ الْخَطَايَـا كَمَـا يُـنَقَّى الثَّـوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপসমূহের মাঝে এমন দুরত্ব সৃষ্টি করে দাও যেমন দুরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমুহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমনভাবে পাপাচার থেকে পরিস্কার করে দাও যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে ধৌত করে পরিচ্ছন্ন করা হয়"।[১৫] তিনি কখনও এই দু'আটি পাঠ করতেন-

وَجَّهْتُ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَـاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِـكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْـتَ. أَنْـتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى جَمِيعًـا إِنَّـهُ لاَ يَغْفِـرُ الذُّنُـوبَ إِلاَّ أَنْـتَ وَاهْـدِنِى لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِى لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَـنِّى سَـيِّئَهَا إِلاَّ أَنْـتَ لَبَّيْـكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"আমি একমূখী হয়ে স্বীয় মুখমন্ডল ঐ সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেকদের অন্তর্ভূক্ত নই। আমার সলাত, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্যে। তার কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। হে আল্লাহ! তুমি এমন বাদশাহ যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার বান্দা। আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি।

আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও। তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই। তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করো। তুমি ব্যতীত আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারেনা। তুমি আমার থেকে খারাপ চরিত্রগুলো দূর করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার থেকে খারাপ চরিত্রগুলো দূর করতে সক্ষম নয়। হে আমার প্রভু! আমি তোমার হুকুম পালন করতে প্রস্তুত ও উপস্থিত আছি। আমি তোমার আনুগত্যের জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার উভয় হস্তেই নিহিত। অকল্যাণকে তোমার দিকে সম্পৃক্ত করা শোভনীয় নয়। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার দিকে মুখাপেক্ষী ও নিজেকে তোমার উপর সোপর্দকারী এবং তোমার দিকেই আমি প্রত্যাবর্তনকারী। তুমি বরকমতময় ও মহিমান্বিত। তোমার কাছেই আমি ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকটই তাওবা করছি।"[১৬]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা হায়াত সিন্দি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) যিনি কুতুবে সিত্তার উপর টিকা লিখেছেন, তাঁর বিরচিত কিতাব فتح الغفور في وضع اليدين فوق الصدور (ফাতহুল গাফুর ফী ওয়ায-ইল ইয়াদাইনে ফাওকাস্ সুদুর) দেখে নেয়া যেতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

১৫. বুখারী, অধ্যায়ঃ তাকবীরে তাহরীমার পর কী বলবে?, বুখারী, তাও. হা/৭৪৪, ইফা. হা/৭০৮, আপ্র. হা/৭০০ মুসলিম, হাএ. হা/১২৪১, ইফা. হা/১২৩০, ইসে. হা/১২৪২, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৬৫৬, নাসায়ী, মাপ্র. হা/ ৮৯৫, মিশকাত, হাএ. হা/৮১২।

১৬ .মুসলিম হাএ. হা/১৬৯৭, ইফা. হা/১৬৮২, ইসে. হা/১৬৮৯,

তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে এই দু'আটি তাহাজ্জুদ সলাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। কখনও কখনও তিনি এই দু'আটিও পড়তেন-

«اللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

"হে আল্লাহ! তুমি জিবরীল, মীকাঈল এবং ইসরাফীলের প্রভু। আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব বিষয়েই তুমি অবগত। তোমার বান্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয় তুমি সে বিষয়ের ফয়সালাকারী। যেই সত্য সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো। অর্থাৎ তুমি আমাকে হক ও হিদায়াতের উপর অবিচল রাখো। নিশ্চয়ই তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকো"।[১৭]

আবার কখনও তিনি তাকবীরে তাহরীমার পর এই দু'আও পড়তেন

«اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ»

"হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমি আসমান-যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থিত সকল বস্তুর আলো। তোমার জন্য সকল প্রশংসা। আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে তুমি ঐ সব বস্তুর অধিকর্তা। তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমি সত্য, তোমার অঙ্গিকার সত্য, কিয়ামতে তোমার সাক্ষাত সত্য, তোমার কথা সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নাবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ ﷺ সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পন করেছি। তোমার উপর ভরসা করেছি। তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি। তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত হয়েছি। তোমার নিকটই সকল বিষয় মীমাংসার জন্য পেশ করেছি। তুমি আমার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দাও। যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি। তুমি যাকে চাও আগে কর বা অগ্রসর কর এবং তুমিই যাকে চাও পিছিয়ে দাও। তুমি ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই।[১৮]

উপরে বর্ণিত সবগুলো দু'আই নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমার পর তিনি নিম্নের দু'আটির মাধ্যমে সলাত শুরু করতেনঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

১৭.আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সলাত শুরু করার দুআ, আবু দাউদ,আলএ. হা/৭৬৭, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪২০

১৮. বুখারী, অধ্যায়ঃ রাতের তাহাজ্জুদ সলাত। সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ রাতের সলাতের দুআ, হাএ. হা/১৬৯৩, ইফা.হা/১৬৭৮, ইসে. হা/১৬৮৫,

Contents

"হে আল্লাহ্! প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা সকলের উপরে এবং তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন সত্য উপাস্য নেই"।[১৯]

তবে পূর্বে উল্লেখিত দু'আগুলো এই দু'আটির চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে এই শেষোক্ত দু'আটি উঁচু আওয়াজে পাঠ করতেন এবং মানুষকে তা শিখাতেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণনাই আমি গ্রহণ করছি। তবে কোন ব্যক্তি যদি সলাতে দাঁড়ানোর সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে বর্ণিত যে কোন দু'আ পাঠ করে, তা উত্তম হবে।

সলাত শুরু করার দু'আ তথা ছানা পাঠ করার পর তিনি বলতেন-

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি। শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু"। অতঃপর তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। তিনি কখনও উঁচু আওয়াজে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতেন। তবে অধিকাংশ সময়ই তিনি তা নিরবে বলতেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক আয়াত পাঠ করার পর সামান্য সময় থামতেন। আয়াতের শেষ অক্ষর উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ লম্বা করতেন। সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ হলে আমীন বলতেন। যেই সলাতে উঁচু আওয়াজে কেরাআত পাঠ করা হয়, তাতে তিনি আমীনও উঁচু আওয়াজে বলতেন। তাঁর পিছনের মুসল্লীগণও উঁচু আওয়াজে আমীন বলতেন।[২০]

সলাতের প্রথম রাকআতে তাঁর দু'টি সাকতাহ্ (সামান্য বিরতি) ছিল। অর্থাৎ তিনি দুইবার সামান্য সময়ের জন্য বিরতি গ্রহণ করতেন। একটি ছিল তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মাঝখানে। দ্বিতীয়টির ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তা ছিল সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তা ছিল কিরাআত পাঠ শেষে এবং রুকুতে যাওয়ার পূর্বে। আরও বলা হয়েছে যে, প্রথম সাকতাহ্ ছাড়াও আরও দু'টি সাকতা রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে সাকতাহ্ মাত্র দু'টি। তৃতীয় সাকতা'র ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তা ছিল খুবই সামান্য সময়ের জন্য। শ্বাস নেওয়ার জন্য তিনি এই সাকতাহ্ (সামান্য বিরতি) গ্রহণ করতেন। খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে কতক আলেম এটিকে সাকতাহ্ হিসাবে উল্লেখ করেন নি।[২১]

---

১৯. আবু দাউদ, আলএ. ও ইফা হা/৭৭৫,৭৭৬, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৮৯৯, ইফা.হা/৯০২, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৪৩, মিশকাত, হা/৮১৫, ইরওয়াউল গালীল,হা/ ৩৪০সহীহ , তাহক্বীক্ব: আলবানী

২০. **উঁচু আওয়াজে আমীন বলার বিস্তারিত হাদীছগুলো জানতে দেখুন:** বুখারীতে ৩টি = তাও.হা/৭৮০,৭৮১,৭৮২, ইফা. হা/৭৪৪,৭৪৫, ৭৪৬, আপ্র. হা/৭৩৬,৭৩৭, ৭৩৮, মুসলিমে মোট ৮টি= হাএ. হা/৭৯৯ হতে ৮০৬ পর্যন্ত, ইফা. হা/৭৯৬-৮০৩, ইসে. হা/৮০৮-৮১৫, আবু দাউদ,আলএ. হা/৯৩২, ৯৩৬, ইফা. হা/৯৩২, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৮৩০, ৯২৮, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৫০, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, মুয়াত্তা মালেক, মাশা. হা/২৮৮, সুনানুল কুবরা আ-বাইহাকী, মাশা. হা/২৫৫৫, মিশকাত, হাএ. হা/৮২৫, ৮২৬)এছাড়াও একাধিক সহীহ হাদীস প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

২১. সুতরাং সাকতার সংখ্যা মোট দু'টি। একটি তাকবীরে তাহরীমার পর অন্যটি সূরা ফাতিহা পাঠের পর। ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পড়ে সাকতাহ গ্রহণ করবেন তখন মুক্তাদীগণ পূর্বে প্রত্যেক আয়াতের সাথে সাথে না পড়ে থাকলে এই সুযোগে সূরা

সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে অন্য একটি সূরা পড়তে হবে। রসূল ﷺ কখনও লম্বা সূরা পাঠ করতেন আবার কখনও সফর অথবা অন্য কোন কারণে সংক্ষিপ্ত কিরাআত পাঠ করতেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন।

সলাতে নাবী ﷺ এর কিরাআত

ফজরের কিরাআত

ফজরের সলাতে তিনি ষাট থেকে একশ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন। তিনি উভয় রাকআতেই সূরা ক্ব-ফ, সূরা রোম, সূরা তাকভীর, সূরা যিলযাল পড়েছেন। তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস দিয়েও ফজরের সলাত পড়েছেন।

তিনি একদা কোন এক সফরে ছিলেন। তখন তিনি ফজরের সলাতে সূরা মুমিনূন পড়তে শুরু করলেন। প্রথম রাকআতে যখন মুসা এবং হারুনের বর্ণনা আসল অর্থাৎ ৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত পড়লেন তখন তাঁর কাশি এসে গেল। তখন তিনি কিরাআত পাঠ বন্ধ করে রুকুতে চলে গেলেন।

জুমআর দিন ফজরের সলাতের প্রথম রাকআতে তিনি আলীফ-লাম-মীম সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইনসান (সূরা দাহর) তথা هل أتى على الإنسان পাঠ করতেন। কেননা এই সূরা দু'টিতে সৃষ্টির সূচনা, শেষ, আদম সৃষ্টি, মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশ ও পাপীদের জাহান্নামে প্রবেশের আলোচনা এবং জুমআর দিনে যা সংঘটিত হয়েছে ও আগামীতে এতে যা কিছু হবে তার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সুতরাং জুমআর দিনের বড় বড় ঘটনাগুলো উম্মাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এই দিনের ফজরের সলাতে সূরা দু'টি পাঠ করতেন। এমনিভাবে তিনি দুই ঈদ এবং জুমআর ন্যায় বড় ধরণের সম্মেলনে সূরা কাফ, সূরা কামার, সূরা আ'লা এবং গাশিয়া পাঠ করতেন।

যোহরের কিরাআত

যোহরের সলাতে কখনও তিনি লম্বা কিরাআত পাঠ করতেন। আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- যোহরের সলাতে কিরাআত এত দীর্ঘ করতেন যে, ইকামত শুনে কেউ ইচ্ছা করলে বাকী নামক স্থানে গিয়ে প্রয়োজন সমাধা করে বাড়িতে ফিরে এসে ওযূ করে মাসজিদে গিয়ে নাবী ﷺ কে প্রথম রাকআতেই পেয়ে যেত।[২২] তিনি তাতে কখনও সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ তিলাওয়াত করতেন। কখনও সূরা আলা, কখনও সূরা লাইল এবং কখনও সূরা বুরুজ তিলাওয়াত করতেন।

আসরের কিরাআত

আসরের সলাতের কিরাআত যোহরের সলাতের কিরআতের অর্ধেক পরিমাণ লম্বা করতেন। আসরের লম্বা কিরাআত যোহরের সংক্ষিপ্ত কিরাআতের সমান ছিল।

ফাতিহা পড়ে নিবেন। মনে রাখবেন উক্ত বিরতি মূলত সূরা ফাতিহা পাঠ করার জন্য নয়। তাই যারা শুরু থেকে সলাতে উপস্থিত থাকেন, তাদের ইমামের সাথে তা পড়ে নেয়া উচিত।

২২. মুসলিম, অধ্যায়- যোহর ও আসরের সলাতের কিরাআত।

মাগরিবের কিরাআত

মাগরিবের সলাতের কিরাআতে রসূল ﷺ এর সুন্নাত আজ কালের কিরাআতের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি একবার উভয় রাক'আতে সূরা আরাফকে দুইভাগ করে পাঠ করেছেন। একবার তিনি এতে সূরা তুর এবং অন্যবার সূরা মুরসালাত পড়েছেন।

মাগরিবের সলাতে সব সময় ছোট সূরা পাঠ করার রীতি উমাইয়া খলীফা মারওয়ান বিন হাকামের যুগ থেকে শুরু হয়েছে। তাই যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার এই কাজের প্রতিবাদ করেছেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- নাবী ﷺ মাগরিবের সলাতে সূরা আলিফ-লাম-মীম সোয়াদ, সাফ্ফাত, দুখান, আলা, তীন, নাস, ফালাক এবং সূরা মুরসালাত পাঠ করেছেন। কখনও তিনি তাতে ছোট ছোট সূরা পড়েছেন। এ সমস্ত বর্ণনার সবগুলোই সহীহ এবং প্রসিদ্ধ।

ইশার কিরাআত

নাবী ﷺ ইশার সলাতে সূরা তীন পড়েছেন এবং মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য তাতে সূরা শামস্, সূরা আলা, সূরা লাইল এবং অনুরূপ সূরা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সূরা বাকারা দিয়ে মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ইশার সলাত পড়ানোর প্রতিবাদ করতে গিয়ে নাবী ﷺ বলেছেন- হে মুআয! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় ফেলতে চাচ্ছ? যারা সলাতে তাড়াহুড়া করতে পছন্দ করে, তারা রসূল ﷺ এর এই বাক্যটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ তারা ঘটনার পূর্বের ও পরের সাথে সংশিষ্ট প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি।[২৩]

জুমআর সলাতের কিরাআত

জুমআর সলাতের প্রথম রাকআতে তিনি কখনও সূরা জুমআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকুন পড়তেন। আবার কখনও প্রথম রাকআতে সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরাতুল গাশিয়া পাঠ করতেন। কিন্তু নাবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম সূরা জুমআ ও মুনাফিকুনের শুধু শেষ আয়াতগুলো দিয়ে কখনও জুমআর সলাত পড়েননি।

দুই ঈদের সলাতের কিরাআত

ঈদের সলাতে কখনও তিনি সূরা কাফ ও কামারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন। কখনও তিনি সূরা আলা ও সূরাতুল গাশিয়া পাঠ করতেন।

---

২৩. প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী ﷺ এর সাথে ইশার সলাত পড়তেন। তারপর তিনি তাঁর মহল্লায় গিয়ে উক্ত সলাতের ইমামতি করতেন। একবার তিনি রসূল ﷺ এর সাথে ইশার সলাত পড়েও কিছুক্ষণ দেরী করলেন। ঐ দিকে তাঁর মহল্লার লোকেরা তাঁর পিছনে ইশার সলাত পড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি বিলম্বে ফিরে এসে সেদিন সূরা বাকারা শুরু করে দিলেন। একজন মুসল্লী দীর্ঘ কিরাআতে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে পিছনে গিয়ে একা সলাত পড়ে চলে গেল। এতে মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- অমুক মুনাফেক হয়ে গেছে। লোকেরা বিষয়টি নাবী ﷺ এর কাছে পেশ করলে তিনি মুআযকে বললেনঃ হে মুআয! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় ফেলতে চাচ্ছ? (বুখারী)

মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)এর মহল্লার লোকেরা যেহেতু তাঁর পিছনে ইশার সলাত পড়ার জন্য রাত জেগে অপেক্ষা করতেন, তাই তার জন্য বেশী দীর্ঘ কিরাআত শুরু করা উচিত হয় নি। এ কারণেই নাবী ﷺ মুআযের কাজকে অপছন্দ করেছেন।

এই ছিল সলাতে কিরাআত পাঠের ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত রসূল ﷺ এর সুন্নাত। তিনি একেক সময় একেক সূরা দিয়ে সলাত পড়েছেন এবং তাতে কখনও ছোট সূরা আবার কখনও বড় সূরা পাঠ করেছেন। তাঁর পরে খোলাফায়ে রাশেদীনও এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। আবু বকর (রাঃ) একবার ফজরের সলাতে সূরা বাকারা পাঠ করেছেন। এতে তিনি সূর্যোদয়ের একটু পূর্বে সালাম ফিরিয়েছেন। আবু বকরের পরে উমার (রাঃ) ফজরের সলাতে সূরা ইউসুফ, সূরা নাহল, সূরা হুদ, সূরা বানী ইসরাঈল এবং অনুরূপ সূরা পড়েছেন।

রসূল ﷺ এর বাণী- "তোমাদের কেউ যখন সলাতে মানুষের ইমামতি করবে তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত সলাত পড়ে"। এ ব্যাপারে জেনে রাখা দরকার যে, রসূল ﷺ কর্তৃক সলাত সংক্ষিপ্ত করার বিষয়টি ছিল আপেক্ষিক। অর্থাৎ তিনি সংক্ষিপ্ত করে যে সমস্ত সলাত পড়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তাঁর সংক্ষিপ্ত সলাতসমূহ তাঁর দীর্ঘ সলাতগুলোর তুলনায় অধিক সংক্ষিপ্ত ছিল।

এমনটি নয় যে তিনি সব সময় সংক্ষিপ্ত করে সলাত পড়েছেন। দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করার সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রসূল ﷺ এর আমলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, মুক্তাদীগণের দাবী অনুযায়ী কিরাআত ও সলাত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করা যাবেনা। রসূল ﷺ তাঁর যে সুন্নাত ও তরীকা সব সময় অবলম্বন করেছেন, মতভেদপূর্ণ প্রত্যেক বিষয়ে তাই হবে ফয়সালাকারী। জুমআ ও দুই ঈদের সলাত ব্যতীত অন্যান্য সকল সলাতে তিনি এভাবে সূরা নির্দিষ্ট করে দেন নি যে, তা ছাড়া অন্যটি পড়া যাবে না।

একই সলাতের দুই রাকআতে একই সূরা পাঠ করা এবং দ্বিতীয় রাকআতের প্রথম লম্বা করা

তাঁর সুন্নাত এই ছিল যে, কোন সলাতের এক রাকআতে তিনি পূর্ণ একটি সূরা পাঠ করতেন। কখনও তিনি একই সূরা উভয় রাকআতে পড়েছেন। নাবী ﷺ থেকে সূরার শেষাংশ বা মাঝখান থেকে পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়নি। নফল সলাতের এক রাকআতে কখনও দুইটি সূরা পাঠ করতেন। ফরজ সলাতে তিনি কখনও এমনটি করেন নি। একই সূরা একই সলাতের দুই রাকআতে খুব কমই পাঠ করতেন। তিনি প্রত্যেক সলাতের প্রথম রাকআত দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় অধিক লম্বা করতেন। তাঁর পবিত্র সুন্নাতের মধ্যে এটিও ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত জামাআতে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে আগত মানুষের পায়ের আওয়াজ শুনতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সলাতের প্রথম রাকআতের কিরাআত লম্বা করতেন।

সলাতে নাবী ﷺ এর রুকূর পদ্ধতি

কিরাআত পাঠ শেষ করে তিনি রাফউল ইয়াদাইন করতেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে যেতেন। উভয় হাতের তালু তাঁর উভয় হাঁটুর উপর রাখতেন। মনে হত, তিনি যেন উভয় বাহুকে খুঁটির মত শক্ত করে উভয় হাত দিয়ে উভয় হাঁটু ধরে আছেন। বাহুদ্বয়কে পার্শ্বদেশ হতে পৃথক করে রাখতেন। পিঠকে সোজাভাবে লম্বা করে রাখতেন। মাথা উপরের দিকে বেশী উঠিয়েও রাখতেন না এবং নীচু করেও রাখতেন না; বরং পিঠ বরাবর সোজা করে রাখতেন। রুকূতে তিনি বলতেন-

سُبْحَان رَبِّي الْعَظِيم "আমি প্রশংসার সাথে মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ননা করছি।"[২৪] কখনও এই দু'আটির সাথে পড়তেন-

«سُبْحَانك اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِك اللّٰهُمَّ اِغْفِرْ لِي»

"হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু। তোমার প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর"।[২৫]

কখনও শুধু সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম পড়তেন। তিনি সাধারণতঃ রুকুতে এতটুক সময় অবস্থান করতেন যে, তাতে স্বাভাবিকভাবে দশবার সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম পড়া যেত। সিজদাতেও তিনি অনুরূপ সময় অবস্থান করতেন।

কখনও কখনও তিনি রুকু ও সিজদাতে সমান পরিমাণ সময় অবস্থান করতেন। তবে তিনি কেবল রাতের সলাতেই কখনও কখনও এমনটি করতেন। অধিকাংশ সময় নাবী ﷺ এর সলাতগুলো ভারসাম্যপূর্ণ হত। অর্থাৎ সলাতের প্রতিটি রুকন পালনে প্রায় সমান পরিমান সময় ব্যয় করতেন। একটির তুলনায় অন্যটি পালনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত সময় ব্যয় করতেন না। রুকুতে তিনি এই দু'আও পড়তেন-

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ»

"ফিরিস্তাকূল এবং জিবরীলের প্রতিপালক অতি পবিত্র"।[২৬]

আবার কখনও তিনি বলতেন-

«اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِى وَمُخِّى وَعَظْمِي وَعَصَبِي»

"হে আল্লাহ! তোমার জন্যই রুকু করেছি"। একমাত্র তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি এবং তোমার কাছেই আত্মসমর্পন করেছি। তোমার ভয়ে ও শ্রদ্ধায় আমার কান, আমার চোখ, আমার মন-মগজ, আমার হাড় এবং আমার পেশী বিনীত হয়েছে।" তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে এটি তিনি রাতের সলাতের রুকুতে পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন-

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শুনে থাকেন।"[২৭]

---

২৪. মুসলিম, হাএ. হা/১৬৯৯, ইফা. ১৬৮৪, ইসে. ১৬৯১, আবু দাউদ,আলএ. হা/ ৮৭১ ইফা. হা/৮৭১ নাসায়ী, মাপ্র.হা/১৬৬৪, ইফা. ১৬৬৭, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৬২, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৭২৫, মিশকাত, হাএ. হা/৮৮০

২৫. বুখারী, তাও. হা/৮১৭, ইফা. হা/৭৮০, নাসায়ী, মাপ্র. ১১২২, ইফা.হা/১১২৬,মিশকাত, হাএ. হা/৮৭১, সহীহ, তাহক্বীক্বঃ আলবানী রহ.

২৬. মুসলিম, হাএ. হা/ ৯৭৮, ইফা. হা/৯৭৩, ইসে. হা/৯৮৪, আবু দাউদ,আলএ. হা/৮৭২, নাসায়ী, মাশা. হা১০৪৮, মিশকাত, হাএ. হা৭৮২, সহীহ, আলবানী রহ.

২৭. বুখারী, তাও. হা/৭৩২, ইফা. হা/৬৯৬, আপ্র. হা/৬৮৮, মুসলিম. হাএ. হা/৭৫৪, ইফা.হা/৭৫২, ইসে. হা/৭৬৫, আবু দাউদ,আলএ.হা/৬০১, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৮৭৬, তিরমিযী, মাপ্র.হা/২৬৭, মিশকাত, হা/১১৩৯

পাঠ করতে করতে রুকু হতে মাথা উঠাতেন এবং রাফউল ইয়াদাইন করতেন। তিনি সব সময় রুকু হতে উঠে পিঠ সোজা করে দাঁড়াতেন। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। দুই সিজদার মাঝখানেও তিনি পরিপূর্ণরূপে সোজা হয়ে বসতেন। তিনি বলেছেন-

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

"ঐ ব্যক্তির সলাত বিশুদ্ধ হবেনা, যে রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা করেনা"।[২৮]

রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলতেন-

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

"হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা"। কখনও তিনি মাঝখানে ওয়াও বাদ দিয়ে বলতেন- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ। কখনও বলতেন- اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ তবে আল্লাহুম্মা এবং ওয়াও বৃদ্ধিসহ বর্ণনাটি সহীহ নয়।[২৯]

রুকুতে তিনি যে পরিমাণ সময় অবস্থান করতেন, রুকু হতে উঠেও তিনি সেই পরিমাণ সময় অবস্থান করতেন। রুকু হতে উঠে দাঁড়িয়ে এই দীর্ঘ দু'আটিও পড়তেনঃ

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْد وكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"হে আল্লাহ! তোমার জন্য আকাশ-পৃথিবী পূর্ণ প্রশংসা এবং এতদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য। হে আল্লাহ! তুমি প্রশংসা, বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী! তোমার প্রশংসায় বান্দা যা বলে, তুমি তার চেয়েও অধিক প্রশংসার হকদার। আমরা সকলেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। তুমি যা বারণ কর তা দেয়ার মত কেউ নেই। আর তোমার পাকড়াও হতে কোন বিত্তশালী ও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারবেনা"।[৩০]

তিনি এই দু'আও পড়তেন-

اللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَایَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ وَ نَقِّنِي مِنَ الذُّنُوْبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَایَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

---

২৮. সুনানে নাসাঈ, অধ্যায়ঃ সলাতে পিঠ সোজা করা। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ ওয়া যঈফু সুনানে নাসাঈ, হা. ১০২৭।

২৯. তবে ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর সালাত বিষয়ক কিতাবে একে সহীহ বলেছেন।

৩০. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ রুকু হতে মাথা উঠিয়ে কি বলবে?

"হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, পানি এবং শিশির দ্বারা পবিত্র কর। হে আল্লাহ! আমাকে ভুল-ত্রুটি এবং পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপসমূহের মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে"। সহীহ সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বারবার لِرَبِّيَ الْحَمْـدُ পাঠ করতেন, যাতে রুকুর পর দাঁড়ানোর সময় রুকুতে অবস্থান করার সময়ের সমান হয়ে যেত।

ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি ভুলে গেছেন। অতঃপর তিনি সিজদা করতেন। সিজদাহ হতে উঠেও তিনি এতক্ষণ বসে থাকতেন যে আমরা মনে করতাম তিনি ভুলে গেছেন।

এটিই ছিল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রসিদ্ধ রীতি। এই রুকন দু'টি অতি সংক্ষেপে পালন করা বনী উমাইয়ার শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার অন্তর্ভূক্ত। তারাই সর্বপ্রথম রুকু হতে উঠে এবং দুই সিজদার মাঝখানে অতি সামান্য সময় অবস্থান করার নিয়ম চালু করে। এরপর লোকেরা এটাকেই সুন্নাত মনে করে নিয়েছে।

সলাতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সিজদা এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসার পদ্ধতি কেমন ছিল?

অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে রাফউল ইয়াদাইন করা ছাড়াই সিজদায় চলে যেতেন। তিনি প্রথমে উভয় হাঁটু এবং পরে উভয় হাত মাটিতে রাখতেন।[৩১] অতঃপর কপাল ও নাক। এ পদ্ধতিই

---

৩১. মুসল্লী সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখবে? না হাতের পূর্বে তার হাঁটু রাখবে? এ বিষয়ে আলেমদের দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে।

প্রথম মতঃ সিজদায় যাওয়ার সময় মুসল্লী তার হাতের পূর্বে হাঁটু রাখবে। এটি হচ্ছে হানাফী, শাফেঈ এবং হাম্বলী মাজহাবের আলেমদের অভিমত। তাদের দলীল হচ্ছেঃ

(ক) আবু দাউদ, নাসাঈ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীছ। তিনি বলেনঃ

«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه»

আমি দেখেছি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিজদায় যেতেন তখন তিনি উভয় হাত রাখার আগে তাঁর হাঁটুদ্বয় রাখতেন। আর যখন সিজদাহ হতে উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন। ইমাম খাত্তাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেনঃ হাত আগে রাখার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে এই হাদীসটি অধিক বিশুদ্ধ। আর এই পদ্ধতিটি মুসালণ্টীদের জন্য অধিক সহজ এবং দেখতেও অধিক সুন্দর। দেখুনঃ المجموع للنووي ৩৯৫/৩

ইমাম তিরমিযী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ এই হাদীসটি গরীব। শারীক বিন আব্দুল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অধিকাংশ আলেম এই হাদীসের উপরই আমল করেন। তারা হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার পক্ষে মত প্রদান করেন। সহীহ মুসলিমের শর্তে ইমাম হাকেম এই হাদীছকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবীর সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযায়মা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোন মন্তব্য করেন নি।

ইমাম দারকুতনী (রাঃ) বলেনঃ ইয়াযীদ একাই এই হাদীসটি শারীক থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আসেম বিন কুলাইব থেকে শারীক ছাড়া আর কেউ রেওয়ায়েত করেন নি। আর মুহাদ্দীছদের নিকট শারীকের একক বর্ণনা শক্তিশালী নয়। ইমাম দারকুতনীর কথা এখানেই শেষ।

এ জন্যই ইমাম আলবানী (রহঃ) এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন। তিনি এই হাদীসের ব্যাপারে অনেক লম্বা আলোচনা করেছেন। দেখুনঃ সিলসিলায়ে যঈফা হা/ ৯২৮, ইরওয়াউল গালীল হা/ ৩৫৭। রসূল (ﷺ) এর সলাতের পদ্ধতি নামক বইয়েও তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

(খ) তাদের আরেকটি দলীল হচ্ছে, মুসআব বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ। মুসআব তার পিতা সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা সলাতে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতাম। পরে আমাদেরকে হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে এই হাদীছ সম্পর্কে ইবনে খুযায়মা (রাঃ) বলেন যে, এর সনদে রয়েছে ইসমাঈল বিন ইয়াহ-ইয়া। তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় (মাতরুক) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাঃ) বলেনঃ ইবনে খুজায়মার দাবী হচ্ছে সলাতে আগে হাত রাখার ব্যাপারে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসটি সা'দ (রাঃ) এর এই হাদীছ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। সা'দের এই হাদীসটি যদি সহীহ হত তাহলে এ বিষয়ে মতভেদের অবসান হয়ে যেত। কিন্তু এর সনদে রয়েছে ইসমাঈল বিন ইয়াহ-ইয়া, যার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

(গ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ। রসূল (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন সিজদাহ করবে তখন সে যেন হাতের পূর্বে হাঁটু রাখে এবং উটের মত করে না বসে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেনঃ হাদীসের সনদ দুর্বল। ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ, তাহাবী এবং বায়হাকীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী বলেনঃ হাদীসটি বাতিল (মিথ্যা)।

দ্বিতীয় মতঃ সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর পূর্বে হাত রাখবে। এটিই হচ্ছে ইমাম মালেক, আওযাঈ এবং ইমাম আহমাদের অপর একটি মত। তাদের দলীলগুলো হচ্ছেঃ

(ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

«إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»

"তোমাদের কেউ যখন সলাতে সিজদায় যাবে তখন যেন উটের মত করে না বসে। সে যেন হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখে। (আবু দাউদ, নাসাঈ, দারামী এবং তারিখে কবীর লিল-বুখারী) ইমাম নববী (রহঃ) বলেনঃ হাদীসের সনদ ভাল। আব্দুল হক আহকামে কুবরাতে এই হাদীছকে সহীহ বলেছেন। আর যারা এই হাদীছকে দুর্বল বলেছেন তাদের জবাবে ইমাম আলবানী অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। (দেখুনঃ সিলসিলায়ে যঈফা এবং ইরওয়াউল গালীল)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের মতনে কতক রাবী ধারণা বশত ভুল করেছেন। হাদীসের প্রথমাংশ শেষাংসের বিরোধী। কেননা হাঁটুর পূর্বে হাত রাখলে উটের বসার মতই হয়ে যায়। কারণ উট প্রথমে মাটিতে হাত রাখে। তিনি আরও বলেনঃ আমার মতে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদীসের মতন ও সনদ কতিপয় রাবীর নিকট পরিবর্তন হয়ে গেছে। সম্ভবত মতনটি এমন ছিলঃ وليضع ركبتيه قبل يديه অর্থাৎ উভয় হাতের পূর্বে হাঁটু রাখবে। ইমাম আবু বকর ইবনু শায়বা এমনই বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাটি দুর্বল, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

২) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন। (ইবনু খুযায়মা, দারাকুতনী) হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করে তা সহীহ্ বলেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেন।

৩) ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আগে মাটিতে হাত রাখতেন এবং বলতেনঃ নাবী (ﷺ) ও তাই করতেন। ইমাম তাহাবী (শরহু মাআনিল আছার), ইমাম দারকুতনী, এবং হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীসটি মুসলিমের শর্তে বর্ণনা করে তা সহীহ্ বলেছেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম আলবানী ইরওয়াউল গালীলে বলেনঃ ইমাম হাকেম ও যাহাবীর বক্তব্য সঠিক। ইবনে খুযায়মাও সহীহ বলেছেন।

ইমাম আলবানী (রহঃ) হাকেম থেকে উদ্ধৃত করে বলেনঃ হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার ব্যাপারে বর্ণিত এই হাদীসটি হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার বিষয়ে ওয়ায়েল বিন হুজরের হাদীসের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার প্রতি আমার অন্তর ধাবিত হয়। কেননা এ ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেঈদের থেকে অনেক বর্ণনা রয়েছে। আলবানীর কথা এখানেই শেষ। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এর হাদীসটি ইমাম বুখারীও মুআলাক সূত্রে দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মোটকথা সিজদায় যাওয়ার সময় যমীনের অধিক নিকটবর্তী অঙ্গ প্রথমে যমীনে পড়বে। তারপর তুলনামূলক অধিক নিকটবর্তী অঙ্গ যমীনে রাখবে। আর সিজদা থেকে উঠার সময় যমীন থেকে শরীরের সবচেয়ে উপরের অঙ্গটি অন্যগুলোর আগে উঠবে। অতঃপর তার পরেরটি। সুতরাং মাথা যেহেতু যমীন থেকে সবচেয়ে উপরে তাই সবার আগে মাথা উঠবে, অতঃপর উভয় হাত, তারপর উভয় হাঁটু। এভাবে কাজ করলে উটের উঠা-বসার সাথে সাদৃশ্য হয়না। কেননা আমাদেরকে সলাতে বেশ কিছু পশুর সাথে সাদৃশ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। সিজদার যাওয়ার সময় প্রথমে যমীনে হাত রেখে উটের মত করে বসা, শিয়ালের মত ডানেবামে তাকানো, সিজদায় গিয়ে হিংস্র প্রাণীর ন্যায় সামনের দিকে দুই হাত ছড়িয়ে দেয়া, কুকুরের ন্যায় 'ইকআ' করা অর্থাৎ উভয় হাঁটু খাড়া রেখে নিতম্বের উপর বসা এবং কাকের ঠোকর মারার মত এবং সালাম ফিরানোর সময় উশৃঙ্খল ঘোড়ার লেজ নাড়ানোর ন্যায় হাত নাড়াতে নিষেধ করেছেন।[৩২]

প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতঃ

উপরে উভয় পক্ষের দলীলগুলো আলোচনা করা হল। কোন সন্দেহ নেই যে, দ্বিতীয় মতের অর্থাৎ সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার দলীলগুলো বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

এই মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা আহমাদ শাকের সুনানে তিরমিযীর (২/৫৮) ব্যাখ্যায় বলেনঃ আবু হুরায়রা এবং ওয়ায়েল বিন হুজর থেকে বর্ণিত হাদীছ দু'টি পর্যালোচনায় আলেমদের কথা থেকে সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সহীহ এবং তা ওয়ায়েল বিন হুজর এর হাদীছ থেকে অধিক বিশুদ্ধ। তা ছাড়া ওয়ায়েল বিন হুজর থেকে বর্ণিত হাদীসটি ফে'লী অর্থাৎ তাতে রসূল আগে হাঁটু রাখতেন বলে বর্ণনা এসেছে। আর আবু হুরায়রা এর বর্ণিত হাদীসটি কাওলী অর্থাৎ তাতে আগে হাত রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। কোন বিষয়ে কাওলী হাদীছ ও ফে'লী হাদীছ পরস্পর বিরোধী হলে উসূলে হাদীছ সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমগণের পরিভাষায় ফে'লী হাদীসের উপর কাওলী হাদীছ প্রাধান্য পায়। এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মত।

যাদুল মাআদের মুহাক্কিক শুআইব এবং আব্দুল কাদের আরনাউতী বলেনঃ উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে পরিস্কার হয়ে গেল যে, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম সিজদায় যাওয়ার সময় হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার যে মত দিয়েছেন তার বিপরীত মতটিই প্রাধান্যযোগ্য। আর আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে তা ওয়ায়েল বিন হুজর এর হাদীসের উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আবু হুরায়রা এর বর্ণিত হাদীছ মুজতারেব তথা একেক বর্ণনায় একেক শব্দ থাকার দাবী ঠিক নয়। কারণ যে সমস্ত বর্ণনায় ইজতেরাব রয়েছে তার সব গুলোই দুর্বল।

তবে এখানে বলে রাখা দরকার যে, চতুষ্পদ জন্তু আগে রাখে। তবে তাদের হাটু থাকে হাতের মধ্যে। এ কথা যেমন পশু বিজ্ঞানীরা জানেন ঠিক তাদের চুলকানোসহ মাটিতে শয়ন করার সময় হাত-পা গুটানোর অঙ্গ ভঙ্গি দেখলেও বুঝা যায়। ফলে জানা গেল যে, হাত পূর্বে রাখার হাদীসের সনদ যেমন শক্তিশালী তেমনি তার বিন্যাসও বাস্তব সম্মত। এমনিভাবে শাইখ আলবানী এ মর্মে একটি সহীহ হাদীছ এনেছেন, যদ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে উটের মত ধপাস করে হাত রাখতে মানা করা উদ্দেশ্য। ফলে আস্তে করে শান্তভাবে রাখলে উটের সাথে সামঞ্জস্য থেকে বাঁচার উপায় হয়ে যায়।

উপসংহারঃ সার কথা হচ্ছে, হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার মতটি হাদীসের সনদের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী। আর ইহা জানা কথা যে, এ ক্ষেত্রে সনদের অবস্থার উপরই নির্ভর করতে হবে এবং বলতে হবে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আল্লাহই ভাল জানেন। আরও দেখুনঃ ফতহুল বারী (২/২৪১), তুহফাতুল আহওয়াযী, (২/১৩৪), সুবুলস্ সালাম (১/২৬৩) ইত্যাদি।

৩২. জাবের বলেন, আমরা যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে সলাত পড়তাম তখন আমাদের কেউ সালাম ফেরানোর সময় আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে স্বীয় হাত দিয়ে ডান ও বাম দিকে ইঙ্গিত করত। তখন রসূল সাল-লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ উশৃংখল ঘোড়ার লেজ ঘুরানোর ন্যায় হাত দিয়ে তোমরা কিসের দিকে ইঙ্গিত করছ? তোমাদের কারও এতটুকু করাই যথেষ্ট যে সে তার হাতকে স্বীয় রানের উপর রেখে তার ডান ও বামের ভাইকে সালাম দিবে। (সহীহ মুসলিম)

নাবী ﷺ কপাল ও নাকের উপর সিজদাহ করতেন। পাগড়ির পেঁচের উপর সিজদাহ করার কথা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তিনি অধিকাংশ সময় মাটির উপর সিজদাহ করতেন। পানি ও কাঁদার উপর সিজদাহ করার কথাও বর্ণিত হয়েছে। খেজুর পাতার চাটাই, পাটি এবং শোধনকৃত চামড়ার উপরও তিনি সিজদাহ করতেন।

সিজদাহ করার সময় তিনি কপাল ও নাক যমীনে ভালভাবে লাগাতেন। বাহুদ্বয়কে পার্শ্বদেশ হতে এমনভাবে আলাদা করে রাখতেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেত। সিজদাতে তিনি হস্তদ্বয়কে উভয় কাঁধ ও কান বরাবর রাখতেন এবং পিঠকে সোজা রাখতেন। উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহকে কিবলামুখী রাখতেন এবং উভয় হাতের তালু এবং আঙ্গুলসমূহকে ছড়িয়ে রাখতেন। আঙ্গুলসমূহের মাঝে বেশী ফাঁক রাখতেন না এবং একটিকে অন্যটির সাথে একেবারে মিলিয়েও রাখতেন না।[৩৩] সিজদাতে তিনি এই দু'আ পড়তেন এবং পড়ার আদেশ করতেনঃ

« سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى »

"আমি প্রশংসার সাথে মহান সুউচ্চ প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি"।[৩৪] কখনও এই দু'আটির সাথে পড়তেনঃ

«سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي»

"হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু। তোমার প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর'।[৩৫] সিজদায় তিনি এই দু'আও পড়তেন-

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

"ফিরেশতাকূল এবং জিবরীলের প্রতিপালক অতি পবিত্র।[৩৬]

আবার কখনও তিনি বলতেন-

«اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»

"হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সিজদাহ করেছি"। একমাত্র তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি এবং তোমার কাছেই আত্মসমর্পন করেছি। আমার মুখমন্ডল ঐ সত্তার জন্য সিজদাবনত হয়েছে, যিনি উহাকে সৃষ্টি করেছেন, সুসমন্বিত আকৃতি দিয়েছেন এবং তাতে কান ও চক্ষু স্থাপন করেছেন। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়![৩৭]

---

৩৩. সহীহ হাদীছে অঙ্গুলি মিলিয়ে রাখার প্রমাণ এসেছে। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কর্তৃক রচিত সলাত বিষয়ক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩৪. মুসলিম, হাএ. হা/১৬৯৯, ইফা. ১৬৮৪, ইসে. ১৬৯১, আবু দাউদ, আলএ. হা/৮৭১, ইফা.হা/ ৮৭১, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৬৬৪, ইফা.১৬৬৭,তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৬২, মিশকাত, হাএ. হা/৮৮০।

৩৫. বুখারী, তাও. হা/৮১৭, ইফা. হা/৭৮০, নাসায়ী, মাপ্র. ১১২২, ইফা.হা/১১২৬, মিশকাত, হাএ. হা/৮৭১, সহীহ, আলবানী (রহ.)

৩৬. মুসলিম, হাএ. হা/ ৯৭৮, ইফা.হা/৯৭৩, ইসে.হা/৯৮৪, আবু দাউদ, আলএ, হা/৮৭২, নাসায়ী, মাশা. হা১০৪৮, মিশকাত, হাএ. হা৭৮২, সহীহ, আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

৩৭. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ রাতের সালাত ও কিয়ামের দুআ।

সিজদায় তিনি এই দু'আটিও পাঠ করতেনঃ

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ»

"হে আল্লাহ! তুমি আমার ছোট, বড়, পূর্বের, পরের, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও"।[৩৮]

তিনি সিজদায় আরও বলতেন-

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّى وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِيْ لاَ إِلَهَ أَنْتَ»

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার অসতর্কতা বশত কৃত গুনাহ্, অজ্ঞতা বশত অপরাধ, আমার কাজের ক্ষেত্রে সীমালংঘন এবং তুমি আমার ঐ সমস্ত অপরাধও ক্ষমা করে দাও যে সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে অধিক অবগত আছ। হে আল্লাহ্! তুমি আমার চেষ্টাপ্রসূত, হাসি-ঠাট্টা প্রসূত, ভুলবশত এবং ইচ্ছাকৃত সকল গুনাহ্ মা'ফ করে দাও। উপরোক্ত সকল প্রকার অপরাধই আমার মধ্যেই রয়েছে। হে আল্লাহ! আমার পূর্বের, পরের, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই আমার একমাত্র উপাস্য। তুমি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই"।

সিজদার মধ্যে নাবী ﷺ বেশী বেশী দু'আ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলতেন- আশা করা যায় যে, সিজদাবনত অবস্থায় তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে।

তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সলাতের প্রথম তাশাহুদে বসার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর সুন্নাত

তাশাহুদে বসার পূর্বে তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদা হতে মাথা উঠাতেন। এ সময় তিনি রাফউল ইয়াদাইন করতেন না। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। আর উভয় হাতের কনুই উভয় রানের উপর রাখতেন এবং হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ উভয় হাঁটুর উপর রাখতেন। ডান হাতের কনিষ্ঠা এবং অনামিকা আঙ্গুলকে মুষ্ঠিবদ্ধ রেখে বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে বৃত্তাকার বানিয়ে শাহাদাত আঙ্গুলি উঠিয়ে রেখে দু'আ করতেন। কিন্তু এ সময় তিনি শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াতেন না। দুই সিজদার মাঝখানে তিনি এই দু'আ পড়তেন-

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي واجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي»

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি আমার উপর রহম কর, আমার ক্ষতিসমূহ পূরণ করে দাও, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর এবং আমাকে রিযিক দান কর"[৩৯]। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী ﷺ হতে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

---

৩৮. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ রুকু ও সিজদায় পঠিতব্য দুআ, মুসলিম, হাএ. হা/৯৭১, ইফা. হা/৯৬৬, ইসে.হা/৯৭৭,আবু দাউদ,আলএ. হা/৮৭৮, মিশকাত, হাএ. হা/৮৯২, সহীহ, আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

৩৯. সহীহ তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৮৪

হুযায়ফা হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী দুই সিজদার মাঝখানে اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِـي বলতেন। অতঃপর তিনি উভয় রানের উপর হাত রেখে পা-দ্বয়ের অগ্রভাগে এবং হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। দাঁড়িয়েই কিরাআত পাঠ শুরু করে দিতেন। প্রথম রাকআতের ন্যায় বিরতি গ্রহণ করতেন না। প্রথম রাকআতের মতই তিনি দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করতেন। তবে চারটি বিষয়ে পার্থক্য ছিল। (১) প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমার পর যেমন কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন দ্বিতীয় রাকআতে তা করেননি। (২) দু'আয়ে ইসতিফতাহ তথা ছানা পাঠ করেন নি। (৩) তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করেন নি এবং (৪) দ্বিতীয় রাকআত প্রথম রাকআতের ন্যায় দীর্ঘ করেন নি।

তিনি যখন তাশাহুদে বসতেন, তখন বাম হাত বাম রানের উপর এবং ডান হাত ডান রানের উপর রাখতেন। শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করতেন। উহাকে সম্পূর্ণ খাড়া করে রাখতেন না এবং সম্পূর্ণরূপে সোজা করেও রাখতেন না; বরং সামান্য পরিমাণ বাঁকা করে রাখতেন এবং নাড়াতেন। কনিষ্ঠা এবং অনামিকা অঙ্গুলিকে মুষ্ঠিবদ্ধ করে ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে মিলিয়ে গোলাকার বানিয়ে শাহাদাত অঙ্গুলিকে উঠিয়ে রেখে দু'আ পড়তেন। চোখের দৃষ্টি শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে রাখতেন, বাম হাতের তালু বাম রানের উপর খোলা অবস্থায় রাখতেন এবং তা দিয়ে হাঁটুকে চেপে ধরতেন।

দুই সিজদার মাঝখানে বসার মত করেই তিনি (প্রথম) তাশাহুদে বসতেন। মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর এর হাদীছে বসার ধরণ উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল যখন সলাতে বসতেন তখন বাম পা-কে রান ও নলার মাঝখানে রাখতেন এবং ডান পা বিছিয়ে রাখতেন, তা মূলত শেষ তাশাহুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর ডান পা বিছিয়ে রাখার কথা উল্লেখ করেছেন এবং আবু হামীদ উহা খাড়া রাখার কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা তিনি যেহেতু পায়ের উপর বসতেন না (বরং নিতম্বের উপর বসতেন) তাই ডান দিকে বাম পা বের করে দিতেন। সুতরাং ডান পা খাড়া ও বিছানোর মাঝামাঝি অবস্থায় থাকত। অথবা বলা যায় যে তিনি উভয়টি করতেন। কখনও ডান পা খাড়া রাখতেন আবার কখনও তা বিছিয়ে রাখতেন। পায়ের জন্য এটিই অধিক আরাম দায়ক। আল্লাহই ভাল জানেন।

তিনি এভাবেই সব সময় তাশাহুদে বসতেন। তাশাহুদে তাঁর সাহাবীদেরকে এই দু'আ পড়ার শিক্ষা দিতেন-

«التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَـةُ اللهِ وَبَرَكَاتُـهُ السَّـلاَمُ عَلَيْنَـا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

"সব রকম মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতসমূহ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নাবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর

সৎকর্মশীল বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল"।[৪০]

তিনি খুব দ্রুত এই তাশাহুদ শেষ করতেন। মনে হত তিনি যেন গরম পাথরের উপর বসে আছেন (তাই তিনি দ্রুত উঠে যাচ্ছেন)। এই বৈঠকে নাবী ﷺ এবং তাঁর পরিবারের উপর দুরূদ পড়েছেন মর্মে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।[৪১] কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের আযাব হতে, জীবন ও মরণ কালীন ফিতনা হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয়ও প্রার্থনা করতেন না। যারা প্রথম তাশাহহুদে উক্ত দু'আ পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন, তারা শেষ তাশাহুদের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকেই তা বুঝেছেন।

অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রানের উপর হাত রেখে পা-দ্বয়ের অগ্রভাগে এবং হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন।

সহীহ মুসলিম এবং বুখারীর কতিপয় বর্ণনায় এসেছে যে, প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠার সময়ও রাফউল ইয়াদাইন করতেন।[৪২] দাঁড়িয়ে তিনি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। শেষ দুই রাকআতে তিনি সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সলাত আদায়কালে তিনি এদিক ওদিক তাকাতেন না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন- এটি হচ্ছে চুরি। এর মাধ্যমে শয়তান বান্দার সলাত থেকে কিছু অংশ চুরি করে নেয়। নাবী ﷺ কখনও বিশেষ প্রয়োজনে এমনটি করতেন। তবে এটি তাঁর সব সময়ের অভ্যাস ছিলনা। একবার তিনি একটি গোত্রের দিকে মুজাহিদ বাহিনী পাঠিয়ে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

সলাতের মধ্যে দু'আ করা

শেষ তাশাহুদ পাঠের পর এবং সালাম ফেরানোর পূর্বে তিনি দু'আ করতেন। আবু হুরায়রা ও ফুযালা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে তিনি তা পড়ার আদেশ দিয়েছেন।[৪৩]

---

৪০. বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ সিফাতুস্ সালাত, বুখারী, তাও. হা/৮৩১, ইফা. হা/৭৯৩, মুসলিম, হাএ. হা/৭৮৩, ইফা. হা/৭৮০, সহীহ তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৮৯, নাসায়ী,হা/১১৬২, আবু দাউদ,আলএ.হা/৯৬৮, মিশকাত, মাশা. হা/৯০৯, ৩১৪৯

৪১. ইমাম আবু আওয়ানা ও ইমাম নাসাঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) দুরূদ পড়ার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তা গ্রহণ করেছেন।

৪২. সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ দুই রাকআত পড়ে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন করা, তাও. হা/৭৩৯, আবু দাউদ,আলএ.হা/৭৪১, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা ও তাও. হা/১০৬১, মিশকাত,হাএ. ও মাশা. হা/৭৯৭,

৪৩. গ্রন্থকার এখানে আলাদাভাবে শেষ তাশাহুদে বসার ধরণ বর্ণনা করেন নি। সহীহ হাদীছ মুতাবেক চার রাকআত বা তিন রাকআত বিশিষ্ট সলাতের শেষ তাশাহুদে تورك তাওয়াররুক করা সুন্নাত। আলেমগণ তাওয়াররুকের একাধিক পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক সহজ পদ্ধতিটি হচ্ছেঃ

«هو أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من الجانب الأيمن ويمكن مقعدته من الأرض»

ডান পা খাড়া রেখে ডান দিক দিয়ে বাম পা-কে বের করে দিয়ে যমীনে নিতম্ব লাগিয়ে বসাকে তাওয়াররুক বলা হয়।

অনুরূপভাবে লেখক শেষ বৈঠকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উপর দরূপ পাঠ করার কথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি। তিনি শুধু বলেছেন যে, সালামের আগে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক দুআ পাঠ করতেন। অন্যান্য সহীহ হাদীছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সালাম পেশ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুরূদে ইবরাহীমি হচ্ছে সর্বোত্তম। দরূদে ইবরাহীমি নিম্নরূপঃ

সালামের পর কিবলামুখী হয়ে কিংবা মুসল্লীদের দিকে ফিরে দু'আ করা কখনই রসূল ﷺ এর সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। সলাতের সাথে সংশিলিষ্ট সকল দু'আ তিনি সলাতের ভিতরেই করতেন এবং সলাতের মধ্যেই দু'আ করার আদেশ দিয়েছেন। এটিই মুসল্লীর অবস্থার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা মুসল্লী যতক্ষণ সলাতে থাকে ততক্ষণ তার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ রত থাকে (এ অবস্থায় দু'আ কবুল হওয়ার বিরাট একটি সুযোগ)। সালাম ফেরানোর পর এই অবস্থার অবসান হয়ে যায়।

অতঃপর তিনি ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাম ফেরানোর সময় বলতেন-

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ»

বাম দিকে সালাম ফেরানোর সময়ও তিনি তা করতেন। এটিই ছিল রসূল ﷺ এর সার্বক্ষণিক আমল। হাদীছে সামনের দিকে শুধু একবার সালাম ফিরানোর কথাও বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নয়। এ ব্যাপারে সুনানের কিতাবসমহে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদীসটিই সর্বোত্তম।
তবে তা তাহাজ্জুদ সলাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এই হাদীসটিও মা'লুল (দুর্বল)। তারপরও এখানে এ কথা সুস্পষ্ট নয় যে, রসূল ﷺ একবার সালাম ফিরানোকে যথেষ্ট মনে করতেন।
তিনি সলাতে তথা শেষ বৈঠকে এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

«اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে, জীবনের ও মরন কালীন ফিতনা (কঠিন পরীক্ষা) হতে, এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি গুনাহ ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে"[৪৪]। তিনি এ দু'আও পাঠ করতেনঃ

«اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي»

"হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা করো, আমার ঘরবাড়ি প্রশস্ত করে দাও এবং আমার রিযিকে বরকত দান করো"।[৪৫] তিনি আরও বলতেন-

---

«اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

"হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের উপর ঐ রূপ রহমত নাযিল কর যে রূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারের উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাজিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। বুখারী, তাও. হা/৩৩৭০, আপ্র. হা/ ৩১২০, ইফা. হা/৩১২, মুসলিম, মিশকাত,হাএ. হা/৯১৯

৪৪. বুখারী, তাও. হা/৮৩২, মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৬২২, মিশকাত,হাএ. হা/৯৩৯

৪৫. ইমাম সুন্নী রহিমাহুল্লাহ দিবা-রাত্রির আমলে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।, মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৬৫০, **ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ হাদীসটি যঈফ**, তবে দুআটি সুন্দর। গায়াতুল মুরাম, হা/ ১১২।

«اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ و أستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দ্বীনের উপর দৃঢ়তা এবং কল্যাণ ও হিদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রার্থনা করছি। তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় এবং উত্তমভাবে তোমার ইবাদত করার তাওফীক চাচ্ছি। আরও চাচ্ছি পরিশুদ্ধ আত্মা ও সত্যবাদী জবান। যেই কল্যাণ সম্পর্কে তুমি অবগত আছো, আমি তোমার কাছে তা প্রার্থনা করছি এবং যেই অকল্যাণ সম্পর্কে তুমি অবগত আছো তা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমার যে সমস্ত গুনাহ সম্পর্কে অবগত আছ, তা থেকে আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য জগতের সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত।[৪৬] রসূল ﷺ সলাতের সকল দু'আয় একবচনের শব্দ অর্থাৎ আমি / আমার / আমাকে ইত্যাদি একবচনের ব্যবহার করেছেন; আমরা / আমাদের / আমাদেরকে ইত্যাদি বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেননি।

সলাতীর দৃষ্টি কোন দিকে থাকবে?

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ﷺ যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন মাথা নীচু করে (সিজদার দিকে) রাখতেন। আর তাশাহুদ পাঠ করার সময় তাঁর দৃষ্টি শাহাদাত আঙ্গুলের সীমা পার হত না। আল্লাহ্ তা'আলা সলাতের মাধ্যমেই তাঁর চক্ষু ও হৃদয়কে শীতল করতেন। তিনি বলতেন- হে বেলাল! সলাতের মাধ্যমে আমার মনকে শান্ত কর।[৪৭] সলাতের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও আন্তরিকতা থাকা সত্বেও তিনি সবসময় মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল রাখতেন (সলাতকে অত্যন্ত দীর্ঘ করে তাদেরকে সংকটে ফেলতেন না)।

দীর্ঘ করে সলাত পড়ার জন্য দাঁড়ানোর পরওকোন কারণে সলাত সংক্ষিপ্ত করা

নাবী ﷺ কখনও দীর্ঘ করে সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন। অতঃপর শিশুর কান্না শুনে সলাত সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। যাতে শিশুর মায়ের কোন কষ্ট না হয়।

সলাতে সামান্য কাজ করা

তিনি কখনও তাঁর নাতনী উমামা বিনতে যাইনাবকে কাঁধে নিয়ে ফরজ সলাত পড়তেন। দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি মেয়েটিকে কাঁধে বহন করে রাখতেন এবং রুকু-সিজদাহ অবস্থায় নামিয়ে রাখতেন।[৪৮] তিনি সলাতরত থাকতেন। এমন সময় হাসান ও হুসাইন এসে তাঁর পিঠে আরোহন করত। তাদেরকে

---

৪৬. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত দাওয়াত। **ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেনঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল**। আলকালিমুত তায়্যিব, হা/১০৫।
৪৭. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথার অর্থ হচ্ছে, হে বিলাল! সলাতের সময় হয়েছে, আযান দাও। আমি সলাত আদায় করব। সলাতের মাধ্যমেই আমার চোখ ও অন্তর শীতল হবে।
৪৮. বুখারী, অধ্যায়ঃ সলাত অবস্থায় কোন ছোট মেয়েকে ঘাড়ে বহন করা বৈধ।

পিঠ থেকে নামিয়ে দেয়া অপছন্দ করতেন বলেই তিনি সিজদাহ দীর্ঘ করতেন। তিনি নফল সলাতে থাকা অবস্থায় আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আগমণ করলে তিনি অগ্রসর হয়ে তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতেন। অতঃপর তিনি সলাতের মুসাল্লায় ফেরত যেতেন। সলাতে তিনি হাতের ইশারায় সালামের জবাব দিতেন। সলাত অবস্থায় ইশারা করলে দ্বিতীয়বার সলাত পড়তে হবে বলে যে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তা বানোয়াট হাদীস। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেছেন যে, প্রয়োজন বশত তিনি সলাতরত অবস্থায় ফুঁ দিয়ে সিজদার জায়গা পরিষ্কার করতেন এবং কাশি দিতেন। তিনি কখনও সলাতে ক্রন্দন করতেন।

জুতা পরিহিত অবস্থায় সলাত পড়া

তিনি কখনও খালী পায়ে আবার কখনও জুতা পরিহিত অবস্থায় সলাত পড়েছেন। ইহুদীদের বিরোধিতা করে তিনি জুতা পরিধান করে সলাত আদায়ের আদেশও দিয়েছেন। কখনও তিনি মাত্র একটি কাপড় পরে আবার কখনও দু'টি আবার কখনও তার বেশী কাপড় পরিধান করে সলাত আদায় করেছেন।

ফরয সলাতে কুনুত পড়া

তিনি একমাস পর্যন্ত ফজরের সলাতে রুকুর পর দু'আয়ে কুনুত পাঠ করেছেন। অতঃপর তা বাদ দিয়েছেন। তিনি মসীবতের সময়ও দু'আয়ে কুনুত পড়তেন। মসীবত চলে গেলে তা আর পাঠ করতেন না। সুতরাং তাঁর সুন্নাত ছিল শুধু বিপদাপদ আসার সময়ই দু'আয়ে কুনুত পাঠ করা এবং তার অবসান হলে বর্জন করা। তিনি শুধু ফজরের সলাতেই দু'আয়ে কুনুত পড়েন নি; বরং তাতে তিনি অধিকাংশ দু'আ কুনুত পড়েছেন। কারণ ফজরের সলাতে কিরাআত দীর্ঘ হয়ে থাকে। এ ছাড়া ফজরের সলাত তাহাজ্জুদ সলাতের অধিক নিকটবর্তী, দু'আ কবুলের সময়ের অতি নিকটে এবং দুনিয়ার আসমানে আল্লাহর নেমে আসার সময়ের খুব কাছাকাছি

সাহু সিজদার বিবরণ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন-

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»

"আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনি ভুল করি। আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো"।[৪৯] সলাতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক একাধিক বার ভুল

৪৯. বুখারী, অধ্যাঃ কিতাবুস্ সালাত,তাও. হা/৪০১, মিশকাত,হাএ. হা/১০১৬

করা উম্মাতের জন্য নেয়ামত স্বরূপ এবং দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ। যাতে তাঁর পরে উম্মাত ভুল করলে সংশোধনের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অনুসরণ করতে পারে।

সুতরাং তিনি একবার চার রাকআত বিশিষ্ট সলাত পড়তে গিয়ে দুই রাকআত পড়ে (মাঝখানে না বসে ভুল বশতঃ) দাঁড়িয়ে গেছেন। সলাত শেষে করে সালামের পূর্বে তিনি দু'টি সাহু সিজদাহ করেছেন। সুতরাং এ থেকে একটি মাসআলা পাওয়া গেল যে, কোন ব্যক্তি সলাতের রুকন ব্যতীত অন্য কোন অংশ ভুল বশতঃ ছেড়ে দিলে তার জন্য সালামের পূর্বে দু'টি সাহু সিজদাহ করতে হবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, রুকন ছাড়া অন্য কোন অংশ (ওয়াজিব বিষয়) ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী রুকন পালন করা শুরু করে দিলে স্মরণ হওয়ার পর ছুটে যাওয়া ওয়াজিব পালনের দিকে পুনরায় ফিরে আসবে না। (বরং পরবর্তী রুকন পালন করা অব্যাহত রাখবে এবং সালামের পূর্বে দু'টি সাহু সিজদাহ করবে)

তিনি একবার যোহর কিংবা আসরের সলাত দুই রাকআত পড়েই সালাম ফিরিয়ে দিয়েছেন। কথাও বলেছেন। অতঃপর তিনি বাকী সলাত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়েছেন। অতঃপর সাহু সিজদাহ করার পর পুনরায় সালাম ফিরিয়েছেন।

একবার তিনি কোন সলাতের এক রাকআত বাকী থাকতেই সালাম ফিরিয়ে চলে গেলেন। তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেন- আপনি সলাতের এক রাকআত ভুলে গেছেন। তিনি ফিরে এসে মাসজিদেপ্রবেশ করে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ইকামাত দিতে বললেন । বেলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইকামাত দিলেন আর তিনি লোকদেরকে নিয়ে বাকী রাকআত সলাত আদায় করলেন।[৫০]

একবার তিনি যোহরের সলাত পাঁচ রাকআত পড়ে সালাম ফিরালেন। সাহাবীগণ তাঁকে বললেন- সলাত কি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন- কি হয়েছে? তারা বললেন- আপনি পাঁচ রাকআত সলাত পড়েছেন। তখন তিনি সালাম ফিরানোর পরে দু'টি সাহু সিজদা প্রদান করলেন। (অন্য বর্ণনায় আছে তিনি সাহু সিজদাহ করে পুনরায় সালাম ফিরিয়েছেন)

তিনি একবার আসরের সলাত তিন রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। লোকেরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বের হয়ে এসে তাদেরকে নিয়ে বাকী এক রাকআত সলাত পড়লেন। অতঃপর তিনি সালাম ফেরালেন। অতঃপর দু'টি সাহু সিজদাহ প্রদান করলেন। পরিশেষে তিনি সালাম ফেরালেন।

উপরোক্ত পাঁচটি স্থানে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সলাতে ভুল হওয়া এবং সাহু সিজদাহ দেয়ার কথা সংরক্ষিত হয়েছে।

সলাতে চোখ বন্ধ রাখা

সলাতে চোখ বন্ধ রাখা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং অন্যান্য ইমামগণ সলাতে চোখ বন্ধ রাখাকে মাকরুহ বলেছেন। তারা বলেন- এটি হচ্ছে ইহুদীদের অভ্যাস। অন্যরা চোখ বন্ধ রাখাকে জায়েয বলেছেন। সঠিক কথা হচ্ছে চোখ খুললে যদি

---

৫০. মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ৬/৪০১, আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাত। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই হাদীছকে সহীহ বলেছেন, সহীহু আবী দাউদ, হা/ ৮৯৯।

সলাতে খুশু-খুযুর (একাগ্রতা, মনোযোগ ও একনিষ্ঠতার) কোন ক্ষতি না হয় তাহলে চোখ খুলে রাখাই উত্তম।

তবে কিবলার দিকে যদি চাকচিক্যময় বস্তু থাকে এবং চোখ খোলা রাখার কারণে দৃষ্টি ঐ সব বস্তুর দিকে চলে যাওয়ার কারণে সলাতে একাগ্রতার ক্ষতি হয় তাহলে চোখ বন্ধ রাখাতে কোন দোষ নেই।

সলাতের পর যিক্‌র-আযকার

সালামের পর তিনি তিন বার ইস্তেগফার করতেন অর্থাৎ আস্তাগফিরুল্লাহ্ বলতেন। অতঃপর তিনি বলতেন-

«اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَام وَمِنْك السَّلَام تَبَارَكْت يَا ذَا الْجَلَال وَالْإِكْرَام»

উচ্চারণ: (আল্লা-হুম্মা আনতা সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া-যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম) "হে আল্লাহ্! তুমিই সালাম (শান্তিময়)। তোমার পক্ষ হতেই শান্তি আগমণ করে। তুমি সুমহান, সম্মানিত এবং মর্যাদাবান।"[৫১]

এই দু'আটি পড়তে যতটুকু সময় লাগে তিনি কেবল ততটুকু সময়ই কিবলামুখী হয়ে বসতেন। অতঃপর বিলম্ব না করে তিনি মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসতেন। সালামের পর তিনি কখনও ডান দিক থেকে আবার কখনও বাম দিক থেকে ঘুরে বসতেন। অতঃপর তিনি মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। মুখ ফিরানোর বেলায় মুসল্লীদের এক দিক বাদ দিয়ে অন্য দিককে প্রাধান্য দিতেন না। ফজরের সলাতের পর সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত তিনি জায়সলাতে বসে থাকতেন। তিনি প্রত্যেক ফরজ সলাতের পর এই দু'আটি পাঠ করতেনঃ

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

"এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো, তা প্রতিহত করার কেউ নেই এবং তুমি যা রোধ কর, তা দান করারও কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা ও সম্পদশালীর সম্পদ তোমার শাস্তি থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারেনা"।[৫২]

---

৫১. মুসলিম, হাএ. হা/১২২২, আবু দাউদ,আলএ. হা/১৫১২, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৩৩৭, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/ ৭৫২, মিশকাত, হাএ. হা/৯৬০, সহীহ

৫২. অর্থাৎ কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা আল্লাহর নিকট থেকে কারও জন্য কিছু আদায় করে দিতে পারেনা অথবা আল্লাহর পক্ষ হতে কোন বিপদ আসলে কোন বিত্তশালীর বিত্ত তা প্রতিহত করতে পারেনা। (আল্লাহই ভাল জানেন) বুখারী, তাও. হা/৮৪৪, ইফা. হা/৮০৪, আপ্র. হা/৭৯৬, মুসলিম, হাএ. হা/১২২৫, ইফা. হা/১২১৪, আবু দাউদ,আলএ. হা/১৫০৫, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৩৪১, মিশকাত, হা/৯৬২

আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা সম্ভব নয় এবং আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায়না। আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আর আমরা তাঁরই ইবাদত করি। সকল নিয়ামাত তাঁরই, সকল অনুগ্রহ তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল উত্তম প্রশংসা।
আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তার নিমিত্তেই আমরা একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন করি। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।"

তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য প্রত্যেক সলাতের পর নিম্নের দু'আগুলো পাঠ করা মুস্তাহাব হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেনঃ

سُبْحَانَ اللهِ (সুব্হানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلهِ (আল্হামদুলিল্লাহ) ৩৩ বার

اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আক্বার) ৩৩ সাথে নিম্নের কালিমা পড়া-

এবং একশত বার পূর্ণ করার জন্য এই দু'আটি বলবে-

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহু লা- শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।[৫৩]

(সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি অত্র দুয়াটি বলবে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা রাশি পরিমান হয়।[৫৪])

সহীহ ইবনে হিব্বানে হারেছ বিন মুসলিম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন- যখন তুমি ফজরের সলাত আদায় করবে তখন কথা বলার পূর্বে সাতবার এই দু'আ পড়বেঃ

«اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ»

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও"।[৫৫] অতঃপর তুমি যদি সেই দিন মারা যাও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে জাহান্নামের আগুন হতে পরিত্রাণ দিবেন। (এছাড়া ফরয সলাতের পর পাঠ করার জন্য আরও অনেক দু'আসমূহ সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে)

দেয়ালের কাছাকাছি দাঁড়ানো এবং সামনে সুতরাহ স্থাপন করে সলাতে দাঁড়ানো

তিনি যখন দেয়াল সামনে রেখে সলাত পড়তেন তখন দেয়াল ও তাঁর মাঝখানে এতটুকু জায়গা ফাঁকা রাখতেন যাতে একটি ছাগল চলাচল করতে পারে। দেয়ালের অনেক দূরে দাঁড়াতেন না; বরং

৫৩. মুসলিম, হাএ. হা/১২৩৯, ইফা. হা/১২২৮, ইসে. হা/১২৪০, আবু দাউদ, আলএ. হা/১১০৪, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪১৩, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৩৩৯, মিশকাত, হা/৯৬২, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।

৫৪ . মুসলিম, হাএ. হা/১২৩৯, মুসনাদে আহমাদ হা/৮৮২০, মিশকাত, হাএ. হা/৯৬৭

৫৫. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটি যাদুল মাআদে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য ইমামগণ হাদীসটিকে সহীহ বা হাসান বললেও ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ ব্যাপারে বিশাল আলোচনা করেছেন। **তাঁর মতে হাদীসটি যঈফ।**

তিনি সুতরার নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ দিতেন। তিনি যখন কাঠি বা খুঁটি কিংবা গাছ সামনে নিয়ে সলাত পড়তেন তখন তিনি সেগুলো ডানে অথবা বামে রেখে দাঁড়াতেন; সরসূরি সামনে রাখতেন না। সফর অবস্থায় এবং মরুভূমিতে অবস্থানকালে তিনি স্বীয় বর্শা পুঁতে সেই দিকে ফিরে সলাত পড়তেন।

এটিকে তিনি সুতরা বানাতেন। কখনও তিনি স্বীয় বাহনকে সামনে রেখে সলাত পড়তেন। কখনও তিনি হাওদার কাঠকে [৫৬] সোজাভাবে সামনে স্থাপন করে সে দিকে ফিরে সলাত পড়তেন। তিনি একটি তীর বা লাঠি দিয়ে হলেও মুসল্লীকে সুতরা স্থাপন করার আদেশ দিয়েছেন। আর তাও যদি না পাওয়া যায় তাহলে মাটিতে একটি রেখা টেনে রেখাটিকেই সুতরা হিসাবে মনে করে সলাত আদায় করতে বলেছেন। সামনে সুতরা না রেখে যদি সলাত পড়া হয়, তাহলে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহিলা, গাধা এবং কালো কুকুর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে সলাত বাতিল হয়ে যায়। এই বর্ণনার বিপরীতে যা বর্ণিত হয়েছে তা সহীহ হলেও সুস্পষ্ট নয়। আর যে সমস্ত সুস্পষ্ট বর্ণনায় আছে যে মহিলা, গাধা এবং কালো কুকুর বা অন্য যে কোন প্রাণী সামনে দিয়ে অতিক্রম করুক তাতে সলাত বাতিল হবে না, তা সহীহ নয়। নাবী ﷺ কখনও সলাত পড়তেন। তখন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর সামনে কিবলার দিকে ঘুমিয়ে থাকতেন। তবে এই অবস্থা সলাতীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার মত নয়। কেননা সলাতীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। কিন্তু সলাতীর সামনে অবস্থান করা (ঘুমিয়ে থাকা) দোষণীয় নয়।

নাবী ﷺ এর সুন্নাত সলাতগুলো কেমন ছিল?

নিজ দেশে (মদীনায়) থাকা অবস্থায় তিনি সর্বদা দশ রাকআত সলাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। এই দশ রাকআতের ব্যাপারে ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- আমি রসূল ﷺ হতে দশ রাকআত সলাত স্মরণ রেখেছি। যোহরের পূর্বে দুই রাকআত, তার পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত, ইশার পরে দুই রাকআত, যা তিনি বাড়িতে পড়তেন এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকআত। যোহরের পরের দুই রাকআত সলাত একবার ছুটে গেল তিনি তা আসরের পরে নিষিদ্ধ সময়ে আদায় করেছেন। তিনি কখনও যোহরের পূর্বে চার রাকআত আদায় করতেন।

মাগরিবের পূর্বেও সুন্নাত রয়েছে

মাগরিবের পূর্বের দুই রাকআত সম্পর্কে নাবী ﷺ হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন-

---

৫৬. অশ্বপৃষ্ঠে বসার জন্য অশ্বারোহী যেমন জিন (গদি) স্থাপন করে থাকে তেমনি উটের পিঠে উষ্ট্রারোহীর বসার জন্য যে আসন স্থাপন করা হয় তাকে হাওদাজ বলা হয়। এই হাওদাজের পিছনের দিকে প্রায় এক হাত লম্বা একটি কাঠ স্থাপন করা হয়। এর সাথে আরোহী প্রয়োজনের সময় হেলান দিয়ে থাকে। সফর অবস্থায় সুতরার জন্য কোন কিছু পাওয়া না গেলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাওদাজের এই কাঠটিকেই সুতরাহ হিসেবে ব্যবহার করতেন।

«صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً»

"তোমরা মাগরিবের পূর্বে সলাত আদায় কর। তৃতীয়বার তিনি বললেন- তবে যে ব্যক্তি তা পড়তে চায়। যাতে করে লোকেরা এটিকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ হিসেবে গ্রহণ না করে"।[৫৭] এটিই সঠিক কথা। মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত পড়া মুস্তাহাব, সুন্নাতে রাতেবা (মুআক্কাদাহ) নয়।

নফল ও সুন্নাত সলাত বাড়ীতে পড়া

নাবী ﷺ সকল সুন্নাত ও যাবতীয় নফল সলাত বিশেষ কোন কারণ না থাকলে বাড়িতেই পড়তেন। বিশেষ করে মাগরিবের সুন্নাত তিনি বাড়িতেই আদায় করতেন। কখনও তিনি তা মাসজিদে পড়েছেন বলে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নেই। তবে মাসজিদে পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। সমস্ত নফল সলাতের মধ্য হতে তিনি ফজরের সুন্নাতের প্রতি অধিক গুরত্ব প্রদান করতেন। ফজরের সুন্নাত এবং বিতর সলাত তিনি সফরে বা নিজ বাসস্থানে থাকা অবস্থায় কখনও ছাড়েন নি। সফর অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ও বিতর সলাত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

বিতর ও ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের গুরুত্ব এবং তাতে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়ার হিকমত

ফিক্হবিদগণ বিতর ও ফজরের সুন্নাত- এদু'টির মধ্যে কোনটি বেশী গুরত্বপূর্ণ ও জরুরী তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। ফজরের সুন্নাতের মাধ্যমে দিবসের সলাত শুরু হয় এবং বিতর সলাতের মাধ্যমে রাতের আমলের পরিসমাপ্তি হয়। এ জন্যই নাবী ﷺ এই দুইটি সলাত সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরুন দিয়ে পড়তেন। কেননা এই সূরা দু'টির মধ্যে তাওহীদে ইলমী ও তাওহীদে আমলী তথা তাওহীদুল আসমাও ওয়াস্ সিফাত এবং তাওহীদুল উলুহীয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং সূরা ইখলাসে আল্লাহর জন্য এমন পরিপূর্ণ একক ও অদ্বিতীয় হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা সকল প্রকার শির্কের পরিপন্থী। এই সূরায় আল্লাহর জন্য সন্তান ও পিতা হওয়ার ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এটি তাঁর পরিপূর্ণরূপে অমূখাপেক্ষী, স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর এতে বলা হয়েছে, কেউ আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারেনা। এ কথাটি আল্লাহর জন্য কোন উপমা, কোন দৃষ্টান্ত এবং তাঁর মত অন্য কেউ হওয়ার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিয়েছে।

সুতরাং সূরা ইখলাসে আল্লাহর জন্য সকল প্রকার কামালিয়াত তথা পরিপূর্ণ ও পবিত্র গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ত্রুটিপূর্ণ সকল গুণ থেকে মুক্ত হওয়ার কথাটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে। মূলতঃ এই সূরায় তাওহীদের মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, যা মেনে নিলে মানুষ সকল প্রকার গোমরাহ ও বাতিল ফির্কাহ থেকে দূরে থাকতে পারবে। তাই সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।[৫৮] কেননা কুরআনের বিষয় বস্তু খবর ও হুকুম-আহকামের মাঝে সীমিত। হুকুম-আহকামের মধ্যে রয়েছে

---

৫৭. বুখারী তাও. হা/১১৮৩, মিশকাত, হাএ. হা/১১৬৫

৫৮. সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী ইবনে জারীরে বরাত দিয়ে বলেনঃ কুরআনের বিষয় বস্তু তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত। (১) তাওহীদ, (২) ঘটনাবলী এবং (৩) হুকুম-আহকাম ও শরীয়ত। সূরা ইখলাসে শুধু তাওহীদের আলোচনা হয়েছে বলেই এটিকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান বলা হয়েছে। (দেখুনঃ আল-ইতকান (২/৩৩৮) আল্লাহই ভাল জানেন।

আদেশ, নিষেধ এবং মুবাহ বা বৈধ বিষয়সমূহ। আর তাতে রয়েছে দুই প্রকারের খবর। রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার যাতে পাক এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে খবর আর রয়েছে মাখলুক তথা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ। (যেমন অতীতের জাতিসমূহের খবরাদি, তাদের নিয়ামাত প্রাপ্তির খবর এবং আল্লাহর অবাধ্য জাতিসমূহের ধ্বংসের খবর কুরআন মজীদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে) সূরা ইখলাস বিশেষভাবে আল্লাহ্ সম্পর্কে এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে খবর দিয়েছে বলেই এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।

আর সূরা ইখলাস পাঠকারী যেমন শির্কে এতেকাদী তথা আকীদায় শিরক হওয়া থেকে পরিত্রাণ পায় তেমনি সূরা কাফিরুন বান্দাকে তার আমলে শিরক সংঘটিত হওয়া থেকে মুক্ত রাখে। কথা ও কাজের পূর্বে যেহেতু ইলম (সঠিক আকীদাহ) জরুরী, ইলমই যেহেতু মানুষকে আমলের দিকে নিয়ে যায় এবং তা নিয়ন্ত্রণ করে তাই সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান আর সূরা কাফিরুন কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান।[৫৯]

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণেই যেহেতু মানুষ শির্কে আমলীতে লিপ্ত হয় এবং এতে লিপ্ত অধিকাংশ মানুষই যেহেতু এর ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হয়েই লিপ্ত হয় এবং এটিকে দূর করা শির্কে এতেকাদী তথা বিশ্বাসের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী শিরক দূর করার চেয়ে অধিক কঠিন, কারণ আকীদায় প্রবেশকারী শিরক দলীল-প্রমাণ পেশ করলে যেহেতু দূর হয়ে যেতে পারে আর যার আকীদায় শিরক আছে সে যখন ভালভাবে তা জানতে পারবে তখন তার পক্ষে জেনেবুঝে শির্কের উপর অবিচল থাকা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই সূরা কাফিরুনে জোর দিয়ে বারবার শির্কে আমলীর প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ জন্যই নাবী ﷺ কাবা ঘরের তাওয়াফের পর দুই রাকআত সলাতে উক্ত সূরা দু'টি পাঠ করতেন। কেননা হাজ্জ হচ্ছে তাওহীদের বিরাট একটি নিদর্শন।

এই সূরা দু'টি ফজরের সুন্নাতে পড়ার মাধ্যমে তিনি দিবসের আমল শুরু করতেন এবং বিতর সলাতে পড়ার মাধ্যমে রাতের আমলের পরিসমাপ্তি ঘটাতেন।

ফজরের সুন্নাত সলাতের পর ডান কাতে শয়ন করা

তিনি ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শয়ন করতেন। এই শয়নের ব্যাপারে দু'টি দল মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে। যাহেরী মাজহাবের লোকেরা এই শয়নকে ওয়াজিব বলেছে। আরেক দল এটিকে মাকরুহ বলেছে। ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং অন্যান্য আলেমগণ এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন

---

৫৯. সূরা কাফিরুন কুরআনের এক চতুথাংশের সমান। এর ব্যাখ্যায় আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেনঃ কুরআনের বিষয় বস্তু মূলত চারটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত। এতে এককভাবে আল্লাহর ইবাদতের আদেশ, শিরক ও পাপ কাজ থেকে নিষেধ, সৎ কাজের বিনিময়ে পুরস্কারের ওয়াদা এবং নাফরমানির ফলাফল হিসাবে শাস্তি দেয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। উপরোক্ত চারটি বিষয় থেকে সূরা কাফিরুনে যেহেতু আল্লাহর ইবাদতের আদেশ দেয়া হয়েছে তাই এটি কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান।

আল্লামা আব্দুর রাহমান মুবারকপুরী তিরমিযীর ব্যাখ্যা তুহফাতুল আহওয়াযীতে বলেনঃ সূরা কাফিরুন কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, কুরআন মজীদে তাওহীদ, নবুওয়াত, পার্থিব জীবনের হুকুম-আহকাম এবং পরকালের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই সূরাতে যেহেতু শির্কের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করার মাধ্যমে তাওহীদকে সাব্যস্ত করা হয়েছে তাই এটি কুরআনের চারভাগের এক ভাগের সমান। আল্লাহই ভাল জানেন।

করেছেন। তারা বলেছেন- একটু আরাম গ্রহণ করার জন্য এবং সামান্য সময়ের জন্য শয়ন করলে দোষের কিছু নয়। আর কেউ শয়নকে সুন্নাত মনে করে পালন করলে ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং অন্যান্য ইমামগণ মাকরুহ বলেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রাতের বা তাহাজ্জুদ সলাত

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়িতে কিংবা সফরে থাকা অবস্থায় কখনও রাতের তাহাজ্জুদ সলাত বর্জন করেন নি। রাতে যখন তাঁর ঘুম এসে যেত বা অসুস্থতা অনুভব করতেন তখন তিনি দিনের বেলায় বার রাকআত সলাত আদায় করতেন। আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে বলতে শুনেছি, এতে দলীল রয়েছে যে, তাহিয়াতুল মাসজিদ, সূর্য গ্রহণের সলাত এবং বৃষ্টির প্রার্থনার সলাতের ন্যায়ই বিতর সলাতের সময় চলে গেলে তা কাযা করা যাবেনা। কেননা বিতর সলাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা যেন রাতের শেষ সলাত হয় (সুতরাং রাত চলে যাওয়ার কারণে তা আদায় ও কাযা করার সময় শেষ হয়ে গেছে)[৬০]। তিনি রাতে এগার অথবা তের রাকআত সলাত আদায় করতেন। এগার রাকআতের ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। শেষ দুই রাকআতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তা কি ফজরের দুই রাকআত ছিল? না অন্য কোন সলাত?

ফরয সলাতের রাকআত সংখ্যার সাথে রাতের সলাতের রাকআত সংখ্যা এবং সুন্নাতে রাতেবার (মুআক্কাদার) রাকআত সংখ্যা যদি মিলানো হয় তাহলে দেখা যায় যে, রাত ও দিনের সলাত সব মিলে চল্লিশ রাকআত হয়। এই মোট চল্লিশ রাকআত সলাত তিনি যত্নসহকারে আদায় করতেন। এর বাইরে তিনি যে সমস্ত সলাত পড়েছেন তা নিয়মিত পড়েন নি। সুতরাং মুসলিম বান্দার উচিত মৃত্যু পর্যন্ত এই সলাতগুলো আদায় করা। যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে আল্লাহর দরজায় চল্লিশবার করাঘাত করবে আশা করা যায় যে, তার জন্য দ্রুত সেই দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার কথা শ্রবণ করা হবে। রাতে যখন তিনি জাগ্রত হতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

«لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ»

"হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার গুনাহ থেকে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি তোমার রহমত কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। আমাকে সঠিক পথ দেখানোর পর আমার অন্তরকে বক্র করে দিওনা। তোমার পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা"।[৬১]

---

৬০. তবে অধিকাংশ আলেমের মতে বিতরেরও কাযা আছে। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ যে ব্যক্তি বিতর না পড়েই ঘুমিয়ে পড়বে অথবা বিতর পড়তে ভুলে যাবে, সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই তা পড়ে নেয়। শাইখ আলবানী এই হাদীছকে সহীহ বলেছেনঃ দেখুন সহীহ আবু দাউদ, হা/ ১২৬৮।

৬১ . আবু দাউদ, আলএ. হা/১১০৪, **শাইখ আলবানী এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন**।

ঘুম থেকে উঠতেন তখন এই দু'আও পাঠ করতেন

«الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জাগ্রত করেছেন। তাঁর দিকেই সকলকে একত্রিত হতে হবে"।[৬২] অতঃপর তিনি মিসওয়াক করতেন। কখনও তিনি সূরা আল-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি ওযূ করে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত সলাত আদায় করতেন। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছে এ ব্যাপারে আদেশও দেয়া হয়েছে।

রাত অর্ধেক হয়ে গেলে বা তার একটু পূর্বে বা অর্ধেক রাতের একটু পরে তিনি সলাতে দাঁড়াতেন। কখনও তিনি রাতের সলাতকে কয়েক অংশে ভাগ করে নিতেন আবার কখনও এক সাথে মিলিয়ে আদায় করতেন। তবে অধিকাংশ সময়ই তিনি কয়েক ভাগে বিভক্ত করেই আদায় করতেন। ভাগ করে আদায় করার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই রাকআত সলাত পড়ে শুয়ে পড়তেন এবং নিদ্রা যেতেন। এভাবে ছয় রাকআত সলাতে তিনবার এরূপ করেছেন। প্রতিবার উঠেই তিনি মিসওয়াক করেছেন এবং ওযূ করেছেন। অতঃপর তিন রাকআত বিতর পড়েছেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েক পদ্ধতিতে বিতর সলাত পড়তেন

- রাতের সলাত তিনি আট রাকআত পড়তেন। প্রত্যেক দুই রাকআতের পর সালাম ফেরাতেন। অতঃপর একটানে পাঁচ রাকআত বিতর পড়তেন। শেষ রাকআতের আগে তিনি তাশাহুদের জন্য বসতেন না।
- তিনি কখনও একাধারে নয় রাকআত সলাত পড়তেন। শুধু অষ্টম রাকআতে বসতেন। বসে তিনি আল্লাহর যিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং দু'আ করতেন। অতঃপর সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর নবম রাকআত পড়ে বসতেন, তাশাহুদ পাঠ করতেন এবং সালাম ফিরাতেন। সালাম ফিরানোর পর আরও দুই রাকআত সলাত পড়তেন।
- উপরোক্ত নয় রাকআতের নিয়মে তিনি সাত রাকআতও পড়তেন। অতঃপর বসে দুই রাকআত সলাত আদায় করতেন।
- তিনি দু'দু রাকআত করে সলাত পড়তেন। অতঃপর তিন রাকআত বিতর পড়তেন। এতে তাশাহুদ পাঠ বা বসার মাধ্যমে পার্থক্য করতেন না। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে এটিই বর্ণনা করেছেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন রাকআত বিতর পড়তেন। মাঝখানে কোন বিরতি নেন নি। তবে এই বর্ণনার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কেননা সহীহ ইবনে হিব্বানে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফু হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- তোমরা তিন রাকআত বিতর পড়বেনা। পাঁচ অথবা সাত রাকআত পড়। আর ولا تشبهوا بصلاة المغرب অর্থাৎ বিতরকে মাগরিবের মত করে আদায় করোনা। ইমাম দারকুতনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- এই হাদীছের সকল

---

৬২ . বুখারী, তাও. হা/৬৩১৪ ইফা. হা/৫৭৬২, আপ্র. হা/৫৮৬৯, আবু দাউদ, আলএ. হা/৫০৪৯, সহীহ ইবনে মাজাহ, তাও. হা/৩৮৭০, তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪১৭, মিশকাত, মাশা. হা/২৩৮২

বর্ণনাকারীই সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। হারব বলেন- ইমাম আহমাদকে বিতর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে। সালাম না ফিরালেও আমার মতে কোন অসুবিধা নেই। তবে নাবী ﷺ থেকে সালাম ফিরানোর বর্ণনাই অধিক বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত। আবু তালেব থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, এক রাকআত বিতর পড়ার ব্যাপারেই অধিকাংশ এবং অধিক শক্তিশালী হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- আমিও এই মতের পক্ষপাতী।

- বিতর সলাতের আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে যা ইমাম নাসাঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, তিনি নাবী ﷺ এর সাথে রামাযানের সলাত পড়েছেন। তিনি রুকুতে ঠিক সেই পরিমাণ সময় অবস্থান করেছেন, যে পরিমাণ সময় তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাতে এই দু'আ পড়েছেনঃ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ। এই হাদীছে রয়েছে যে, তিনি চার রাকআত সলাত পড়ে শেষ করতেই বিলাল তাঁকে ফজরের সলাত পড়ার জন্য ডাকতে আসলেন।

বিতর সলাতের সময়

তিনি রাতের প্রথমাংশে, মাঝখানে এবং শেষাংশে বিতর পড়েছেন। তিনি কোন এক রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি আয়াত পাঠ করেছেন। আয়াতটি ছিল এই-

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"হে আল্লাহ! তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তাহলে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি তো পরাক্রমশালী ও মহা প্রজ্ঞাময়"। (সূরা মায়েদাঃ ১১৮)

রাতে তাঁর সলাতগুলো তিন ধরণের ছিল।

- ১. অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে সলাত পড়তেন।
- ২. তিনি বসেও সলাত পড়তেন।
- ৩. তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন। কিরাআতের সামান্য বাকী থাকতে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে রুকু করতেন।

রসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বিতরের পরে কখনও বসে দুই রাকআত সলাত পড়তেন। কখনও তিনি তাতে বসে কিরাআত পাঠ করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং রুকু করতেন।

এই হাদীসটিকে অনেকেই সমস্যা মনে করেছে। তারা এটিকে রসূল ﷺ এর হাদীসঃ "তোমরা রাতের শেষ সলাতকে বিতর-এ পরিণত কর" এর বিরোধী মনে করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- আমি এই দুই রাকআত পড়বো না এবং কাউকে তা পড়তে বাঁধাও দিবোনা। ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই দুই রাকআতের প্রতিবাদ করেছেন। তবে সঠিক কথা হচ্ছে বিতর একটি আলাদা ইবাদত। এটি মাগরিবের সলাতের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাতের মতই। সুতরাং উল্লেখিত এই দুই রাকআত সলাত বিতর সলাতেরই পরিপূরক। স্বতন্ত্র কোন সলাত নয়।

Contents

বিতর সলাতে দু'আ কুনুত পড়া

বিতর সলাতে দু'আয়ে কুনুত পড়ার কথা নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। শুধু ইবনে মাজাহ শরীফের একটি হাদীছে তাতে দু'আ কুনুত পড়ার কথা উল্লেখ আছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- নাবী ﷺ থেকে এ বিষয়ে সহীহ সূত্রে কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পূর্ণ এক বছর বিতর সলাতে দু'আয়ে কুনুত পড়েছেন।

সুনান গ্রন্থসমূহের লেখকগণ দু'আয়ে কুনুতের ব্যাপারে হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীস সম্পর্কে বলেন- হাদীসটি হাসান, তবে তা আবুল হাওরা সা'দীর সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

বিতর সলাতে দু'আয়ে কুনুত পড়ার কথা উমার, উবাই বিন কা'ব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ﷺ বিতর সলাতের প্রথম রাকআতে সূরাতুল আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। বিতর সলাত শেষে সালাম ফেরানোর পর তিনি তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ পাঠ করতেন। তৃতীয়বার আওয়াজ লম্বা ও উঁচু করতেন।

তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করা

তিনি তারতীলের সাথে (থেমে থেমে) কুরআনের সূরা পাঠ করতেন। যাতে সূরাটি মূলত যতটুকু লম্বা তার চেয়ে অধিক লম্বা মনে হত। কেননা কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা মনোযোগ সহকারে পড়া ও বুঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। তিলাওয়াত ও মুখস্থ করা কুরআনের অর্থ বুঝার সর্বোত্তম একটি মাধ্যম।

কোন কোন সালাফ (পূর্ববর্তী যুগের আলেম) বলেছেন- আমল করার জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং তার তিলওয়াতকেও আমল মনে কর। শু'বা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- আবু হামজাহ আমাকে বলেছেন- আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললামঃ আমি দ্রুত পড়ায় অভ্যস্থ। কখনও কখনও এক রাতেই একবার অথবা দুইবার পূর্ণ কুরআন খতম করে ফেলি। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন বললেন- তুমি যা করে থাক তার চেয়ে আমার নিকট একটি সূরা পড়াই অধিক প্রিয়। তুমি যদি দ্রুত পড়তেই চাও তাহলে এভাবে পড় যাতে তোমার কান উহা শুনে এবং তোমার অন্তর তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। ইবরাহীম বলেন- একদা আলকামা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সামনে কুরআন তিলাওয়াত করলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা শুনে বললেন- আমার মা বাপ তোমার জন্য কোরবান হোক! তারতীলের সাথে পড়। কেননা এতেই কুরআনের সৌন্দর্য।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরও বলেন- কবিতা আবৃত্তির মত করে কুরআন পড়ো না এবং সাধারণ কথা-বার্তার ন্যায়ও তা চালিয়ে যেয়োনা; বরং তা পড়ার সময় বিস্ময়কর বিষয়গুলোর নিকট একটু থামো এবং তার দ্বারা অন্তরে সাড়া জাগাও। সূরা শেষ করাই যেন তোমাদের কারও উদ্দেশ্য না হয়। তিনি আরও বলেন- যখন তুমি শুনবে যে আল্লাহ তা'আলা বলছেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ হে

ঈমানদারগণ! তখন তোমার কানকেও এই বাণীটি শুনাও। কারণ এটি হয়ত তোমাকে কোন কল্যাণের আদেশ দিচ্ছে না হয় তোমাকে কোন অকল্যাণ হতে বারণ করছে।

আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- আমার কাছে এক মহিলা আসল। তখন আমি সূরা হুদ পড়ছিলাম। মহিলাটি আমাকে বলল- হে আব্দুর রহমান! তুমি এভাবে সূরা হুদ পড়ছ? আল্লাহর শপথ! আমি ছয় মাস যাবৎ এটি পড়ছি। এখনও তা শেষ করতে পারি নি।

নাবী ﷺ কখনও রাতের সলাতে নীচু আওয়াজে কুরআন পড়তেন। আবার কখনও স্বরবে পড়তেন। কখনও দীর্ঘ কিয়াম করতেন আবার কখনও সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি সফর অবস্থায় দিনে ও রাতে বাহনের উপর বসে নফল সলাত পড়তেন। বাহন তাঁকে নিয়ে যেদিকে যেত সেদিকে ফিরেই তিনি সলাত পড়তেন (কিবলামুখী হওয়া জরুরী নয়)। ইঙ্গিতের মাধ্যমে রুকু ও সিজদাহ করতেন। রুকুর তুলনায় সিজদাতে বেশী ঝুকতেন।

নাবী ﷺ এর চাশতের সলাত

সহীহ বুখারীতে আয়শা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- আমি কখনও নাবী ﷺ কে চাশতের সলাত পড়তে দেখিনি। তবে আমি তা পড়ি। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন- আমার বন্ধু রসূল ﷺ আমাকে প্রত্যেক মাসে তিন দিন সিয়াম রাখার, দুই রাকআত চাশতের সলাত পড়ার এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সলাত পড়ার আদেশ দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে যায়েদ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফু হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, দিবসের উত্তাপ বেড়ে গেলে সালাতুল আওয়াবীন (চাশতের) সলাতের সময় হয়। তিনি তা পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি যেহেতু তাহাজ্জুদ পড়তেন, তাই তিনি এই সলাত পড়েন নি। মাসুরক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- আমরা মাসজিদে সলাত পড়তাম। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ সলাত পড়ে চলে গেলে মাসজিদেই থেকে যেতাম। অতঃপর চাশতের সলাত পড়তাম। এই খবর ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন- হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তোমাদের উপর যেই বোঝা চাপিয়ে দেন নি, তোমরা কেন তা বহন করতে যাচ্ছ? তোমরা যদি তা পড়তেই চাও, তাহলে তোমরা তা ঘরের মধ্যে পড়। সাঈদ বিন যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি এই আশঙ্কায় চাশতের সলাত ছেড়ে দেই, যাতে আমার উপর তা আবশ্যক হয়ে না যায়।

সিজদায়ে শোকর আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত

নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের পবিত্র সুন্নাতের অংশ ছিল যে, নতুন কোন খুশীর খবর আসলে অথবা মসীবত চলে যাওয়ার সংবাদ আসলে তারা আল্লাহর দরবারে সিজদায়ে শোকর আদায় করতেন। কুরআন তিলাওয়াতের সময় সিজদাহ বিশিষ্ট কোন আয়াত আসলে আল্লাহু আকবার বলে তিনি সিজদাহ করতেন। তিলাওয়াতের সিজদায় তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন-

«سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»

"আমার মুখমন্ডল সেই আল্লাহর জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়েছে, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, উহার সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন এবং স্বীয় ক্ষমতা বলে উহাতে কান ও চক্ষু স্থাপন করেছেন"[৬৩]। এই সিজদাহ হতে মাথা উঠানোর সময় আল্লাহু আকবার বলেছেন কি না, এ মর্মে তাঁর থেকে কিছুই বর্ণিত হয়নি। এতে তাশাহুদ পাঠ করা ও সালাম ফিরানোর কথাও বর্ণিত হয়নি।

কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাহ

রসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সূরা আলিফ লাম তানযীল, সূরা সোয়াদ, সূরা আলাক, সূরা নাজম এবং সূরা ইযাস সামাউন শাক্কাতে সিজদাহ করেছেন।

আবু দাউদ শরীফে আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ তাঁকে পনেরটি সিজদাহ শিক্ষা দিয়েছেন। তার মধ্যে মুফাস্সালে তিনটি এবং সূরা হজ্জে দুইটি। মদীনায় হিজরতের পরে মুফাস্সালে কোন সিজদা দেন নি বলে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে যেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ। তার সনদে রয়েছে আবু কুদামাহ হারিছ বিন উবাইদ। তার বর্ণিত হাদীস দলীল হতে পারেনা। তা ছাড়া এর সনদে মাতার আল-ওয়াররাক নামক একজন রাবী থাকার কারণেও ইবনুল কাত্তান হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। তিনি বলেন- মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লার মতই তার স্মরণ শক্তি দুর্বল ছিল। ইমাম মুসলিম কর্তৃক তার থেকে হাদীস বর্ণনা করাতে দোষের কিছু নেই। কেননা তিনি কেবল তার ঐ সমস্ত হাদীসই বর্ণনা করেছেন, যা তিনি স্মরণ রাখতে পেরেছেন বলে নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। যেমন তিনি নির্ভরযোগ্য রাবীদের ঐ সমস্ত হাদীসও বর্জন করতেন, যাতে তারা ভুল করেছেন।

কিছু মুহাদ্দিছ সকল ছিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য রাবীর সব হাদীসকেই সহীহ বলেছেন। আবার কতিপয় আলেম দুর্বল স্মরণ শক্তি সম্পন্ন সকল রাবীর সকল হাদীসকে যঈফ বলেছেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম হাকেম এবং অন্যান্যদের পদ্ধতিটিই উত্তম। অতঃপর ইবনে হাযম (রহিমাহুল্লাহ) এর অভিমত। আর ইমাম মুসলিম যেই পন্থা অবলম্বন করেছেন তাই উসূলে হাদীছের ইমামদের মত। অর্থাৎ যে সমস্ত রাবীর মধ্যে সকল শর্তই বিদ্যমান, কিন্তু তাদের স্মরণ শক্তি তেমন প্রখর নয়, তাদের হাদীসগুলো যদি অন্যান্য রাবীদের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয় বা যে সমস্ত হাদীসকে তারা স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা যাবে মুহাদ্দিছগণ তাদের সেই হাদীসগুলোকে গ্রহণ করেছেন।

জুমআর সলাতে রসূল ﷺ এর হিদায়াত কেমন ছিল?

নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা জুমআর দিনের সন্ধান দেন নি। ইহুদীরা বেছে নিয়েছে শনিবারকে, নাসারসূণ পেয়েছে রোববার। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জুমআর দিনের সন্ধান দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের জন্য জুমআর দিন।

---

৬৩. আবু দাউদ, আলএ, হা/১৪১৪, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪২৫, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১১২৯, মিশকাত, মাশা. হা/১০৩৫, সহীহ

ইহুদীরা আমাদের এক দিন পর, নাসারারা দুই দিন পর। এমনি কিয়ামতের দিন তারা আমাদের পিছনে থাকবে। আমরা দুনিয়াতে এসেছি সবার পরে, কিন্তু কিয়াতের দিন থাকবো সকলের আগে। আমাদের মাঝেই কিয়ামতের দিন সকলের পূর্বে ফায়সালা করা হবে।

ইমাম তিরমিযী আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে সহীহ সূত্রে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- সমস্ত দিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে জুমআর দিন। এই দিনে আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। জুমআর দিনেই কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মুআত্তায় এই হাদীসকে কয়েকটি শব্দ বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী সেই বর্ণনাকেও সহীহ বলেছেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- সমস্ত দিবসের মধ্যে জুমআর দিনই হচ্ছে সর্বোত্তম দিন। এ দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এতেই তাঁকে দুনিয়ায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে, এ দিনেই তাঁর তাওবা কবুল করা হয়েছে, এতেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন এবং এতেই কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। জুমআর দিন সূর্য উদয় হওয়ার পর মানুষ এবং জিন ব্যতীত প্রত্যেক প্রাণীই কিয়ামতের ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। জুমআর দিনে এমন একটি বরকতময় সময় আছে যাতে মুসলিম বান্দা সলাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ্ তাকে তা দান করবেন। কা'ব বিন মালেক হাদীছের রাবী আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করলেন- এটি কি প্রত্যেক বছরে হয়ে থাকে? আবু হুরায়রা বললেন- বরং প্রত্যেক জুমআতেই তা রয়েছে। অতঃপর কা'ব তাওরাত খুলে পাঠ করলেন এবং বললেন- আল্লাহর রসূল সত্য বলেছেন। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ বিন সালামের সাথে সাক্ষাৎ করে কা'বের সাথে আমার বৈঠকের কথা জানালাম। তিনি বললেন- আমি সেই সময়টি সম্পর্কেও অবগত আছি। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আমি তাকে বললামঃ আমাকে সেই সময়টি সম্পর্কে সংবাদ দিন। তিনি বললেন- এটি হচ্ছে জুমআর দিনের শেষ মুহূর্ত। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি করে সম্ভব? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো বলেছেন- মুসলিম বান্দা তখন সলাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ্ তাকে উহা দান করবেন। আর জুমআর দিনের শেষ মুহূর্ত এমন একটি সময় যাতে সলাত পড়া বৈধ নয় (আসর সলাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সলাত পড়া নিষিদ্ধ)। সুতরাং উহা তো সলাতের সময় নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তখন বললেন- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বলেন নি, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে সলাতের অপেক্ষায় থাকে সে ব্যক্তি সলাত পড়া পর্যন্ত সলাতেই মশগুল থাকে? মুসনাদে আহমাদে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসটি এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল, কি কারণে জুমআর দিনকে এই নামে নাম করণ করা হয়েছে? তিনি বললেন- জুমআর দিনে তোমাদের পিতা আদমকে তৈরীর জন্য সংগৃহিত মাটিকে মানবাকৃতি প্রদান করা হয়েছে, এ দিনেই সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, এ দিনেই হাশর হবে এবং কাফেরদেরকে পাকড়াও করা হবে। এই দিনের শেষাংশে তিনটি মুহূর্ত রয়েছে। তার মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে তাতে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করবে তার দু'আ কবুল করা হবে।

কোন্ সাহাবী মদীনায় সর্বপ্রথম জুমআর সলাত চালু করেন?

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক আব্দুর রহমান বিন কাব বিন মালেক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- আমার পিতা অন্ধ হয়ে গেলে আমিই তাঁকে নিয়ে সলাতে যেতাম। আমি যখন তাঁকে নিয়ে জুমআর সলাতে যেতাম তখন তিনি আযান শুনে আবু উমামাহ আসআদ বিন যুরারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করতেন। আমি যখন তার কাছ থেকে আসআদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা শুনতাম তখন মনে মনে বলতাম- অবশ্যই এ ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করবোঃ কেন তিনি তা করেন। সুতরাং একদা জুমআর দিন এমনটি করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আমার পিতা! প্রত্যেকবার জুমআর আযান শুনেই আপনি আসআদ বিন যুরারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন কেন? তিনি বললেন- হে বৎস! শুন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর মদীনায় আগমণের পূর্বে আসআদ আমাদেরকে সর্বপ্রথম বনী বায়াযার 'হাযমুন নাবিত' নামক স্থানে জুমআর সলাতে একত্রিত করেছিলেন। এই স্থানটিকে 'নাকীউল খাযমাত' বলা হয়। আব্দুর রহমান বিন কাব বলেন- আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সেদিন সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বললেন- চল্লিশজন পুরুষ।

ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- এই হাদীসটি হাসান। এর সনদ সহীহ। অতঃপর রসূল ﷺ মদীনায় আসলেন। কুবায় এসে সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার এই চার দিন অবস্থান করলেন। কুবার অধিবাসীদের জন্য তাদের মাসজিদ নির্মাণ করলেন। জুমআর দিন তিনি কুবা থেকে বের হলেন। বনী সালেম বিন আওফ গোত্রের নিকট আসতেই জুমআর সলাতের সময় হয়ে গেল। সেখানের উপত্যকায় অবস্থিত মাসজিদেই তিনি জুমআর সলাত পড়লেন। এটি ছিল মাসজিদে নববী নির্মাণ করার পূর্বে।

নাবী ﷺ এর জুমআর খুতবা

প্রথম খুতবাঃ ইবনে ইসহাক বলেন- রসূল ﷺ সর্বপ্রথম যেই খুতবাটি দিয়েছিলেন তা আমার নিকট আবু সালামা বিন আব্দুর রাহমানের সূত্রে পৌঁছেছে। রসূল ﷺ যা বলেন নি, আমরা তাঁর দিকে ঐ সমস্ত কথা সম্পৃক্ত করা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

তিনি মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন-

«أَمّا بَعْدُ أَيّهَا النّاسُ فَقَدّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ تَعْلَمُنّ وَاللهِ لَيُصْعَقَنّ أَحَدُكُمْ ثُمّ لَيَدَعَنّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ ثُمّ لَيَقُولَنّ لَهُ رَبّهُ وَلَيْسَ لَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُونَهُ أَلَمْ يَأْتِك رَسُولِي فَبَلّغَكَ وَآتَيْتُك مَالًا وَأَفْضَلْتُ عَلَيْك فَمَا قَدّمْت لِنَفْسِك فَلَيَنْظُرَنّ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا ثُمّ لَيَنْظُرَنّ قُدّامَهُ فَلَا يَرَى غَيْرَ جَهَنّمَ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ مِنْ النّارِ وَلَوْ بِشِقّ مِنْ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيّبَةٍ فَإِنّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»

"আম্মা বাদ। হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের মুক্তির জন্য আমল কর। আল্লাহর শপথ! তোমরা তখন অবশ্যই (পরকালের উদ্দেশ্যে আমল করার গুরুত্ব সম্পর্কে) জানতে পারবে যখন তোমাদের কেউ (শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার আওয়াজ শুনে) বেহুঁশ হয়ে যাবে। সে তার ছাগলের পালকে রাখাল বিহীন অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে, অতঃপর তার প্রভু তার সাথে কথা বলবেন, তার মাঝে ও তার প্রভুর মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না (সরসূরি কথা হবে) এবং তার মাঝে ও তার প্রভুর মাঝে কোন পর্দা থাকবে

না। তিনি বলবেনঃ তোমার কাছে কি আমার রসূল এসে আমার হুকুম-আহকাম পৌঁছে দেয় নি? আমি তোমাকে দুনিয়ার সম্পদ দিয়েছিলাম এবং তোমার উপর অনুগ্রহ করেছিলাম। সুতরাং তুমি নিজের জন্য কি প্রেরণ করেছ? তখন সে ডান দিকে তাকাবে, বাম দিকে তাকাবে। কিন্তু সে কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সামনে তাকাবে। কিন্তু সে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এক টুকরা খেজুর দান করার বিনিময়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার সামর্থ রাখে সে যেন জাহান্নাম থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি তারও ক্ষমতা না রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলার মাধ্যমে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। কেননা এর বিনিময়েও নেকীর সংখ্যা এক থেকে দশ গুণ আর দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্"।

ইবনে ইসহাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- এই বলে তিনি প্রথম খুতবা শেষ করেছেন। অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বিতীয় খুতবা দিয়েছেন। ****

দ্বিতীয় খুতবা

দ্বিতীয় খুতবায় তিনি বলেছেন-

«إنّ الْحَمْدَ لِلّهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِنّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَيّنَهُ اللهُ فِي قَلْبِهِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ فَاخْتَارَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَحَادِيثِ النّاسِ إِنّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغُهُ أَحِبّوا مَا أَحَبّ اللهُ أَحِبّوا اللهَ مِنْ كُلّ قُلُوبِكُمْ وَلَا تَمَلّوا كَلَامَ اللهِ وَذِكْرَهُ وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَإِنّهُ مِنْ كُلّ مَا يَخْلُقُ اللهُ يَخْتَارُ وَيَصْطَفِي قَدْ سَمّاهُ اللهُ خِيرَتَهُ مِنْ الْأَعْمَالِ وَمُصْطَفَاهُ مِنْ الْعِبَادِ وَالصّالِحِ مِنْ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلّ مَا أُوتِيَ النّاسُ مِنْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتّقُوهُ حَقّ تُقَاتِهِ وَاصْدُقُوا اللهَ صَالِحَ مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَحَابّوا بِرُوحِ اللهِ بَيْنَكُمْ إِنّ اللهَ يَغْضَبُ أَنْ يَنْكُثَ عَهْدَهُ وَالسّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাচ্ছি, আমরা আমাদের নফসের অকল্যাণ থেকে এবং খারাপ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি যাকে হিদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে সঠিক পথ দেখাতে পারেনা। আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সঠিক কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।

নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি সফল হবে, যার অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন এবং কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার পর তাকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের কথাগুলো বাদ দিয়ে সে আল্লাহর কালামকে বেছে নিয়েছে। কেননা আল্লাহর কথাই হচ্ছে

সর্বোত্তম কথা ও তাঁর বাণীই হচ্ছে সর্বোচ্চ বাণী। আল্লাহ্ যা ভালাবাসেন তোমরা তাই ভালবাস এবং তোমাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহর ভালবাসা দিয়ে ভরে দাও। আল্লাহর কালামকে পাঠ করতে এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে তোমরা ক্লান্তিবোধ করো না। তোমাদের অন্তর যেন কুরআন থেকে (কুরআন ছেড়ে দিয়ে) পাষাণ না হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টি থেকে উত্তমটিই বাছাই করেন এবং তা নিজের জন্য নির্বাচন করেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের আমলসমূহ থেকে কুরআন তিলাওয়াতকে সর্বোত্তম আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন, বান্দাদের আমল থেকে তা পছন্দ করেছেন, তাকে সর্বোত্তম বাণী বলে ঘোষণা করেছেন এবং তার মাঝে মানুষের জন্য সকল হালাল ও হারাম বিষয় বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা এবং তাঁকে যথাযথভাবে ভয় কর। তোমরা মুখ দিয়ে যে সমস্ত কথা উচ্চারণ করে থাকো, তা থেকে সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে আল্লাহ্র সত্যতার ঘোষণা প্রদান কর। আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে পরস্পর ভালবাসার বন্ধন রচনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গকারীকে মোটেই পছন্দ করেননা। ওয়াস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্"।

জুমআর দিনের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য

নাবী ﷺ জুমআর দিনকে খুব সম্মান করতেন। তিনি এই দিনের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে-

১. জুমআর দিনের ফজরের সলাতে তিনি সূরা আলিফ-লাম-মীম সিজদাহ ও ইনসান পাঠ করতেন। কেননা এই সূরা দু'টিতে জুমআর দিনে যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা সংঘটিত হবে তা বর্ণিত হয়েছে।

২. জুমআর দিনে ও রাতে নাবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বেশী দুরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। কেননা তাঁর মাধ্যমেই উম্মাত দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনে ধন্য হয়েছে। জুমআর দিনেই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সম্মান অর্জিত হবে। কেননা এদিনেই তাদেরকে জান্নাতে তাদের ঘরসমূহে স্থান দেয়া হবে। তাতে প্রবেশের পর এ দিনেই তাদেরকে অতিরিক্ত নিয়ামাতটি (আল্লাহর দর্শন) দান করা হবে। অতিরিক্ত পুরস্কারটি পাওয়ার সময় তারা তাদের প্রভুর নিকটবর্তী হবে। আল্লাহর বান্দাগণের মধ্য হতে যারা জুমআর দিন দ্রুত জুমআয় উপস্থিত হবে ও ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করবে সে অনুপাতেই তারা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হবে এবং অতিরিক্ত নিয়ামত প্রাপ্ত হবে।

৩. জুমআর দিন গোসল করার বিশেষ তাগিদ রয়েছে। এ দিনে গোসল করা ওয়াজিব হওয়ার দলীলগুলো গোপ্তাঙ্গ স্পর্শ করলে, নাক দিয়ে রক্ত বের হলে, বমি করলে ওযূ আবশ্যক হওয়ার দলীলসমূহের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। এমনকি সলাতের শেষ বৈঠকে নাবী ﷺ এর উপর দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হওয়ার দলীলগুলোর চেয়েও অধিক মজবুত।

৪. জুমআর দিন মিসওয়াক করা ও শরীরে খুশবো লাগানো মুস্তাহাব। এ দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করা অন্যান্য দিনে তা ব্যবহারের চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ কাজ। জুমআর উদ্দেশ্যে সকাল সকাল বের

হওয়া, আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা এবং ইমাম উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সলাতরত থাকাও জুমআর দিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫. খুতবার সময় চুপ থাকা এবং মনোযোগ দিয়ে তা শুনা জুমআর দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমাম যখন খুতবা দিবেন তখন চুপ থাকা ওয়াজিব। সূরা জুমআ, মুনাফিকুন, সূরা আ'লা এবং সূরা গাশীয়া দিয়ে জুমআর সলাত পড়াও জুমআর দিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬. জুমআর দিন সুন্দর পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

৭. জুমআর দিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পায়ে হেঁটে জুমআর সলাতে গমণকারীর জন্য প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছর দিনের বেলা নফল সিয়াম রাখা ও রাতের বেলা তাহাজ্জুদ সলাতের ছাওয়াব রয়েছে।

৮. জুমআর দিনে বান্দার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হয়।

৯. এই দিনে রয়েছে দু'আ কবুলের একটি বিশেষ মুহূর্ত।[৬৪]

রসূল ﷺ খুতবায় যেসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতেন

এ ছাড়া রসূল ﷺ যখন জুমআর খুতবায় দাঁড়াতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেতো, আওয়াজ উঁচু হতো এবং চেহারা মোবারকে ক্রোধের লক্ষণ পরিলক্ষিত হতো। মনে হতো তিনি যেন কোন সেনাবাহিনীর আক্রমণের ভয় দেখাচ্ছেন এবং বলছেনঃ হে লোক সকল! প্রত্যুষে কিংবা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর শত্রুরা ঝাপিয়ে পড়বে। তিনি খুতবায় আম্মা বাদ বলতেন। খুতবা সংক্ষিপ্ত করতেন এবং সলাত দীর্ঘ করতেন। তিনি খুতবায় ইসলামের মূলনীতি ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম বর্ণনা করতেন। কখনও কোন বিষয়ে মুসলিমদেরকে আদেশ বা নিষেধ করার প্রয়োজন পড়লে তিনি খুতবায় তা করতেন। যেমন খুতবার সময় প্রবেশকারী এক ব্যক্তিকে দুই রাকআত সলাত আদায়ের আদেশ করেছেন। সময়ের দাবি অনুপাতে তিনি খুতবা দিতেন। মুসলিমদের মধ্যে অভাব-অনটন দেখা দিলে দান-খয়রাত করার আদেশ দিতেন এবং সাদকাহ করার প্রতি তাদেরকে উৎসাহ দিতেন।

খুতবায় দু'আ করার সময় কিংবা আল্লাহর যিকির করার সময় শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করতেন।

অনাবৃষ্টি দেখা দিলে এবং বৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করলে তিনি খুতবাতেই বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন। মাসজিদে লোকেরা একত্রিত হয়ে গেলেই তিনি বের হয়ে আসতেন। মাসজিদে প্রবেশ করেই সালাম দিতেন। মিম্বারে আরোহন করে উপস্থিত মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আরেকবার সালাম দিতেন। তারপর মিম্বারে বসতেন। এরই মধ্যে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আযান দেয়া শুরু করতেন। আযান শেষ হলে তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা শুরু করতেন। খুতবা প্রদানকালে তিনি লাঠি বা ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। তাঁর মিম্বারে তিনটি সিঁড়ি ছিল। মিম্বার নির্মাণের পূর্বে তিনি খেজুর গাছের একটি গোড়ার উপর

---

৬৪. জুমআর দিনের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট হচ্ছে,

(ক) জুমআর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করলে পরবর্তি জুমআ পর্যন্ত (অপর বর্ণনায় রয়েছে কাবাঘর পর্যন্ত) নূর দ্বারা তাকে আলোকিত করা হয়।

(খ) জুমআর দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে এই দিন দুপুর বেলায় মাকরুহ সময়ে সলাত পড়তে কোন বাধা নেই।

দাঁড়াতেন। মাসজিদের মাঝখানে মিম্বার স্থাপিত হয়নি; বরং পশ্চিম পার্শ্বে স্থাপিত হয়েছিল। মিম্বার ও দেয়ালের মাঝে মাত্র একটি ছাগল চলাচলের দূরত্ব ছিল।

তিনি যখন জুমআ ছাড়া অন্যান্য সময় মিম্বারে বসতেন কিংবা জুমআর দিন খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বারে দাঁড়াতেন তখন সাহাবীগণ তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তারপর সামান্য সময় বসতেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবা দিতেন। খুতবা শেষ করলেই বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইকামত দেয়া শুরু করতেন।

তিনি মুসলিমদেরকে খুতবার সময় ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ দিতেন এবং চুপ থাকতে বলতেন। তিনি বলতেন- জুমআর দিন খুতবার সময় যে ব্যক্তি তার পাশের ব্যক্তিকে বলবেঃ চুপ থাকো, সে অনর্থক কাজ করল। আর যে ব্যক্তি অনর্থক কাজ করবে তার জুমআ বাতিল হয়ে যাবে।

জুমআর সলাত শেষে তিনি স্বীয় ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকআত জুমআর সুন্নাত সলাত আদায় করতেন। তিনি জুমআর সলাতের পর চার রাকআত সুন্নাত পড়ারও আদেশ দিয়েছেন।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- মাসজিদে পড়লে চার রাকআত পড়বে আর ঘরে পড়লে দুই রাকআত পড়বে।

সলাতুল ঈদাইন তথা দুই ঈদের সলাতে নাবী ﷺ এর হিদায়াত

পূর্ব দিক দিয়ে মদীনার প্রবেশ পথে অবস্থিত ঈদগাহে (মুসাল্লায়) তিনি দুই ঈদের সলাত আদায় করতেন। তৎকালে এই স্থানেই হাজীদের আসবাবপত্র রাখা হতো। সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি মাত্র একবার বৃষ্টির কারণে মাসজিদে নববীতে ঈদের সলাত পড়েছেন।

ঈদের দিন তিনি সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সলাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় খেজুর খেয়ে বের হতেন। আর ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহ থেকে ফেরত আসার আগে কিছুই খেতেন না। ফেরত এসে তিনি কুরবানীর গোশত খেতেন। তিনি দুই ঈদের দিন গোসল করতেন। এ বিষয়ে দু'টি যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তা ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দৃঢ়তার সাথে রসূল ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ করে চলতেন। রসূল ﷺ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন। সাথে বর্শা বহন করে নেওয়া হতো। মুসাল্লায় পৌঁছে তা কিবলার দিকে পুঁতে রেখে সেটির দিকে ফিরে সলাত পড়তেন। মদীনার সেই ঈদগাহে কোন কিছুই (বর্তমান সময়ের ন্যায় মিম্বার) নির্মাণ করা হয় নি।

তিনি ঈদুল ফিতরের সলাত বিলম্বে আদায় করতেন এবং ঈদুল আযহায় তা করতেন না। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণকারী হওয়া সত্ত্বেও সূর্য পুরোপুরি উদিত হওয়ার পূর্বে ঈদের মুসাল্লার উদ্দেশ্যে বের হতেন না। ঘর থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন।

ঈদগাহে পৌঁছে তিনি আযান, ইকামত ও সলাতের জন্য ডাকাডাকি ছাড়াই সলাত শুরু করে দিতেন। তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ ঈদের মাঠে গিয়ে সলাতের পূর্বে বা পরে কোন সুন্নাত বা নফল সলাত পড়তেন না।

তিনি খুতবার পূর্বে সলাত পড়তেন। দুই রাকআত ঈদের সলাত পড়তেন। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমাসহ মোট সাতটি তাকবীর পাঠ করতেন। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে সামান্য বিরতি গ্রহণ করতেন। তাকবীরগুলোর মাঝখানে তাঁর থেকে নির্দিষ্ট কোন দু'আ বা যিকির বর্ণিত হয়নি। তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করবে এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দুরূদ পাঠ করবে। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রত্যেক তাকবীর পাঠ করার সময় রাফউল ইয়াদাইন করতেন।

তাকবীর পাঠ শেষ করে তিনি কিরাআত শুরু করতেন। তিনি প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা অতঃপর সূরা ক্বা-ফ পাঠ করতেন আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইকতারাবাত তথা কামার পাঠ করতেন। কখনও কখনও তিনি সূরা আ'লা ও গা-শীয়া দিয়েও ঈদাইনের সলাত পড়েছেন। উপরোক্ত চারটি সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা দিয়ে দুই ঈদের সলাত পড়ার বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস নেই।[৬৫]

কিরাআত পাঠ শেষে তিনি আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যেতেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতে পরপর পাঁচটি অতিরিক্ত তাকবীর পাঠ করতেন। তাকবীর পাঠ শেষে কিরাআত শুরু করতেন।

সলাত শেষে মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতেন। মানুষেরা কাতারে নিজ নিজ স্থানেই বসে থাকত। অতঃপর তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন এবং আদেশ প্রদান করতেন। অতঃপর কোন দিকে সেনাবাহিনী পাঠানোর ইচ্ছা করলে বা কোন বিষয়ে আদেশ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা করতেন।

ঈদের সলাতে কে সর্বপ্রথম মিম্বার স্থাপন করেন?

সে সময় ঈদগাহে কোন মিম্বার ছিলনা। মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দিতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের যে হাদীছে বলা হয়েছে অতঃপর তিনি নামলেন এবং মহিলাদের কাছে গেলেন সেই হাদীছের মর্মার্থ হচ্ছে সম্ভবতঃ তিনি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যা থেকে তিনি নেমেছেন।

মদীনার ঈদগাহে উমাইয়া শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকামই সর্বপ্রথম মিম্বার স্থাপন করেন। লোকেরা তার এই কাজের প্রতিবাদ করেছে। আর কাছীর ইবনুস সালতই সর্বপ্রথম মারওয়ানের শাসনামলে পাকা মিম্বার তৈরী করেন।

ঈদের সলাতে উপস্থিত লোকদেরকে সলাত শেষ হলে বসে খুতবা শুনা এবং তা না শুনে চলে যাওয়া উভয়টির অনুমতি দিয়েছেন।

---

৬৫. তবে অন্যান্য সূরা পড়লেও সলাতের কোন ক্ষতি হবেনা। কারণ বিষয়টি এমন নয় যে, দুই ঈদ অথবা অন্যান্য সলাতে উক্ত সূরাগুলো পাঠ করা ওয়াজিব বা ফরজ। তিনি যে সলাতে যেই সূরা পাঠ করেছেন বা যে পরিমাণ পাঠ করেছেন, অন্যদেরকে সেই সূরা ও সেই পরিমাণ পাঠ করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। কেননা মূলত কিরাআত পাঠ করা হচ্ছে সুন্নাত। সেই সাথে হাদিছে যে অংশ পড়ার কথা এসেছে, তা অনুসরণ করা ভাল।না করলে মূল সুন্নাত পালন করাই যথেষ্ট।

জুমআর দিন ঈদ হলে

জুমআর দিন ঈদ হলে তিনি লোকদের জন্য ঐ দিনের জুমআর সলাতে না আসার অনুমতি দিয়েছেন এবং ঈদের সলাতকেই যথেষ্ট বলে ঘোষণা দিয়েছেন। (তবে যোহরের সলাত আদায় করতে হবে এবং মাসজিদে জুমআর সলাত অবশ্যই পড়ানো হবে)

ঈদের দিন তিনি এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরত আসতেন।

যুল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন তিনি বেশী করে দু'আ করতেন এবং তাঁর সাহবীদেরকেও অধিক পরিমাণ তাকবীর, তাহমীদ এবং তাহলীল পাঠ করার আদেশ দিতেন। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আরাফা দিবসের ফজরের সলাতের পর থেকে তাকবীর শুরু করতেন এবং আইয়্যামে তাশরীকের (কুরবানীর) শেষ দিন পর্যন্ত তা চালু রাখতেন। তাকবীরের শব্দগুলো ছিল এ রকমঃ

«اللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ»

এই শব্দগুলো দিয়ে তাকবীর পাঠ করার হাদীসটি সহীহ না হলেও[৬৬] এর উপরই আমল চালু হয়ে গেছে। এখানে আল্লাহু আকবার দুইবার এসেছে। প্রথমে তিনবার আল্লাহু আকবার বলা জাবের এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আমল ছিল। তবে উভয় শব্দে পড়াই মুস্তাহাব। ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- নিম্নের বাক্যে তাকবীর পাঠ করলেও উত্তম হবে। বাক্যগুলো হচ্ছে এই-

«اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً»

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার কাবীরান ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরান ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলা।

সূর্য গ্রহণের সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবস্থা কেমন ছিল?

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে যখন সূর্যগ্রহণ লাগলো তখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় চাদর টানতে টানতে দ্রুত মাসজিদের দিকে বের হয়ে গেলেন। দিবসের প্রথম ভাগে যখন সূর্য উদিত হওয়ার পর দুই বা তিন বর্শা পরিমাণ উঁচু হলো তখন সূর্যগ্রহণটি লেগেছিল। তিনি অগ্রসর হয়ে দুই রাকআত সলাত পড়লেন। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সশব্দে লম্বা একটি সূরা পাঠ করলেন। কিরাআত শেষে তিনি দীর্ঘ রুকু করলেন। রুকু হতে উঠে তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে এই দাঁড়ানো প্রথমবারের দাঁড়ানোর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় তিনি এই দু'আ পাঠ করলেন-

«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»

অতঃপর তিনি সিজদায় না গিয়ে পুনরায় কিরাআত পাঠ করতে লাগলেন। কিরাআত পাঠ শেষে তিনি পুনরায় দীর্ঘ রুকু করলেন। তবে প্রথম রুকুর তুলনায় দ্বিতীয়বারের রুকু সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ সিজদাহ করলেন।

---

৬৬. ইরওয়াউল গালীল, মাশা.৩/১২৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, মাশা. হা/৫৬৯৭, সহীহ, যাদুল মা'আদ, মাশা. পৃ. ২/৩৯৫ অন্যান্য মুহাদ্দিছদের নিকট সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে। তাই হাদীসের দুআ মনে করে নির্দ্বিধায় পাঠ করা চলে।

এরপর তিনি প্রথম রাকআতের মত করে দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তিনি চারটি রুকু ও চারটি সিজদার মাধ্যমে দুই রাকআত সলাত সমাধা করলেন।

তিনি সেই সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। সাহাবীদেরকে দেখানোর জন্য তিনি জান্নাতের এক গুচ্ছ আঙ্গুর ছেড়ার ইচ্ছা পোষণও করেছেন। তিনি জাহান্নাম ও জাহান্নামীদেরকে দেখেছেন। আরও দেখেছেন একজন মহিলাকে একটি বিড়াল খামছিয়ে আহত করছে। বিড়ালটিকে সে বেঁধে রেখেছিল। ফলে সেটি ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হয়ে মারা গিয়েছিল। তিনি জাহান্নামে আমর বিন মালেক লুহাইকে দেখলেন যে, সে স্বীয় নাড়ী-ভূড়ি টেনে নিচ্ছে। কারণ সেই প্রথম ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) এর দ্বীনকে পরিবর্তন করেছিল। জাহান্নামে হাজীদের সম্পদ চুরী করার শাস্তিও তিনি দেখেছেন।

অতঃপর সলাত শেষে তিনি জ্ঞানপূর্ণ উচ্চাঙ্গের এক ভাষণ প্রদান করলেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- সালাম ফিরিয়ে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। আরও সাক্ষ্য দিলেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রসূল। অতঃপর তিনি বললেন- হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা যদি মনে কর আমার প্রভুর রেসালাতের কোন বিষয় তোমাদের কাছে পৌঁছাতে ত্রুটি করেছি, তাহলে তোমরা এখনও সে বিষয়টি আমাকে অবগত করোনি। তখন কিছু লোক দাঁড়িয়ে বলল- আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আপনার প্রভুর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, আপনার উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন এবং আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

অতঃপর তিনি বললেন- "আম্মা বাদ"। কিছু লোক ধারণা করে যে, এই সূর্য আলোকহীন হওয়া, এই চন্দ্রের আলো মিটে যাওয়া (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ) এবং এই নক্ষত্রগুলো উদয়াস্তাচল থেকে সরে যাওয়া পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিদের মৃত্যু বরণের কারণেই হয়ে থাকে। যারা এমনটি মনে করে থাকে তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। বরং এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন সমূহের অন্যতম। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান এবং উপদেশ ও শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং তিনি দেখতে চান তাদের মধ্য হতে কে তাঁর নিকট তাওবা করে। আল্লাহর কসম! দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা যা কিছু দেখতে পাবে তার সবকিছুই আমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছি। আল্লাহর শপথ! ত্রিশজন মিথ্যুকের আগমণ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা। তাদের মধ্যে সর্বশেষ আগমণকারী মিথ্যুকের নাম হবে কানা দাজ্জাল। তার বাম চোঁখ অন্ধ হবে। সে বের হয়ে নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবী করবে। যে তার প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সত্যায়ন করবে এবং তার আনুগত্য করবে ঐ ব্যক্তির কোন সৎ আমলই উপকারে আসবেনা। আর যেই ব্যক্তি তাকে আল্লাহ্ হিসাবে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করবে এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তার অসৎ আমলের কারণে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। আর সে মক্কা, মদীনা ও বাইতুল মাকদিস ব্যতীত পৃথিবীর সকল স্থানেই প্রবেশ করবে। সে মুসলিমদেরকে বাইতুল মাকদিসে অবরুদ্ধ করে রাখবে। এ সময় মুসলিমগণ কঠিন বিপদাপদের সম্মুখীন হবেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এবং তার বাহিনীকে (ইহুদীদেরকে) ধ্বংস করে দিবেন। এমনকি প্রাচীরের ভিত্তি এবং গাছের শিকড়ও বলে দিবে যে, হে মুসলিম! এই তো ইহুদী-কাফের! এদিকে এসো এবং তাকে হত্যা করো। তিনি আরও বলেন- উহা ততক্ষণ পর্যন্ত হবেনা যতক্ষণ না তোমরা এমন ভয়াবহ বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করবে, সেগুলোকে তোমরা খুব ভয়ানক ও

বিপদজনক মনে করবে এবং তোমরা পরস্পর জিজ্ঞেস করবে তোমাদের নাবী কি তোমাদের জন্য এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেছেন? এরপর পাহাড়সমূহ স্বীয় স্থান থেকে সরে যাবে। তারপর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে"।

নাবী ﷺ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি প্রত্যেক রাকআতে তিনটি অথবা চারটি করে রুকু করেছেন। প্রত্যেক রাকআতে একটি করে রুকু করার কথাও বর্ণিত হয়েছে। তবে বিজ্ঞ আলেমগণ এই বর্ণনাগুলোকে সহীহ বলেন নি। তারা বলেন- এই বর্ণনাগুলোতে রাবীগণ ভুল করেছেন।
মোট কথা, সূর্যগ্রহণের সময় আল্লাহর যিকির, সলাত আদায়, দু'আ, ইস্তেগফার, সাদকাহ ও দাসমুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন।

সলাতুল ইস্তিসকা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত

আল্লাহর নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনার বিষয়ে নাবী ﷺ থেকে কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পদ্ধতিঃ জুমআর দিন খুতবা প্রদান করা অবস্থায় মিম্বারে দাঁড়িয়ে তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ তিনি দিন নির্দিষ্ট করে মানুষের সাথে ময়দানে বের হওয়ার ওয়াদা করেছেন। সুতরাং ওয়াদা মোতাবেক তিনি সূর্য উদয়ের পর অত্যন্ত বিনীত ও কাকুতী-মিনতীকারী অবস্থায় ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন। ময়দানে পৌঁছে মিম্বারে আরোহন করতেন। ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- ঈদগাহে মিম্বারে আরোহনের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। তিনি সেখানে গিয়ে খুতবার শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করতেন এবং আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা দিতেন। বৃষ্টি প্রার্থনার সলাতের বিষয়ে তাঁর থেকে যে খুতবা ও দু'আ সংরক্ষিত হয়েছে তা নিম্নরূপ-

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ تفعل ما تريد اللَّهُمَّ أنت الله لاإله إلا أنت أنت الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينٍ»

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক এবং পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। তিনি প্রতিদান দিবসের এক মাত্র মালিক। আল্লাহ ব্যতীত সঠিক কোন উপাস্য নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ্! তুমিই একমাত্র উপাস্য। তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি যা ইচ্ছা তাই করো। হে আল্লাহ! তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। তুমি ছাড়া অন্য কোন সঠিক উপাস্য নেই। তুমি অমূখাপেক্ষী আর আমরা সকলেই তোমার রহমত ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আর আমাদের জন্য যেই বৃষ্টি তুমি বর্ষণ কর তা দ্বারা আমাদের শক্তি বৃদ্ধি কর এবং উহাকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমাদের জীবন যাপনের উপকরণে পরিণত কর"।[৬৭] অতঃপর তিনি উভয় হাত উঠাতেন এবং কাকুতি-মিনতি ও অনুনয় বিনয়ের সাথে দু'আ করতেন। তিনি হাত এত উপরে উঠাতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। অতঃপর তিনি মানুষের দিকে পীঠ দিয়ে

---

৬৭. আবু দাউদ, আলএ. হা/১১৭৩, মিশকাত, হাএ. হা/১৫০৮

কিবলামুখী হতেন। এ সময় তিনি চাদর উল্টিয়ে পরিধাণ করতেন। ডান কাঁধের অংশ বাম কাঁধের উপর রাখতেন এবং বাম কাঁধের অংশ ডান কাঁধের উপর স্থাপন করতেন। সে সময় তাঁর গায়ে কালো চাদর থাকত। কিবলামুখী হয়ে তিনি দু'আ করতে থাকতেন। লোকেরাও তাই করত।

অতঃপর তিনি অবতরণ করে দুই ঈদের সলাতের ন্যায় আযান ও ইকামত ছাড়াই দুই রাকআত সলাত আদায় করতেন। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর তিনি সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া পাঠ করতেন।

তৃতীয় পদ্ধতি: তিনি মদীনার মিম্বারে দাঁড়িয়ে জুমআর দিন ছাড়াও অন্যান্য সময় বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। মাসজিদে বৃষ্টির জন্য সলাত পড়েছেন কি না- এ ব্যাপারে কিছুই বর্ণিত হয় নি।

চতুর্থ পদ্ধতি: তিনি মাসজিদে বসে উভয় হাত উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করেছেন।

পঞ্চম পদ্ধতি: তিনি মাসজিদে নববীর দরজার বাইরে (বর্তমানে বাবুস্ সালামের পার্শ্বে) 'যাওরা' নামক স্থানে অবস্থান করে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন।

ষষ্ঠ পদ্ধতি: কোন এক যুদ্ধে মুশরিকরা যখন মুসলিমদের আগেই ময়দানে অবস্থিত পানীর স্থানকে দখল করে নিল এবং মুসলিমগণ পিপাসায় কাতর হয়ে রসূল ﷺ এর কাছে অভিযোগ করলেন তখন তিনি বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। মুনাফিকরা তখন বলছিল- তিনি যদি সত্য নাবী হয়ে থাকেন, তাহলে মুসা (আলাইহিস সালাম) যেমন তাঁর জাতির জন্য আল্লাহর কাছে পানি চেয়েছিলেন তেমনি তিনিও তার জাতির লোকদের জন্য অবশ্যই পানি প্রার্থনা করবেন। তাদের এই কথা যখন নাবী ﷺ এর কাছে পৌঁছল তখন তিনি বললেন- তারা কি তাই বলছে? আমি আশা করছি তোমাদের প্রতিপালক অচিরেই তোমাদেরকে পানি পান করাবেন। অতঃপর তিনি দুই হাত প্রসারিত করে দু'আ শুরু করলেন। আকাশে মেঘ তাদেরকে ছায়া দান করা এবং বৃষ্টি শুরু না হওয়া পর্যন্ত হাত নামান নি। এভাবে তিনি যখনই দু'আ করেছেন তখনই বৃষ্টি হয়েছে।

একবার তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। আবু লুবাবা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন বললেন- হে আল্লাহর রসূল! খোলা ময়দানে খেজুর পড়ে আছে। (সুতরাং এখন বৃষ্টি হলে তো আমার খেজুরগুলো ভিজে যাবে) তিনি বলতে থাকলেনঃ হে আল্লাহ! আবু লুবাবা উলঙ্গ হয়ে তার লুঙ্গি দিয়ে খেজুর শুকানোর জায়গায় পানি প্রবেশের নালা বন্ধ করতে বাধ্য হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করো।[৬৮] আল্লাহ্ তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং বৃষ্টি হতে থাকল। লোকেরা তখন আবু লুবাবার কাছে গিয়ে বলল- যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি উলঙ্গ হয়ে না দাঁড়াবে এবং লুঙ্গি দিয়ে তোমার খেজুর শুকানোর স্থানে পানি প্রবেশের পথ বন্ধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ হবেনা। সুতরাং তিনি তাই করলেন। অতঃপর বৃষ্টি বন্ধ হল।

---

৬৮. প্রথমতঃ হাদীছ বিশুদ্ধ বলে শক্ত কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয়তঃ যদি সাব্যস্ত হয়ও তবে আমার জানা মতে এটি একটি আরবদের বচন ভঙ্গি। সেকালে তারা এ রকম কথা নিজেদের ভাষায় ব্যবহার করতো। তার পরনের লুঙ্গি খুলে ফেলা দ্বারা এটি বুঝায় না যে তিনি লুঙ্গির বদলে অন্য কোন কাপড় পরেন নি। দুআকে শক্তিশালী করার জন্য রসূল ﷺ কথাটি বলেছেন। কারণ রসূল ﷺ এর দুআর মধ্যে আবু লুবাবা আপত্তি করেছিল এবং বলেছিল যে, এখনই বৃষ্টি হলে তো আমার খেজুর ভিজে যাবে। তাই তিনি আরও বেশী জোর দিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চেয়েছেন। দেখুনঃ মাযমায়ে দাওয়ায়েদ, সুনানে বায়হাকী, তাবরানী ও অন্যান্য। ইমাম তাবারানী বলেনঃ এই হাদীসের সনদে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে।

বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার দু'আ করা

নাবী ﷺ এর যামানায় যখন অবিরাম বৃষ্টিপাত হত তখন সাহাবীগণ তাঁর কাছে এসে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করার আবেদন করতেন। তিনি বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার দু'আ করতেন। তিনি দু'আয় বলতেন-

«اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللّٰهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»

'হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা পাহাড়, ময়দান, উপত্যকা এবং গাছপালা উৎপন্ন হওয়ার স্থানে বর্ষণ করুন'।[৬৯] তিনি যখন আকাশে বৃষ্টির লক্ষণ দেখতেন তখন বলতেন-

«اللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» "হে আল্লাহ্! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন"।[৭০]

বৃষ্টির সময় তিনি শরীরে পরিহিত জামা-কাপড় খুলতেন। যাতে খালী শরীরে বৃষ্টির পানি লাগে। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন- কেননা এই রহমতটি আল্লাহর পক্ষ হতে এই মাত্র এসেছে।

ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- আমাকে একজন বিশ্বস্ত লোক ইয়াজিদ ইবনুল হাদের বরাত দিয়ে সংবাদ দিয়েছে যে, যখন বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হত তখন নাবী ﷺ বলতেন- আমাদের সাথে এই পানির দিকে চল, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন। আমরা উহা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করব। এরপর আল্লাহর প্রশংসা করব। ইমাম শাফেঈ আরও বলেন- আমাকে ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ্-এর বরাত দিয়ে একজন বিশ্বস্ত লোক সংবাদ দিয়েছেন যে, বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হলে উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে পানির কাছে যেতেন এবং বলতেন- আমাদের প্রত্যেকেই যেন এ দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করে।

আকাশে মেঘ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া

নাবী ﷺ যখন আকাশে মেঘ কিংবা অন্ধকার দেখতেন তখন তাঁর চেহারা মোবারকে ভয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হত। তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতেন। আর যখন বৃষ্টি হয়ে যেত তখন তাঁর ভয় কেটে যেত। তিনি আশঙ্কা করতেন যে, সম্ভবত এর মধ্যে আযাব রয়েছে।

সফর অবস্থায় নাবী ﷺ এর আদর্শ এবং তাতে তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি

তাঁর সফর চারটি বিষয়ের মাঝে সীমিত ছিল। (ক) হিজরতের সফর। (খ) জিহাদের সফর। আর এই উদ্দেশ্যেই তাঁর অধিকাংশ সফর ছিল। (গ) উমরার সফর। (ঘ) হজ্জের সফর।

তিনি যখন সফরের ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন তার স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। হজ্জের সফরে তিনি তাঁর সকল আজওয়াযে মুতাহ্হারাকে (স্ত্রীগণকে) সাথে নিয়েছিলেন।

---

৬৯. মুসলিম, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৫১৮, মিশকাত, হাএ. হা/৫৯০২

৭০. মিশকাত, হাএ. হা/১৫০০, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা. ৬/৪৬২৭

আর তিনি সাধারণতঃ দিবসের প্রথমভাগেই সফর শুরু করতেন। বৃহস্পতিবার দিন বের হওয়াকে পছন্দ করতেন। তিনি আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমার উম্মতের সকাল বেলায় বের হওয়ার মধ্যে (তাদের সকালের কাজে) বরকত দান কর। তিনি যখন ছোট বা বড় কোন সৈন্য দল পাঠাতেন তখন সকালেই পাঠাতেন।

সফরকারীর সংখ্যা তিন হলে তিনি একজনকে আমীর নিযুক্ত করতে বলতেন। তিনি একাকী ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর ঘোষণা হচ্ছে একাকী ভ্রমণকারী শয়তান। দু'জন ভ্রমণকারী দু'টি শয়তান আর তিনজন মিলে একটি কাফেলা তৈরী হয়।[৭১] বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন সফরে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

«اللّٰهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ اللّٰهُمَّ اكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وَمَا لاَ أَهْتَمُّ بِهِ اللّٰهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ»

"হে আল্লাহ! তোমার দিকেই দৃষ্টি ফিরাচ্ছি। তোমার কাছেই আশ্রয় নিচ্ছি। হে আল্লাহ! আমার গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ কাজকর্মে সাহায্যকারী হিসাবে তুমিই যথেষ্ট। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাকওয়ার ভূষণে ভূষিত কর। আমার গুনাহ্কে ক্ষমা কর। যেখানেই আমি যাই তুমি আমাকে কল্যাণের দিকে ধাবিত কর।

আরোহনের জন্য তাঁর সামনে সওয়ারী (বাহন) উপস্থিত করা হলে তিনি বাহনের পীঠে পা রেখে বিসমিল্লাহ্ বলতেন। আর যখন বাহনে সোজা হয়ে বসতেন তখন বলতেন-

«الحمد لله سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ»

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি প্রশংসা সহকারে সেই মহান সত্ত্বার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব"।[৭২] অতঃপর তিনি তিনবার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর বলতেন-

«سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমি নিজের প্রতি অশেষ জুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই।"[৭৩] তিনি আরও বলতেন-

---

৭১. একাকী ভ্রমণকারীকে শয়তান বলার কারণ হল শয়তান একাকী চলে। শয়তান মানুষকে একাকী সফর করার প্রতি উৎসাহ দেয়। তাই যে শয়তানের প্ররোচনায় একাকী সফর করল, সে যেন নিজেই শয়তানে পরিণত হল। একাকী সফরকারীকে শয়তান সহজেই ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে দুর্বল ঈমানের অধিকারী যদি একাকী ভ্রমণ করে, তাহলে শয়তান তাকে সহজেই পথভ্রষ্ট করতে পারে। তা ছাড়া একাকী সফরকারী যদি মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার মাল-পত্র হেফাজত করে ওয়ারিছদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া সম্ভব হয়না এবং সে অসীয়ত করারও সুযোগ পায়না। তাই জামাআতের সাথে সফর করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

৭২. সূরা যুখরুফ: ৪৩: ১৩-১৪, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা. ১/৭৫৩

৭৩. মিশকাত, হাএ. হা/২৪৩৪, আবু দাউদ, আলএ. হা/২২৬৭,

«اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَـذَا وَاطْـوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَـةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ»

"হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে তোমার কাছে নেকী, তাকওয়া এবং তোমার পছন্দনীয় আমলের আবেদন করছি (তাওফীক চাচ্ছি)। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই আমাদের সাথী এবং ঘরের তথা পরিবার-পরিজনের হেফাজতকারী। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং ধন-দৌলত ও পরিবার-পরিজনের নিকট মন্দ পরিণাম নিয়ে ফেরত আসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।[৭৪] সফর থেকে ফেরত এসেও উপরোক্ত দু'আটি পড়তেন এবং তার সাথে নিম্নের অংশটি বাড়িয়ে বলতেন-

«آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

"আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী এবং তাঁর প্রশংসাকারী"[৭৫]। চলার পথে যখন কোন উঁচু স্থান সামনে আসত এবং তিনি যখন তাতে উঠতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন। আর যখন নীচে নামতেন তখন সুবহানাল্লাহ্ বলতেন।

তিনি যখন কোন গ্রাম বা বস্তি কিংবা শহরে প্রবেশ করতে চাইতেন তখন প্রবেশের সময় এই দু'আ পাঠ করতেন-

«اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الأَرَضِينِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْـنَ وَرَبَّ الشَّـيَاطِينِ وَمَـا أَضْـلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا»

"হে আল্লাহ! সাত আসমান এবং যে সমস্ত বস্তুকে এগুলো ছায়া দান করেছে তুমি তাদের প্রভু, সাত যমীন এবং যে সমস্ত বস্তুকে এগুলো তাদের পীঠে বহন করে আছে তুমি তাদের মালিক, শয়তান এবং সে যাদেরকে গোমরাহ করেছে তুমি তাদের সকলের প্রভু এবং বাতাস ও যে সমস্ত বস্তুকে সে উড়িয়ে নিয়ে যায় তারও প্রভু, আমরা তোমার নিকট এই গ্রামের এবং গ্রামে বসবাসকারীদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এই গ্রামের, গ্রামে বসবাসকারীদের এবং তার সকল বস্তুর অকল্যাণ থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।[৭৬]

---

৭৪. মুসলিম, মাশা হা/৩৩৩৯, সহীহ ইবনে হিববান হা.৬/২৬৯৬
৭৫. মুসলিম, মাশা হা/৩৩৩৯, সহীহ ইবনে হিববান হা.৬/২৬৯৬
৭৬. আল- কালিমাতুত ত্বয়্যইব লি ইবনে তাইমিয়্যাহ, হা. ১/১৭৯

সফর অবস্থায় নাবী ﷺ এর সলাত

সফরে চার রাকআত বিশিষ্ট সলাতগুলো তিনি কসর করে পড়তেন। উমাইয়া বিন খালেদ ইবনে উমার (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন- আমরা তো কুরআনে নিজ দেশে বা বাড়ীতে অবস্থান করার সময় সলাত পড়ার বর্ণনা দেখতে পাচ্ছি এবং ভয়ের সময় সলাত পড়ার পদ্ধতির কথা জানতে পারছি। সফর অবস্থায় সলাত পড়ার বিষয়টি তো কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। ইবনে উমার (রাঃ) তখন বললেন- "হে ভাই! আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ কে আমাদের নিকট এমন সময় প্রেরণ করেছেন, যখন আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা মুহাম্মাদ ﷺ কে যা করতে দেখেছি এখন আমরাও তাই করছি"।

সফর অবস্থায় তিনি কেবল ফরয সলাতগুলো পড়তেন। ফরযের পূর্বে বা পরে সুন্নাত পড়ার কথা বর্ণিত হয়নি। তবে ফজরের সুন্নাত ও বিতর সলাত পড়তেন। কিন্তু ফরয সলাতের পূর্বে বা পরে সাধারণ নফল সলাত পড়তে নিষেধও করেন নি। আর সফর অবস্থায় তা পড়লে বাড়ীতে অবস্থান কালীন সময়ের ন্যায় সাধারণ নফল হিসেবেই গণ্য হবে। সুন্নাতে মুআক্কাদাহ হিসাবে নয়। অর্থাৎ সফর অবস্থায় আদায়কৃত নফল সুন্নাতের স্থলাভিষিক্ত হবেনা এবং তা সুন্নাতে রাতেবা হিসাবেও গণ্য হবেনা। বাড়ীতে থাকাকালে যেমন সুন্নাতে রাতেবা (মুআক্কাদাহ) পড়ার পর নফল ও তাহাজ্জুদ পড়া তার ইচ্ছাধীন ছিল, তেমনি সফর অবস্থায় সুন্নাতে রাতেবা (মুআক্কাদাহ) বাদ দেয়ার পরও নফল পড়াটি বান্দার ইচ্ছাধীনই থেকে গেল।

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন চাশতের সময় আট রাকআত সলাত পড়েছেন।

ভ্রমণকালে তিনি বাহনের উপর বসেই নফল সলাত পড়তেন। বাহন তাকে নিয়ে যেদিকেই যেত, তাতে কোন অসুবিধা মনে করতেন না। ইঙ্গিতের মাধ্যমে রুকু-সিজদা করতেন। তবে রুকুর তুলনায় সিজদাতে কম সময় অবস্থান করতেন।

তিনি যদি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে যাত্রা শুরু করতেন তাহলে যোহরের সলাতকে বিলম্বে আসরের সলাতের সাথে আদায় করতেন। আর যদি সূর্য ঢলার পর যাত্রা শুরু করতেন তাহলে যোহর ও আসর একসাথে পড়েই যাত্রা শুরু করতেন। আর দ্রুত পথ চলার ইচ্ছা করলে মাগরিবের সলাতকে ইশার সময় পর্যন্ত দেরী করে আদায় করতেন এবং উভয় সলাতকে একত্রিত করে পড়তেন।

বাহনের উপর বসে চলন্ত অবস্থায় কিংবা কোন স্থানে নেমে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে চাইলে তিনি সাধারণত দুই সলাত একত্রে আদায় করতেন না।

আর তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য সলাত কসর করার ক্ষেত্রে এবং সিয়াম ভাঙ্গার অনুমতির বিষয়ে সফরের দূরত্ব নির্ধারণ করে যান নি। বরং তিনি শুধু সফর (ভ্রমণ) বা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয় তাতেই সলাত কসর করা ও সিয়াম ভাঙ্গা জায়েয আছে।

আর কোন স্থানে সফর করে নির্দিষ্টভাবে এক দিন বা দুই দিন অথবা তিন দিন অবস্থান করলে সলাত কসর করা যাবে বলে যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করা হয় তার কোনটিই সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত নয়।[৭৭]

কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর হিদায়াত

নাবী ﷺ প্রতিদিন কুরআন থেকে নির্ধারিত একটি পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন। কখনই তিনি এর ব্যতিক্রম করেন নি। তিনি তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করতেন। প্রত্যেকটি অক্ষর তার নিজস্ব মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান) থেকে সুস্পষ্ট করে উচ্চারণ করতেন এবং প্রতিটি আয়াত পাঠ শেষে ওয়াক্ফ করতেন (বিরতি গ্রহণ করতেন)। তিলাওয়াতের সময় হরফে মদ্ আসলে লম্বা করে পড়তেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি الـرحمن الـرحيم পাঠ করার সময় মদ-এর সাথে পড়তেন। তিলাওয়াতের শুরুতে তিনিأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পাঠ করতেন। কখনও তিনি এই দু'আটি পাঠ করতেন-

«أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ»

"আমি বিতারিত শয়তান, তার ধোঁকা, ফুঁক ও তার যাদু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি"।[৭৮] তিনি অন্যের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে রসূল ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করার আদেশ দিতেন। তিনি তাঁর সামনে কুরআন পড়তেন। নাবী ﷺ তা শুনতেন। এ সময় তাঁর অন্তরের অবস্থা ও একাগ্রতা এমন হত যে, তাঁর উভয় চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হত।[৭৯] তিনি দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ওযূ ছাড়াও তিনি কুরআন পাঠ করতেন। তবে স্ত্রী সহবাস জনিত কারণে অপবিত্র হলে পবিত্রতা অর্জন না করে কুরআন পড়তেন না। তিনি আওয়াজ উঁচু করে সুন্দর সুর দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল লম্বা আওয়াজে তাঁর সামনে কুরআন তিলাওয়াত করার ধরণটি আ-আ-আ (তিনবার) বলার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এরূপই বর্ণনা করেছেন।[৮০] আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত ধরণটি যদি রসূল ﷺ এর বাণী-

«زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»

"তোমাদের আওয়াজের মাধ্যমে কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর। অর্থাৎ তোমরা সুন্দর আওয়াজের মাধ্যমে কুরআন পড়"।[৮১] এবং তাঁর বাণীঃ

---

৭৭. অন্যান্য মুহাদ্দিছদের নিকট সহীহভাবে তা সাব্যস্ত। ফলে স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ঠিকানা তথা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত যত দিন অবস্থান করবে তা সফর হিসাবে গণ্য হবে এবং সলাত কসর করাও চলবে।

৭৮. মুসনাদে আহমাদ, (৪/৮০) আবু দাউদ, হা/৭৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/৮০৭। ইমাম ইবনে হিব্বান ও হাকেম সহীহ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

৭৯. সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের ফজীলত।

৮০. সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের ফজীলত।

৮১. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাত। আবু দাউদ, আলএ. হা/১৪৬৪, ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সিলসিলায়ে সহীহা, হা/ ৭৭১।

«مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يتغنى بِالْقُرْآنِ»

"আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী নাবীর কাছ থেকে সুন্দর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত যেমনভাবে শুনেন অন্য কোন বস্তুকে সে রকমভাবে শ্রবণ করেন না"[৮২] এই দুইটি হাদীসকে একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, তিনি ইচ্ছা করেই কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজকে উঁচু ও সুন্দর করতেন। নিছক উট চালানোর জন্য স্বীয় আওয়াজ উঁচু করেন নি। বরং কুরআন তিলাওয়াতে তাঁর অনুসরণ করার জন্যই তা করেছেন। অন্যথায় আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআন তিলাওয়াতে তাঁর আওয়াজ উঁচু ও সুন্দর করার ধরণ বর্ণনা করে দেখাতেন না। কুরআন তিলাওয়াতে আওয়াজ উঁচু ও সুন্দর করা দু'ভাবে হতে পারে।

১. কোন প্রকার কৃত্রিম প্রচেষ্টা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে যা হয়ে থাকে এবং স্বাভাবিক আওয়াজের সাথে যদি অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য যোগ করা হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা আবু মুসা আশআরী নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লক্ষ্য করে বলেছেন-

«لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْتَمِعُ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا»

"হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি জানতাম যে আপনি আমার কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করছেন, তাহলে আমি আরও সুন্দর কণ্ঠে তা পাঠ করতাম। সালাফগণ এভাবেই কুরআনকে সুন্দর সুরে পাঠ করতেন। এ ব্যাপারে বর্ণিত দলীলগুলো উপরোক্ত অর্থেই প্রয়োগ করতে হবে।

২. সুন্দর সুরে কুরআন পাঠ করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে যা শিল্পীদের তৈরী। যেমন বর্তমানে গানের বিভিন্ন সুর দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া হয়। সালাফগণ এই পদ্ধতিকে অপছন্দ করেছেন। যে সমস্ত হাদীছে সুর দিয়ে কুরআন পড়াকে অপছন্দনীয় বলা হয়েছে, তা দ্বারা এই শেষোক্ত পদ্ধতিটিই উদ্দেশ্য; প্রথমটি নয়।

রোগী দেখতে যাওয়া ও রোগীর সেবায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র অভ্যাসের অন্তর্ভূক্ত ছিল যে, সাহাবীদের মধ্যে যারা অসুস্থ হতেন তিনি তাদেরকে দেখতে যেতেন। এক ইহুদী ছেলে তাঁর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখতে গিয়েছিলেন।[৮৩] তাঁর মুশরিক চাচা অসুস্থ হলে তার পাশেও তিনি উপস্থিত হয়েছেন।[৮৪] অসুস্থ অবস্থায় উভয়ের কাছেই তিনি ইসলাম পেশ করেছেন। বালকটি ইসলাম কবুল করেছে। কিন্তু তাঁর মুশরিক চাচা তা কবুল করে নি।

তিনি রোগীর খুব কাছাকাছি যেতেন এবং মাথার পাশে বসে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। তাঁর ডান হাত রোগীর শরীরে বুলাতেন। এ সময় তিনি বলতেন-

«أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»

---

৮২. বুখারী, অধ্যায়ঃ ফাজায়েলুল কুরআন তাও. হা/৭৫৪৪, মিশকাত, হাএ. হা/২১৯৩

৮৩. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয।

৮৪. বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

"কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রভু! নিরাময় দান কর। তুমিই নিরাময় দানকারী। তোমার নিরাময় দানই আসল নিরাময়। তুমি এমন নিরাময় দান কর, যা কোন রেসূই অবশিষ্ট রাখবে না"।[৮৫] রেসূীর জন্য তিনি তিনবার দু'আ করতেন। তিনি সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দেখতে গিয়ে তিনবার বলেছেন। اللهم اشْفِ سَعْدًا হে আল্লাহ! তুমি সাদকে সুস্থতা দান কর। রোগীর কাছে প্রবেশ করার সময় তিনি বলতেন-

«لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»

অর্থ: ভয় নেই, আল্লাহর মেহেরবাণীতে আরেস্য লাভ করবে ইনশা-আল্লাহ।[৮৬]

কখনও বলতেন- كفارة وطهور উভয় বাক্যের অর্থ হচ্ছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। ইনশা-আল্লাহ্ তোমার এই অসুখ ভাল হয়ে যাবে এবং গুনাহসমূহের কাফ্ফারা বদলা হয়ে যাবে।

কাউকে সাপ-বিচ্ছু কামড় দিলে বা অন্য কোন কারণে আহত হলে কিংবা ব্যথা অনুভব হলে তিনি এই বলে ঝাড়-ফুঁক করতেন-

«بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا»

"আল্লাহর নামের বরকতে আমাদের যমীনের মাটি কারও থুথুর সাথে মিশানো হচ্ছে, আমাদের রবের হুকুমে আমাদের রোগী ভাল হয়ে যাবে"।[৮৭] এটি হচ্ছে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা। এই বর্ণনার মাধ্যমে সত্তর হাজারের হাদীছে ولايرقون শব্দটি তথা ঝাড়-ফুঁক না করার যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা ভুল প্রমাণিত হল। এখানে রাবী ভুল করেছেন।[৮৮]

---

৮৫. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তিব্ব, বুখারী, তাও. হা/৫৬৭৫, ইফা. হা/৫১৬০, আপ্র. হা/৫২৬৪, মুসলিম, হাএ. হা/৫৬০০, ইফা. হা/৫৫১৯, ইসে. হা/৫৫৪৪, মিশকাত, মাশা. হা/১৫৩০

৮৬. বুখারী, তাও. হা/৫৬৬২ ইফা. হা/৫১৪৭, আপ্র. হা/৫২৫১, মিশকাত, মাশা. হা/১৫২৯।

৮৭. সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব, বুখারী, তাও. হা/৫৭৪৫, ইফা. হা/৫২২১, আপ্র. হা/৫৩২৫, মুসলিম, হাএ. হা/৫৬১২, ইফা. হা/৫৫৩১, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৩৫১২, মিশকাত, হাএ. হা/১৫৩১

৮৮. ইবনুল কাইয়্যিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর এই কথাটি এক বাক্যে সঠিক নয়। কারণ **প্রথমতঃ** হাদীসের রাবী ভুল করেন নি। বরং যে ধরণের ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে শিরকী ও কুফরী কথা রয়েছে বা যার অর্থ বোধগম্য নয় এখানে সেই প্রকার ঝাড়-ফুঁক উদ্দেশ্য। অন্যথায় শিরকমুক্ত বাক্য এবং কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত বাক্য দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তা করেছেন এবং করতে বলেছেন।

সত্তর হাজারের হাদীসের পূর্ণ বিবরণ হল, প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "(মিরাজের সময়) পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মত আমার সামনে পেশ করা হল। দেখলাম, কোন নাবীর সাথে রয়েছে একজন লোক, কোন নাবীর সাথে রয়েছে মাত্র দু'এক জন লোক, কোন নাবীর সাথে কোন লোকই নাই। এমতবস্থায় বিশাল একটা জনসমাবেশের প্রতিচছবি আমার সামনে উপস্থাপন করা হল। ভাবলাম, এরা হয়ত আমার উম্মত হবে। কিন্তু বলা হল, এটা মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং তার উম্মত। এরপর আরো একটা বিশাল জনসমষ্টি দেখতে পেলাম। এদের সম্পর্কে বলা হল, এরাই আপনার উম্মত। এদের মধ্যে এমন সত্তর হাজার মানুষ রয়েছে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তাদেরকে হিসাব-নিকাশ বা শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে না। একথা বলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উঠে গিয়ে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলে সাহাবীগণ পরস্পরে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে লাগলেন যে, এই (সৌভাগ্যবান) ব্যক্তিগণ কারা? কেউ বললেন, তারা হয়ত আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীগণ। কেউ বললেন, তারা হয়ত ঐ সমস্ত লোক যারা ইসলাম আসার পর জন্মগ্রহন করেছে এবং কোন দিন শির্ক করেনি। এভাবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বললেন। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘর থেকে বের হয়ে এসে বললেন, "তারা ঐসব লোক যারা কোনদিন ঝাড়-ফুঁক বা লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁক দিয়ে রোগ নিরাময়ের আশ্রয় নিতনা, অশুভ বা কুলক্ষণে বিশ্বাস করত না এবং তারা কেবল তাদের প্রতিপালকের উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করত।"

রোগী দেখতে যাওয়ার জন্য তিনি কোন সময় বা দিন নির্ধারণ করে দেন নি। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী দিনের বা রাতের যে কোন সময় রোগীর কাছে যাওয়া বৈধ।

কারও চোখে বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গে সামান্য সমস্যা হলেও তিনি তাকে দেখতে যেতেন। কখনও তিনি রোগীর কপালে হাত রাখতেন। অতঃপর তার বক্ষদেশ ও পেট মাসাহ করতেন আর বলতেন- اللهم اشــفه "হে আল্লাহ্! তুমি তাকে সুস্থ কর"।[৮৯] তিনি রোগীর চেহারাতেও হাত বুলাতেন। কোন রোগীর ব্যাপারে তিনি যদি নিশ্চিত হতেন যে, সে আর বাঁচবে না, তাহলে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করতেন-

﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

"নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো"। (সূরা বাকারা-২: ১৫৬)

মৃত ব্যক্তির জানাযা ও কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে রসূলের সুন্নাত

জানাযা তথা মৃত ব্যক্তিকে বিদায় দেয়ার ক্ষেত্রে রসূল ﷺ এর হিদায়াতই হচ্ছে সর্বযুগের সকল মানব জাতির রীতি-নীতি ও পদ্ধতিসমূহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ ব্যাপারে তার সুন্নাত হল সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং পূর্ণাঙ্গ এক পদ্ধতি। এতে রয়েছে মৃত ব্যক্তির প্রতি এবং তার আত্মীয় স্বজনের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা। মৃতের সাথে যে ধরণের ব্যবহার ও সম্মান করা হয় তার মধ্যে জীবিতদের

উকাশা বিন মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জন্য দুআ করুন তিনি যেন আমাকে তাঁদের অর্ন্তভূক্ত করেন। রসূল ﷺ বললেন, "তুমি তাঁদের অর্ন্তভূক্ত"। এ কথা শুনে আরেকজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্য দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তাদের অর্ন্তভূক্ত করেন। নাবী করীম ﷺ বললেনঃ "উকাশা তোমার আগে এই সৌভাগ্য অর্জন করে নিয়েছে"।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, নাবী ﷺ এই সত্তর হাজারের সাথে আরও সত্তর হাজার মানুষকে যোগ করে দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন জানালে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন।

উক্ত হাদীসে শিরকী তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ জাহেলী যুগের দেব-দেবী, ভুত-প্রেত ইত্যাদির নামে, কিংবা কোন শির্ক মিশ্রিত তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা ঝাড়–ফুঁক থেকে বিরত থাকায় আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করার কথা প্রমাণিত এবং বৈধ।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদীছ মোটের উপর বৈধ বা অবৈধ বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার জন্য বর্ণিত হয়নি। বরং তাতে দৃঢ়তর ঈমানের ভিত্তিতে বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে মাত্র।

তৃতীয়তঃ এখানে যে নিজ উদ্যোগে ঝাড়-ফুঁক করে, তার কথা বলা উদ্দেশ্য। ফলে কেউ চাইলে যে ঝাড়-ফুঁক দেয় সে উল্লেখিত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে- এ কথা ঘোষণা করা উদ্দেশ্য নয়।

চতুর্থতঃ কিছু আলেম বাহ্যিক বৈপরীত্যের অবসান কল্পে সমীকরণের পথ অবলম্বন করেন। ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও তাই করেছেন। তবে কাবাঘর অভিমুখী দূর পাল্লার কষ্টসাধ্য সফরে নাবী জীবনীর মহা সমুদ্রকে গ্লাসে করে সাজানো যে কি পরিমাণ কঠিন কাজ তা বুঝানো অসম্ভব। তাই তিনি এক গুলিতে শিকারের পথ বেছে নেন বলে মনে হয়। ফলে এক বাক্যে চূড়ান্ত সিদ্বান্ত দিয়ে দেন। নচেৎ তাঁর পদ্ধতি মূলত এর বিপরীত। কেননা তাঁর সম্পর্কে কথা আছে যে, ইবনে তাইমীয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) যেখানে এক আঘাতে বাতিলের প্রাচীর ভাংতেন সেখানে ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) একটি করে ইট খসাতেন।

৮৯. মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/১০৫৭, সিলসিলাতু আহাদীসুস সহীহা, মাশা. ৯/২৭৭৫

ইবাদত-বন্দেগীরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। মৃত ব্যক্তির জানাযা সলাতে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও ইবাদত প্রকাশ করা তাঁর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ভালভাবে প্রস্তুত করে তাকে আল্লাহর দিকে পাঠিয়ে দেয়া তাঁর হিদায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ সারিবদ্ধ হয়ে জানাযা সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ইখলাসের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তারপর তার সাথে চলে কবর পর্যন্ত গিয়ে শেষ বিদায় জানাতেন। অতঃপর তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কবরবাসীকে প্রশ্নের সঠিক উত্তরের উপর দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। পরবর্তীতে বার বার তার কবর যিয়ারত করতেন, কবর বাসীর উপর সালাম দিতেন এবং তার জন্য দু'আ করতেন।

এর আগে মৃত্যুর পূর্বেই অসুস্থ থাকা কালে তিনি তার খোঁজ-খবর নিতেন, তাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, তার ধন-সম্পদে বা অন্য কোন বিষয়ে অসীয়ত করতে বলতেন এবং তাওবা করার আদেশ দিতেন। মৃত্যু শয্যায় রোগীর পাশে উপস্থিত লোকদেরকে তিনি আদেশ দিতেন যে, তারা যেন মুমূর্ষ ব্যক্তিকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তালকীন দেয় অর্থাৎ এটি পাঠ করতে বলে। যাতে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সময় এটিই হয় তার সর্বশেষ কথা।

অতঃপর তিনি পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী অন্যান্য জাতির (জাহেলীয়াতের) অভ্যাস অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির শোকে গালে চপেটাঘাত করা, উচ্চ কণ্ঠে বিলাপ করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কর্ম করতে নিষেধ করতেন।

তিনি মৃতের জন্য চিন্তিত হওয়া এবং আওয়াজ বিহীন ক্রন্দন করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি নিজেও তা করতেন। তিনি বলতেন-

«تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَاللهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

"চোখ কাঁদে, অন্তর ব্যথিত হয় আর আমরা তাই বলব যা আমাদের রব (প্রভু) পছন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাহত"।[৯০] মসীবতের সময় তিনি উম্মাতের জন্য আলহামদুলিল্লাহ্ বলা, ইন্না লিল্লাহ্ পাঠ করা এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

তাঁর পবিত্র সুন্নাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, মৃত ব্যক্তিকে জানাযার জন্য দ্রুত প্রস্তুত করা এবং কাফন ও দাফনে কোন প্রকার বিলম্ব না করা। তাকে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, মৃত দেহে সুগন্ধি মাখানো এবং সাদা কাপড়ে কাফন পরানোও তাঁর সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল। অতঃপর তাঁর কাছে নিয়ে আসা হত। তারপর তিনি জানাযার সলাত পড়তেন। অথচ প্রথমেই মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সময় তার জন্য দু'আ করেছেন। তাঁর সাথীদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তার পাশেই থাকতেন। অতঃপর গোসল দেয়ার সময় উপস্থিত হতেন এবং জানাযার সলাত পড়তেন ও কবর পর্যন্ত গমণ করতেন। সাহাবীগণ যখন দেখলেন এতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে তখন তারা নিজেরাই নিজেদের মাইয়েতকে প্রস্তুত করতেন। অতঃপর বহন করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তিনি মাসজিদের বাইরে

৯০. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয, আবু দাউদ, আলএ. হা/৩১২৬

জানাযা পড়তেন। কখনও তিনি মাসজিদেই জানাযার সলাত পড়তেন। যেমনটি তিনি করেছেন সুহাইল বিন বায়যা এবং তাঁর ভাইয়ের জানাযায়।

রূহ বের হওয়া মাত্রই মৃত ব্যক্তির চেহারা ও শরীর ঢেকে দেয়া, উভয় চোখ বন্ধ করে দেয়া তাঁর পবিত্র সুন্নাত ছিল। তিনি কখনও মৃতকে চুমু খেতেন। যেমনটি তিনি করেছেন উছমান বিন মাযউনের ক্ষেত্রে। তিনি তাকে চুম্বন করেছেন এবং কেঁদেছেন।

তিনি মৃতকে তিনবার বা পাঁচবার অথবা গোসল দাতার ইচ্ছানুপাতে তার চেয়ে অধিকবার গোসল দিতে আদেশ করেছেন। শেষবার কর্পূর ব্যবহার করতে বলেছেন।

তিনি যুদ্ধের ময়দানের শহীদদেরকে গোসল দিতেন না। শুধু যুদ্ধের হাতিয়ার ও লৌহবর্ম খুলে রেখে পরিহিত কাপড়েই তাদেরকে দাফন করতেন। তাদের উপর জানাযার সলাতও পড়তেন না।[৯১] ইহরাম অবস্থায় কেউ মারা গেলে পানি ও বরই পাতা দিয়ে (গরম পানিতে বরই পাতা দিয়ে) গোসল দিতে বলেছেন, ইহরামের দুই কাপড়েই তাকে কাফন পরাতে বলেছেন, সুগন্ধি মাখাতে ও মাথা ঢাকতে নিষেধ করেছেন।

তিনি মৃতের ওয়ারিছদেরকে ভাল এবং সাদা কাপড়ে কাফন পরাতে আদেশ দিতেন ও এতে অপচয় ও বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করতেন। সমস্ত শরীর ঢাকতে গিয়ে কাফনের কাপড় ছোট হয়ে গেলে মাথা ঢেকে ঘাস বা এ ধরণের কোন বস্তু দিয়ে উভয় পা আবৃত করে দিতে আদেশ করেছেন।

তাঁর কাছে লাশ উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন- তার উপর কোন ঋণ আছে কি? মৃতের উপর কোন ঋণ না থাকলে জানাযা পড়তেন। অন্যথায় তার জানাযা পড়তেন না। তাঁর সাহাবীদেরকে পড়তে বলতেন। কেননা তার সলাতই হচ্ছে মৃতের জন্য শাফাআত স্বরূপ। আর তাঁর শাফাআত কবুলযোগ্য। ঐ দিকে বান্দা ঋণের কারণে আটকে থাকবে। তা পরিশোধ না করে জান্নাতে যেতে পারবে না। ইসলামের বিজয়ের ফলে যখন তাঁর হাতে ধন-সম্পদ আসল তখন তিনি নিজের পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করে ঋণগ্রস্তের জানাযার সলাত আদায় করতেন। আর মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিছদের জন্য ছেড়ে দিতেন।[৯২]

জানাযার সলাতের পদ্ধতি

জানাযা সলাতের শুরুতে তিনি আল্লাহু আকবার বলতেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতেন। একদা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একটি জানাযার সলাত পড়লেন। এতে তিনি প্রথম তাকবীরের পর স্বরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। আর বললেন- আমি এটি এ জন্য পাঠ করেছি, যাতে তোমরা জানতে পার যে, জানাযা সলাতে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত।

---

৯১. পড়ার কথাও সাব্যস্ত আছে। যেমন না পড়ার কথাও সাব্যস্ত আছে।

৯২. বুখারীর হাদীছে রয়েছে, অন্য কেউ নিয়ে নিলেও তিনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা পড়তেন।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- জানাযা সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়; বরং তা সুন্নাত।[৯৩] আবু উমামা বিন সাহল একদল সাহাবী থেকে জানাযা সলাতে দুরূদ শরীফ পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন।

ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারী সাঈদ মাকবুরী থেকে বর্ণনা করেন, আর সাঈদ বর্ণনা করেন আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উবাদাহ বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জানাযা সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে সংবাদ দিব। প্রথমে তাকবীর বলবে। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। অতঃপর এই দু'আ পাঠ করবে-

«اللّٰهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلاَنًا كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ اللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

"হে আল্লাহ্! তোমার উমুক বান্দা তোমার সাথে কাউকে শরীক করে নি। তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তুমিই অধিক অবগত আছ। সে যদি নেক আমল করে থাকে তাহলে তুমি তার নেক আমলে আরও বৃদ্ধি করে দাও। আর যদি খারাপ আমল করে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তার বিনিময় (তার জানাযার সলাতের ছাওয়াব) থেকে বঞ্চিত করোনা এবং তার পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করোনা"।

মৃত ব্যক্তির জানাযা সলাত পড়ার উদ্দেশ্য হল তার জন্য দু'আ করা। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে দু'আর ব্যাপারে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে সূরা ফাতিহা ও তাঁর উপর দুরূদ পাঠের ব্যাপারে তত হাদীস বর্ণিত হয় নি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এই দু'আও বর্ণিত হয়েছে-

«اللّٰهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

"হে আল্লাহ্! উমুকের পুত্র উমুক তোমার আশ্রয়ে ও হেফাজতে চলে গেছে। তুমি তাকে কবরের ফিতনা থেকে বাঁচাও এবং জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর। তুমি ওয়াদা পূর্ণকারী ও সত্যবাদী। তাকে তুমি ক্ষমা কর এবং তার উপর রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়"। নীচের দু'আটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৯৪]

«اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وأَنْتَ رَزَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلاَمِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا»

"হে আল্লাহ! তুমিই এই মাইয়্যেতের প্রভু। তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছ ও রিযিক দিয়েছ, তাকে ইসলাম কবুল করার তাওফীক দিয়েছ এবং তুমিই তার রূহ কবয করার হুকুম করেছ। তুমি তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছুই জান। আমরা তার জন্য শাফাআতকারী হিসাবে এখানে এসেছি। সুতরাং

---

৯৩. অনেক সাহাবী, তাবেয়ী এবং ইমামের নিকট তা পাঠ করা ফরয। তাদের দলীল বুখারীর সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করলনা, তার সলাত হলনা। যেহেতু জানাযা একটি সলাত এবং সকলে এটিকে সলাত বলেই জানেন, তাই উক্ত হাদীছ জানাযা সলাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং এটি একটি শক্তিশালী মত। আল্লাহই ভাল জানেন।

৯৪. সুনান ইবনে মাজাহ, তাও. হা/১৪৯৯, আহকামুল জানায়েয ১২৫ পৃষ্ঠা।

তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।"[৯৫] আর তিনি মাইয়্যেতের জন্য ইখলাসের সাথে দু'আ করার আদেশ দিতেন।

জানাযার সলাতের তাকবীর সংখ্যা

তিনি চার তাকবীরে জানাযা সলাত পড়তেন। তাঁর থেকে পাঁচ তাকবীরের কথাও সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীগণ চার, পাঁচ এবং ছয় তাকবীরেও জানাযা সলাত পড়তেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের ছাত্র আলকামা বলেন- আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললাম- শাম থেকে মুআয বিন জাবালের কিছু সাথী আগমণ করেছে। তারা তাদের একজন মাইয়্যেতের জানাযা সলাতে পাঁচ তাকবীর দিয়েছে। তিনি বললেন- মাইয়্যেতের জানাযা সলাতে তাকবীরের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। ইমাম যে কয়টি তাকবীর দেয় তুমিও সেই কয়টি তাকবীর দাও। আর ইমাম যখন সালাম ফেরাবে তখন তুমিও সালাম ফিরাও।[৯৬]

---

৯৫. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আলবানী এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন। দেখুনঃ যঈফে আবু দাউদ, হা/ ৭০৩।

৯৬. **চার তাকবীরে জানাযার সলাত পড়ার পদ্ধতি** হচ্ছেঃ **প্রথম তাকবীরের** পর সূরা ফাতিহা পড়ে কুরআন থেকে আরেকটি সূরা পাঠ করবে। অতঃপর **দ্বিতীয় তাকবীর** দিবে। দ্বিতীয় তাকবীরের পর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর তাশাহুদের দুরূদের ন্যায় দুরূদ পাঠ করবে। এ ক্ষেত্রে দুরূদে ইবরাহীম পাঠ করাই সর্বোত্তম। দুরূদে ইবরাহীমের পূর্ণ বিবরণ এইঃ

«اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐ রূপ রহমত নাযিল কর যে রূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পরিবারের উপর নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাজিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের উপর নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। (বুখারী ও মুসলিম) অতঃপর **তৃতীয় তাকবীর** দিয়ে এই দুআটি পাঠ করবে

« اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ اللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট ও বড় নর ও নারীদেরকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপরে জীবিত রাখ এবং যাদেরকে মৃত্যু দান করেছো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তার সওয়াব হতে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করোনা"। (আবু দাউদ, আলএ. হা/৩২০১) অথবা নিম্নের দুআটি পাঠ করবে।

(اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ واَعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّيالثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِّنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذاَبِ الْقَبْرِ، وَعَذاَبِ النَّارِ»

"হে আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তায় রাখ। তাকে মাফ করে দাও। তার আতিথেয়তা সম্মানজনক কর। তার বাসস্থানকে প্রশস্থ করে দাও। তুমি তাকে ধৌত কর পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তাকে গুনাহ হতে এমন ভাবে পরিষ্কার কর যেমন করে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। তাকে তার

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার কি জানা আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন সাহাবী জানাযা সলাতে দুই দিকে সালাম ফিরাতেন? তিনি বললেন- না। তবে ছয়জন সাহাবী থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা শুধু ডান দিকে সংক্ষিপ্ত সালাম পেশ করতেন। অতঃপর তিনি ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস এবং আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নাম উল্লেখ করেছেন।

জানাযার সলাতে তাকবীর বলার সময় রাফউল ইয়াদাইন করা

জানাযা সলাতে তাকবীর পাঠ করার সময় রাফউল ইয়াদাইন সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- এ ব্যাপারে সাহাবী থেকে বর্ণিত একটি আছারের (হাদীস) উপর ভিত্তি করে এবং সলাতের সুন্নাতের উপর কিয়াস করে রাফউল ইয়াদাইন করা যাবে। ইবনে উমার ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জানাযা সলাতে যখনই তাকবীর বলতেন তখনই রাফউল ইয়াদাইন করতেন।

কারো জানাযার সলাত ছুটে গেলে কবরের উপর পড়তে পারে

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন জানাযা সলাত ছুটে গেলে কবরের উপর সলাত পড়তেন। তিনি একবার এক রাত পরে একটি কবরের উপর জানাযা সলাত পড়েছেন। আরেকবার তিন রাত পর একটি কবরের উপর জানাযা সলাত পড়েছেন। আরেকবার একমাস পর। এ ব্যাপারে তিনি কোন সময় সীমা নির্ধারণ করে দেন নি।[৯৭] ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) শুধু অলী তথা শাসকের জন্য কবরের উপর জানাযা সলাত পড়া জায়েয বলেছেন। বিশেষ করে যখন তিনি জানাযায় উপস্থিত না থাকেন।

যার উপর শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি কায়েম করা হয়েছে, তার জানাযা

তিনি পুরুষ মাইয়্যেতের মাথা বরাবর দাঁড়াতেন এবং মহিলা মাইয়্যেতের মাঝামাঝি দাঁড়াতেন। তিনি শিশুর উপরও জানাযা সলাত পড়তেন। আত্মহত্যাকারীর উপর তা পড়তেন না। গণীমতের মাল খেয়ানতকারীর উপরও না। শরীয়তের দন্ডবিধি কার্যকর করে যেমন জেনার অপরাধে যাকে রজম করে হত্যা করা হয়েছে তার উপর জানাযা পড়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে জুহাইনা গোত্রের যে মহিলাটিকে রজম করা হয়েছিল তার উপর তিনি জানাযা সলাত পড়েছেন। মায়েয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জানাযা পড়া বা না পড়ার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। আসলে উভয় বর্ণনার শব্দের মধ্যে কোন দ্বন্দ নেই। উভয়ের মাঝে সমন্বয় এভাবে করা যেতে পারে যে, কেননা জানাযা সলাতের উদ্দেশ্য হল মাইয়্যেতের জন্য দু'আ করা। তিনি তাঁর উপর সলাতে জানাযা পড়া ছেড়ে

দুনিয়ার ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর দান কর। তার দুনিয়ার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান কর। আরো তাকে দান কর তার (দুনিয়ার) স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী। তাকে জান্নাত প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ দাও"। (মুসলিম, হাএ. হা/২১২১, ২১২৪, ইফা. হা/ ২১০০, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৯৮৪, মিশকাত, হা/১৬৫৫) অতঃপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফেরাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উপরোক্ত দু'টি দুআ ব্যতীত অন্যসব দুআ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয়। তবে সাহাবীদের থেকে প্রমাণিত।

৯৭.তাই এ ব্যাপারে আলেমদের একটি সুন্দর সিদ্ধান্ত হচ্ছে কোন মানুষের আপন কিংবা বিশেষ ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত না হতে পারলে কবরে তা পড়া যাবে। আল্লাহই ভাল জানেন। উহুদের শহীদদের জানাযা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আট বছর পর আদায় করেছেন। (বুখারী, হা/৪০৪২)

দিলেও দু'আ ঠিকই করেছেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে বুখারী ও মুসলিমে। যেনার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি মায়েযের জানাযা পড়া বাদ দিয়েছেন।

আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, মায়েয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীছের শব্দের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে তাহলে এই হাদীসকে বাদ দিয়ে অন্য হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর বিশুদ্ধ ও বিরোধমুক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি গামেদী ও জুহানী গোত্রের মহিলার উপর জেনার শাস্তি কায়েম করার পর জানাযা সলাত পড়েছেন।[৯৮] সুতরাং শরীয়তের নির্ধারিত দন্ডবিধি কায়েম করে কোন মুসলিমকে হত্যা করার পর তার জানাযা সলাত পড়া শরীয়ত সম্মত।

জানাযার (লাশের) আগে ও পিছনে গমন করা

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র সুন্নাত ছিল যে, কারও জানাযা সলাত পড়ার পর তিনি লাশের আগে আগে পায়ে হেঁটে কবর পর্যন্ত যেতেন। আর যারা আরোহন করে যাবে তাদের জন্য লাশের পিছনে যাওয়াকে সুন্নাত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। আর যারা পায়ে হেঁটে যাবে তাদের উচিত হবে লাশের খুব কাছাকাছি থাকা। চাই সামনে হোক বা পিছনে, ডানে হোক বা বামে। তিনি জানাযা নিয়ে দ্রুত চলতে আদেশ করতেন। সাহাবীগণ লাশ নিয়ে দৌড়িয়ে চলতেন। আর তিনিও পায়ে হেঁটে চলতেন এবং বলতেন- ফিরিস্তারা যেহেতু হেঁটে চলছে, তাই আমি আরোহন করতে পারি না।[৯৯] ফেরত আসার সময় তিনি কখনও কখনও আরোহন করেছেন। লাশ কবরে না রাখা পর্যন্ত তিনি বসতেন না। তিনি বলতেন- যখন তোমরা জানাযার সাথে চলবে তখন লাশ কবরে না রাখা পর্যন্ত বসবেনা।[১০০]

গায়েবানা জানাযা

তিনি প্রত্যেক মৃতের গায়েবানা জানাযা পড়তেন না। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি উপস্থিত মাইয়্যেতের জানাযা সলাতের মতই নাজাশীর গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। গায়েবানা জানাযা পড়া এবং না পড়া উভয়টিই সুন্নাত।[১০১] কোন ব্যক্তি যদি এমন দেশে মারা যায় যেখানে জানাযা সলাত পড়া সম্ভব হয় নি, তার জানাযা সলাত পড়তে হবে। কেননা নাজাশী কাফেরদের মাঝে মৃত্যু বরণ করেছেন। তাই সেখানে তাঁর সলাতে জানাযা পড়া হয়নি।

জানাযা দেখে দাঁড়ানো

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পাশ দিয়ে জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় সাহাবীদেরকে দাঁড়াতে বলেছেন।[১০২] সহীহ সূত্রে এও বর্ণিত হয়েছে যে, পাশ দিয়ে জানাযা অতিক্রম

---

৯৮. সহীহ মুসলিমে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

৯৯. আবু দাউদ। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ সহীহ আবু দাউদ হা/ ২৭২০।

১০০. বুখারী, অধ্যায়ঃ জানায়েয।

১০১. যার উপর জানাযা সলাত পড়া হয়ে গেছে, তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়ার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

১০২. এই দাঁড়ানো মৃতকে সম্মানের জন্য নয়। মূলতঃ যিনি মৃত্যু ঘটিয়েছেন তাঁর তথা আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানের জন্য এবং মৃত্যুর ভয়ের কারণেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

করার সময় তিনি বসেই ছিলেন। বলা হয়েছে যে, দাঁড়ানোর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। আরও বলা হয় যে, উভয়টিই জায়েয। দাঁড়ানো মুস্তাহাব আর বসে থাকা জায়েয। এভাবে ব্যাখ্যা করাই উত্তম।

সূর্য ঠিক উদয়ের সময়, অস্তের সময় এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন সূর্য মাথার উপর থাকে তখন মৃতকে দাফন করা তাঁর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। লাহাদ[১০৩] (বগলী কবর) খনন করা এবং তা গভীর করা তাঁর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল। মাথা ও পায়ের দিকে কবরকে প্রশস্ত করার আদেশ দিতেন। বর্ণিত হয়েছে যে, মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময় তিনি বলতেন-

«بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ »

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলতেন-

«بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ»

অন্য বর্ণনায় আছে-

«بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ »

সবগুলো বাক্যের অর্থ হচ্ছে, আমরা এই মাইয়্যেতকে আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাস্তায় এবং রসূলের সুন্নাতের উপর দাফন করছি।[১০৪] তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফনের সময় তিনি মাথার দিকে তিন অঞ্জলি মাটি রাখতেন।[১০৫] তিনি যখন দাফন শেষ করতেন তখন সাহাবীগণসহ কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং মাইয়্যেতকে সঠিক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন এবং সাহাবীদেরকে তা করার আদেশও দিতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে সঠিকভাবে কবরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দানের তাওফীক দান করেন।

কবরের উপর কুরআন পড়া ও কবর পাকা করা নিষেধ

কবরের উপর বসে কুরআন বা অন্য কিছু পাঠ করা এবং মৃত ব্যক্তিকে কোন কিছুর তালকীন দেয়া (শিক্ষা দেয়া) তাঁর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা। কবর উঁচু করা, তা পাকা করা, তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা এবং তাতে চুনকাম করাও তার সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা। বরং এ কাজগুলো সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এই আদেশ দিয়ে পাঠালেন যে, কোন মূর্তি

---

১০৩. লাহাদ কবর হচ্ছে গভীর করে কবর খনন করার পর লাশ রাখার জন্য গর্তের কিবলার দিকে লাশের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লম্বা গর্ত খনন করা এবং সেখানে লাশ রাখার পর সিন্দুকের মত খনন কৃত গর্তটি মাটি দ্বারা ভর্তি করে দেয়া। মাটির ধরণ বুঝে এমনটি করা সম্ভব হলে তাও করা চলে। আমাদের সমাজে প্রচলিত সিন্দুক আকারের কবর খনন করাও বৈধ। এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে সর্বাবস্থায় সাধ্যানুযায়ী কবর গভীর করা সুন্নাত। বগলী বা সিন্দুক কবরের ব্যাপারটির অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যেখানে শক্ত ও সুদৃঢ় মাটি থাকবে সেখানকার জন্য বগলী কবর প্রযোজ্য। অন্যথায় সিন্দুকী কবরই ভাল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ اَللَّحدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا আমাদের জন্য (মদীনা বাসীদের জন্য) বগলী কবর। আর অন্যদের জন্য সিন্দুকী কবর।(আবু দাউদ, আলএ. হা/৩২০৮ সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/১০৪৫, মিশকাত, হাএ. হা/ ১৭০১)

১০৪. সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/১৪৬ সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. ১০/৩৫৩, পৃ. সহীহ : আলবানী। তবে সুসাব্যস্ত বাক্য সর্বশেষটি। ।

১০৫. সহীহ ইবনে মাজাহ, হা/ ১২৭১, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন।

পেলে তিনি যেন তা মিটিয়ে ফেলেন এবং উঁচু কোন কবর পেলে তা যেন মাটির সমান করে দেন।[১০৬] সুতরাং তাঁর পবিত্র সুন্নাত হচ্ছে সমস্ত উঁচু কবর মাটির সমান করে দেয়া। তিনি কবরকে পাকা করত তার উপর কিছু নির্মাণ করতে, তার উপর বসতে এবং তাতে কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন। আর যে ব্যক্তি কোন কবরকে চিনে রাখতে চায় তাকে শিক্ষা দিতেন যে, সে যেন কবরের উপর নিশানা স্বরূপ একটি পাথর রেখে দেয়।[১০৭] তিনি কবরকে মাসজিদে রূপান্তরিত করতে এবং তার উপর বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন।[১০৮] যারা এ কাজগুলো করে তাদের উপর তিনি লা'নত করেছেন। তিনি কবরের দিকে ফিরে সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন এবং তাঁর কবরকে ঈদ ও মেলার (উরুছের) স্থানে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি এক দিকে কবরকে অপদস্ত করতে, পদদলিত করতে, তার উপর বসতে এবং তাতে হেলান দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন এবং অন্য দিকে তাকে সম্মান করে মাসজিদ, উৎসবের স্থান এবং পূজার স্থানে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন।

কবর যিয়ারত ও তার পদ্ধতি

তিনি দু'আ ও ইস্তেগফার করার জন্য তাঁর সাহাবীদের কবর যিয়ারত করতে যেতেন। এটিই হচ্ছে সেই যিয়ারত, যা রসূল ﷺ সুন্নাত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। কবর যিয়ারতের সময় তিনি তাদেরকে এই দু'আ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন-

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»

"সকল মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীর উপর সালাম (শান্তি)। আল্লাহ্ চাহে তো আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আমাদের এবং আপনাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি।"[১০৯] জানাযা সলাতে তিনি যে সমস্ত দু'আ পাঠ করতেন কবর যিয়ারতের সময়ও অনুরূপ দু'আ পাঠ করতেন। তবে মুশরিকদের (বর্তমানের অনেক নামধারী মুসলিমদের) অবস্থা হচ্ছে তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য মৃতদেরকে আহবান করছে, আল্লাহর সাথে মৃতদেরকে শরীক করছে,

মৃতদের কাছে মদদ চাচ্ছে এবং তাদের দিকে মনোনিবেশ করছে। আর এটি রসূল ﷺ এর সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে এককভাবে আল্লাহর ইবাদতের উপর।

মৃতের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা তাঁর সুন্নাতে তায়্যেবার অন্তর্ভূক্ত ছিল। দিন বা তারিখ নির্দিষ্ট করে মৃত ব্যক্তির জন্য একত্রিত হওয়া এবং কুরআন পাঠ করা তাঁর সুন্নাত ছিল না। মূলতঃ কুরআন পড়ার জন্য কবরের পাশে বা অন্য কোন স্থানে একত্রিত হওয়া ইসলামে বৈধ নয়।

---

১০৬. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানায়েয।

১০৭. সহীহ আবু দাউদ, আলএ. হা/২৭৪৫, ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাসান বলেছেন।

১০৮. মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত হা/৭৪০, ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাসান বলেছেন।

১০৯. মুসলিম, হাএ. হা/২১৪৭, ইফা. হা/২১২৬, ইসে. হা/২১২৯, সহীহ ইবনে মাযাহ, মাশাা. হা/১২৫৭, মিশকাত, মাশাা. হা/১৭৬৪

তাঁর পবিত্র সুন্নাতের মধ্যে এটিও ছিল যে, মৃতের পরিবারবর্গ লোকদের জন্য খানা বা অন্য কোন বস্তুর ব্যবস্থা করবে না। বরং তিনি লোকদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন মৃতের পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে। জাফর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মৃত্যুর সংবাদ আসলে তিনি বলছেনঃ

«اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ »

"তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর। কেননা তাদের কাছে এমন খবর এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত করে তুলেছে"।[১১০] মৃত ব্যক্তির উপর উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করা, ব্যাপকভাবে মৃত্যু সংবাদ প্রচার ও ঘোষণা করা তার সুন্নাত ছিল না। বরং তিনি এ সমস্ত কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন- এগুলো হচ্ছে জাহেলী যামানার কাজের অন্তর্ভূক্ত।

ভয়কালীন সলাতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীর জন্য সফর ও ভয়ের সময় সলাতের রাকআত সংখ্যা ও রুকনের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে বিশেষ রহমত করেছেন। আর সফরে ভয় না থাকলে শুধু রাকআত সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। নিজ দেশে বা বাড়ীতে অবস্থান করার সময় শত্রুর ভয় থাকলে রাকআত সংখ্যা ঠিক রেখে সলাতের কতিপয় রুকন কমিয়ে দিয়েছেন। এটিই ছিল তাঁর পবিত্র সুন্নাত। এর মাধ্যমেই শুধু সফর ও ভয়ের অবস্থায় কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে কসরের বিধান সীমিত করার রহস্য জানা গেল। ভয়ের সলাতের একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে-

১. শত্রুরা যদি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কিবলার মাঝখানে থাকতো তাহলে সমস্ত সাহাবী তাঁর পিছনে দুই কাতারে বিভক্ত হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি সলাতে প্রবেশের তাকবীর বলতেন। সাহাবীরাও তাকবীর বলতেন। অতঃপর সকলেই রুকু করতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতেন।

এরপর শুধু তাঁর পিছনের প্রথম কাতারের লোকেরা সিজদায় যেত। আর পরের কাতারের লোকেরা শত্রুর দিকে লক্ষ্য রেখে দাঁড়িয়ে থাকত। তারা দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ালে পিছনের সারির লোকেরা দুইটি সিজদাহ করত। অতঃপর তারা দাঁড়িয়ে সামনের কাতারে চলে যেত আর প্রথম কাতারের লোকেরা তাদের স্থলে চলে আসত। যাতে উভয় কাতারের লোকদের প্রথম কাতারের ছাওয়াব অর্জিত হয় এবং যাতে দ্বিতীয় লাইনের লোকেরাও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে দ্বিতীয় রাকআতের দু'টি সিজদাহ করতে পারে। এটিই পরিপূর্ণ ইনসাফের পরিচয়। এবার যখন তিনি রুকু করতেন তখন প্রথমবারের ন্যায় সকলেই তাঁর সাথে রুকু করত। তিনি যখন তাশাহুদে বসতেন তখন পিছনের কাতারের লোকেরা দু'টি সিজদাহ করে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে তাশাহুদে মিলিত হত। অতঃপর তিনি সকলকে নিয়ে সালাম ফেরাতেন।

---

১১০. আবু দাউদ, আলএ. হা/৩১৩২, ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

২. আর শত্রুরা যদি কিবলার দিকে না থাকত তাহলে কখনও তিনি মুজাহিদদেরকে দুইভাগে বিভক্ত করতেন। এক দলকে শত্রুদের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখতেন এবং অন্য দলকে সাথে নিয়ে এক রাকআত সলাত আদায় করতেন। এই দলটি এক রাকআত সলাত পড়ে দাঁড়ানো দলটির স্থলে চলে যেত আর দাঁড়ানো দলটি (যারা এখনও সলাত পড়েনি) এদের স্থলে চলে আসত এবং তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকআত পড়ত। অতঃপর নাবী ﷺ সালাম ফিরাতেন। সালামের পর প্রত্যেক দলের লোকেরা ইমামের সালামের পরে বাকী এক রাকআত সলাত পড়ে নিত।

৩. আবার কখনও তিনি দুই দলের এক দল লোক নিয়ে এক রাকআত সলাত আদায় করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতেন। এ সময় তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। ঐ দিকে লোকেরা বাকী এক রাকআত পূর্ণ করে নাবী ﷺ রুকুতে যাওয়ার পূর্বেই সালাম ফেরাত। এরপর তারা চলে গেলে যে দলটি এখনও সলাত পড়ে নি সেই দলটি চলে আসত এবং নাবী ﷺ এর সাথে দ্বিতীয় রাকআত সলাত পড়ত। তিনি যখন তাশাহুদে বসতেন তখন সেই দলটি দাঁড়িয়ে তাদের বাকী এক রাকআত সলাত পড়ে নিত। ঐ দিকে নাবী ﷺ তাদের জন্য তাশাহুদে বসে অপেক্ষা করতে থাকতেন। তাদেরও তাশাহুদ পড়া শেষ হলে তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাম ফেরাতেন।

৪. আবার কখনও তিনি দুই দলের এক দলকে সাথে নিয়ে দুই রাকআত সলাত আদায় করে তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাম ফেরাতেন। এরপর অন্য দলটি আসত। তাদেরকে নিয়েও আবার দুই রাকআত সলাত পড়ে তাদের সাথে সালাম ফেরাতেন। এতে করে তাদের হত দুই রাকআত করে আর তাঁর হত চার রাকআত।

৫. আবার কখনও এ রকম করতেন যে, তিনি দুই দলের এক দলকে নিয়ে এক রাকআত পড়তেন। অতঃপর তারা চলে যেত। তারা আর কোন সলাত আদায় করত না। এরপর অপর দলটি আসত। তাদেরকে নিয়ে তিনি আরেক রাকআত পড়তেন এবং সালাম ফেরাতেন। তারা আর কোন সলাত আদায় করত না। এভাবে রসূল ﷺ এর হতো মোট দুই রাকআত এবং উভয় দলের প্রত্যেকের হত এক রাকআত করে। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক দল ইমামের সাথে এক রাকআত করে সলাত পড়লে এবং আর কোন সলাত না পড়লে তাও জায়েয হবে। এটি জাবের, ইবনে আব্বাস, তাউস, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, হাকাম এবং ইসহাক (রহিমাহুল্লাহ) এর মত। উপরোক্ত প্রত্যেক পদ্ধতিতেই ভয়ের সলাত পড়া জায়েয আছে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- ভয়ের সলাতের ক্ষেত্রে ছয়টি বা সাতটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়। প্রত্যেকটিই জায়েয।

ভয়ের সলাতের বিষয়টিতে আরও অনেক পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তবে সবগুলোই উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর কাছাকাছি। কেউ কেউ দশটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাযম (রহিমাহুল্লাহ) পনেরটির মত

পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হচ্ছে যা আমরা উল্লেখ করেছি। এ সমস্ত আলেম যখনই কোন ঘটনায় রাবীদের মতভেদ দেখেছেন তখনই সেই মতভেদকে নতুন একেকটি পদ্ধতি মনে করেছেন।

যাকাতের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর আদর্শ

নাবী ﷺ উম্মাতের জন্য একটি পরিপূর্ণ যাকাত ব্যবস্থা পেশ করেছেন। যাকাতের সময়, পরিমাণ, নেসাব, যাদের উপর তা ফরজ, যারা এর হকদার ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদশালী ও তার সম্পদকে পবিত্র করার জন্যই যাকাত ফরয করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ধনীদের নিয়ামাতকে হেফাজত করেছেন। যে ব্যক্তি মালের যাকাত আদায় করে সে নিয়ামাতশূণ্য হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে এবং তার মালে বরকত হয় ও তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

যে সমস্ত মালের যাকাত দিতে হয়

তিনি চার প্রকার মালের মধ্যে যাকাত ফরয করেছেন। কেননা এগুলোই মানুষের মাঝে সর্বাধিক আদান-প্রদান ও হস্তান্তরিত হয় এবং এগুলোর প্রতিই মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

- ক. যমীন থেকে উৎপন্ন ফসল ও ফল।
- খ. চতুষ্পদ জন্তু যেমন উট, গরু ও ছাগল।
- গ. স্বর্ণ-রোপ্য, যার উপর অর্থনৈতিক লেনদেনের মূল ভিত্তি।
- ঘ. ব্যবসায়িক বিভিন্ন পণ্য।

বিভিন্ন প্রকার সম্পদে যাকাতের বিভিন্ন নিসাব

তিনি প্রত্যেক বছর মাত্র একবার যাকাত দেয়া আবশ্যক করেছেন। প্রত্যেক বছর ফল ও ফসল পরিপূর্ণরূপে পাকা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছেন। এটি একটি অসাধারণ ও অদ্বিতীয় ন্যায় সংগত ব্যবস্থা। কেননা প্রত্যেক মাসে বা সপ্তাহে একবার ফরয করা হলে ধনীদের কষ্ট ও ক্ষতি হত। আর জীবনে একবার ফরয করা হলে দরিদ্রদের হক নষ্ট হত।

সম্পদ উপার্জনে কষ্ট করা বা বিনা কষ্টে তা অর্জিত হওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণে কমবেশী করেছেন। সুতরাং কোন পরিশ্রম ছাড়াই মানুষ যমীনের নীচে যে সমস্ত সম্পদ পেয়ে যায় তাতে তিনি পাঁচ ভাগের এক ভাগ ফরয করেছেন। আর এতে এক বছর পার হওয়াও শর্ত নয়। বরং যখনই পাবে তখনই আদায় করতে হবে। আর যা এর চেয়ে একটু বেশী কষ্ট করে উপার্জন করতে হয় তাতে তিনি তার অর্ধেক তথা দশভাগের এক ভাগ ফরয করেছেন।

সেটি হচ্ছে ঐ সমস্ত ফসলের মধ্যে, যা মানুষেরা চাষ করে আর আল্লাহ্ তা'আলা তাতে পানি দান করেন। পানি সেচের বিষয়ে বান্দার কোন প্রকার কষ্ট করতে হয় না।

আর বান্দা কষ্ট করে নিজ খরচে পানি সেচ দিয়ে এবং অন্যান্য খরচ করে চাষাবাদের মাধ্যমে যে ফসল উৎপাদন করে তাতে তিনি ২০ ভাগের এক ভাগ ফরয করেছেন।

আর মালিকের বিরামহীন পরিশ্রম ছাড়া যে সম্পদ বৃদ্ধি হয়না, চাই সেই পরিশ্রম ভ্রমণের মাধ্যমে হোক বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে হোক, তাতে ৪০ ভাগের এক ভাগ ফরয করেছেন। যেমন স্বর্ণ-রোপ্য, নগদ টাকা ও ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য।

আর যেহেতু একজন ব্যক্তির হাতে যে পরিমাণ মাল থাকে তার পূর্ণটাই দান করে সহমর্মিতা প্রকাশ করা সম্ভব নয় এবং প্রত্যেক প্রকার সম্পদ দিয়েও যেহেতু তা করা অসম্ভব তাই যে সমস্ত সম্পদের মাধ্যমে সহমর্মিতা ও সহযোগিতা করা সম্ভব তাতে নির্দিষ্ট একটি নিসাব (পরিমাণ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাতে ধনীদের কোন ক্ষতি না হয় এবং গরীবদেরও উপকার হয়। সুতরাং রূপার নিসাব হচ্ছে দুইশত দিরহাম। দুই শত দিরহাম (৫৯০ গ্রাম) হলে এবং তার উপর দিয়ে এক বছর অতিক্রম করলে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে বিশ মিছকাল {(সাড়ে সাত ভরি (৮৫ গ্রাম)}। শস্যদানা ও ফলের নিসাব হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক। ছাগলের নিসাব হচ্ছে ৪০টি। গরুর নিসাব হচ্ছে ৩০টি। উটের পাঁচটি। তবে উটের এই নিসাবের অন্তর্ভূক্ত তথা উট দিয়ে যেহেতু সহমর্মিতা ও সাহায্য করা সম্ভব নয়, তাই এতে একটি ছাগল দেয়া আবশ্যক। তবে উট যখন পঁচিশটিতে উপনীত হবে তখন নিসাবের অন্তর্ভূক্ত একটি উট দিয়ে যাকাত বের করা সম্ভব। সুতরাং উট যদি পঁচিশটি হয় তাহলে দুই বছর বয়সে পদার্পনকারী একটি মাদী উট দিতে হবে। ৩৬টি হতে পয়ঁতাল্লিশটি পর্যন্ত তিন বছর বয়সে পদার্পনকারী একটি উটনী দিতে হবে। ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত ৪ বছর বয়সে পদার্পনকারী একটি উটনী দিতে হবে। ৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত চার বছর বয়স পূর্ণকারী একটি উটনী দিতে হবে। ৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত ৫ বছর পূর্ণকারী দু'টি উটনী দিতে হবে। আর উটের সংখ্যা যখন ১২০ এর বেশী হবে তখন প্রত্যেক চল্লিশটিতে দুই বছরের একটি করে বাছুর উটনী দিতে হবে।

সুতরাং পবিত্র শরীয়ত মালদার ও ফকীর-মিসকীন উভয় শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের প্রতিই খেয়াল রেখেছে। যাতে ধনীদের কোন ক্ষতি না হয় এবং গরীবদেরও সহযোগিতা হয় এই দিকটির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তা না করা হলে উভয় শ্রেনীর লোকের পক্ষ হতে জুলুমের আশঙ্কা ছিল। ধনী লোকের উপর সাধ্যাতিত কিছু ওয়াজিব করলে তা না দিয়ে তারা জুলুম করত আর যাকাত উসুলকারীরাও তাদের প্রাপ্যের অধিক দাবী করেও জুলুম করত। আর উভয় শ্রেণীর লোকদের জুলুমের ক্ষতিকর ফলাফল গরীবদেরকেই ভোগ করতে হত।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই যাকাত বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন এবং আট শ্রেণীর লোকদের মাঝে তা ভাগ করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর লোককে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) এক প্রকার লোক হচ্ছে যারা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যাকাত গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তারা অভাবের প্রকটতা বা দুর্বলতা এবং আধিক্যতা বা স্বল্পতা অনুপাতে যাকাত থেকে গ্রহণ করতে পারে। তারা হল ফকীর, মিসকীন, ক্রীতদাস এবং মুসাফির।

(খ) অন্য এক প্রকার লোক হচ্ছে, যারা মুসলিমদের উপকারার্থে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং যাকাত উসুলকারী কর্মচারী/কর্মকর্তাদের, যাদের অন্তর জয় করা সম্ভব তাদের জন্যে, ঋণ

পরিশোধ করে পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক করার জন্য এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য যাকাতের মাল ব্যয় করা জায়েয আছে। আর যাকাত গ্রহণকারী যদি অভাবী না হয় এবং যে খাতে যাকাত ব্যয় করাতে মুসলিমদেরও কোন উপকার নেই। তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়।

নাবী ﷺ এর যাকাত বণ্টন করার পদ্ধতি

তিনি যদি কোন লোকের অবস্থা থেকে জানতে পারতেন যে সে যাকাতের হকদার তাহলে তিনি তাকে যাকাত থেকে দান করতেন। আর এমন কোন লোক যদি যাকাতের মাল চাইত যার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় নি যে সে যাকাতের হকদার কি না, তাহলে তাকেও তিনি দিতেন। তবে এরূপ ক্ষেত্রে তিনি বলে দিতেন যে, ধনী এবং উপার্জন সক্ষম শক্তিশালী যুবকের জন্য যাকাতের কোন অংশ নেই। তাঁর পবিত্র সুন্নাত এই ছিল যে, যেই এলাকার ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করা হত সেই এলাকার হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত। বন্টনের পর যা অতিরিক্ত হত তা তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হত। তিনি তা বণ্টন করতেন। এ জন্যই তিনি যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদেরকে গ্রামাঞ্চলে পাঠাতেন; শহরে পাঠাতেন না। বরং মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ইয়ামানের ধনী লোকদের থেকে যাকাত আদায় করে সেখানকার ফকীরদের মধ্যে বিতরণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি চতুস্পদ জন্তু, শস্যদানা এবং ফলের মধ্য থেকে কেবল প্রকাশ্য মালের মালিকদের নিকটেই কর্মচারীদেরকে পাঠাতেন। তিনি খেজুর ও আঙ্গুরের মালিকদের কাছে কেবল অনুমানে পারদর্শী লোকদেরকেই পাঠাতেন। তারা খেজুরের বাগানের মালিকের খেজুর এবং আঙ্গুরের বাগানের মালিকের আঙ্গুর অনুমান করে যাকাত নির্ধারণ করতেন। তারা অনুমান করে দেখত বাগানে কত ওয়াস্ক ফল হতে পারে। সেই অনুপাতে তারা যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করত।

তিনি অনুমানকারীদেরকে আদেশ দিতেন তারা যেন বাগানের এক তৃতীয়াংশের খেজুর অনুমান না করেই ছেড়ে দেয়। কারণ খেজুরের বাগান বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতি থেকে নিরাপদ নয়। অনুমান করার কারণ এই যে, যাতে বাগান থেকে ফল উঠানো এবং তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলার আগেই জানতে পারা যায় যে তাতে কি পরিমাণ যাকাত আবশ্যক ছিল। ফল গাছে থাকতেই অনুমান করার আরেকটি লাভ হল তাতে বাগানের মালিক পরে ইচ্ছামত তার বাগানের ফলে হস্তক্ষেপ করতে পারবে এবং ফল উঠানোর সময় যাকাত উসুলকারীদের অপেক্ষায় থাকতে হবে না।

ঘোড়ার যাকাত আদায় করা তাঁর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা। এমনিভাবে ক্রীতদাস, খচ্চর, গাধা, শাক-সব্জি, তরমুজ এবং ঐ সমস্ত ফলের উপরও যাকাত নির্ধারণ করেন নি, যা ওজন করা হয়না ও গোদামজাত করে দীর্ঘ দিন রাখা যায়না। তবে আঙ্গুর ও কাঁচা খেজুরের কথা ভিন্ন। তিনি কাঁচা খেজুর ও শুকনো খেজুরের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। কোন লোক যাকাতের মাল নিয়ে আসলে রসূল ﷺ তার জন্য দু'আ করতেন। কখনও তিনি বলতেন-

«اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِيْ إِبِلِهِ»

"হে আল্লাহ! তুমি তাঁর মধ্যে এবং তাঁর উটের মধ্যে বরকত দান করো"।[১১১]

আবার কখনও তিনি বলতে-«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ»"হে আল্লাহ! তুমি তাঁর উপর রহমত নাযিল করো"।[১১২]

শুধু ভাল সম্পদগুলো বাছাই করে নিয়ে নেওয়া তাঁর নিয়ম ছিলনা। বরং মধ্যম মানের সম্পদগুলো গ্রহণ করতেন। তিনি দানকারীকে দানের সম্পদ ক্রয় করতে নিষেধ করতেন। কোন গরীব লোককে সাদকাহ করা হলে সেই গরীব লোক যদি ধনী লোককে হাদীয়া স্বরূপ সেখান থেকে কিছু দান করে তাহলে ধনীর জন্য তা ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছেন। কখনও কখনও তিনি যাকাতের মাল থেকে ঋণ নিয়ে মুসলিমদের স্বার্থে (রাষ্ট্রীয় কাজে) ব্যয় করতেন। তিনি নিজ হাতে যাকাতের উটগুলো চিহ্নিত করতেন। প্রয়োজন পড়লে তিনি ধনীদের থেকে অগ্রীম যাকাত আদায় করতেন। যেমন তিনি তাঁর চাচা আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে দুই বছরের যাকাত অগ্রীম নিয়েছিলেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক ব্যক্তি ও তার প্রতিপালনাধীন ছোট-বড় সকলের উপর ফিতরা ফরয করেছেন। এর পরিমাণ হচ্ছে এক 'সা'। চাই তা খেজুর হোক কিংবা যব হোক বা পনির কিংবা কিসমিস হোক। এক সা আটার কথাও তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় উপরোক্ত বস্তুগুলোর এক সা-এর বদলে গমের অর্ধ 'সা' দেয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। সুনানে আবু দাউদে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।[১১৩] বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় আমীর মুআবীয়াই মূল্যের দিকে খেয়াল রেখে আধা 'সা' পরিমাণ ফিতরা দেয়ার ফায়সালা দিয়েছেন।

ঈদের সলাতের পূর্বেই ফিতরা আদায় করা তাঁর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের সলাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই ফিতরা আদায় করার আদেশ করেছেন।

সুনানের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈদের সলাতের পূর্বে ফিতরা আদায় করবে তা ফিতরা হিসাবে আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতের পরে আদায় করবে তা সাধারণ সাদকাহ হিসাবে গণ্য হবে।

উপরোক্ত উভয় হাদীছের দাবী হচ্ছে ঈদের সলাতের পরে সাদকায়ে ফিতরা আদায় করলে তা জায়েয হবে না। ঈদের সলাত আদায়ের সাথে সাথেই এর সময় শেষ হয়ে যায়। এটিই সঠিক অভিমত। এটি ঈদুল আযহার দিন কুরবানীর পশু যবেহ করার মতই। ঈদুল আযহার সলাতের পূর্বে কুরবানীর পশু যবেহ করলে তা কুরবানী হিসাবে কবুল হবেনা। সলাতের সময় হলেই যবেহ করা যাবেনা। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈদের সলাতের পূর্বেই কুরবানীর পশু যবেহ করবে তা গোশত খাওয়ার যবেহ হিসাবে গণ্য হবে।

---

১১১. সুনানু নাসাঈ , মাপ্র. হা/২৪৫৮, সহীহ

১১২. বুখারী, তাও. হা/৬৩৫৯,

১১৩. আধা 'সা' ফিতরা দেয়ার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে তার সবই কোন কোন সাহাবীর ইজতেহাদ মাত্র। এ ব্যাপারে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন সহীহ মারফু হাদীছ নেই। (অনুবাদক)

নাবী ﷺ এর পবিত্র সুন্নাত ছিল যে, তিনি কেবল ফকীর- মিসকীনদেরকেই সাদকায়ে ফিতর দান করতেন। আট প্রকারের খাতের মধ্য হতে তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে তিনি তা থেকে দান করতেন না। তাঁর পরে সাহাবী ও তাবেয়ীগণও তা করেননি।

নফল সাদকার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর সুন্নাত

তিনি লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। সাদকাহ ও দানের ক্ষেত্রে তাঁর পবিত্র সুন্নাত ছিল যে, তাঁর কাছে কোন সম্পদ আসলে সাথে সাথে তা দান করে দিতেন, নিজের কাছে রেখে দিতেন না। কেউ তাঁর কাছে কোন কিছু চাইলে তা যদি তাঁর কাছে থাকত, তাহলে তিনি তা দান করতেন। কম হোক বা বেশী হোক। তাঁর কাছ থেকে দান গ্রহণকারী কিছু পেয়ে যতটা খুশী না হতেন দান করতে পেরে তিনি তার চেয়ে অধিক খুশী হতেন। কোন অভাবী লোক তাঁর কাছে আসলে তিনি সেই অভাবীকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। কখনও তিনি নিজের খাদ্য, আবার কখনও নিজের পরিধেয় বস্ত্র অভাবীকে দিয়ে দিতেন।

তিনি বিভিন্ন প্রকারের দান করতেন। কখনও তিনি হাদীয়া স্বরূপ দান করতেন, কখনও সাদকাহ করতেন আবার কখনও হিবাহ (দান) করতেন। কখনও তিনি কোন জিনিষ ক্রয় করতেন। অতঃপর বিক্রেতাকে ক্রয়কৃত দ্রব্য ও মূল্য উভয়ই দিয়ে দিতেন। কখনও তিনি ঋণ নিতেন এবং পরিশোধের সময় তার চেয়ে বেশী দান করতেন। তিনি যখন হাদীয়া গ্রহণ করতেন তখন কোন না কোনভাবে তার বদলা দিতেন। তিনি কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে, দানের মাধ্যমে এবং সকল প্রকার লেনদেন ও আচরণের মাধ্যমে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করতেন। কখনও তিনি নিজ থেকে দান করতেন। আবার কখনও অপরকে সাদকাহ করার আদেশ দিতেন এবং উৎসাহ দিতেন। কৃপণ লোকেরা দানের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা দেখে দান করার প্রতি উৎসাহ পেত। তাঁর সাথে যারা মিশতেন তারাও বদান্যতার গুণে গুণান্বিত হতেন। তাঁর বক্ষ খুব প্রশস্ত ছিল, স্বভাব-চরিত্র খুব পবিত্র ছিল।

বক্ষ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে দান-সাদকাহ ও সদাচরণের বিরাট প্রভাব রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা রিসালাত ও তার বৈশিষ্টের মাধ্যমেও তাঁর বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বক্ষকে খুলে তা থেকে শয়তানের অংশ বের করে দিয়েছেন।

তাওহীদ বান্দার অন্তর প্রশস্ত করার অন্যতম মাধ্যম

তাওহীদের বিশ্বাসই অন্তর প্রশস্ত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। বান্দার তাওহীদ যত মজবুত ও পরিপূর্ণ হবে তার বক্ষও তত প্রশস্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

“আল্লাহ্ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে,(সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়) যাদের অন্তর আল্লাহ্ও স্মরনের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। (সূরা যুমার:২২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

“অতঃপর আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে অত্যাধিক সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেনা, আল্লাহ্ তাদের ওপর আযাব বর্ষণ করেন”।[১১৪]

বক্ষ প্রশস্ত হওয়ার আরেকটি মাধ্যম হল সেই নূর, যা আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দার অন্তরে ঢেলে দেন। আর সেটি হচ্ছে ঈমানের নূর (আলো)। সুনানে তিরমিযীতে মারফু সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, ঈমানের আলো যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন অন্তর প্রশস্ত হয় ও তা খুলে যায়।

অন্তর প্রশস্ত হওয়ার আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে ইল্ম (জ্ঞান)। ইলমের মাধ্যমে হৃদয় খুলে যায় এবং উহা প্রশস্ত হয়। তবে সকল প্রকার ইলমের মাধ্যমেই তা হয়না। বরং রসূল ﷺ থেকে যে ইলম (নবুওয়াত ও রেসালাতের জ্ঞান) এসেছে তার মাধ্যমেই হৃদয় প্রশস্ত হয়।

অন্তর প্রশস্ত হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং হৃদয় দিয়ে আল্লাহকে ভালবাসা। হৃদয় উন্মুক্ত হওয়া ও আত্মা পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি ভালবাসার বিরাট প্রভাব রয়েছে। আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালবাসা যতই মজবুত হবে অন্তর ততই প্রশস্ত হবে। পাপ ও গর্হিত কাজ দেখলে এবং তাতে লিপ্ত হলে অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়।

সর্বদা আল্লাহর যিকির করা, সৃষ্টির প্রতি দয়া করা, জান ও মাল দিয়ে মানুষের উপকার করা অন্তর প্রশস্ত হওয়ার বিরাট একটি মাধ্যম। বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন অন্তর প্রশস্ত হওয়ার লক্ষণ। কেননা বাহাদুর ব্যক্তিগণ প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী হয়ে থাকেন। আর কৃপণ, কাপুরুষ, আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ, দ্বীনে ইলাহী সম্পর্কে অজ্ঞ ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে অন্তরকে যুক্তকারীগণ হৃদয় প্রশস্ত হওয়ার স্বাদ উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়। কোন কারণ বশত এ সমস্ত লোকের অন্তর উন্মুক্ত হওয়া বা সংকোচিত হওয়া মূল্যায়নযোগ্য নয়। কেননা কারণ চলে যাওয়ার সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যায়। মূলত যেই গুণাবলী অন্তরে স্থায়ী হলে অন্তর প্রশস্ত হয় কিংবা সংকোচিত হয়, তাই দেখার বিষয়। এটিই হচ্ছে প্রকৃত মানদন্ড।

অন্তর প্রশস্ত হওয়ার উপরোক্ত সকল গুণাবলী থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট বড় মাধ্যম হচ্ছে সে সকল নিকৃষ্ট গুণাবলী অন্তর থেকে বের করে দেয়া, যা অন্তরকে নষ্ট করে দেয়।

অতিরিক্ত ও অর্থহীন কথা-বার্তা, অন্যায় দৃষ্টি, গান-বাজনা শ্রবণ, নারী-পুরুষের অবৈধ মেলা-মেশা, অধিক আহার এবং মাত্রাতিরিক্ত ঘুম বর্জন করাও হৃদয় প্রশস্ত হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

---

১১৪. সূরা আনআম-৬: ১২৫

সিয়াম তথা সিয়াম রাখার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর হিদায়াত

সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য হল কুপ্রবৃত্তির চাহিদা থেকে আত্মাকে রক্ষা করা। যাতে সে পরিপূর্ণ শান্তি ও সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, ক্ষুধা ও পিপাসা যেন নফসের চাহিদাকে কমিয়ে দেয়, ফকীর-মিসকীনদের ক্ষুধার্ত থাকার জ্বালা যেন অনুভব করে, এবং বান্দা পানাহার কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে যেন শরীরের রগে রগে শয়তানের চলাচলের পথকে সংকীর্ণ করতে পারে। সুতরাং সিয়াম হচ্ছে মুত্তাকীদের লাগাম (পাপ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার হাতিয়ার), মুজাহিদদের ঢাল (পাপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার যন্ত্র) এবং সৎকর্মশীলদের অনুশীলন। বান্দার আমলসমূহ থেকে এটি কেবল আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। কেননা সায়িম আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় পানাহার ও যৌন সম্ভোগ ছেড়ে দেয়। সে আল্লাহর ভালবাসার কারণেই প্রিয় বস্তুসমূহ ত্যাগ করে । সিয়ামর মাধ্যমে আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে এক গোপন সম্পর্ক তৈরী হয়। কেননা বান্দাগণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো (পানাহার ও যৌন সম্ভোগ) ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি জানতে পারে। কিন্তু তার মাবুদের সন্তুষ্টির জন্য ছেড়ে দিয়েছে কি না, তা কোন মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এটিই হচ্ছে সিয়ামর হাকীকত (গোপন রহস্য)।

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ কাজ থেকে রক্ষায়, অপকর্মের দিকে ধাবিত হওয়া থেকে আভ্যন্তরীন শক্তিকে হেফাজতের ক্ষেত্রে এবং শরীরকে সকল খারাপ অভ্যাস থেকে পবিত্র করতে সিয়ামর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এটি হচ্ছে তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে করে তোমারা আল্লাহ ভীরু (মুত্তাকী) হতে পার।"[১১৫]

যে ব্যক্তির যৌন চাহিদা খুব প্রবল তাকে তিনি বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন। আর যার যৌন চাহিদা আছে, কিন্তু সে আর্থিকভাবে সক্ষম নয়, তাকে তিনি সিয়াম রাখার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- সিয়াম শাহওয়াত তথা অতিরিক্ত যৌন ক্ষুধা ও চাহিদাকে কমিয়ে ফেলে।

সিয়ামর ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত হচ্ছে সবচেয়ে অধিক সুন্দর ও পরিপূর্ণ একটি সুন্নাত এবং জান্নাত অর্জনের সবচেয়ে বড় একটি মাধ্যম। তা পালন করাও খুব সহজ। আর নফসের চাহিদা ও দাবী থেকে বিরত থাকা যেহেতু খুব কঠিন, তাই হিজরতের পর তথা বিলম্বে এটিকে ফরয করা হয়েছে। প্রথমে সিয়াম রাখা বা না রাখার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। কেউ রোযা না রাখতে চাইলে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করত। পরবর্তীতে এ আদেশ রহিত করে তা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। সিয়াম রাখার শক্তি না রাখলে তিনি শাইখে কাবীর তথা অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার উপর সিয়াম রাখার পরিবর্তে খাদ্য দান করাকে আবশ্যক করেছেন। অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য সিয়াম ভাঙ্গার অনুমতি দিয়েছেন। তারা পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া সিয়ামগুলো সমান সংখ্যায় কাযা করে নিবে। গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মহিলাগণ যদি নিজেদের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশঙ্কা করে, তাহলে তাদের জন্যও সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয।

---

১১৫. সূরা আল-বাকারা-০২:১৮৩

তারা পরবর্তীতে কাযা করে নিবে। আর এই শ্রেণীর মহিলাগণ যদি নিজেদের সন্তানের ক্ষতির ভয় করে তাহলে সিয়াম ছাড়তে পারে। তবে তারা কাযা করার সাথে সাথে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। কেননা তারা অসুস্থতার আশঙ্কায় সিয়াম ভঙ্গ করে নি; বরং তারা স্বাস্থ্য ভাল থাকা সত্ত্বেও তা ভঙ্গ করেছে। সুতরাং মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করার মাধ্যমে সেই ক্ষতি পূর্ণ করবে। আর এটি ইসলামের প্রথম যুগে সুস্থ ব্যক্তির সিয়াম ভঙ্গ করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করার মতই।

নাবী ﷺ রমযান মাসে বেশী পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। জিবরীল ফিরিস্তা রমযান মাসে তাকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। এই মাসে তিনি প্রচুর সাদকাহ করতেন, মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করতেন, বেশী করে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, অধিক পরিমাণ সলাত আদায় করতেন, যিকিরে মশগুল থাকতেন এবং ইতেকাফ করতেন।

তিনি রমযান মাসে যত ইবাদত করতেন তার তুলনায় অন্য মাসে তা করতেন না। তাতে তিনি কখনও পানাহার ছেড়ে দিয়ে দিনরাত ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু তাঁর সাহাবীদেরকে তিনি এভাবে পানাহার ছেড়ে দিয়ে ইবাদতে মশগুল থাকতে নিষেধ করেছেন।

তাঁকে যখন বলা হল আপনিও তো পানাহার ছেড়ে দিয়ে একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থাকেন তখন তিনি বললেন- আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমার প্রভু আমাকে পানাহার করান।[১১৬]

রমযান মাসের আগমন ও সিয়ামের বিভিন্ন আহকাম

নাবী ﷺ এর পবিত্র সুন্নাত ছিল যে, চাঁদ উঠার খবরটি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা কমপক্ষে এক জনের সাক্ষীর উপর ভিত্তি না করে রমযান মাসের সিয়াম রাখা শুরু করতেন না। নিজে চাঁদ না দেখলে কিংবা কোন সাক্ষী পাওয়া না গেলে শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করতে হবে। শাবান মাসের ২৯তম রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে যদি চাঁদ দেখা না যেত, তাহলে তিনি শাবান মাসকে ত্রিশ দিনের মাধ্যমে পূর্ণ করতেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে অর্থাৎ সন্দেহের দিনে তিনি সিয়াম রাখতেন না এবং সাহাবীদেরকে সিয়াম রাখার আদেশও দিতেন না; বরং শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করতে বলেছেন। আর এটি নাবী ﷺ এর বাণীঃ

«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা অনুমান করে নাও-এর বিরোধী নয়।[১১৭] কেননা এখানেও অনুমান করে ত্রিশ দিন নির্ধারিত করতে বলা হয়েছে।

রমযান মাসের আগমণ ও চাঁদ উঠা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হলেও রমযান মাসের পরিসমাপ্তি প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুই জনের সাক্ষ্য দেয়া জরুরী। ঈদের সলাতের সময়

১১৬. বুখারী, অধ্যায়ঃ সিয়াম।
১১৭. বুখারী, তাও. হা/১৯০০, আবু দাউদ, আলএ. হা/২৩২০, ইবনে মাজাহ, তাও. হা/১৬৫৪

চলে যাওয়ার পরও যদি দুইজন লোক সাক্ষ্য দিত তাহলে তিনি রোযা ছেড়ে দিয়ে খেয়ে নেয়ার আদেশ দিতেন। তবে পরের দিন ঈদের সলাতের সময়েই তা আদায় করতেন।

তিনি সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপরই দ্রুত ইফতার করতেন এবং এর উপরই লোকদেরকে উৎসাহ দিতেন। তিনি সেহরী খেতেন এবং সেহরী খাওয়ার প্রতি সকলকে উৎসাহ দিতেন। তিনি বিলম্বে সেহরী খেতেন এবং বিলম্বে খাওয়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন। তিনি খেজুর দিয়ে ইফতার করার জন্য উৎসাহ দিতেন। তা পাওয়া না গেলে পানি দ্বারা ইফতার করতে বলতেন।

নাবী ﷺ সায়িমকে স্ত্রী সহবাস, শোরগোল, কাউকে গালি দেয়া, গালির জবাবে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। কেউ গালি দিলে গালি প্রদত্ত ব্যক্তিকে এ কথা বলতে বলেছেন যে, আমি সায়িম।

সফর অবস্থায় সিয়াম রাখা

তিনি রমযান মাসে ভ্রমণ করেছেন। সফর অবস্থায় তিনি কখনও সিয়াম রেখেছেন আবার কখনও সিয়াম ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি সাহাবীদেরকে সফর অবস্থায় উভয়টির যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। শত্রুদের নিকটবর্তী হলে মুজাহিদদেরকে সিয়াম ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিতেন।[১১৮] কতটুকু রাস্তা ভ্রমণ করলে মুসাফিরের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয তার কোন নির্ধারিত সীমা রেখা তিনি নির্ধারণ করে দেন নি। সাহাবীগণ যখন সফর শুরু করতেন তখন সিয়াম ছেড়ে দিতেন। নিজেদের ঘরবাড়ি চোখের আড়ালে পড়া বা না পড়ার বিষয়টিকে মূল্যায়ন করতেন না। তারা বলতেন যে, এটিই ছিল রসূল ﷺ এর সুন্নাত।

স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করার পূর্বেই ফজরের সময় হয়ে গেলে

স্ত্রী সহবাস করে অপবিত্র হওয়ার পর গোসল করার আগেই ফজরের সময় হয়ে যেত। অতঃপর তিনি ফজর হয়ে যাওয়ার পর গোসল করতেন এবং সিয়াম রাখতেন।

সিয়াম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা

তিনি রমযান মাসের দিনের বেলায় সিয়াম অবস্থায় তাঁর কতক স্ত্রীকে চুম্বন করতেন। তিনি সায়িম ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রীকে চুম্মন করার বিষয়টিকে মুখে পানি নিয়ে কুলি করার সাথে তুলনা করেছেন। স্ত্রীকে চুম্বন করার ক্ষেত্রে তিনি যুবক ও বৃদ্ধের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। অর্থাৎ উভয়ের জন্যই তা জায়েয।

ভুলক্রমে সায়িম ব্যক্তি দিনের বেলা পানাহার করে ফেললে তিনি কাযা করতে বলেন নি। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।[১১৯]

---

১১৮. বিদ্বানদের নিকট সফরে স্বাভাবিক অবস্থায় সিয়াম রাখা না রাখা উভয়ই সমান। তবে কষ্টকর হলে সিয়াম ভাঙ্গা ভাল আর কষ্টকর না হলে সিয়াম রাখাই ভাল।

১১৯. তবে শর্ত হল স্মরণ হওয়ার পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত পানাহার থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

যে সমস্ত কারণে সিয়াম ভেঙে যায়

যে সমস্ত কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় তার মধ্যে রয়েছে,

- ১. ইচ্ছাকৃত পানাহার করা।
- ২. শিঙ্গা লাগানো।
- ৩. ইচ্ছাকৃত বমি করা।
- ৪. স্ত্রী সহবাস করা। স্ত্রী সহবাস করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি কুরআনেই উল্লেখ আছে। চোখে সুরমা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হবেনা।

নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করতেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- নাবী ﷺ সিয়াম অবস্থায় মাথায় পানি ঢালতেন, নাকে পানি দিতেন এবং কুলি করতেন। তবে তিনি নাকে অতিরিক্ত পরিমাণ পানি ঢুকাতে নিষেধ করেছেন। সিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানোর বিষয়টি সহীহ সূত্রে তার থেকে বর্ণিত হয় নি।[120]

ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- এক বর্ণনায় এসেছে, সায়িম চোখে সুরমা লাগানো থেকে বিরত থাকবে। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে এই বর্ণনাটি সহীহ নয়। ইবনে মাঈন বলেন- হাদীসটি মুনকার (যঈফ)।

নফল সিয়াম রাখার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর সুন্নাত

তিনি একাধারে এত বেশী নফল সিয়াম রাখতেন, যাতে বলা হত, তিনি আর কখনও সিয়াম ছাড়বেন না। আর যখন সিয়াম রাখা ছেড়ে দিতেন, তখন এমন বলা হত যে তিনি আর নফল সিয়াম রাখবেনই না। রমযান মাস ব্যতীত তিনি আর কোন পূর্ণমাস সিয়াম রাখেন নি। তিনি শাবান মাসের চেয়ে অধিক নফল সিয়াম অন্য কোন মাসে রাখেন নি। এ ছাড়া এমন কোন মাস তিনি পার করেন নি, যাতে তিনি নফল সিয়াম রাখেন নি। তিনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন নফল সিয়ামর প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- রসূল ﷺ আইয়্যামে বীযের (প্রতি মাসের

---

১২০. সিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হবে কি না? এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও পরবর্তী যামানার কতিপয় আলেমের মতে সিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাদের দলীল হচ্ছে أفطر الحاجم والمحجوم। অর্থাৎ যে শিঙ্গা লাগিয়ে দিল এবং যাকে লাগানো হল তাদের উভয়েরই সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে শিংগা লাগালে সিয়ামর কোন ক্ষতি হবেনা। এটিই ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মত। আল্লামা আব্দুল আযীব বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেনঃ রাত পর্যন্ত দেরী করে শিংগা লাগানোই উত্তম অর্থাৎ সিঙ্গা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হবেনা। তাদের দলীল হচ্ছে, «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ সিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন"। (বুখারী তাও. হা/১৯৩৮, ও মুসলিম)। প্রথম দলের দলীলের জবাবে আলেমগণ বলেনঃ শিংগা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে বলে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তা রহিত হয়ে গেছে। দেখুনঃ ফাতহুল বারী (৪/১৫৫)। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী ﷺ সিয়ামদারকে শিংগা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা কোন জিনিস নিষিদ্ধ হওয়ার পরই তা করার অনুমতি দেয়া হয়। সুতরাং এটিই প্রমাণ করে যে, শিঙ্গা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার হুকুম মানসুখ তথা রহিত হয়ে গেছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের) সিয়াম কখনই ছাড়েন নি। তিনি এই তিন দিন সিয়াম রাখার প্রতি উৎসাহও দিতেন। ইমাম নাসাঈ এরূপই বর্ণনা করেছেন। যুল-হাজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন সিয়াম রাখার ব্যাপারে নাবী ﷺ থেকে মতভেদ রয়েছে।[১২১] শাওয়াল মাসের ছয় সিয়াম সম্পর্কে সহীহ সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- শাওয়ালের ছয় সিয়াম রামাযানের সিয়ামর সাথে এক বছরের সিয়ামর সমান। আশুরার সিয়াম সম্পর্কে কথা হচ্ছে তিনি সকল নফল সিয়ামর মধ্যে আশুরার সিয়ামর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। তিনি যখন মদীনায় আসলেন তখন দেখলেন ইহুদীরা আশুরার সিয়াম রাখছে। তিনি এই দিনের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল- এ দিন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরাউন ও তার বাহিনীকে ধ্বংস করেছেন এবং মুসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর সাথীদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। তখন তিনি বললেন- আমরা তোমাদের চেয়ে মুসার অনুসরণ করার অধিক হকদার। সুতরাং তিনি সিয়াম রেখেছেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকেও সিয়াম রাখার আদেশ দিয়েছেন। আর এটি ছিল রামাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বের ঘটনা। যখন রামাযানের সিয়াম ফরয করা হল তখন তিনি বললেন- যার মন চায় সে যেন এই দিন সিয়াম রাখে আর যার মন চায়না সে যেন না রাখে। আরাফার দিন আরাফায় অবস্থান কালে রোযা রাখা তাঁর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে সহীহ সূত্রে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে (হাজীদেরকে) আরাফা দিবসে সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। তাঁর থেকে সহীহ সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

আরাফা দিবসের সিয়াম পূর্বের ও পরের এক বছরের গুনাহ্ সমূহকে মোচন করে দেয়।[১২২] সারা বছর একটানা সিয়াম রাখা নাবী ﷺ এর সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা। তিনি বলেন- যে ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখল সে মূলতঃ সিয়াম রাখেও নি এবং সিয়াম ছাড়েও নি; বরং সে রসূল ﷺ এর পবিত্র সুন্নাতের বিরোধীতা করেছে। তিনি অধিকাংশ সময় সকাল বেলা ঘরে প্রবেশ করে স্ত্রীদের কাছে জিজ্ঞেস করতেনঃ তোমাদের কাছে খাবার কিছু আছে কি? না সূচক উত্তর আসলে তিনি বলতেন- তাহলে আমি সিয়াম রেখে দিলাম। তিনি কখনও নফল সিয়ামর নিয়ত করতেন। অতঃপর তা ছেড়ে দিতেন।

---

১২১. যুল হজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেনঃ "জিল হজ্জ মাসের প্রথম দশকের চেয়ে উত্তম এমন কোন দিন নেই, যে দিনগুলোর সৎ আমল আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়"। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ﷺ আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? রসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। অবশ্য সেই মুজাহিদ ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে স্বীয় জান-মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়ে পড়ে। অতঃপর উহার কিছুই নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেনা। (বুখারী)

সুতরাং এই দিনগুলোতে নফল ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। নাবী ﷺ নির্দিষ্ট কোন আমলকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নি। এতে বুঝা যায় যুল হাজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন সিয়াম রাখাও মুস্তাহাব। আলেমদের থেকে এ ধরণের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

তবে নাবী ﷺ থেকে প্রথম দশকে সিয়াম রাখার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন- নাবী ﷺ এই দশ দিন সিয়াম রাখেন নি। অপর পক্ষে হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর বর্ণনায় সিয়াম রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীছ সনদের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী। তা ছাড়া নাবী ﷺ থেকে এই নয় দিন সিয়াম রাখার ব্যাপারে আলাদাভাবে সহীহ কোন হাদীছ না থাকলেও তাতে সিয়াম রাখা মুস্তাহাব হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা সাধারণ ভাবে তাতে নফল ইবাদতের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আর সিয়াম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নফল ইবাদত। (আল্লাহই ভাল জানেন)

১২২. মুসলিম মাশ হা/২৮০৩, আবু দাউদ, আলএ. হা/২৪২৫ নাসায়ী, মাপ্র. হা/,সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র.৭৪৯

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে হাদীছে তিনি আয়িশা ও হাফসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেছেন যে, তোমরা নফল সিয়ামর কাযা কর, তা মালুল তথা যঈফ হাদীস।

সিয়াম অবস্থায় কোন কোন গোত্রের কাছে গেলে তিনি সিয়াম পূর্ণ করতেন। যেমনটি তিনি করেছিলেন উম্মে সুলাইমের কাছে প্রবেশ করার সময়। উম্মে সুলাইম তাঁর আহলে বাইতের (পরিবারের) পদমর্যাদায় ছিলেন। সহীহ বুখারীতে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন- তোমাদের কাউকে যখন খানা গ্রহণ করার জন্য ডাকা হয় এবং যাকে ডাকা হল সে যদি সায়িম হয় তখন সে যেন বলে আমি সায়িম। তার পবিত্র সুন্নাতে নির্দিষ্ট করে জুমআর দিন সিয়াম রাখাকে মাকরূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতেকাফের ক্ষেত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত

আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা এবং তাঁর দিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন ব্যতীত অন্তরের সংশোধন এবং আল্লাহর পছন্দনীয় পথে চলা সম্ভব নয়। আর আল্লাহর দিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন ব্যতীত অন্তরের প্রশান্তি লাভ করা যায়না।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানাহার, মানুষের সাথে অধিক মেলামেশা, অতিরিক্ত ঘুম এবং বেশী কথা বলা মানুষের অন্তরে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাতে পেরেশানী বৃদ্ধি করে, আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের পথে চলতে ব্যঘাত সৃষ্টি করে অথবা তার সামনে সেই পথকে বন্ধ করে দেয়। তাই মহা পরাক্রমশালী দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য সিয়ামর মাধ্যমে এমন বিধান শরীয়ত ভুক্ত করেছেন যা তাদেরকে অতিরিক্ত পানাহার থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অতিরিক্ত শাহ্ওয়াত (যৌন চাহিদা) থেকে মন ও মগজকে পবিত্র রাখবে। সিয়াম থেকে তিনি (আল্লাহ্) সেই পরিমাণ ফরয ও নির্ধারণ করেছেন, যা কাঙ্খিত লক্ষ-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য যথেষ্ট এবং বান্দা তার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হবে এবং তা পালন করলে তাদের কোন ক্ষতিও হবেনা। রমযান মাসের শেষের দিকে ইতেকাফ করাকে শরীয়তভুক্ত করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মাখলুক (সৃষ্টি) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্তরকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর আটকিয়ে রাখা এবং একমাত্র তাঁর দিকেই একাকী মনোনিবেশ করা।

এই একাকিত্বের মাধ্যমে বান্দা সৃষ্টির সাথে সখ্যতা ও সম্পর্ক গড়ে তোলার পরিবর্তে মহান আল্লাহর সাথে একান্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এই সম্পর্ক তাকে কবরে একা থাকার জন্য প্রস্তুত করে তুলবে।

সিয়াম রাখার মাধ্যমে যেহেতু উপরোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়, তাই সিয়ামের শ্রেষ্ঠতম দিনসমূহে তথা রামাযানের শেষ দশকে ইতেকাফ করা ইসলামী শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কেবল সিয়ামর সাথেই ইতেকাফের কথা উল্লেখ করেছেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিয়াম ব্যতীত কখনও ইতেকাফ করেন নি।

অতিরিক্ত কথা বলা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা হল আখিরাতে যে সমস্ত কথা কোন উপকারে আসবেনা, তা থেকে জবানকে হেফাজত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ঘুম সম্পর্কে কথা হচ্ছে রাতে অযথা জেগে থাকার চেয়ে তাহাজ্জুদ সলাত পড়াকে উত্তম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিণামের দিক থেকে এটিই উত্তম। রাতে সেই পরিমাণ তাহাজ্জুদ পড়ার কথা বলা হয়েছে, যা শরীর ও 'রূহের জন্য উপকারী এবং বান্দার দুনিয়াবী স্বাভাবিক কাজ কর্মের পথেও ব্যঘাত সৃষ্টি করেনা।

এই চারটি তথা কম খাওয়া, মানুষের সাথে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেলামেশা না করা, কম ঘুমানো এবং কম কথা বলা সালফে সালেহীন তথা পূর্ব যামানার সৎকর্মশীল লোকদের আমল ছিল। যারা নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর পথ অনুসরণ করেছেন তারাই এই কাজগুলো করার মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হয়েছেন। তারা বাড়াবাড়ি কারীদের ন্যায় গোমরাহ হয়ে যান নি এবং অলসতাকারীদের ন্যায় ত্রুটিও করেন নি। সিয়াম, কিয়ামুল্লাইল এবং কথা বলার ক্ষেত্রে রসূল ﷺ এর হিদায়াতের বিবরণ পেশ করলাম। এবার ইতেকাফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

নাবী ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত রামাযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করেছেন। একবার তিনি তা ছেড়ে দিয়ে শাওয়াল মাসে কাযা করেছেন। লাইলাতুল কদর অর্জন করার জন্য তিনি একবার প্রথম দশকে, একবার মাঝের দশকে, আরেকবার শেষ দশকে ইতেকাফ করেছেন। অতঃপর যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, লাইলাতুল কদর রামাযানের শেষ দশকেই তখন থেকে তিনি তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছা পর্যন্ত শেষ দশকেই ইতেকাফ করেছেন এবং তাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করেছেন। তাঁর আদেশক্রমে মাসজিদে ছোট একটি তাঁবু টানানো হত। তাতে তিনি তাঁর মহান প্রভুর জন্য নির্জনে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি ইতেকাফের ইচ্ছা করলে ফজরের সলাতের পর ইতেকাফের স্থলে প্রবেশ করতেন। একবার তাঁর জন্য তাঁবু টানানোর আদেশ করা হলে তা টানানো হল। তাঁর অনুসরণ করে তাঁর স্ত্রীগণও নিজ নিজ তাঁবু টানিয়ে ফেলল। তিনি ফজরের সলাত পড়ে সেই তাঁবুগুলো দেখে (ক্রোধান্বিত হয়ে) তাঁর তাঁবু উঠিয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। সেই বছর রমযান মাসে তিনি ইতেকাফ করা বাদ দিলেন এবং শাওয়াল মাসের প্রথম দশকে ইতেকাফ করলেন।

তিনি প্রত্যেক বছর দশ দিন ইতেকাফ করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন সেই বছর তিনি বিশ দিন ইতেকাফ করেছেন। প্রত্যেক বছর জিবরীল ফিরিস্তা তাঁকে সম্পূর্ণ কুরআন একবার পাঠ করে শুনাতেন। যে বছর তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন সেই বছর দুইবার পাঠ করে শুনিয়েছেন। এমনিভাবে তাঁর উপর প্রত্যেক বছর একবার কুরআন পেশ করা হত। মৃত্যুর বছর তাঁর উপর দুইবার পেশ করা হয়েছিল।

তিনি একাকী ইতেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন এবং বিনা প্রয়োজনে নিজ ঘরে প্রবেশ করতেন না। মাসজিদের জানালা দিয়ে তিনি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে মাথা প্রবেশ করিয়ে দিতেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর মাথায় চিরুনী করে দিতেন। অথচ তিনি ছিলেন ঋতুবতী।

ইতেকাফের স্থানে তাঁর কতক স্ত্রী তাঁকে দেখতে আসতেন। চলে যাওয়ার জন্য তাঁর সেই স্ত্রী যখন দাঁড়াতেন তখন তিনিও বিদায় দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। আর এমনটি হত রাত্রিতে। ইতেকাফে থাকা অবস্থায় তিনি স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতেন না, তাদেরকে চুম্বনও করতেন না এবং এ ধরণের অন্য কিছুই করতেন না। তাঁর ইতেকাফের স্থলে চাদর ও খাট-চৌকি স্থাপন করা হত। কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় রাস্তায় কোন রোগীর দেখা মিললে রোগীর হাল-হাকীকতও জিজ্ঞেস

করতেন। একবার তিনি তুরস্কে প্রস্তুতকৃত একটি তাঁবুতে ইতেকাফ করেছেন এবং তাঁবুর ভিতরে একটি পাটিও বিছানো হয়েছিল।

ইতেকাফের এত বিশদ আলোচনা ও হুকুম-আহকাম এ জন্যই বর্ণনা করা হল, যাতে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। আফসোসের বিষয় হল বর্তমানে লোকেরা ইতেকাফের স্থানকে গল্পের আসর এবং যিয়ারতের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছে। এই যামানার (ইবনুল কাইয়্যিমের যামানার) লোকদের ইতেকাফ ইতেকাফে মুহাম্মাদী থেকে বহু দূরে সরে এসেছে।

হাজ্জ ও উমরার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর পবিত্র সুন্নাত

তিনি হিজরতের পর চারটি উমরাহ করেছেন। বিদায় হজ্জের বছর হজ্জের সাথে যেই উমরা করেছেন তা ব্যতীত প্রত্যেকটিই ছিল যুল-কাদ মাসে।

- ১. হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি প্রথম উমরার জন্য বের হন। কিন্তু মুশরিকরা কাবা ঘর পর্যন্ত যেতে বাঁধা প্রদান করে। তাই যেখানে তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেখানেই কুরবনীর পশু জবাই করে হালাল হয়ে যান।
- ২. হুদায়বিয়ার বছর যেই উমরাটি করতে পারেন নি, তা পরের বছর কাযা করেছেন। মক্কায় প্রবেশ করে তিন দিন অবস্থান করেন এবং উমরাহ আদায় করে মক্কা থেকে বের হয়ে আসেন।
- ৩. তার সেই উমরাহ, যা তিনি বিদায় হজ্জের বছর হজ্জের সাথে মিলিয়ে আদায় করেছেন।
- ৪. 'জি-ইর্‌রানা' নামক স্থান থেকে ফেরত আসার সময় আরেকটি উমরাহ করেছেন।

একই সফরে একাধিক উমরাহ করা এবং তানঈম থেকে ইহরাম বাঁধা

তিনি যত উমরাহ করেছেন, তার সবগুলোই আপন স্থান থেকে মক্কায় প্রবেশ করেই আদায় করেছেন। এমনটি প্রমাণিত নেই যে, তিনি মক্কাতে ছিলেন এবং উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য বাইরে গিয়েছেন অতঃপর উমরাহ আদায় করেছেন। যেমনটি বর্তমান সময়ের অনেক মানুষ করে থাকে। বরং তিনি সব উমরাহ আপন স্থান থেকে মক্কায় গিয়েই করেছেন। নবুওয়াত পাওয়ার পর ১৩ বছর মক্কায় ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও হারামের বাইরে গিয়ে এহরাম বেঁধে মক্কায় এসে উমরাহ করেছেন বলে প্রমাণিত নেই।

নাবী ﷺ জীবিত থাকতে তাঁর কোন সাহাবী কখনও এমন কাজ করেন নি। শুধু আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে একবার তানঈম থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বিদায় হজ্জের বছর প্রথমে উমরার এহরাম বেঁধেছিলেন।

অতঃপর তাঁর মাসিকের রক্তস্রাব শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে সাথের লোকদের সাথে উমরাহ করতে পারেন নি। তাই তিনি নাবী ﷺ এর আদেশে কিরান হজ্জের নিয়ত করে ফেললেন। নাবী ﷺ তাকে বললেন যে, তিনি যেহেতু কাবা ঘরের তাওয়াফ করেছেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করেছেন

তাই তাঁর হাজ্জ ও উমরাহ উভয়টিই হয়েছে। তাঁর সাথীগণ যেহেতু তামাত্তুকারী ছিলেন এবং তাদের কারও হায়েয শুরু হয় নি বলে কিরান হজ্জেও প্রবেশ করেন নি, তাই তারা আলাদাভাবে হাজ্জ ও উমরাহসহ ফেরত যাচ্ছেন দেখে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মনে কষ্ট পেলেন। কারণ তিনি পৃথক উমরাহ করতে পারেন নি। বরং হজ্জের সাথে মিলিয়ে যে উমরাটি করেছিলেন তিনি কেবল তা নিয়েই ফেরত যাচ্ছেন। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর মনকে খুশী করার জন্য তাঁর ভাই আব্দুর রহমান বিন আবু বকরকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তাকে তানঈম থেকে একটি উমরা করান।

হজ্জের মাসগুলোতেই তিনি সবগুলো উমরাহ করেছেন। এটি ছিল মুশরিকদের সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত। কেননা তারা হজ্জের মাসগুলোতে উমরাহ করাকে অপছন্দ করত। এতে প্রমাণিত হয় যে নিঃসন্দেহে হজ্জের মাসগুলোতে উমরাহ করা রজব মাসে উমরাহ করার চেয়ে অনেক উত্তম।

রমযান মাসে উমরাহ করা

বাকী থাকল রমযান মাসে উমরা করার বিষয়টি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রমযান মাসের উমরাহ ছাওয়াবের দিক দিয়ে হজ্জের সমান। রমযান মাসে উমরাহ করার এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে উমরাহ না করার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি রমযান মাসে উমরা করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তা ছাড়া তাতে উমরাহ করা ছেড়ে দিয়ে উম্মাতের উপর রহমত ও সহজ করেছেন। সুতরাং তিনি যদি রমযান মাসে উমরা করতেন তাহলে সমস্ত উম্মাত এই মাসে উমরাহ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠত। ফলে একই সাথে উমরা করা ও সিয়াম রাখা তাদের উপর কষ্টকর হয়ে যেত। উম্মাতের উপর কষ্টকর হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তিনি অনেক পছন্দনীয় আমলও ছেড়ে দিতেন।

এক বছরের মধ্যে তিনি একটির বেশী উমরাহ করেছেন বলে প্রমাণিত নেই। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, তিনি হিজরতের পরে দশম হিজরীতে কেবল একবারই হাজ্জ করেছেন। যখন হাজ্জ ফরয হল তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলম্ব না করে হজ্জের জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। কেননা নবম অথবা দশম হিজরী সালে হাজ্জ ফরজ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

তোমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ এবং উমরাহকে পরিপূর্ণ কর।[১২৩] যদিও এই আয়াতটি হিজরী ৬ষ্ঠ সালে নাযিল হয়েছে, কিন্তু তাতে হাজ্জ ফরয হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না। তাতে শুধু হাজ্জ ও উমরাহ শুরু করার পর তা পূর্ণ করার আদেশ রয়েছে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হজ্জের নিয়ত করলেন এবং মানুষকে তা জানিয়ে দিলেন তখন সকলেই তাঁর সাথে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল। মদীনার চার পাশের এলাকাগুলোতে যখন খবর পৌঁছে গেল তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হাজ্জ করার জন্য তারাও দলে দলে মদীনায় আসতে লাগল। পথেও অগণিত লোক তাঁর কাফেলায় যোগ দিল। তাঁর সামনে, পিছনে, ডানে এবং বামে যতদূর চোখের দৃষ্টি যেত ততদূর শুধু মানুষই দেখা যাচ্ছিল। যুল-কাদ মাসের ছয় দিন বাকী থাকতে যোহরের

---

১২৩. সূরা বাকারা-২: ১৯৬

সলাতের পর তিনি মদীনা থেকে বের হলেন। বের হওয়ার আগে তিনি মদীনাতে যোহরের চার রাকআত সলাত আদায় করেছেন। যাত্রার পূর্বে লোকদেরকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দিয়েছেন। তাতে তিনি ইহরামের নিয়ম এবং তার ওয়াজিব ও সুন্নাত বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি শরীরে তেল মাখালেন এবং চুল-দাড়িতে চিরুনী ব্যবহার করলেন। অতঃপর লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে বের হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি যুল-হুলায়ফায় গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি আসরের সলাত কসর করে দুই রাকআত পড়লেন। অতঃপর তিনি যুল হুলায়ফায় সারা রাত অবস্থান করলেন।

এখানে তিনি আসর থেকে শুরু করে মাগরিব, এশা, ফজর এবং যোহর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করলেন। রসূল ﷺ এর পবিত্র স্ত্রীগণও এই সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। এই রাত্রে এক এক করে তিনি সকলের কাছেই তাশরীফ নিয়েছেন। তিনি যখন ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন ইহরামের জন্য দ্বিতীয়বার গোসল করলেন। অতঃপর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বীয় হাতে তাঁর শরীর ও মাথায় আতর-সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছেন। তার দাড়ি এবং মাথায় সিঁথি করার স্থানে আতরের চমক দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি সেই চিহ্ন থাকতে দিয়েছেন এবং তা তিনি ধৌত করেন নি। তারপর তিনি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে যোহরের সলাত কসর করে দুই রাকআত আদায় করার পর মুসাল্লায় (সলাতের স্থানে) বসেই একসাথে হাজ্জ এবং উমরার ইহরাম বাঁধলেন এবং তাকবীর পাঠ করলেন। এ সময় রসূল ﷺ থেকে ইহরামের জন্য আলাদাভাবে দুই রাকআত সলাত পড়ার কথা বর্ণিত হয়নি।

ইহরামের পূর্বে নাবী ﷺ তার উটগুলোর গলায় কোরবানীর বিশেষ চিহ্ন হিসেবে মালা (হার) পরালেন এবং কুঁজের ডান পাশে জখম রক্ত প্রবাহিত করলেন। বিশটির অধিক সহীহ এবং সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তিনি কিরান হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন।

রসূল ﷺ খেত্মী (এক ধরণের ঘাসের রস) বা এ ধরণের বস্তু দ্বারা মাথার চুলকে জমাট করেছিলেন। যাতে করে সফর অবস্থায় মাথার চুলগুলো এলোমেলো না হয় এবং তাতে ময়লা-আবর্জনা ও ধুলোবালি প্রবেশ না করে । অতঃপর মুসাল্লায় বসেই তালবীয়া পড়লেন। উটনীর উপর আরোহন করে আবার তালবীয়া পাঠ করলেন। বায়দা নামক স্থানে যখন উটনী তাঁকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল তখন পুনরায় তালবীয়া পড়লেন।

তিনি কখনও হাজ্জ ও উমরার তালবীয়া এক সাথে পাঠ করেছেন আবার কখনও শুধু হজ্জের তালবীয়া পাঠ করেছেন। কেননা উমরাহ হজ্জেরই অংশ। এ জন্যই আমরা বলি যে তিনি কিরান হাজ্জ করেছেন। কেউ বলেছেন- তিনি তামাত্তো হাজ্জ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন- তিনি মুফরিদ (ইফরাদ হাজ্জকারী) ছিলেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- যোহরের সলাতের একটু পূর্বে ইহরাম বেঁধেছেন মর্মে ইবনে হায্‌ম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে যে কথা বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল তাঁর ধারণা প্রসূত। বিশুদ্ধ মতে তিনি যোহরের পর ইহরাম বেঁধেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ বলেন নি যে, রসূল ﷺ যোহরের পূর্বে ইহরাম বেঁধেছেন। জানি না তিনি কোথায় এ ধরণের কথা পেলেন?

অতঃপর তিনি নিম্নের বাক্যগুলোর মাধ্যমে উচ্চ স্বরে তালবীয়া পড়তে থাকলেনঃ

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ»

"হে আল্লাহ! আমি হাযির! হে আল্লাহ আমি উপস্থিত হয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাযির। সকল প্রকার প্রশংসা এবং নিয়ামাত কেবল তোমার জন্যই। রাজত্ব কেবল তোমারই জন্য। তোমার কোন শরীক নেই"।[১২৪] তাঁর সাহাবীগণ তালবীয়া পাঠের আওয়াজ শুনেছেন। তিনি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সাহাবীদেরকে উঁচু আওয়াজে তালবীয়া পাঠ করার আদেশ দিলেন।

হজ্জের এই সফরে তিনি বাহনে আরোহন করেছেন। হাওদায় আরোহন করেন নি। অর্থাৎ তিনি হাওদা বিহীন উটে আরোহন করেছেন। ইহরাম অবস্থায় হাওদাজ (পালকী) বিশিষ্ট ও হাওদাজ (পালকী) বিহীন বাহনে আরোহন করার বিষয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।

এহরাম বাঁধার সময় তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে ইফরাদ, তামাত্তো এবং কিরান এই তিন প্রকার হজ্জের যে কোন একটি করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। অতঃপর যাদের সাথে কুরবানীর জানোয়ার ছিলনা মক্কার নিকটবর্তী হয়ে তাদেরকে উমরাহ করে ইহরাম খুলে ফেলার আহবান জানালেন এবং হজ্জে কিরানের ইহরাম বাতিল করতে উৎসাহ দিলেন। অতঃপর মারওয়ার নিকট এসে তিনি তাদের উপর তা আবশ্যক করে দিলেন।

এই সময় আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই নব জাতক শিশু ছিলেন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসমা বিনতে উমাইসকে গোসল করে এক টুকরা কাপড় দিয়ে পট্টী বেঁধে ইহরাম ও সফর অব্যাহত রাখতে আদেশ করলেন। তিনি তাঁকে ইহরাম বাঁধতে এবং তালবীয়া পাঠ করার আদেশও প্রদান করলেন।

এই ঘটনাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুহরিম ব্যক্তি গোসল করতে পারে এবং হায়েয বিশিষ্ট মহিলাদের জন্য হায়েয চলাকালে গোসল করা জায়েয। এতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হায়েয অবস্থায় মহিলারা হাজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলে তা বিশুদ্ধ হবে।

অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তালবীয়ার উপরোক্ত বাক্যসমূহ পাঠরত অবস্থায় অগ্রসর হতে থাকলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে সেই বাক্যগুলোর উপর কিছু বৃদ্ধি করে কিংবা তা থেকে কিছু কমিয়ে পাঠ করছিল। তিনি তা শুনেও কোন প্রতিবাদ করেন নি।

কাফেলা যখন 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছে গেল তখন তিনি একটি আহত বন্য গাধা দেখে সাহাবীদেরকে বললেন- এটিকে ছেড়ে দাও। কেননা সম্ভবতঃ অচিরেই তার মালিক এসে যাবে। ইতিমধ্যেই গাধাটির মালিক এসে বলল- গাধাটি আপনাদের জন্য ছেড়ে দিলাম। অতঃপর তিনি আবু বকরকে তা সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে বললেন।

এতে দলীল পাওয়া যায় যে, মুহরিম ব্যক্তি অমুহরিম ব্যক্তির শিকার করা জন্তুর গোশত খেতে পারবে। তবে শর্ত হল যখন জানা যাবে যে সে মুহরিমদেরকে খাওয়ানোর জন্য শিকার করে নি। আরও জানা গেল যে শিকারকৃত জন্তুর মালিকানা উপযুক্ত প্রমাণ পেশকারীর জন্যই প্রতিষ্ঠিত হবে।

তিনি পুনরায় চলতে থাকলেন। 'রাওছা' এবং 'আরজ' নামক স্থানের মধ্যবর্তী জায়গায় গিয়ে একটি গাছের নীচে তীরের আঘাতে আহত একটি হরিণ দেখতে পেলেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হরিণটির পাশে

---

১২৪. বুখারী, তাও. হা/১৫৪৯, আবু দাউদ, আলএ. হা/১৮১২, নাসায়ী, মাপ্র. হা/২৭৪৯,সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৮২৫, ইবনে মাজাহ, তাও. হা/২৯১৮,মিশকাত, হাএ. হা/২৫৪১

একজন লোককে দাঁড় করিয়ে রাখলেন এবং তাকে আদেশ করলেন কেউ যেন এর কোন ক্ষতি না করে।

হরিণ এবং বনু গাধার ব্যাপারে আলাদা হুকুম দেয়ার কারণ হল গাধার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে, তা অমুহরিম ব্যক্তি শিকার করেছে। আর হরিণের ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায় নি যে কে শিকার করেছে? মুহরিম না হালাল (ব্যক্তি)?

অতঃপর তিনি যখন 'আরজ' নামক জায়গায় উপনীত হলেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাহন একটিই ছিল। আর তা ছিল আবু বকরের চাকরের কাছে। এই সময় চাকর আগমণ করল। তার সাথে উটটি ছিল না। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জিজ্ঞেস করলেন- উট কোথায়? সে উত্তর দিল যে, আমি গত রাতে তাকে হারিয়ে ফেলেছি। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন বললেন- একটিই উট ছিল, তাও হারিয়ে ফেললে? এই বলে তাকে মারতে লাগলেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দৃশ্য দেখে মুচকি হেসে বলতে লাগলেনঃ দেখ! এই ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কী করছে?

তিনি আবার চলতে লাগলেন। 'আবওয়া' নামক স্থানে এসে পৌঁছলে সা'ব বিন জাসামা তাঁকে বন্য গাধার একটি রান উপহার দিলেন। তিনি তা ফেরত দিয়ে বললেন- আমরা ইহরামের হালতে (অবস্থায়) আছি বলেই তোমার হাদীয়াকে ফেরত দিচ্ছি।

অতঃপর যখন উসফান নামক উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করলেন তখন তিনি বললেন- হে আবু বকর! এটি কোন্ উপত্যকা? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- এটি হচ্ছে উসফান নামক উপত্যকা। তিনি বললেন- এই উপত্যকা দিয়ে হুদ এবং সালেহ (আলাইহিস সালাম) লাল রঙের দু'টি উটের উপর আরোহন করে পবিত্র ঘরের হজ্জের তালবীয়া পাঠরত অবস্থায় অতিক্রম করেছেন। তাদের পরনে ছিল লুঙ্গি। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এটি বর্ণনা করেছেন।

'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মাসিকের রক্তস্রাব শুরু হয়ে গেল। সেখানে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণকে বললেন- যার হাতে কুরবানীর জন্তু নেই, সে ইচ্ছা করলে এটিকে উমরার ইহরামে পরিণত করতে পারে। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে উমরাহ করে ইহরাম খুলে ফেলতে পারে। আর যার সাথে কুরবানীর জন্তু আছে, তার জন্য এমন করার অনুমতি নেই। ইফরাদ, তামাত্তো এবং কিরানের যে কোন একটি গ্রহণের ক্ষেত্রে মীকাতে অবস্থানকালের পছন্দ ও নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচন ছিল অন্য রকম। অতঃপর মক্কায় গিয়ে এই মর্মে অকাট্য আদেশ জারি করলেন। যার সাথে কুরবানীর জন্তু নেই সে যেন হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করে ফেলে এবং উমরার কাজ সমাধা করে যেন ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যায়। আর যার সাথে কুরবানীর জন্তু রয়েছে সে যেন ইহরাম অবস্থাতেই থেকে যায়। হাজ্জকে উমরায় পরিণত করার এই হুকুম পরবর্তীতে কখনই রহিত হয়নি। বরং সুরাকা বিন মালেক এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলঃ হজ্জের ইহরামকে বদল করে উমরার ইহরামে পরিণত করার এই হুকুম কি শুধু এই বছরের জন্য? না সব সময়ের জন্য? উত্তরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- বরং সব সময়ের জন্যই এই হুকুম চালু থাকবে।

অতঃপর তিনি চলতে লাগলেন। যু-তুয়া নামক জায়গায় গিয়ে থামলেন। এই স্থানটি 'আবারে যাহের' হিসাবে পরিচিত। তথায় তিনি যুল-হাজ্জ মাসের চার তারিখের দিবাগত রাত্রি যাপন করলেন। সেখানে ফজরের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি গোসল করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন।

জাহুনের নিকট অবস্থিত মক্কার উঁচু স্থান ছানিয়াতুল উল-ইয়ার দিক থেকে তিনি দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করেন। উমরাহ করার সময় তিনি মক্কার নীচু ভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন। সুতরাং তিনি চাশতের সময় মাসজিদে ঢুকলেন। ইমাম তাবারীর বর্ণনায় এসেছে, বাবে বনী আব্দে মানাফ তথা আবদে মানাফের গেইট দিয়ে তিনি প্রবেশ করেন, যাকে বাবে বনী শায়বাও বলা হয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- তিনি যখন দারে ইয়ালার কোন স্থান দিয়ে প্রবেশ করতেন তখন আল্লাহর ঘরকে সামনে রেখে দু'আ করতেন।

ইমাম তাবারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- তিনি যখন কাবা ঘরের দিকে তাকাতেন তখন এই দু'আ পড়তেন-

«اللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً»

"হে আল্লাহ্ তুমি এই ঘরের সম্মান, মর্যাদা ও প্রভাব আরও বৃদ্ধি কর"।[১২৫] অন্য বর্ণনায় আছে তিনি কাবা ঘর দেখার সময় উভয় হাত উঠাতেন, তাকবীর বলতেন এবং এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

«اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ اللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا»

"হে আল্লাহ্! তুমি শান্তির আধার, তোমার থেকেই শান্তি আসে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে শান্তির সাথে জীবিত রাখো। হে আল্লাহ্! তুমি এই ঘরের সম্মান, মর্যাদা ও প্রভাব আরও বৃদ্ধি করো। আর যে ব্যক্তি এই ঘরের হাজ্জ বা উমরাহ করবে, তুমি তারও সম্মান, মর্যাদা ও নেকী বৃদ্ধি করো"। তবে এই বর্ণনাটি মুরসাল।

কাবা ঘরের তাওয়াফের ক্ষেত্রে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিদায়াত

মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তিনি কাবা ঘরের দিকে চলে গেলেন। তাহিয়াতুল মাসজিদ তথা মাসজিদে প্রবেশের দুই রাকআত সলাত পড়েন নি। কেননা মাসজিদুল হারামের তাহিয়াতুল মাসজিদই হচ্ছে কাবা ঘরের তাওয়াফ। হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হয়ে তিনি তাতে চুমু দিলেন। সেখানে ভিড় (দেরী) করেন নি। হাজরে আসওয়াদ থেকে তিনি রুকনে ইয়ামানীর দিকে যান নি এবং হাত উঠিয়ে ইশারাও করেন নি। এ সময় তিনি মুখে এ কথা উচ্চারণ করেণ নি যে, আমি তাওয়াফের নিয়ত করছি বা এই তাওয়াফের মাধ্যমে আমি এই এই নিয়ত করছি। তিনি তাকবীরের মাধ্যমেও তাওয়াফ

---

১২৫. ইমাম বায়হাকী আরও বাড়িয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছকে যঈফ ও মাউযু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দেখুনঃ دفاع عن الحديث النبوي , (১/৩৭)।

Contents

শুরু করেন নি।[১২৬] এমনিভাবে পূর্ণ শরীরকেও হাজরে আসওয়াদের সামনে রেখে তারপর এটিকে ডান দিকে রেখেও ফেরত আসেন নি; বরং তিনি তাকে সামনে রেখে চুমু দিয়ে এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করে ডান দিকে চলে গেলেন। এ সময় দরজার কাছে, কিংবা মীযাবের (কাবা ঘরের ছাদের পানি প্রবাহিত হওয়ার নালার) নীচে কিংবা কাবা ঘরের পিছনে অথবা কাবার রুকনসমূহের কাছেও দু'আ করেন নি। তাওয়াফের জন্য তিনি কোন দু'আও নির্দিষ্ট করেন নি। তবে রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝখান দিয়ে তাওয়াফের সময় রসূল ﷺ থেকে নিম্নের এই দু'আটি পাঠ করার কথা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে-

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো"। (সূরা বাকারা-২: ২০১)

তিনি এই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করেছেন। তাওয়াফ অবস্থায় তিনি শরীরের উপরের অংশে পরিহিত চাদর দিয়ে ইজতেবা করেছেন অর্থাৎ ডান কাঁধের চাদরকে ভাজ করে বাম কাঁধের উপর ফেলে রেখে ডান কাঁধ খালি রেখেছেন।

যতবারই তিনি হাজরে আসওয়াদের বরাবর এসেছেন তখন হাত দ্বারা এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং হাতের লাঠি তাতে লাগিয়ে লাঠিতে চুম্বন করেছেন।

সহীহ সূত্রে প্রমাণিত আছে যে, তিনি রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করেছেন। তবে তাতে চুম্বন করা কিংবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুমু দেয়ার কথা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়েছেন। এও প্রমাণিত আছে যে, তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুমু খেয়েছেন। তাতে লাঠি দিয়ে স্পর্শ করার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এই তিনটি পদ্ধতির কথাই সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তাবারানী ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার সময় তিনি 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলতেন। আর যখনই হাজরে আসওয়াদ বরাবর আসতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত কাবা ঘরের অন্য কোন স্থান স্পর্শ বা চুম্বন করেন নি। তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের পিছনে এসে এই আয়াত পাঠ করলেন

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

আর তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে (ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে) সলাতের জায়গা বানাও।[১২৭] অতঃপর তিনি দুই রাকআত সলাত পড়লেন। তখন তার ও কাবা ঘরের মাঝখানে ছিল মাকামে ইবরাহীম। দুই রাকআতের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর তিনি সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পাঠ করলেন। এই সূরা দু'টি পাঠ করার উদ্দেশ্য হল এ

১২৬. তাকবীরের মাধ্যমে তাওয়াফ শুরু করা হাদীছ দ্বারা সুসাব্যস্ত। এমন কি বিসমিল্লাহ সহ তাকবীর বলা সাহাবী থেকে সুসাব্যস্ত। (আলবানী রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত হাজ্জাতুন নাবী দ্রষ্টব্য)

১২৭. সূরা বাকারা-২:১২৫

কথা ঘোষণা করা যে, তাঁর সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই। কেননা এই সূরা দু'টিতে খালেসভাবে আল্লাহর ইবাদত করার কথা এসেছে।

সলাত শেষে তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে ফেরত আসলেন এবং তাতে চুম্বন করে সামনের দরজা দিয়ে 'সাফা'এর দিকে অগ্রসর হলেন। সাফার নিকটে গিয়ে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন-

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾

"নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত"।[১২৮] অতঃপর তিনি বললেন- আল্লাহ তা'আলা যেখান থেকে শুরু করেছেন আমিও সেখান থেকে শুরু করবো। অর্থাৎ প্রথমে যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সাফা-এর কথা উল্লেখ করেছেন, তাই আমি সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করব। নাসাঈ শরীফের অন্য বর্ণনায় সাফা থেকে শুরু করার আদেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেখান থেকে শুরু করেছেন তোমরা সেখান থেকে শুরু করো। অতঃপর সাফা পাহাড়ে উঠে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দিলেন এবং তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করলেন। আর সেখানে তিনি এই দু'আ পাঠ করলেন-

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْـدَهُ أَنْجَـزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

"এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। মালিকানা তাঁরই। সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সকল শত্রুদলকে একাই পরাজিত করেছেন। তিনবার এই দু'আটি পড়লেন এবং এর মাঝখানে দু'আ করলেন।

অতঃপর তিনি মারওয়ার দিকে নামলেন এবং চলতে লাগলেন। নীচু স্থানে নেমে দৌড়াতে লাগলেন। আর তা থেকে উপরে উঠে সাধারণ গতিতে চললেন। তিনি যখন মারওয়ায় পৌঁছতেন তখন তার উপরে উঠে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার বলতেন এবং কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করতেন। সাফাতে তিনি যা করতেন মারওয়াতেও তাই করতেন। মারওয়ার নিকট যখন সাঈ শেষ করলেন তখন যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিলনা তাদের সকলকে পরিপূর্ণভাবে হালাল হয়ে যেতে বললেন এবং যুল-হাজ্জ মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত সেভাবেই থাকতে বললেন। তাঁর সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল বলেই তিনি ইহরাম ছাড়তে পারলেন না। তিনি সেখানে বলেছেন- আমি এখন যা জানতে পারছি, তা যদি পূর্বে জানতাম তাহলে কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে আসতাম না এবং এটিকে আমি উমরায় পরিণত করে ফেলতাম। সেখানে তিনি মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার দু'আ করেছেন এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দু'আ করেছেন।

তাঁর স্ত্রীগণ উমরাহ করে হালাল হয়ে গেলেন। কিন্তু আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হায়েয অবস্থায় থাকার কারণে কাবার তাওয়াফ করতে পারলেন না এবং হালালও হতে পারলেন না। যে সমস্ত লোক তাঁর মত করেই ইহরাম বেঁধেছিল এবং তাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল তিনি তাদেরকে দশ তারিখ পর্যন্ত ইহরাম

---

১২৮. সূরা বাকারা-২:১৫৮

অবস্থায় থাকতে আদেশ করেছেন। আর যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিলনা তারা তাঁর মত করে ইহরাম বেঁধে থাকলেও তাদেরকে উমরাহ করে হালাল হয়ে যাওয়ার আদেশ করেছেন। তারবীয়ার দিন পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থান কালে মুসলিমদেরকে নিয়ে চার দিন কসর করে সলাত আদায় করেছেন। অতঃপর বৃহস্পতিবার দিন তিনি সাথীদেরকে নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। যারা ইতিপূর্বে উমরাহ করার পর ইহরাম ছেড়ে দিয়েছিল, তারা এই সময় নিজ নিজ বাসস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। তারা ইহরাম বাঁধার জন্য মাসজিদে প্রবেশ করেন নি; বরং তারা কাবাকে পিছনে রেখেই ইহরাম বেঁধেছেন।

আরফার দিনে নাবী ﷺ এর পবিত্র হিদায়াত

মিনায় গিয়ে তিনি যোহর ও আসর সলাত পড়েছেন এবং তথায় রাত্রি যাপন করেছেন। পরের দিন সূর্য উঠার পর ডান পাশের রাস্তা দিয়ে আরাফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তখন সাহাবীদের কেউ তালবীয়া পাঠ করছিল আবার কেউ তাকবীর পড়ছিল। তিনি শুনতেন এবং কোন প্রতিবাদ করতেন না। আরাফার পূর্ব প্রান্তে নামেরায় পৌঁছে দেখেন তাঁর আদেশ মোতাবেক তাঁর জন্য তাঁবু টানানো হয়েছে। বর্তমানে সেই জায়গাটি খালী অবস্থায় পড়ে আছে। সুতরাং তিনি নামেরায় অবতরণ করলেন। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর কাসওয়া নামক উটনীর উপর আরোহন করে উরানার নিম্নভূমিতে পৌঁছলেন।

সেখানে তিনি উটের উপর আরোহী অবস্থায় এক মহান ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করলেন। এই ভাষনে তিনি ইসলামের মূল বুনিয়াদগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করলেন এবং শিরক ও অন্ধকার যুগের সকল প্রথা বাতিল করলেন। পূর্বের যে সমস্ত বিষয়কে সকল শরীয়ত হারাম করেছে ইসলামী শরীয়তে সে বিষয়গুলো হারাম হওয়ার কথা তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন মানুষের রক্তপাত করা হারাম এবং তাদের ধন-সম্পদও অনুরূপ হারাম। জাহেলী সমাজের রীতি-নীতিকে তিনি তাঁর পায়ের নীচে দাফন করলেন এবং ঐ সময়ের সকল সুদকে তিনি বাতিল বলে ঘোষণা দিলেন। তিনি নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিলেন, স্বামীদের উপর তাদের হক এবং তাদের উপর তাদের স্বামীদের হকের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন- স্ত্রীদের জন্য ন্যায়ভাবে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তবে তিনি তাদের জন্য ভরণপোষণের নির্ধারিত কোন পরিমাণ উল্লেখ করেন নি। স্বামীদের অপছন্দনীয় লোককে ঘরে প্রবেশ করালে তিনি তাদেরকে প্রহার করার অনুমতি দিয়েছেন। এই ভাষণে তিনি আল্লাহর কিতাবকে মজবুতভাবে ধারণ করার জন্য উম্মাতকে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- তারা যদি এটিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তাহলে তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। অতঃপর তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। তাঁর ব্যাপারে তারা কি বলবেন এবং কি সাক্ষী দিবেন, সেই স্বীকৃতি তিনি তাদের থেকে আদায় করেছেন। মুসলিমগণ সেদিন এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আমাদের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং উম্মাতকে নসীহত করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠালেন এবং তাদের কথার উপর তিনবার আল্লাহকে সাক্ষী রাখলেন। তিনি উপস্থিত মুসলিমদেরকে আদেশ করলেন, তারা

যেন অনুপস্থিত লোকদেরকে তাঁর এই ভাষণটি পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি আরাফায় মাত্র একটি খুতবা (ভাষণ) দিলেন। মাঝখানে বৈঠক দিয়ে এটিকে জুমআর খুতবার ন্যায় দুই খুতবায় বিভক্ত করেন নি।

খুতবা শেষে তিনি বিলালকে আযান দেয়ার আদেশ দিলেন। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আযান দিলেন। অতঃপর ইকামত দিলেন। তিনি নিঃরবে কিরাআত পাঠ করে দুই রাকআত সলাত পড়লেন। সেই দিন ছিল জুমআর দিন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুসাফিরের উপর জুমআর সলাত নেই। অতঃপর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আসরের ইকামত দিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসরের সলাতও দুই রাকআত আদায় করলেন। এ সময় মক্কাবাসীগণও তাঁর সাথে ছিলেন। তারাও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যোহর ও আসর সলাত কসর ও একত্রিত করে আদায় করলেন। এতে প্রমাণিত হল যে, কত দূর সফর করলে সলাত কসর করা যাবে তার সঠিক কোন সীমা নির্ধারিত হয়নি।

সলাত শেষে তিনি বাহনে আরোহন করে আরাফার সীমানায় ঢুকলেন এবং আরাফার পাহাড়ের নীচের অংশে কংকরময় ভূমিতে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এ সময় তিনি হাবলে মুশাত তথা বালুময় রাস্তাকে সামনে রাখলেন। তিনি উটের উপর ছিলেন। সেখানে থেকেই তিনি দু'আ শুরু করলেন। তিনি সূর্য ডুবা পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে দু'আয় কাকুতি-মিনতি করতে থাকলেন। এ সময় তিনি লোকদেরকে উরানা উপত্যকা থেকে সরে আসতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, আরাফার সকল স্থানই অবস্থানের জায়গা। তিনি লোক পাঠিয়ে উপস্থিত জনগণকে বলে দিলেন, তারা যেন এই পবিত্র স্থানেই অবস্থান করে এবং এখানেই উকুফে আরাফা করে। এটিই হচ্ছে তাদের পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর অবস্থানের জায়গা।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন দু'আয় বুক পর্যন্ত হাত উঠিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল কোন ভিক্ষুক যেন খাবার চাচ্ছে। তিনি বলেছেন-

«خير الدعاء دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَة»

আরাফা দিবসের দু'আ হচ্ছে, সর্বোত্তম দু'আ। তিনি আরাফায় অবস্থানকালে যে সমস্ত দু'আ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে-

«اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِى نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللّٰهُمَّ لَكَ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى وَإِلَيْكَ مَآبِى وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِى اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الأَمْرِ اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِىءُ بِهِ الرِّيحُ»

"হে আল্লাহ্! আমরা যে রকম প্রশংসা করি তা কেবল তোমার জন্যই। আর আমরা যে সকল প্রশংসা করি তার চেয়েও উত্তম প্রশংসার তুমি হকদার। হে আল্লাহ্! তোমার জন্যই আমার সলাত, আমার কুরবানী, তোমার জন্যই আমার বেঁচে থাকা, তোমার জন্যই আমার মরণ এবং তোমার দিকেই আমি ফিরে আসব। হে আমার রব্! আমি যা কিছু অর্জন করেছি, তার সবই তোমার জন্য। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে, অন্তরের ওয়াস্ওয়াসা (কুমন্ত্রনা) থেকে এবং কাজের

এলোমেলো থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সেই অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই, যা বাতাস বয়ে নিয়ে আসে"।[১২৯] সেখানে তিনি এই দু'আটিও করেছেন-

«اللّٰهُمَّ إنكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي ولا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي أَنَا الْبَائِسُ الفقير، المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ وَذَلَّ جَسَدُهُ وَرَغِمَ أَنْفُهُ لَكَ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَكُنْ بِي رَءُوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ»

"হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুনছ, আমার অবস্থান দেখছ, আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবই অবগত আছ। আমার কোন কিছুই তোমার কাছে গোপন নয়। আমি দুর্দশাগ্রস্ত-ফকীর, ফরিয়াদকারী-আশ্রয় প্রার্থী, ভীত-সন্ত্রস্ত এবং স্বীয় অপরাধের স্বীকৃতি প্রদানকারী। মিসকীনের ন্যায় তোমার কাছে যাচনা করছি এবং অপদস্ত অপরাধীর ন্যায় তোমার কাছে কাকুতি-মিনতি করছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে ঐ ভীত অন্ধের ন্যায় আহবান করছি, যার গর্দান তোমার জন্য অবনত, যার উভয় চোখ তোমার জন্য অশ্রু প্রবাহিত করছে, যার শরীর তোমার অধীন হয়েছে এবং যার নাক তোমার জন্য ধূলোমলিন হয়েছে। হে আল্লাহ্! হে আমার রব্! আশা করি, তোমার কাছে দু'আ করার পর আমাকে বঞ্চিত করবে না। হে সর্বোত্তম প্রার্থনার স্থল! হে সর্বোত্তম দাতা! তুমি আমার প্রতি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান হয়ে যাও"।[১৩০]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আমর বিন শুআইব হতে তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফার দিন যে দু'আটি খুব বেশী করেছেন, সেটি হচ্ছে-

«لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

"এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। মালিকানা তাঁরই। সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। এ পর্যন্ত যত দু'আ বর্ণনা করা হল সেগুলোর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।[১৩১]

আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে তাঁর উপর কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিয়ামাতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।[১৩২]

---

১২৯. তিরমিযী ও ইবনে খুযায়মা। তবে ইমাম আলবানী এই হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন যঈফা, হা/২৯১৮।

১৩০. ইমাম তাবারানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আল-মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী এই হাদীসটিকেও যঈফ বলেছেন। দেখুনঃ যঈফুল জামে, হা/১১৮৬।

১৩১. কিন্তু সর্বশেষ দুআর হাদীছ বিশুদ্ধ।

১৩২. সূরা মায়েদা-৫:৩

ইহরাম অবস্থায় কেউ মারা গেলে

আরাফার ময়দানে এক লোক তার বাহন থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেলে রসূল ﷺ তাকে ইহরামের দুই কাপড়েই কাফন পরাতে বলেছেন এবং তার শরীরে খুশবো না লাগানোর আদেশ দিয়েছেন। তিনি তাকে বড়ই পাতা ও পানি দিয়ে (গরম পানিতে বড়ই পাতা মিশিয়ে) গোসল দিতে বলেছেন। তার চেহারা ও মাথা ঢাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, উক্ত সাহাবীকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তালবীয়া পাঠরত অবস্থায় পুনরুজ্জিবীত করবেন। এই ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বারটি হুকুম পাওয়া যাচ্ছে। যথা-

১. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ওয়াজিব।

২. মুমিন ব্যক্তি মারা যাওয়ার কারণে অপবিত্র হয়না। কেননা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার মাধ্যমে নাপাক হলে গোসল দিলেও তার অপবিত্রতা দূর হবেনা।

৩. মৃত ব্যক্তিকে বড়ই পাতা ও পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে।

৪. পানিতে পবিত্র জিনিস পতিত হওয়ার কারণে পানির রং বদল হয়ে গেলেও তার পবিত্রতা নষ্ট হয় না। কারণ হাদীছে পানির সাথে বড়ই পাতা মিশানোর আদেশ করা হয়েছে।

৫. মুহরিম ব্যক্তির জন্য গোসল করা জায়েয।

৬. মুহরিম ব্যক্তির জন্য পানি ও বরই পাতা ব্যবহার করা অবৈধ নয়।

৭. মীরাছ ও ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে কাফন-দাফনকে প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি সম্পদ, ওয়ারিছ এবং ঋণ রেখে যায় তাহলে সেই সম্পদ দ্বারা প্রথমে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা নাবী ﷺ দু'টি কাপড়ে ইহরাম পরিহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণকারীকে তা দিয়েই কাফন পরাতে আদেশ করেছেন। এ কথা জিজ্ঞেস করেন নি যে, তার কোন ঋণ ও ওয়ারিছ আছে কি না? কাফন-দাফন সম্পন্ন করার পর যদি সম্পদ বাকী থাকে তাহলে তা থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তারপর অন্যান্য হক আদায় করার পর কিছু বাকী থাকলে তা ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

৮. মাত্র দুই কাপড়ে কাফন পরানো জায়েয আছে।

৯. মুহরিম ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ।

১০. মুহরিমের জন্য মাথা ঢাকা নিষেধ।

১১. মুহরিমের জন্য মুখ ঢাকাও নিষেধ। ছয়জন সাহাবী থেকে মুখ ঢাকা জায়েয হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। যারা জায়েয বলেন, তারা এই ছয়জন সাহাবীর কথা থেকেই দলীল গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন- মুখ ঢাকার আদেশটি নাবী ﷺ থেকে সংরক্ষিত তথা সুসাব্যস্ত হয়নি।

১২. মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মারা গেলেও সে ইহরাম অবস্থার হুকুমেই থাকে।

পরিশেষে যখন সূর্য ডুবে গেল এবং হলুদ রং অপসারিত হওয়ার মাধ্যমে সূর্য ডুবার বিষয়টি নিশ্চিত হলেন তখন তিনি আরাফা থেকে মুযদালাফার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। এই সময় তিনি উসামা বিন যায়েদকে বাহনের পিছনে বসালেন। তিনি ধীরস্থীরতার সাথে চলতে থাকলেন। উটের লাগামকে তিনি এমনভাবে টেনে ধরলেন যে, তার মাথা হাওদার সাথে মিশে যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি তখন বলছিলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা ধীরস্থীরতার সাথে চল। কেননা দ্রুত চলার মধ্যে কোন নেকীর কাজ নেই। তিনি মাযামাইনের পথ ধরে তথা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন। এর

আগে আরাফায় যাওয়ার সময় তিনি যব্-এর পথ দিয়ে (ডান পাশের রাস্তা দিয়ে) গমণ করেছেন। ঈদের দিনগুলোতেও এমনি ছিল তাঁর পবিত্র অভ্যাস। এক রাস্তা দিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরত আসতেন। অতঃপর তিনি সাইরে আনাক তথা মধ্যম গতিতে চলতে লাগলেন। প্রশস্ত ময়দান পেলে দ্রুত চলতেন। সামনে টিলা বা উঁচু স্থান পড়লে তিনি উটের লাগাম ঢিলা করতেন, যাতে উপরে উঠা তার জন্য সহজ হয়।

চলার পথে তালবীয়া পাঠ অব্যাহত রাখতেন; তা বন্ধ করতেন না। রাস্তায় কোন এক স্থানে তিনি অবতরণ করলেন এবং পেশাব করার পর হালকা ওযু করলেন। তখন উসামা তাকে বললেন- হে আল্লাহর রসূল! সলাত পড়তে হবে। তিনি বললেন- সলাতের স্থান তোমার সামনে (মুযদালিফায়)।

মুযদালিফায় নাবী ﷺ এর পবিত্র সুন্নাত

অতঃপর তিনি মুযদালাফায় এসে সলাতের ওযু করলেন। তাঁর আদেশক্রমে মুআযযিন আযান দিলেন অতঃপর ইকামত দিলেন। লোকেরা বাহন থেকে মাল-পত্র নামালো এবং বাহনগুলো বসানোর পূর্বেই তিনি মাগরিবের সলাত পড়লেন। তারপর যখন লোকেরা বাহন থেকে মাল-পত্র নামাল তখন তিনি ইশার সলাতের ইকামত দিতে বললেন। অতঃপর তিনি আযান ছাড়াই শুধু একামতের মাধ্যমে ইশার সলাত আদায় করলেন। ইশা ও মাগরিবের সলাতের মাঝখানে অন্য কোন সলাত পড়েন নি। অতঃপর তিনি ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ঘুমালেন। সেই রাত্রে তিনি তাহাজ্জুদ পড়েন নি। ঈদাইনের রাতেও তিনি তাহাজ্জুদ পড়তেন বলে প্রমাণিত নেই। মুযদালিফার রাত্রে তিনি তাঁর পরিবারের দুর্বল সদস্যদেরকে ফজর হওয়ার পূর্বে এবং চন্দ্র ডুবে যাওয়ার সময় (অর্ধরাত পার হওয়ার পর) মিনার দিকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি মুসলিমদেরকে আদেশ দিলেন যে, তারা যেন সূর্য উদয়ের পূর্বে (জামরায়ে কুবরায়) পাথর নিক্ষেপ না করে।

আর যেই হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মে সালামা ফজরের পূর্বেই পাথর নিক্ষেপ করেছেন, তা মুনকার হাদীস। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং অন্যরা এই হাদীসকে মুনকার বলেছেন। অতঃপর তিনি সাওদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন- আমরা অনুসন্ধান করে এই হাদীসগুলোর মধ্যে কোন প্রকার পারস্পরিক বিরোধিতা পাইনি। তিনি শিশুদেরকে ফজরের পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সময় হওয়ার পূর্বে তাদের পাথর নিক্ষেপ করার কোন ওযুহাত নেই। আর সূর্য উঠার পর ভীড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ও পুরুষদের ভীড়ের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই তিনি মহিলাদেরকে ফজরের পূর্বেই পাথর মারার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

সহীহ হাদীস দ্বারা এটিই প্রমাণিত। অতি বৃদ্ধ ও অসুস্থ হলে ফজরের পূর্বেই ১০ তারিখের পাথর মারা জায়েয আছে। সক্ষম ও সুস্থ হলে তার জন্য এটি জায়েয নয়। আর সহীহ হাদীস যা প্রমাণ করে তা হচ্ছে, তিনি চন্দ্র ডুবে যাওয়ার পরপরই মহিলাদেরকে রওয়ানা দিতে বলেছেন; অর্ধেক রাতের পর নয়। যারা অর্ধেক রাত চলে যাওয়ার পর রওয়ানা হওয়ার কথা বলেছেন, তাদের কথার পক্ষে কোন দলীল নেই।

অতঃপর মুযদালিফায় রাত্রি যাপন কালে যখন ফজর উদিত হল তখন তিনি আযান ও ইকামত দিয়ে প্রথম ওয়াক্তেই ফজরের সলাত আদায় করলেন; সময় হওয়ার পূর্বে নয়। সলাত শেষে বাহনে আরোহন করে মাশআরে হারামের নিকট (বর্তমানে এখানে একটি বিশাল মাসজিদ রয়েছে) এসে কিবলামুখী হয়ে দু'আ শুরু করলেন। এখানে তিনি সূর্য ভালভাবে প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দু'আয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করলেন, তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করলেন এবং আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকলেন। তিনি মুযদালিফার একটি স্থানে অবস্থান করেছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিলেন যে, মুযদালিফার সকল স্থানই হাজীদের অবস্থানের জায়গা। অতঃপর তিনি ফযল বিন আব্বাসকে পিছনে বসালেন এবং তালবীয়া পাঠ করতে করতে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এবার উসামা পায়ে হেঁটে কুরাইশদের দলের সাথে চলতে লাগলেন।

এবার চলার পথে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জামরায়ে কুবরায় নিক্ষেপ করার জন্য সাতটি পাথর সংগ্রহ করার আদেশ দিলেন। মুযদালিফায় রাত্রি যাপন কালে পাহাড় থেকে পাথর ভেঙ্গে কিংবা রাতের বেলায় কুড়িয়ে তা সংগ্রহ করেন নি; যেমন করে থাকে অজ্ঞ লোকেরা। সুতরাং ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর হুকুমে সাতটি ছোট ছোট পাথর সংগ্রহ করলেন। হাতে নিয়ে তিনি এগুলো থেকে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেনঃ এ রকম পাথর দিয়ে নিক্ষেপ কর। আর তোমরা দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান থাকবে কেননা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়েছে।

আযাবের স্থান দিয়ে চলার সময় দ্রুত চলা

বাতনে মুহাস্‌সার নামক স্থানে (আবরাহার বাহিনী যেখানে ধ্বংস হয়েছিল) এসে তিনি উটকে দ্রুত চালালেন। যে সমস্ত স্থানে আল্লাহর শত্রুদের উপর আযাব নাযিল হয়েছিল সে সমস্ত স্থান অতিক্রম করার সময় এটিই ছিল তাঁর সুন্নাত। সুতরাং তিনি সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় আযাবের ভয়ে দ্রুত চললেন। কারণ সেখানেই হস্তী বাহিনীকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেছিলেন। কুরআনের সূরা ফীলে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই উপত্যকার নাম محسر মুহাস্‌সার রাখার কারণ এই যে, এখানে এসে হাতীগুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং মক্কায় প্রবেশ করতে অপারগ হয়ে গিয়েছিল। محسر শব্দটির মূল হচ্ছে حسر। এর অর্থ হচ্ছে ক্লান্ত হওয়া, দুর্বল হওয়া ইত্যাদি।

হিজির অঞ্চল তথা সালেহ (আলাইহিস সালাম) এর জাতি যেখানে ধ্বংস হয়েছিল সেই স্থান দিয়ে তাবুক যাওয়ার পথেও তিনি দ্রুত চলেছেন। বাতনে মুহাস্‌সার হচ্ছে মিনা ও মুযদালিফার মধ্যে পার্থক্যকারী সীমানা। তবে মাশআরে হারাম মিনা ও মুযদালিফার কোনটিরই অন্তর্ভূক্ত নয়। বাতনে উরানা আরাফা ও মাশআরে হারামের মাঝে পার্থক্যকারী। এমনিভাবে প্রত্যেক দু'টি পবিত্র স্থানের একটি করে সীমা রেখা রয়েছে, যা উক্ত পবিত্র স্থান দু'টির কোনটিরই অন্তর্ভূক্ত নয়। সুতরাং মিনা হারাম এলাকার অন্তর্ভূক্ত এবং পবিত্র (ইবাদতের) স্থান। মুহাস্‌সার হারামের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু পবিত্র (ইবাদতের) স্থান নয়। মুযদালিফা হারাম ও পবিত্র স্থানের অন্তর্ভূক্ত। বাতনে উরানা (আরাফার বাইরের স্থান) মাশআর (পবিত্র

স্থান) নয়, হারামেরও অন্তর্ভূক্ত নয়। আরাফাও হারামের অন্তর্ভূক্ত নয়; কিন্তু তা মাশআর (পবিত্র ও ইবাদতের স্থান)।

এবার তিনি যখন মিনায় পৌঁছলেন তখন দুই রাস্তার মাঝখানের রাস্তা দিয়ে চলতে থাকলেন। আর এটি হচ্ছে সেই রাস্তা, যা সরসূরি জামারায়ে কুবরার দিকে বের হয়ে গিয়েছে। তিনি মিনায় পৌঁছে জামারায়ে আকবার (বড় জামরার) নিকট এসে উপাত্যকার নীচু স্থানে দাঁড়ালেন। তখন কাবা ঘরকে বামে এবং মিনাকে ডানে রাখলেন এবং জামারাকে সামনে রাখলেন। তিনি তখন উটের উপর আরোহী অবস্থায় সূর্য উদয়ের পর একটি একটি করে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তিনি আল্লাহু আকবার বললেন এবং তালবীয়া পাঠ করা বন্ধ করে দিলেন। তখন বিলাল ও উসামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সাথে ছিলেন। তাদের একজন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উটনীর লাগাম ধরেছিলেন অন্যজন কাপড় দিয়ে তাঁকে রোদ্রের তাপ থেকে ছায়া দান করছিলেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহরিমের জন্য কাপড়, ছাতা বা অন্য কিছুর ছায়া গ্রহণ করা জায়েয আছে।

অতঃপর তিনি মিনায় ফেরত এসে এক প্রজ্ঞা ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন। এতে তিনি কুরবানীর দিনের সম্মান, মর্যাদা ও তার ফযীলত এবং পৃথিবীর সকল নগরীর উপর মক্কার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। মুসলিমদের যেই নেতা তাদেরকে আল্লাহর কিতাব দিয়ে পরিচালিত করবেন, তিনি সেই নেতার কথা শ্রবণ করার ও মান্য করার আদেশ দিয়েছেন। লোকদেরকে তিনি তাঁর থেকেই হজ্জের কার্যাবলী ও বিধিবিধান শিখতে বলেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন- সম্ভবত এবারের পর আমি আর কখনও হাজ্জ করার সুযোগ পাবনা। সুতরাং তিনি লোকদেরকে হজ্জের মাসায়েল শিক্ষা দিলেন। তিনি মুহাজিরদের এবং আনসারদের যথাযথ মর্যাদা বর্ণনা করলেন। তিনি লোকদেরকে আদেশ দিলেনঃ তারা যেন তাঁর মৃত্যুর পর কুফুরীর দিকে ফিরে না যায় এবং তারা যেন পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত না হয়। তিনি তাঁর ভাষণ এবং দ্বীনের অন্যান্য বিষয় মানুষদেরকে পৌঁছিয়ে দেয়ার আদেশ করলেন। এ বিষয়ে তিনি সংবাদ দিলেন যে, যাদের কাছে সংবাদ পৌঁছানো হয় তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকে যে উপস্থিত হয়ে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী হয়।

ভাষণে তিনি এও বললেন যে, অপরাধী কেবল নিজের উপর জুলুম করে থাকে। কেননা জুলুমের ফল তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এ সময় তিনি কিবলামুখী হয়ে মুহাজিরদেরকে ডান পাশে এবং আনসারদেরকে বাম পাশে রাখলেন। বাকী লোকেরা তাদের চার পার্শ্বে ছিল। মিনাতে অবস্থানকারী সকল লোকই নিজ নিজ বাসস্থান হতে তাঁর ভাষণ শুনতে পেল। ভাষণে তিনি আরও বলেন- হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত কায়েম কর, রমযান মাসের সিয়াম রাখ এবং তোমাদেরকে যেই হুকুম দেয়া হয় তা পালন কর এবং তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর। তিনি তখন মানুষকে বিদায় জানালেন। এ জন্যই সেই বারের হাজ্জকে লোকেরা বিদায় হাজ্জ বলেছে।

অতঃপর তিনি মিনায় কুরবানীর জায়গায় গেলেন। নিজ হাতে তিনি ৬৩টি উট নহর যবেহ করলেন। উটকে দাঁড়ানো রেখেই বাম পা বেঁধে তিনি নহর করতেন। তিনি তাঁর বয়সের বছর সংখ্যার (৬৩ বছর) সমান সংখ্যক উট জবাই করলেন। অতঃপর তিনি নিজ হাতে যবেহ করা বাদ দিয়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ১০০ উটের বাকীগুলো জবাই করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি এগুলোর গোশত ও

চামড়া মিসকীনদেরকে সাদকাহ করে দেয়ার আদেশ দিলেন। কসাইকে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসাবে সেখান থেকে কিছু দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন- আমরা তাকে নিজেদের পক্ষ হতে পারিশ্রমিক দিব। তিনি আরও বললেন- যে ব্যক্তি কুরবানীর গোশত হতে কেটে নিতে চায় সে যেন সেখান থেকে কেটে নেয়।

যদি বলা হয় যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বিদায় হজ্জের বছর মিনাতে কেবল সাতটি উট নিজ হাতে জবাই করেছেন। এর উত্তর কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর তিনভাবে দেয়া যেতে পারে। (১) তিনি নিজ হাতে সাতটির বেশী যবেহ করেন নি; বরং সাতটি যবেহ করে ৬৩ টি পূর্ণ করার জন্য অন্য কাউকে আদেশ দিয়েছিলেন। তেষট্টিটি পূর্ণ হলে তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে আদেশ দিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করেছেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নির্দেশে ১০০টি পূর্ণ করেছেন। (২) সম্ভবতঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাতটির বেশী যবেহ করতে দেখেন নি। আর জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সবগুলো যবেহ করতে দেখেছেন। (৩) সম্ভবতঃ তিনি একাই সাতটি যবেহ করেছেন। অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সাথে নিয়ে তেষট্টিটি পূর্ণ করেছেন। যেমনটি বর্ণনা করেছেন গুরফাহ বিন হারিছ আলকেন্দী। তিনি সেদিন দেখেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলণ্ডমের উপরিভাগে ধরেছেন এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলণ্ডমের নিম্নভাগ ধরতে বলেছেন। তারা উভয়ে মিলে উটগুলো জবাই করেছেন। অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বাকী ৩৭টি একাকী যবেহ করেছেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা তাঁর কোন সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয় যে, হজ্জের মৌসুমে তাদের কেউ হাদী[১৩৩] এবং কুরবানী এক সাথে যবেহ করেছেন। বরং তাদের হাদীই ছিল কুরবানী। হাজীগণ মিনাতে যা জবাই করেন তা হচ্ছে হাদী। অন্যরা বকরা ঈদের দিন মিনার বাইরে যা যবেহ করেন তার নাম কুরবানী। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উক্তি, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেদিন তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে গরু কুরবানী করেছেন, এখানেই হাদীর ক্ষেত্রেই কুরবানী কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের সকলেই তামাত্তো হাজ্জ করেছেন। সুতরাং তাদের উপর হাদী আবশ্যক ছিল। আর তিনিই তাদের পক্ষ হতে জবাই করেছেন। এখন সমস্যা হল নয়জন স্ত্রীর পক্ষ হতে একটি গাভী যবেহ করা নিয়ে। গাভী যবেহ করার এই হাদীস তিনটি শব্দে বর্ণিত হয়েছে। (১) সকলের পক্ষ হতে তিনি মাত্র একটি গাভী কুরবানী করেছেন। (২) সে দিন স্ত্রীদের সকলের পক্ষ হতে গাভী কুরবানী করেছেন। (৩) আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন- কুরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত নিয়ে আসা হল। আমি বললামঃ এটি কি? বলা হল- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে যবেহ করেছেন।

ভাগে কুরবানী করা

কয়জনের পক্ষ হতে একটি গরু অথবা একটি উট কুরবানী করা জায়েয হবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ এবং ইমাম আহমাদ (রহেমাহুল্লাহ আলায়হি)-এর প্রসিদ্ধ মতে সাত জনের পক্ষ হতে একটি গরু অথবা একটি উট কুরবানী করা জায়েয আছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন- দশ জনের পক্ষ হতে তা

১৩৩. হাজীদের কুরবানীকে হাদী এবং হাজীগণ ব্যতীত অন্যান্য মুসলিমগণ মিনার বাইরে যে কুরবানী করেন তাকে উযহিয়াহ বা বকরা ঈদের কুরবানী বলা হয়।

জায়েয আছে। এটি হচ্ছে ইসহাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মত। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন- উক্ত হাদীসগুলোকে তিন পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। (১) উট ও গরু সাত জনের পক্ষ হতে কুরবানী করার হাদীসগুলো অধিক সংখ্যক রাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলো অধিক বিশুদ্ধ। (২) এও বলা যেতে পারে যে, গণীমতের মাল বন্টনের সময় এক উটকে তিনি দশটি ছাগলের সমান করেছেন। যাতে সুষ্ঠুভাবে তা বণ্টন করা যায় এবং তাতে কোন অসুবিধা না হয়। আর কুরবানীতে সাত জনের পক্ষ হতে একটি উট বা একটি গরু করার বিধান হচ্ছে শরীয়তের একটি বিশেষ নির্ধারণ। (৩) কোন বর্ণনায় সাত জনের পক্ষ হতে আবার কোন বর্ণনায় দশজনের পক্ষ হতে একটি উট কুরবানী করার বা একটি উটকে সাতটি বা দশটি বকরীর সমান করা স্থান, কাল ও উটের বিভিন্নতার কারণে হয়েছে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময় ও বিশেষ স্থানে উট বড় হওয়ার কারণে এবং ছাগল ছোট হওয়ার কারণে একটি উটকে দশটি ছাগলের সমান করেছেন এবং দশজনের পক্ষ হতে তা কুরবানী করার কথা বলেছেন।

আবার কোন সময় উট ছোট হওয়ার কারণে একটি উটকে সাতটি ছাগলের সমান করেছেন এবং তা দিয়ে সাত জনকে কুরবানী করার আদেশ দিয়েছেন।[১৩৪] আল্লাহই ভাল জানেন।

তিনি মিনায় মানহারে (কুরবানীর স্থানে) কুরবানীর পশু যবেহ করেছেন এবং মুসলিমদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মিনার সকল স্থানই মানহার (যবেহ করার স্থান) মক্কার গলিসমূহ মানুষের চলার রাস্তা এবং কুরবানী করার জায়গা।[১৩৫] এতে দলীল রয়েছে যে, হাজীদের কুরবানীর পশু যবেহ করার স্থান শুধু মিনা নয়; বরং মক্কার যে কোন স্থানে যবেহ করলেই চলবে। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- আমি এখানে অবস্থান করেছি। তবে আরাফার সকল স্থানই উকুফের (অবস্থানের) জায়গা। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে মিনাতে সূর্যের তাপ থেকে বাঁচার জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করার অনুমতি প্রার্থনা করা হলে তিনি অনুমতি দেন নি। বরং তিনি বললেন- মিনার যে স্থানে যে ব্যক্তি আগে পৌঁছবে সে ব্যক্তিই উক্ত স্থানের বেশী হকদার। মিনায় সকল মুসলিমের অংশীদারিত্ব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি মিনার কোন স্থানে অন্য ব্যক্তির পূর্বেই পৌঁছে যাবে সেই সে স্থানে অবস্থানের অধিক হকদার, যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তবে সে আগে অবস্থান নেওয়ার কারণে সেই স্থানের মালিক হয়ে যাবেনা।

তিনি যখন কুরবানী পূর্ণ করলেন তখন তিনি নাপিত ডেকে মাথা কামালেন এবং বললেন- হে মা'মার! তোমার হাতে রয়েছে খুর। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমার কাছে স্বীয় কানের লতি সোপর্দ

---

১৩৪. আর গরুতে কোন অবস্থাতেই সাত পরিবারের সাত জনের বেশী অংশ গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নয়জন স্ত্রীর পক্ষ হতে মাত্র একটি গরু কুরবানী করেছেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি সেদিন তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে গরু কুরবানী দিয়েছেন। এই বর্ণনা থেকে প্রত্যেক স্ত্রীর পক্ষ হতে একটি করে গরু কুরবানী দেয়ার কথা সহজেই অনুমেয়। কারণ এখানে সাধারণভাবে গরু শব্দটি উল্লেখ আছে। সংখ্যা উল্লেখ নেই। অথবা বলা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের সাতজনের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী দিয়েছেন। বাকী দুই জনের ব্যাপারে অন্য কিছু হয়েছিল। অথবা বাকী দুইজন বিভিন্ন প্রকার হজ্জ থেকে এমন হজ্জ করেছেন, যাতে আদৌ কুরবানী ওয়াজিব ছিল না। আল্লাহই ভাল জানেন।

১৩৫. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আরাফাতের সব জায়গাই হাজীদের উকুফ (অবস্থান) করার স্থান।

করে দিচ্ছেন। তখন সে বলল- হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! এটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে আমার উপর বিশেষ একটি নেয়ামত ও রহমত। নাবী ﷺ বললেন- হ্যাঁ, তাই। ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নাবী ﷺ তখন বললেন- তাহলে শুরু কর। এই বলে তিনি মাথার ডান দিকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। মাথার ডান দিক কামানো হলে তিনি চুলগুলো নিকটস্থ লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। অতঃপর তিনি নাপিতকে বাম দিকের প্রতি ইঙ্গিত করলে সে মাথার বাম দিকও কামিয়ে ফেলল। এ সময় তিনি বললেন- এখানে আবু তালহা আছে কি? অতঃপর তিনি বাম দিকের চুল আবু তালহাকে দিয়ে দিলেন।

এরপর তিনি মাথা মুন্ডকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল ছোটকারীদের জন্য মাত্র একবার মাগফিরাতের দু'আ করলেন। এ থেকে প্রমাণিত হল মাথা মুন্ডানো মূলত একটি ইবাদত; ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ ছিল তা থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম নয়।

তাওয়াফে ইফাযাহ (হজ্জের তাওয়াফ)

অতঃপর নাবী ﷺ আরোহী অবস্থায় যোহরের পূর্বে মক্কায় ফেরত আসলেন এবং তাওয়াফে ইফাযাহ (হজ্জের তাওয়াফ) করলেন। এটিই হচ্ছে তাওয়াফে যিয়ারত। এ ছাড়া তিনি আর কোন তাওয়াফ করেন নি। এর সাথে তিনি সাঈ করেন নি।[১৩৬] এটিই হচ্ছে সঠিক কথা। এতে এবং বিদায়ী তাওয়াফেও তিনি রমল করেন নি। তিনি শুধু তাওয়াফে কুদুমে রমল করেছেন।

অতঃপর তিনি যমযমের কাছে আসলেন। সেখানে লোকেরা পানি পান করছিল। তিনি বললেন- যদি এই আশঙ্কা না থাকত যে লোকেরা তোমাদেরকে পরাস্ত করে ফেলবে, তাহলে আমি নিজে নেমেও তোমাদের সাথে লোকদেরকে পানি পান করাতাম। লোকেরা তাঁকে পানির বালতি দিল। তিনি দাঁড়িয়ে তা থেকে পান করলেন। এই হাদীস দ্বারা কতক আলেম দলীল দিয়ে বলে থাকেন যে, বিনা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা নিষিদ্ধ। তবে প্রয়োজন বশতঃ দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয আছে। এটিই অধিক সুস্পষ্ট ও সঠিক মত। সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, বিদায় হজ্জের বছর উটের উপর আরোহন করে নাবী ﷺ কাবা ঘরের তাওয়াফ করেছেন। এ সময় লাঠি দিয়ে তিনি হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন। ঐ হাদীছে এও রয়েছে যে, লোকেরা যাতে তাঁকে দেখতে পারে এবং মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারে সেই জন্যই তিনি আরোহন করে ছিলেন। কারণ লোকেরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। এটি বিদায়ী তাওয়াফের ঘটনা ছিলনা। কারণ তিনি রাত্রে এ তাওয়াফ করেছেন। এটি তাওয়াফে কুদুমও ছিলনা। কারণ তাওয়াফে কুদুমে তিনি রমল করেছেন। আর এ কথা কেউ বলেন নি যে, উটের উপর আরোহন করে তিনি রমল করেছেন। অতঃপর তাওয়াফ শেষে তিনি মিনায় ফিরে গেলেন।

---

১৩৬. এ থেকেই দলীল নেয়া হয় যে, কেরান ও ইফরাদ হজ্জকারীর একটি সাঈ যথেষ্ট। চাই তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে করা হউক বা পরে। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফে কুদুমের সাথে তা করেছিলেন এবং সেটাকেই যথেষ্ট মনে করেছিলেন।

তিনি যোহরের সলাত কোথায় পড়েছেন? মক্কায়? না মিনায়? এ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও সেই দিন মাত্র একটি তাওয়াফ এবং মাত্র একটি সাঈ করেছেন। তাঁর হাজ্জ এবং উমরাহর জন্য একটি তাওয়াফ ও একটি সাঈ যথেষ্ট ছিল। সেই দিন সাফিয়াও তাওয়াফ করেছিলেন। তাওয়াফ শেষে তাঁর ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেল। এই তাওয়াফই তাঁর বিদায়ী তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট ছিল। সুতরাং তারা আলাদাভাবে বিদায়ী তাওয়াফ করার সুযোগ পেলেন না। এর ফলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল যে, কোন মহিলা যদি তাওয়াফে কুদুমের পূর্বে ঋতুবতী হয়ে যায়, তাহলে সে হজ্জে কিরান করবে। তার জন্য মাত্র একটি তাওয়াফ ও মাত্র একটি সাঈ যথেষ্ট। আর যদি তাওয়াফে ইফাযার পরে ঋতুবতী হয়ে যায়, তাহলে তার বিদায়ী তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই।

১১, ১২ এবং ১৩ তারিখে জামারায় পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাত

অতঃপর তিনি সে দিনই মিনায় ফেরত গিয়ে তথায় রাত্রি যাপন করলেন। পরের দিন সকাল হলে তিনি সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকলেন। সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি জামারাতের দিকে হেঁটে গেলেন। এই সময় তিনি বাহনে আরোহন করেন নি। প্রথমে তিনি মাসজিদে খাইফের নিকটবর্তী জামারায়ে উলার (প্রথম জামারাতের) কাছে গেলেন এবং তাতে পরপর সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তিনি আল্লাহু আকবার বললেন। সাতটি পাথর নিক্ষেপ শেষে তিনি জামারাকে পিছনে রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'আ শুরু করলেন। এই দু'আয় তিনি তাঁর উভয় হাত উঠালেন। তিনি দু'আ এত লম্বা করলেন যে, এতক্ষণে সূরা বাকারা পাঠ শেষ করা যেত। তারপর তিনি জামারায়ে উসতায় (মধ্যম জামারায়) আসলেন এবং তাতেও প্রথমটির ন্যায়ই সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন।

এখানে পাথর নিক্ষেপ করার পর তিনি বাম দিকে সরে আসলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত তুলে প্রথম বারের ন্যায়ই দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি জামারায়ে কুবরায় (বড় জামাড়ায়) গেলেন এবং উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়ালেন। এ সময় তিনি কাবাকে বামে রেখে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। পাথর মারা শেষে তিনি সেখানে অবস্থান না করে সরসূরি পিছনে ফিরে আসলেন। এখানে দু'আ না করার কারণ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন- জায়গা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে এখানে দু'আ করেন নি। আবার কেউ কেউ বলেন- এই স্থানে দু'আ করা জামরাতসমূহে পাথর নিক্ষেপের (ইবাদতের) একটি অংশ। তাই বড় জামারায় পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে এই ইবাদতটির সমাপ্তি ঘটে বলেই এখানে তিনি দু'আ করেন নি। কারণ পাথর নিক্ষেপ শেষে দু'আ করা অনার্থক। আর সঠিক কথা হচ্ছে ইবাদতের মাঝখানে দু'আ করাই হচ্ছে উত্তম; শেষে নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- এ মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। সলাতের মধ্যেও এটিই ছিল তাঁর পবিত্র সুন্নাত। তিনি সলাতের মাঝখানে দু'আ করতেন; শেষে নয়। সলাত শেষে দু'আ করার ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি।[১৩৭]

---

১৩৭. বর্তমান সময়ে পাক, ভারত, বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের বিরাট একটি অংশের মুসলিমগণ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাতের পরই হাত তুলে দলবদ্ধভাবে দুআ করে থাকে। এই ভাবে দুআ করার কথা কোন সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয় নি। অথচ সলাত

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- আমার অন্তরে সর্বদা একটি খটকা রয়ে যাচ্ছে যে, আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে তথা ১১, ১২, ও ১৩ তারিখে তিনি কি যোহরের পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করেছেন? না যোহরের পরে? এ ব্যাপারে আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে তিনি যোহরের পূর্বেই নিক্ষেপ করেছেন। কেননা জাবের এবং অন্যান্য সাহাবীগণ বলেছেন- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথেই পাথর নিক্ষেপ করতেন।

বিদায় হজ্জের বছর দু'আ করার জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথায় কোথায় অবস্থান করেছেন?

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের বছর দু'আ করার জন্য ছয়টি স্থানে অবস্থান করেছেন। (১) 'সাফা'এর উপর (২) মারওয়ার উপর (৩) আরাফায় (৪) মুযদালিফায় (৫) জামারায়ে উলায় (ছোট জামারায়) এবং (৬) জামারায়ে উসতায় (মধ্যম জামারায়)।

মিনায় তিনি দু'টি খুতবা দিয়েছেন। একটি দিয়েছেন কুরবানীর দিন। এটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যটি হচ্ছে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝখানে।

হাজীদের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে কিংবা অন্য কোন শরঈ উযর থাকলে মিনায় রাত্রি যাপন করা জরুরী নয়ঃ

আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাজীদেরকে পানি পান করানোর জন্য মিনার রাতসমূহ মক্কায় কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন। উটের রাখালগণ মিনার বাইরে উটের নিকট রাত্রি যাপনের অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকেও অনুমতি দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে কুরবানীর দিন এবং বাকী দুই দিনের পাথর এক সাথে দুই দিনের যে কোন এক দিন মারার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- আমার ধারণা, নাবী (তাদেরকে দুই দিনের প্রথম দিনে এক সাথে দুই দিনের পাথর মারতে বলেছেন এবং শেষের দিন তথা বিদায়ের দিন মারতে বলেছেন। ইবনে উয়াইনা বলেন- তিনি রাখালদেরকে এক দিন পাথর মারার আরেক দিন না মারার অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং হাজীদের জন্য পানি ব্যবস্থাকারী এবং উটের রাখালদেরকে মিনায় রাত্রি যাপন বর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু পাথর নিক্ষেপ বর্জন করার অনুমতি দেন নি। বরং তাদের জন্য জায়েয আছে যে, তারা ইচ্ছা করলে রাত্রে পাথর নিক্ষেপ করবে অথবা দুই দিনের পাথর এক সাথে মারবে।

সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সকল মাসআলাই বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাতের পর যদি প্রচলিত নিয়মে দুআ করা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত হত তাহলে এই বিষয়টি অবশ্যই সাহাবীদের কাছে গোপন থাকার কথা নয়। যেহেতু কোন সাহাবী থেকে সহীহ সূত্রে এই পদ্ধতিতে দুআ করার কথা বর্ণিত হয় নি, তাই বুঝা গেল এটি সুন্নাত বা মুস্তাহাব নয়; বরং এটি সুস্পষ্ট বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। আব্দুল আযিয বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ সমসাময়িক বিজ্ঞ আলেমগণও এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, জুমআর সলাত এবং ঈদাইনের সলাত শেষে হাত তুলে দলবদ্ধভাবে দুআ করাকে বিদআত বলেছেন। (আল্লাহই ভাল জানেন)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- কেউ যদি তার সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত থাকে অথবা নিজে অসুস্থ থাকার কারণে মিনায় রাত্রি যাপন করা অসম্ভব হয়, তাহলে রাখাল ও পানি সরবরাহ কারীদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছের উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত লোকদের জন্যও মিনায় রাত্রি যাপন করা জরুরী নয়।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই দিন পাথর মেরে মিনা ছেড়ে চলে আসেন নি; বরং তিন দিন পাথর মারা পূর্ণ করেছেন। মঙ্গলবারের দিন তিনি যোহরের সলাতের পর মুহাস্‌সাব নামক উপত্যকার দিকে রওয়ানা হলেন। এটি ছিল আবতাহ নামে পরিচিত। এখানেই ছিল বনী কেননার তাঁবু। সেখানে আবু রাফে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর জন্য তাঁবু প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। শুধু আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত তাওফীকের কারণেই তিনি এই কাজ করেছিলেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এই মর্মে কোন আদেশ দেন নি। সুতরাং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সলাত আদায় করলেন। তিনি সেখানে সামান্য সময় শুয়ে থাকলেন। অতঃপর শয়ন থেকে উঠে তিনি মক্কায় গিয়ে রাতের শেষাংশে বিদায়ী তাওয়াফ করলেন।

তানঈম থেকে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উমরাহ

সেই রাতে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আকাঙ্খা করলেন যে, তিনি যেন তাঁকে আলাদাভাবে একটি উমরাহ করার সুযোগ দান করেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, কাবা ঘরের তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ হাজ্জ এবং উমরাহ- উভয়ের জন্যই যথেষ্ট। কিন্তু তিনি স্বীয় অবস্থানে অনড় থাকলেন এবং আলাদাভাবে উমরাহ করার ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করলেন। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ভাই আব্দুর রহমান বিন আবু বকরকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁকে তানঈম থেকে উমরাহ করান। তিনি রাতেই উমরাহ সম্পন্ন করলেন। অতঃপর মধ্যরাতে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ভাইয়ের সাথে মুহাস্‌সাবে পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি উমরাহ শেষ করেছ? তিনি বললেন- হ্যাঁ শেষ করেছি। অতঃপর তিনি কাফেলাকে যাত্রা করার হুকুম দিলেন। লোকেরা যাত্রা শুরু করল।

সহীহ বুখারীতে আসওয়াদ হতে বর্ণিত আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন- অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন তিনি মক্কা হতে বের হচ্ছিলেন এবং আমি তাতে প্রবেশ করছিলাম। কিংবা তিনি প্রবেশ করছিলেন আর আমি বের হচ্ছিলাম। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা উভয়ে রাস্তায় সাক্ষাৎ করেছেন। পূর্বের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁবুতে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আসওয়াদের হাদীসটি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সঠিক কথা হচ্ছে, তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন আমি মক্কা হতে বের হচ্ছিলাম আর তিনি মক্কার দিকে যাচ্ছিলেন। কেননা তিনি উমরাহ শেষ করে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাতের জন্য উপরে উঠছিলেন। তখন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর সাথে এমন সময় সাক্ষাত করলেন যখন তিনি বিদায়ী তাওয়াফের জন্য মক্কার দিকে নামছিলেন। এই ঘটনাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মুহাস্‌সাবে অবস্থান করা কি সুন্নাত? না ঘটনাক্রমে এখানে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবস্থান করেছেন? এ সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়।

কেউ কেউ বলেছেন, এটি হজ্জের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। আবার কেউ বলেছেন, এখানে রসূল ﷺ ঘটনাক্রমে অবস্থান করেছেন; সুন্নাত হিসাবে নয়।

কাবা ঘরে প্রবেশ করা কি হজ্জের সুন্নাত

অনেকেই মনে করেন, কাবা ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হজ্জের সুন্নাত এবং নাবী ﷺ-এর অনুসরণের অন্তর্ভূক্ত। তবে এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদীস একত্রিত করলে বুঝা যায়, হাজ্জ বা উমরাহ করার সময় কাবা ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নি; বরং তিনি মক্কা বিজয়ের দিন তাতে প্রবেশ করেছেন। মুলতাযামে অবস্থানের ব্যাপারেও একই কথা। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এখানে দাঁড়িয়ে দু'আ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) আমর বিন শুআইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর বুক, চেহারা, তাঁর উভয় বাহু এবং হাত প্রসারিত করে মুলতাযামে রেখে দু'আ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন- আমি রসূল ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।[১৩৮] এটি হতে পারে বিদায়ী তাওয়াফের সময়, হতে পারে অন্য সময়ের ঘটনা। কিন্তু মুজাহিদ এবং অন্যান্যগণ বলেন- বিদায়ী তাওয়াফের পর মুলতাযামে সামান্য সময় দাঁড়িয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'আ করতেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ যখন মক্কা হতে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখনও উম্মে সালামা তাওয়াফ করেন নি। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনিও যাত্রা করতে চাইলেন। নাবী ﷺ তখন তাকে বললেন- যখন ফজরের সলাতের ইকামত দেয়া হবে এবং লোকেরা সলাত আদায় করবে তখন তুমি উটের উপর আরোহন করে তাওয়াফ করবে। তিনি তাই করলেন এবং বের হওয়ার পূর্বে ফজরের সলাত আদায় করেন নি।

এই ঘটনাটি ছিল মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফের সময়কার। এটি কুরবানীর দিনের ঘটনা নয়। এ থেকে আরও বুঝা গেল যে, রসূল ﷺ সে দিন মক্কায় ফজরের সলাত পড়েছেন। উম্মে সালামা সেদিন ফজরের সলাতে রসূল ﷺ কে সূরা তুর পড়তে শুনেছেন। অতঃপর তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।

তিনি যখন 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন একটি কাফেলার সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- এরা কোন সম্প্রদায়ের লোক? তারা বলল- মুসলিম। তারা জিজ্ঞেস করলঃ আপনারা কোন্ সম্প্রদায়? বলা হল, তিনি হলেন রসূলুল্লাহ্ ﷺ। তখন একটি মহিলা তাঁর শিশুকে উঠিয়ে বলল- হে আল্লাহর রসূল! এরও কি হাজ্জ আছে? তিনি বললেন- হ্যাঁ, তার হাজ্জও বিশুদ্ধ হবে। তোমারও ছাওয়াব মিলবে।

---

১৩৮. ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। আবু দাউদ, আলএ. হা/ ১৮৯৯।

ফেরার পথে তিনি যুল-হুলায়ফায় এসে রাত্রি যাপন করলেন। যখন মদীনা মুনাওয়ারা চোখে পড়ল তখন তিনি তিনবার আল্লাহু আকবার বললেন এবং এই দু'আটি পাঠ করলেন-

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِـدُونَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

"এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। মালিকানা তাঁরই। সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সেজদাহকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সকল শত্রুদলকে একাই পরাজিত করেছেন।" [১৩৯]

অতঃপর তিনি দিনের বেলায় মুআররিসের পথ দিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন। যখন তিনি মদীনা হতে বের হয়েছিলেন তখন শাজারার পথ দিয়ে বের হয়েছিলেন।

কুরবানী ও আকীকার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর আদর্শ

কুরবানী ও আকীকাহ সেই আট প্রকার পশুর দ্বারাই করতে হবে, যা সূরা আনআমে বর্ণিত হয়েছে।[১৪০] এ ছাড়া অন্যান্য জন্তু দিয়ে কুরবানী করার কথা প্রমাণিত নেই। এই আট প্রকার জন্তুর কথা কুরআনের চারটি আয়াতের মধ্যে উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾

"তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে"। (সূরা মায়েদা-৫:১) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾

"যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময়"। (সূরা হাজ্জ-২২:২৮) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

"তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে (ছোট আকৃতির জানোয়ার)। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে অবশ্যই তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আনআম-৬:১৪২) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

---

১৩৯. বুখারী, তাও. হা/১৭৯৭, মুসলিম মাশা. হা/৩৩৪৩, আবু দাউদ, আলএ. হা/২৭৭০

১৪০ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا

অর্থাৎ (নর-মাদী চার) জোড়ায় আট প্রকার, মেষের দু'টি, ছাগলের দু'টি। বল, তিনি কি নর দু'টি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টি কিংবা মাদী দু'টির গর্ভে যা আছে তা? এ সম্পর্কিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জবাব দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর উটের দু'টি, আর গরুর দু'টি। বল, এদের নর দু'টি কি তিনি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টি অথবা মাদী দু'টির গর্ভে যা আছে তা? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এ রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন? (সূরা আনআম-৬:১৪৩-১৪৪)

﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾

"তোমাদের মধ্যে যে জেনে শুনে শিকার হত্যা করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে- বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌছাতে হবে"।[১৪১] এ থেকে জানা গেল যে, এই আট প্রকার জন্তুই কাবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এই আয়াত থেকে আলী বিন আবু তালেব এভাবেই দলীল গ্রহণ করেছেন।

ইবাদতের জন্য যে সমস্ত যবেহ করা হয়, তা তিন প্রকার। (১) হাজীগণের কুরবানী (হাদী)। (২) ঈদুল আযহার কুরবানী এবং (৩) আকীকাহ।

হজ্জের কুরবানী (হাদী) যবেহ করার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর আদর্শ

নাবী ﷺ হজ্জের কুরবানীতে ছাগল ও উট যবেহ করেছেন। তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে গরু কুরবানী করেছেন। তিনি মদীনাতে থাকা অবস্থায়, হজ্জের সফরে এবং উমরার সফরে হাদী (কুরবানী) প্রেরণ করেছেন। তিনি ছাগলের গলায় কেলাদা (কুরবানীর নিদর্শন হিসেবে মালা) পরাতেন। দাগ দিয়ে নিশানা লাগাতেন না। তিনি যদি কাবায় হাদী (কুরবানীর জানোয়ার) পাঠাতেন তাহলে তিনি নিজের উপর কোন হালাল বস্তুকেই হারাম মনে করতেন না।

আর তিনি যখন কুরবানীর জন্য মক্কায় উট পাঠাতেন তখন উটের গলায় মালা পরাতেন এবং উটের গায়ে নিশানাও লাগাতেন। তিনি উটের কুঁজের ডান পাশে সামান্য চিরে রক্ত প্রবাহিত করতেন। তিনি যখন হাদী (কুরবানীর জন্তু) পাঠাতেন তখন প্রেরিত ব্যক্তিকে বলে দিতেন, জন্তুটি মরে যাওয়ার উপক্রম হলে সেটিকে যেন যবেহ করে দেয়া হয়। অতঃপর স্বীয় জুতায় জন্তুটির রক্ত মাখিয়ে যেন জন্তুর পৃষ্ঠদেশে রেখে দেয়া হয়। প্রেরিত ব্যক্তিকে আদেশ দিতেন যে, সে এবং তার সাথীগণ সেখান থেকে যেন কিছু না খায়। বরং অন্যদের মাঝে যেন তা বিতরণ করে দেয়া হয়। তাকে খেতে এই জন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, যাতে পশুটির যত্ন নিতে সে যেন কোন প্রকার অলসতা না করে। অর্থাৎ এই সন্দেহ যাতে না হয় যে, অযত্ন ও অবহেলার কারণে পশুটি মরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে সে যবেহ করে নিজে এবং তার সাথীগণ গোশত খেয়ে নিয়েছে।

নাবী ﷺ একটি উট ও একটি গরুর মধ্যে সাতজনের অংশ গ্রহণকে বৈধ বলেছেন। কুরবানীর জন্তু মক্কার উদ্দেশ্যে চালিয়ে নেয়ার সময় চালককে তার উপর আরোহন করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে শর্ত হচ্ছে, যদি আরোহনের জন্য অন্য কোন বাহন না পাওয়া যায় এবং যাতে পশুর কষ্ট না হয়। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- উটনীর যদি বাচ্চা থাকে, তাহলে বাচ্চা পান করার পর অবশিষ্ট দুধ পান করা চালকের জন্য জায়েয আছে।

---

১৪১. সূরা মায়েদা-৫:৯৫

বাম পা বেঁধে তিন পা-এর উপর খাড়া রেখে উটকে নহর করা (সামনের দু'পা বরাবর বুকে ধাঁরালো অস্ত্র ঢুকিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা) তাঁর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল। নহর করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তিনি নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করতেন। কখনও তিনি এই কাজের জন্য অন্য কাউকে নিয়োগ করতেন। তিনি যখন ছাগল যবেহ করতেন স্বীয় ছাগলের চেহারার এক পার্শ্বে 'পা' রাখতেন এবং বিসমিল্লাহ্ 'আল্লাহু আকবার' বলে ছুরি চালাতেন। তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য হজ্জের ও ঈদের কুরবানীর গোশত খাওয়া বৈধ করেছেন এবং তা রেখে দিয়ে পরবর্তীতে সফর সামগ্রী হিসেবে সাথে বহন করার অনুমতি দিয়েছেন। একবার মদীনায় অভাব দেখা যাওয়ার কারণে তিন দিনের বেশী জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কখনও তিনি কুরবানীর গোশত বিলিয়ে দিতেন। কখনও তিনি বলতেন- যে চায় সে যেন এ রকম করে এবং যে চায় সে যেন কেটে নিয়ে যায়। এ থেকে দলীল পাওয়া যায় যে, বিয়ের অলীমা, ঈদের দিন বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে যে সমস্ত বস্তু সকলের জন্য ছিটিয়ে দেয়া হয় বা ফেলে রাখা হয় তা থেকে লুটে নেওয়া জায়েয। অনেকেই কুরবানীর গোশত ও বিবাহের অনুষ্ঠানে ছিটিয়ে রাখা বস্তু থেকে লুটে নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অথচ তা সঠিক নয়। তিনি উমরার হাদী (কুরবানী) মারওয়ার নিকট যবেহ করতেন আর হজ্জে কিরানের হাদী মিনাতে যবেহ করতেন। হালাল না হয়ে তথা ইহরাম না খুলে তিনি কখনও কুরবানীর পশু জবাই করতেন না। সূর্য উদয়ের আগে এবং জামারায়ে কুবরায় পাথর নিক্ষেপ করার পূর্বে তিনি হাদী যবেহ করেন নি। কুরবানীর দিন তথা যুল-হাজ্জ মাসের ১০ তারিখে চারটি কাজ তিনি ধারাবাহিকভাবে করতেন। প্রথমে তিনি পাথর নিক্ষেপ করতেন, অতঃপর কুরবানী করতেন, অতঃপর মাথা মুন্ডাতেন এবং সর্বশেষে তাওয়াফ করতেন। সূর্য উঠার পূর্বে কুরবানী করার অনুমতি দেন নি।

ঈদের কুরবানীর ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর সুন্নাত

কুরবানীর ক্ষেত্রে তাঁর পবিত্র সুন্নাত হল, তিনি কখনও এই সুন্নাতটি ছাড়েন নি। তিনি ঈদের দিন ঈদের সলাতের পর দু'টি করে মেষ কুরবানী করতেন। তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি ঈদের সলাতের পূর্বে জবাই করবে তার কুরবানী ইবাদত হিসেবে গণ্য হবেনা। এটি হবে গোশত খাওয়ার যবেহ, যা সে তার পরিবারের লোকদেরকে খাওয়াতে চেয়েছে। এটিই হচ্ছে নাবী ﷺ-এর পবিত্র সুন্নাত। সলাতের সময় হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং আগে সলাত পড়তে হবে, তারপর কুরবানীর জন্তু যবেহ করতে হবে। ছয় মাস বয়সের ভেড়া কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। অন্যান্য পশুর ক্ষেত্রে দাঁত ওয়ালা হওয়া জরুরী। অর্থাৎ ছাগল এক বছর, গরু দুই বছর এবং উটের বয়স পাঁচ বছর হওয়া জরুরী। নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আইয়্যামে তাশরীকের সকল দিনই পশু যবেহ করার সময়। তবে এই হাদীছের সনদ মুনকাতে (বিচ্ছিন্ন)। এটিই ইমাম আতা, হাসান বসরী এবং ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)এর অভিমত। ইবনুল মুনযির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)এর মতও তাই।

কুরবানীর জন্য সবচেয়ে উত্তম এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত পশু নির্বাচন নাবী ﷺ এর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তিনি ভাঙ্গা শিং এবং কাটা কান বিশিষ্ট পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। কান যদি অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশী কাটা থাকে এবং শিং যদি অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশী ভাঙ্গা থাকে তাহলে তা দিয়ে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সুনানে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। নাবী ﷺ কুরবানীর পশু সংগ্রহ করার সময় চোখ ও কান ভাল করে দেখে নিতে বলেছেন। সুতরাং কানের অগ্রভাগ কাটা বা গোড়ার দিক কাটা এবং লম্বাভাবে চিরা-ছেড়া-ফাটা কান ওয়ালা পশু দ্বারা কুরবানী করা জয়েয নয়।

ঈদগাহে কুরবানী করা তাঁর পবিত্র সুন্নাত ছিল। ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে উল্লেখ করেছেন যে, নাবী ﷺ কুরবানীর দিন শিং ওয়ালা এবং খুব সুন্দর রং বিশিষ্ট দু'টি খাসী যবেহ করেছেন। খাসী দু'টিকে শায়িত করে তিনি এই দু'আ পাঠ করেছেনঃ

«إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ»

"হে আল্লাহ্! আমি একমুখী হয়ে স্বীয় মুখমন্ডল ঐ সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেকদের অন্তর্ভূক্ত নই। আমার সলাত, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্যে। তার কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। হে আল্লাহ্! এটি তোমার পক্ষ হতে প্রাপ্ত এবং এই কুরবানী তোমার জন্যই। অর্থাৎ তোমার নৈকট্য লাভের জন্যই। এটি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ হতে। তুমি এটিকে কবুল কর। অতঃপর বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করেছেন। তিনি পশু যবেহ করার সময় মানুষকে পশুর উপর ইহসান করতে বলেছেন। অর্থাৎ ধাঁরালো অস্ত্র দিয়ে এবং এক আঘাতে যবেহ করবে। এতে পশুর কষ্ট কম অনুভব হবে। এমনিভাবে কাউকে কেসাস স্বরূপ হত্যা করলে উত্তমভাবে হত্যা করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর রহম (দয়া) করা ফরয করেছেন। আর কুরবানীতে একজন কিংবা একটি পরিবারের পক্ষ হতে একটি ছাগল যথেষ্ট।

আকীকার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর সুন্নাত

মুআত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে এসেছে, ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে আকীকাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন- আমি আকীকাহ শব্দটি পছন্দ করিনা। কারণ আকীকাহ শব্দটি আরবী عـق শব্দ হতে গৃহীত। আক্কা অর্থ নাফরমানী করা অবাধ্য হওয়া। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়াকে আরবীতে عقـوق الوالدين উকুকুল ওয়ালিদাইন বলা হয়। তাই ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সন্তান জন্ম উপলক্ষে ইবাদত হিসেবে

যেই পশু যবেহ করা হয় তাকে আকীকাহ নামে নামকরণ করাকে অপছন্দ করেছেন। রসূল ﷺ বলেন-

«عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

"ছেলে সন্তান হলে দু'টি সমবয়সের ছাগল এবং মেয়ে সন্তান হলে একটি ছাগল দিয়ে আকীকাহ দিতে হবে।[১৪২] তিনি আরও বলেন-

«كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى»

"আকীকাহ না করা হলে সন্তান রিহান (رهـــان) বন্ধক থাকে"।[১৪৩] সুতরাং সপ্তম দিনে সন্তানের আকীকাহ করা উচিত। সেই সাথে মাথা কামাবে এবং নাম রাখবে।[১৪৪] ভাষাবিদগণ বলেন- রিহান অর্থ হচ্ছে আটকিয়ে রাখা। অর্থাৎ আকীকাহ না করলে সন্তান শয়তানের প্ররোচনার শিকার হওয়া থেকে মুক্ত হয়না বা পিতা-মাতা সন্তানের সদাচরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন- সে পিতা-মাতার জন্য শাফাআত করা থেকে বঞ্চিত হবে। তবে প্রকাশ্য কথা হচ্ছে সন্তান থেকে যে কল্যাণের আশা করা হয় সে নিজেই সেই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। আখিরাতে সে শাস্তি পাবে- এটি উদ্দেশ্য নয়। কখনও সন্তান পিতা-মাতার ত্রুটির কারণে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন স্ত্রী সহবাস করার সময় বিসমিল্লাহ্ না বলা (স্ত্রী সহবাসের সময় দু'আ পাঠ না করা)।

ইমাম আবু দাউদ তাঁর মারাসিল গ্রন্থে জাফর বিন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আকীকাহ করার সময় বলেছেন- দুধ মাতা-এর ঘরে এর একটি ঠ্যাং (রান) পাঠিয়ে দাও, তোমরা এ থেকে খাও এবং অন্যদেরকে খেতে দাও। তবে তোমরা এর কোন হাড় ভেঙ্গোনা।

মাইমুনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- আমরা পরস্পর আলোচনা করলাম যে, জন্মের কত দিন পর বাচ্চার নাম রাখতে হবে? তখন আবু আব্দুল্লাহ্ আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন- তৃতীয় দিনে নাম রাখতে হবে। আর সামুরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- সপ্তম দিনে রাখতে হবে।[১৪৫]

নাম ও কুনীয়ত (উপনাম) রাখা সম্পর্কে নাবী ﷺ এর সুন্নাত

নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ঐ ব্যক্তির নাম যে নিজের নাম মালিকুল আমলাক তথা শাহানশাহ বা রাজাধিরাজ রাখল। কেননা আল্লাহই একমাত্র বাদশাহ। তিনি আরও বলেন- আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অধিক প্রিয় নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও

---

১৪২. আবু দাউদ, আলএ. হা/২৮৩৪, তিরমিযী মাপ্র. হা/১৫১৩, ও মুসনাদে আহমাদ।

১৪৩. আবু দাউদ, আলএ. হা/২৮৩৮, আহমাদ, তিরমিযী ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থ।

১৪৪. আহমাদ, তিরমিযী ও নাসাঈ।

১৪৫. এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের কথাটি সবচেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ। তিনি বলেন, কথাটি শাফায়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যেই শিশুর আকীকা দেওয়া হয়নি, সে যদি মৃত্যু বরণ করে, কিয়ামতের দিন শিশুর শাফায়'াত থেকে তার পিতা-মাতা বঞ্চিত হবে। আর হাদীসে একথা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমানদের যে সমস্ত শিশু বাচ্চা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করবে, তারা তাদের মুসলিম পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর দরবারে শুপারিশ করবে।

আব্দুর রহমান। সবচেয়ে অধিক সুন্দর নাম হচ্ছে, হারিছ ও হাম্মাম এবং মন্দ নাম হচ্ছে হার্‌ব (যুদ্ধ) ও মুর্‌রা (তিক্ত)। নাবী ﷺ আরও বলেন- তোমরা ছেলে সন্তানের নাম ইয়াসার, রাবাহ্, নাজিহ এবং আফলাহ্ রাখবেনা। কেননা হয়ত তোমরা কখনও বলবে যে এখানে সে (ইয়াসার বা রাবাহ বা নাজিহ বা আফলাহ) আছে কি? সে যদি সেখানে না থাকে তাহলে বলা হবে নাই।[১৪৬]

মন্দ নামকে ভাল নামে পরিবর্তন করা তার পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল। নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি عاصية আসীয়া (পাপী) নাম পরিবর্তন করে জামীলাহ নাম রেখেছেন। উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পূর্বের নাম ছিল বার্‌রা (পূণ্যবান)। নাবী ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জুওয়াইরিয়া। যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- নাবী ﷺ বর্‌রা নাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

আর তিনি বলেছেন- তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবী করোনা। কেননা আল্লাহই ভাল জানেন তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র।[১৪৭] তিনি আবুল হাকামের নাম পরিবর্তন করে আবু শুরাইহ রেখেছেন। আর তিনি আসরামের নাম বদল করে যারআ রেখেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর দাদার নাম ছিল হায্‌ন (শক্ত মাটি)। তিনি তা পরিবর্তন করে রাখলেন সাহ্‌ল (নরম ভূমি), যাতে চলাচল করা সহজ এবং যা চাষাবাদের জন্য উপযোগী।

ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ আস (পাপী-অবাধ্য), আযীয (শক্তিশালী-কঠিন), আতলা (অবাধ্য), শয়তান (অভিশপ্ত-বিতাড়িত), হাকাম (মহা জ্ঞানী), গুরাব (কাক), হুবাব, শিহাব (অগ্নিপিন্ড) ইত্যাদি নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি শিহাবের নাম পরিবর্তন করে হিশাম রেখেছেন। হারব (যুদ্ধ)-এর নাম বদল করে সিল্‌ম (শান্তি) রেখেছেন। মুযতাযি (ঘুমন্ত-শায়িত)-এর নাম পরিবর্তন করে মুনবাইছ (জাগ্রত) রেখেছেন। তিনি সাদা যমীনের নাম বদল করে সবুজ যমীন নাম করণ করেছেন। গোমরাহীর ঘাটিকে পরিবর্তন করে হিদায়াতের ঘাটি হিসেবে নাম দিয়েছেন। বনু মুগবীয়া (গোমরাহ সম্প্রদায়)এর নাম বদল করে বনু রিশদাহ তথা জ্ঞানী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত সম্প্রদায়

---

১৪৬. ইয়াসার অর্থ সহজ, রাবাহ, নাজিহ ও আফলাহ-এই তিনটি নামের অর্থ হচ্ছে সফল, সফলতা ইত্যাদি ভাল অর্থ। এই শব্দগুলোর দ্বারা কোন ছেলে সন্তানের নাম রাখতে নিষেধ করার কারণ হল, উপরোক্ত নামে যদি কারও নাম রাখা হয় তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, অচিরেই তাকে উক্ত নাম ধরে ডাকা হবে। বলা হবে এখানে আফলাহ (সফলতা) নাজিহ (সফলকাম) রাবাহ (লাভবান) আছে কি? সে যদি ঐ স্থানে উপস্থিত না থাকে তাহলে অবশ্যই উত্তর আসবে এখানে সে নাই। এই না সূচক উত্তরকে শ্রোতাগণ অশুভ লক্ষণ মনে করতে পারে। অর্থাৎ এখানে সফলতা, সফল লাভবান কোন ব্যক্তি নেই- এ ধরণের কথা লোকেরা কুলক্ষণ মনে করতে পারে। তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরণের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

১৪৭. বার্‌রা বা এ জাতীয় যে সমস্ত নামের মধ্যে নামকরণকৃত ব্যক্তির পবিত্রতা ও প্রশংসার আভাস রয়েছে সে সমস্ত নাম রাখা ঠিক নয়। এমনি ভাবে দূর্ণাম ও নিন্দা বুঝায় এমন নামেও কারও নাম রাখা মাকরূহ। তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরণের নাম পরিবর্তন করে ভাল ও সুন্দর নাম রেখেছেন। তিনি এমন নামে সন্তানের নাম করণ করতে বলেছেন, যাতে বিনয়-নম্রতা ও আল্লাহর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দাস-বান্দা, আব্দুর রাহমান বা রাহমানের গোলাম ইত্যাদি। আর যে সমস্ত নামের মধ্যে শিরক রয়েছে সে সমস্ত নাম থেকে তিনি কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। যেমন আব্দুল হারিছ (শয়তাতের বান্দা) আব্দুল মুত্তালেব (মুতালেবের বান্দা) ইত্যাদি।

Contents

বলে নাম দিয়েছেন। (মূলতঃ কোন মানুষ, বস্তু বা স্থানের এমন নাম রাখাকে তিনি অপছন্দ করতেন, যা মানুষের কাছে অপছন্দনীয় অর্থ বহন করে বা অপছন্দনীয় কোন অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে)।[১৪৮]

বস্তুর নাম যেহেতু বিশেষ অর্থ বহন করে, তাই নাম ও নামকরণকৃত বস্তুর মাঝে গভীর সম্পর্ক থাকা জরুরী। সুতরাং কারও নাম যেন এ রকম না হয় যে, নামের অর্থ হচ্ছে এক রকম আর সেই ব্যক্তির চরিত্র ও আচার-আচরণ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ এটি এমন বিষয়, যা মানুষের বিবেক ও স্বভাব মেনে নেয়না।[১৪৯] ব্যক্তির নাম তার ব্যক্তি সত্তার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে।

মানুষও তার ভাল বা খারাপ, উচ্চ মানের বা নিম্ন মানের নাম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কোন একজন আরব কবি বলেন- তুমি যদি বিশেষ উপাধী ওয়ালা কোন মানুষকে দেখ তাহলে তার বৈশিষ্ট সেই উপাধীর মধ্যেই খুঁজে পাবে।

নাবী ﷺ সুন্দর নাম পছন্দ করতেন এবং সুন্দর নাম রাখার আদেশ দিতেন। তাঁর কাছে কোন লোক আসলে তিনি আগমণকারীর নাম ও আকার-আকৃতি সুন্দর হওয়া পছন্দ করতেন। নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থায় তিনি নামের অর্থ উপলব্ধি করতেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ উকবা বিন রাফে-এর ঘরে অবস্থান করছেন। তখন তাদের কাছে ইবনে তাবের তাজা (কাচা-পাকা) খেজুর উপস্থিত করা হল। তিনি এর ব্যাখ্যা করলেন যে, দুনিয়াতে মুসলিমদের শেষ পরিণতি ভাল হবে এবং আখিরাতে তারাই সফলকাম হবে। আর আল্লাহ তাদের জন্য যে দ্বীনকে চয়ন করেছেন, তা নরম ও তাজা খেজুরের ন্যায় খুব সহজ-সরল।

হুদাইবিয়ার দিন সুহাইল বিন আমরের আগমণের মাধ্যমে তিনি কাজটি সহজ হওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা সুহাইল নামটি সাহ্‌ল থেকে গৃহীত। এর অর্থ হচ্ছে সহজ। একবার তিনি সাহাবীদেরকে ছাগলের দুধ দোহন করতে বললেন। একজন লোক সেই কাজে অগ্রসর হলে তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করলেন- তোমার নাম কি? সে বলল- মুর্‌রা (তিক্ত)। নাবী ﷺ তখন বললেন- তুমি বস। এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়াল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমার নাম কি? সে বলল- হারব (যুদ্ধ)।

---

১৪৮. সৌদি আরবের আল-যুবাইল শহর থেকে আনুমানিক ১০০ কিলোমিটার দূরে একটি অঞ্চলের নাম ছিল رأس الزور রাসুয যুর। এর সরল বাংলা অনুবাদ হচ্ছে মিথ্যার মাথা। আরবী ভাষায় যার সামান্য জ্ঞান আছে সেও নামটি শুনেই অপছন্দ করবে। স্থানের নাম মিথ্যার মাথা হয় কিভাবে? তা ছাড়া এই শহরে রয়েছে বিভিন্ন মূল্যবান খণিজ সম্পদ। এটি ২০০৯-১০ সালের ঘটনা। ২০১২ ইং সালে সেই অঞ্চলে গিয়ে দেখি যে সব স্থানে রাসুয্‌ যুর লেখা ছিল সেখানে লেখা আছে رأس الخير অর্থাৎ কল্যাণের মাথা। পরবর্তীতে জানতে পারলাম যে, বর্তমান সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ্‌ বিন আব্দুল আযীয সেখানে কোন এক প্রকল্প উদ্বোধন করতে এসে এই শহরের পুরাতন নাম রাসুয্‌ যুরের পরিবর্তে রাসুল খাইর রেখেছেন।

১৪৯. যেমন কারও নাম রাখ হল মিষ্টি। কিন্তু দেখা গেল তার ব্যবহার অত্যন্ত কঠোর ও নিকৃষ্ট। অপর পক্ষে কারও নাম রাখা হল তিক্ত-তিতা। কিন্তু দেখা গেল তার ব্যবহার খুবই মিষ্ট। এ ক্ষেত্রে নামের অর্থ ও নাম বহনকারী লোকের বৈশিষ্ট ভিন্ন হওয়ার কারণে এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্য থাকার কারণে মানুষের বিবেক এ সমস্ত নাম মানুষ সহজভাবে মেনে নেয় না। এমনি কারও নাম যদি রাখা হয় আসাদ (সিংহ), কিন্তু দেখা যায় সে সিংহের মত সাহসী নয়, কারও নাম যদি রাখা হয় জাওয়াদ (দানাবীর), কিন্তু সে খুবই কৃপণ, এভাবে নাম রাখা ইসলাম সমর্থন করে না।

সুন্দর নামের অধিকারীর উপর নামের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ্‌, আব্দুর রাহমান ইত্যাদি নামের যেহেতু সুন্দর অর্থ রয়েছে তাই এই জাতীয় নামের কারণেও মানুষ সৎগুণাবলী অর্জন করতে পারে। অনেক সময় ভাল নামের কারণেও মানুষের ভালবাসা ও সমাদর পাওয়া যায়।

তিনি তাকেও বসতে বললেন। আরেক ব্যক্তি দাঁড়ালে তিনি তারও নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলল- ইয়া-ঈশ (দীর্ঘ জীবি হবে)। এবার তিনি বললেন- তাহলে তুমি দুধ দোহন কর।

যে সমস্ত জায়গার নাম সুন্দর নয়, তিনি তা অপছন্দ করতেন এবং সেখান দিয়ে পথ চলাও অপছন্দ করতেন। তিনি একবার দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেই পাহাড় দু'টির নাম জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল- ফাযেহ (অপদস্তকারী) এবং মুখযি (অপমানকারী)। এ রকম নাম শুনে তিনি সেই রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য পথে চললেন।

একই ব্যক্তির দেহ ও মনের মধ্যে যেরকম সম্পর্ক রয়েছে নাম ও নাম বহনকারী ব্যক্তির মধ্যে তেমনি গভীর সম্পর্ক থাকে। তাই বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কোন মানুষের নাম শুনেই তার আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেন। এমনিভাবে আচার-ব্যবহার ও ব্যক্তির গুণাবলী দেখেই তার নাম সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারেন। ইয়াস বিন মুআবীয়া এবং আরও কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা কোন লোক দেখেই বলে দিতেন, এই ব্যক্তির নাম এমন হওয়া উচিত, অমুক ব্যক্তির নাম এ রকম হওয়া উচিত বা এ রকম হতে পারে। তাদের অনুমান কখনও ভুল হতনা। এর বিপরীতে নাম শুনেও ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়। একদা উমার একজন লোকের নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলল- আমার নাম জামরা (জ্বলন্ত আঙ্গার)। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমার পিতার নাম কি? সে বলল- শিহাব (অগ্নিশিখা)। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমার বাড়ী কোথায়? সে বলল- হার্‌রাতুন নার (যেখানে আগুনের তাপ লাগে)। অতঃপর উমার তাকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কোন্ অঞ্চলের লোক? সে বলল- লাযার এলাকায় (জ্বলন্ত আগুন বিশিষ্ট এলাকায়)। এবার উমার বললেন- গিয়ে দেখো তোমার বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন- সে গিয়ে দেখল ঠিকই তার ঘরবাড়ি জ্বলে গেছে। নাবী যেমন সুহাইল নাম শুনে কাজ সহজ হয়ে যাওয়ার আশা পোষণ করেছেন। তিনি উম্মাতকে সুন্দর নাম রাখার আদেশ দিয়েছেন। তিনি এও বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে দুনিয়ার নামেই ডাকা হবে।

হে পাঠক! আপনি চিন্তা করুন, কিভাবে নাবী এর জন্য আহমাদ ও মুহাম্মাদ নাম নির্বাচন করা হয়েছে, যা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুহাম্মাদ অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত। অর্থাৎ তার মধ্যে উত্তম ও প্রশংসিত গুণাবলী প্রচুর পরিমাণ থাকার কারণে তিনি মুহাম্মাদ আর অন্যের তুলনায় তিনি অধিক প্রশংসাকারী এবং অধিক প্রশংসিত গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান বলে তিনি হচ্ছেন আহমাদ।

এমনি তিনি আবুল হাকামকে আবু জাহেল উপনামে নামকরণ করেছেন, আব্দুল উয্‌যাকে আবু লাহাব বলেছেন। কেননা আবু লাহাব অর্থ হচ্ছে প্রজ্বলিত আগুনের পিতা বা আগুন ওয়ালা। কারণ অচিরেই সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে।

নাবী যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন মদীনার নাম ছিল ইয়াছরিব। নাবী ইহাকে পরিবর্তন করে মদীনার নাম রাখলেন তাইবা। কেননা ইয়াছরিব শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে তাছরীব

থেকে। তাছরীব অর্থ দোষারোপ করা, তিরস্কার করা ইত্যাদি। আর নাবী ﷺ-এর আগমণের মাধ্যমে যেহেতু মদীনা এ সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হয়ে গেছে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে তাইবা।[১৫০]

সুন্দর নাম যেহেতু নাম বহনকারীর সুন্দর আচার-আচরণের দাবী রাখে তাই নাবী ﷺ কোন কোন আরব গোত্রকে বলেছেন- হে বনী আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদাদের নামকে সুন্দর করেছেন।

পাঠক বৃন্দ লক্ষ্য করুন! তিনি কিভাবে এর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করেছেন? বদর যুদ্ধের দিন কাফেরদের যেই তিন জন লোক প্রথমে মুসলমানদের মুকাবেলা করার জন্য বের হয়েছিল এবং নাবী ﷺ মুসলিমদের থেকে যেই তিন জন লোককে তাদের মুকাবেলা করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন, তাদের নামগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। তাদের নামগুলো ছিল তাদের অবস্থার অনুরূপ। কাফেররা যাদেরকে নির্বাচন করেছিল তারা হল- অলীদ, উতবা ও শায়বা। অলীদ অর্থ শিশু বা নবজাতক, যার শুরুতেই থাকে দুর্বলতা। শায়বা অর্থ হচ্ছে এমন বৃদ্ধ, যার মধ্যে সকল প্রকার দুর্বলতা একত্রিত হয়। তাদের আরেকজনরে নাম ছিল উতবা (দোষারোপ করা, তিরস্কার করা ইত্যাদি)। তাদের তিনটি নামের মধ্যেই দুর্বলতার অর্থ বিদ্যমান। এতে বুঝা যায় তারা পরাজয়ের ফলে পরস্পর দোষারোপ করবে এবং অচিরেই তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। এই নামগুলোর মুকাবেলায় নাবী ﷺ যাদেরকে নির্বাচন করলেন তাদেরকে নিয়ে একটু চিন্তা করুন। তিনি এমন তিনজন লোককে নির্বাচন করলেন, যাদের নামগুলো তাদের চারিত্রিক গুণাবলীর অনুরূপ ছিল। তাদের মুকাবেলা করার জন্য আলী, হামযাহ এবং উবাইদাহ ইবনুল হারিছ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নিযুক্ত করলেন। আলী নামটি العلـو আল-উলু থেকে গৃহীত। এর দ্বারা উচ্চ মর্যাদা অর্জন, শক্তি ও বিজয় অর্জন বুঝায়। 'উবাইদাহ' আল্লাহর দাসত্ব বুঝায়। সুতরাং তারা আল্লাহর ইবাদত, আখিরাতের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম ও বীরত্ব এবং সাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে কাফেরদের উদ্দেশ্যে জয়লাভ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সেই নামই অধিক প্রিয় যার অর্থ অধিক উত্তম। তাই আল্লাহ্ তা'আলার নামগুলো থেকে আল্লাহ্ এবং রহমান নামের দিকে উবুদিয়াতের তথা আবদ্ শব্দটি যোগ করে আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান নাম রাখা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। এই নাম দু'টি আল্লাহর নিকট আব্দুল কাদের ও আব্দুল কাহের নাম রাখার চেয়েও অধিক প্রিয়। কারণ বান্দা ও তার রবের মাঝে শুধু ইবাদত ও রহমতের সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ স্বীয় রহমতে বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন ও পূর্ণতা দিয়েছেন। আর সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাব্বত, ভয় ও আশা নিয়ে বান্দা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করবে।

প্রত্যেক মানুষই যেহেতু স্বীয় ইচ্ছায় নিজেকে পরিচালিত করে আর যেহেতু কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া থেকেই ইচ্ছার সূচনা হয় এবং বান্দার ইচ্ছাতেই কামাই ও অর্জন হয়ে থাকে তাই হারেছ ও হাম্মাম (উদ্যোমী, উদ্যোগী ও পরিশ্রমী) হচ্ছে সবচেয়ে বাস্তব ভিত্তিক নাম। আর প্রকৃত রাজত্ব যেহেতু একমাত্র আল্লাহর জন্যই তাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট নাম হচ্ছে শাহানশাহ বা

---

১৫০. মদীনা শরীফের বহু নাম রয়েছে। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নরূপ (১) মদীনা, (২) দারুল হিজরাত, (৩) তাবা ও (৪) তাইবা। (৫) জাবিরাহ, (৬) মাজবুরাহ, (৭) আল-মুবারাকাহ, (৮) হারামু রাসূলিল্লাহ ইত্যাদি। আরও অনেক নাম রয়েছে, যা তার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ যে জিনিষের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য যত বেশী হয়, তার টাইটেল ও উপাধিও হয় তত বেশী হয়ে থাকে।

রাজাধিরাজ এবং সুলতানুস্ সালাতীন। এই উপাধি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্য শোভনীয় নয়। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্য এই উপাধি ধারণ করা বাতিল বা অন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায়কে ভালবাসেন না। কতক আলেম কাযীউল কুযাত পদবী ধারণ করাকেও অন্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সাইয়েদুন নাস (সকল মানুষের নেতা) নাম রাখাও অপছন্দনীয়। কেননা এটি শুধু রসূল ﷺ এর জন্য নির্দিষ্ট।

মুরারা (তিক্ত) এবং হারব (যুদ্ধ) যেহেতু মানুষের নিকট সবচেয়ে অপ্রিয়, তাই এই দু'টি নাম রাখা ঠিক নয়। এর উপর অনুমান করেই হানজালা, হাজন এবং এ জাতীয় অন্যান্য নাম অপছন্দনীয়। নাবীদের চরিত্র যেহেতু সর্বোত্তম তাই তাদের নামগুলোও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তিনি উম্মাতকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন নাবীদের নামে নাম রাখে। সুনানে আবু দাউদ ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা নাবীদের নামে নাম রাখো। নাবীদের নামে নাম রাখার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরী হবে এবং নাবীদের গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

শিশুর নাম ইয়াসার (সহজ) রাখতে নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে যার দিকে হাদীছে ইঙ্গি করা হয়েছে। কেননা তুমি হয়ত তাকে এই বলে ডাকবে যে, এখানে ইয়াসার আছে কি? লোকেরা হয়ত বলবেঃ এখানে এমন কিছু (ইয়াসার বা সহজ) নেই। আল্লাহই ভাল জানেন, এই অংশ কি হাদীছের? না রাবী কর্তৃক বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেহেতু এ সমস্ত নামের কারণে মানুষেরা অশুভ ধারণা করতে পারে, তাই তাদের ধারণাকে খন্ডন করার জন্যই তিনি এ ধরণের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং উম্মাতের প্রতি দয়াবান নাবী চেয়েছেন যে, তার উম্মাতদেরকে এমন সব মাধ্যম থেকে বিরত রাখবেন, যা তাদেরকে অপছন্দনীয় বিষয় শ্রবণ করতে বাধ্য করবে কিংবা অপছন্দনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন করবে। তা ছাড়া ইয়াসার (সহজকারী), নাজীহ (সফলকাম), রাবাহ (লাভ, লাভবান) ইত্যাদি নাম রাখলে সম্ভাবনা আছে যে, নাম যেই অর্থ বহন করে নামের অধিকারীর ভিতরে তার সম্পূর্ণ বিপরীত গুণাবলী থাকতে পারে। কোন লোক তার সন্তানের নাম ইয়াসার (সহজকারী) রাখতে পারে। অথচ সেই সন্তান এমন হতে পারে যে, সে মানুষের উপর খুবই কঠোর। এমন লোককে নাজীহ (সফলকাম) রাখতে পারে, যার ভিতরে কোন সফলতা নেই এবং এমন লোককেও রাবাহ (লাভবান) রাখতে পারে, যিনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত। এ রকম হলে এই গুণগুলো উপরোক্ত নাম বহনকারীদের সাথে সম্পৃক্ত করা মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত হবে। এতে আল্লাহর উপরও মিথ্যারোপ করা হবে। কারণ আল্লাহ্ তাকে সেই গুণাবলী প্রদান করেন নি। আরেকটি বিষয় হল তার নাম অনুযায়ী তাকে কাজ করতে বলা হতে পারে। অথচ তার সে রকম কাজ করার ক্ষমতা নেই। পরিণামে তাকে নিন্দা ও বিদ্রুপ করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে ব্যক্তি কবিতা রচনা করতে পারে না তাকে যদি شاعر (কবি) নাম দেয়া হয় এবং কৃপণ ব্যক্তিকে যদি جواد (দানবীর) নাম রাখা হয় তাহলে তাদের নামের দাবী অনুযায়ী কাজ করতে বলা হলে তারা যদি তা করতে না পারে তাহলে অবশ্যই তিরস্কারের সম্মুখীন হবে। কবি বলেন-

লোকেরা মূর্খতা বশতঃ سديد (সঠিক, সৎলোক) হিসেবে নাম রেখেছে। অথচ তোমার মধ্যে কোন সঠিকতা পাওয়া যাচ্ছেনা।

কোন কোন প্রশংসা অনেক সময় নিন্দায় পরিণত হয়, যা প্রশংসা কৃত ব্যক্তির অপমানের কারণ। কেননা মানুষ হয়ত কারও প্রশংসায় এমন গুণ উল্লেখ করে, যা উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই। এর ফলে কেউ

তার কাছে সেই গুণের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয় দাবী করতে পারে এই ভেবে যে, তার কাছে উহা বিদ্যমান। যখন তার কাছে সেই গুণটি পাবেনা তখন তাকে গালি দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এ ধরণের লোকদের যদি প্রশংসাহীন নাম রাখা হয় তাহলে কোন সমস্যা হবেনা। আরেকটি কথা হল, যার মধ্যে প্রশংসিত কোন গুণ নেই তাকে যদি প্রশংসিত নামে ডাকা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি এই ধারণা করতে পারে যে, মূলতই সে প্রশংসিত গুণের অধিকারী। ফলে সে নিজেকে মহৎ বলে দাবী করতে পারে। এ জন্যই নাবী ﷺ বার্‌রা নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। এর উপর ভিত্তি করেই রশীদ (বুদ্ধিমান, জ্ঞানী), মুতী (অনুগত) ইত্যাদি নাম রাখা মাকরূহ।

উপরোক্ত নামগুলো রাখা মুসলিমদের জন্য মাকরূহ। আর কাফেরদেরকে কখনই এ সমস্ত নামে ডাকা যাবেনা এবং তারা নিজেদের জন্য যে সমস্ত সম্মানিত নাম রাখে তা দ্বারাও তাদেরকে সম্বোধন করা যাবেনা।

উপনাম রাখার ব্যাপারে কথা হচ্ছে তা এক প্রকার সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভূক্ত। নাবী ﷺ সুহাইবের উপনাম রেখেছেন। আবু ইয়াহইয়াহ। আলীর উপনাম রেখেছেন আবু তুরাব। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ছোট ভাই যখন শিশু ছিলেন তখনই তার উপনাম রেখেছেন আবু উমায়ের।

কারও নাম বা উপনাম আবুল কাসেম রাখা

যার সন্তান ছিল এবং যার ছিল না তাদের সকলেরই কুনিয়ত তথা উপনাম রাখা তাঁর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল। শুধু আবুল কাসেম ব্যতীত তিনি অন্য যে কোন উপনাম রাখতে নিষেধ করেন নি। তাই এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন এই উপনাম যেহেতু রসূল ﷺ-এর ছিল, তাই অন্যদের জন্য এটি রাখা জায়েয নয়। অন্যরা বলেছেন- রসূল ﷺ এর নাম ও কুনিয়ত এক সাথে রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী সেটিকে সহীহ বলেছেন। আবার কতক আলেম বলেছেন- তাঁর নাম ও কুনিয়ত এক সাথে রাখতে মানা নেই। কেননা এ ব্যাপারে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনার পরে যদি আমার কোন ছেলে সন্তান হয় তাহলে আমি কি আপনার নামে তার নাম এবং আপনার কুনিয়াতেই তার কুনিয়ত রাখতে পারি? তিনি বললেন- হ্যাঁ, রাখতে পার। ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এটিকেও সহীহ বলেছেন। কেউ বলেছেন- রসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় তাঁর কুনিয়ত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জায়েয।

সঠিক কথা হচ্ছে, রসূল ﷺ এর কুনিয়ত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তার জীবদ্দশায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এমনিভাবে নাম ও কুনিয়ত একসাথে রাখাও নিষিদ্ধ। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীস সহীহ বলার ক্ষেত্রে সামান্য উদারতা দেখিয়েছেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- রসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, অনুমতিটি শুধু তার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল; অন্যদের জন্য নিষিদ্ধতা এখনও বলবৎ রয়েছে। আর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসঃ কে আমার নামে নাম রাখাকে হালাল করল? আর কে আমার কুনিয়তকে হারাম করল? এটি একটি গরীব (যঈফ হাদীস)। সহীহ হাদীছের মুকাবেলায় এটি দলীল হতে পারেনা।

সালাফদের একটি দল আবু ঈসা কুনিয়ত রাখাকে অপছন্দ করেছেন।[১৫১] অন্য একটি দল অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু দাউদ যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক পুত্র আবু ঈসা কুনিয়ত রাখার কারণে তিনি তাকে প্রহার করেছেন। মুগীরা ইবনে শুবা আবু ঈসা কুনিয়ত গ্রহণ করলে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- আবু আব্দুল্লাহ হিসেবে কুনিয়ত রাখা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন- আমাকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই কুনিয়ত দান করেছেন। তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আর আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে, তা আমরা জানিনা। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত তাকে আবু আব্দুল্লাহ্ কুনিয়তেই ডাকা হত।

তিনি আঙ্গুরকে কারাম বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন- কারাম হচ্ছে মুমিন ব্যক্তির অন্তর। কেননা কারাম শব্দটি প্রচুর কল্যাণ ও লাভ অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৫২] রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- তোমাদের সলাতের নামকরণে গ্রাম্য লোকেরা যেন তোমাদের উপর বিজয়ী না হয়। দেখো সেটি হচ্ছে এশার সলাত। আর গ্রাম্য লোকেরা এটিকে আতামাহ বলে থাকে।[১৫৩] তিনি আরও বলেন- তারা যদি জানতে পারত যে, ফজর ও এশার সলাতে কি পরিমাণ ছাওয়াব রয়েছে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এ দু'টি সলাতে (জামাআতে) শরীক হত।[১৫৪] সঠিক কথা হচ্ছে এশাকে আতামাহ বলতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেন নি; বরং এশা নামটিকে পরিহার করে আতামাহ বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যে ইবাদতকে যেই নামে নামকরণ করেছেন তিনি সেই ইবাদতকে আল্লাহর দেয়া নামেই সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন। সুতরাং সেই নাম বর্জন করা যাবেনা বা তার উপর অন্যটিকে প্রাধান্য দেয়া যাবেনা। যেমনটি করেছেন পরবর্তী যুগের আলেমগণ। তারা অনেক পুরাতন ইসলামী পরিভাষা ও শব্দের নাম পাল্টিয়ে দিয়েছেন। এতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যা কেবল আল্লাহই অবগত আছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং যে সমস্ত নামকে পূর্বে উল্লেখ করেছেন, তাকে প্রাধান্য দেয়া এবং পূর্বে উল্লেখ করা জরুরী। কোরবানীর ঈদের দিন প্রথমে সলাতের কথা বলেছেন। অতঃপর কোরবানী করতে বলেছেন। ওযূতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি মুখমন্ডল ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন, অতঃপর উভয় হাত, তারপর মাথা মাসাহ এবং সর্বশেষে উভয় পা ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন। ঈদুল ফিতরে সলাতের পূর্বে ফিতরা আদায় করতে বলেছেন। তারপর সলাতের উদ্দেশ্যে ঈদগাহের দিকে বের হতে বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾

---

১৫১. আবু ঈসা অর্থ ঈসা-এর পিতা। আল্লাহর নাবী ঈসা (আঃ) এর যেহেতু পিতা ছিল না, তাই আবু ঈসা বা ঈসার বাপ হিসাবে কুনিয়াত রাখাকে একদল আলেম অপছন্দ করেছেন। তবে আবু ঈসা বলে কুনিয়াত রাখা নিষিদ্ধ নয়।

১৫২. জাহেলী যুগের আরবরা আঙ্গুর, আঙ্গুরের গাছ এবং আঙ্গুর থেকে নির্মিত মদকে কারাম বলত। ইসলাম এসে আঙ্গুরকে কারাম বলতে নিষেধ করেছে। যাতে ভাল নামে ডাকার কারনে মদের প্রতি মুসলমানদের মনে কোন প্রকার আগ্রহ ও ভালবাসা জাগ্রত না হয় এবং এর ভাল নাম শুনে কেউ যেন মদ্য পানে লিপ্ত না হয়। তাই বলা হয়েছে কারাম (উত্তম, ভাল ও কল্যাণকর) হচ্ছে মুমিন ব্যক্তি বা মুমিন ব্যক্তির অন্তর। মুমিনগণই এ সম্মানিত নামের হকদার; নিকৃষ্ট বস্তুর সুন্দর নাম ইসলাম সমর্থন করে না।

১৫৩. বুখারী, অধ্যায়ঃ মাওয়াকীতুস সালাহ।

১৫৪. বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান।

"নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে, যে পরিশুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর সলাত আদায় করে।" (সূরা আলাঃ ১৪-১৫) সুতরাং যেটিকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিকে প্রথমেই রাখতে হবে।

কথা-বার্তায় সংযত হওয়া এবং শব্দ নির্বাচন ও তা প্রয়োগে নাবী ﷺ-এর সতর্কতা

তিনি তাঁর ভাষণে সুন্দরতম শব্দ নির্বাচন করতেন এবং তাঁর উম্মাতের জন্যও তাই নির্বাচন করেছেন। অশ্লীল ও কঠোর শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কর্কশভাষী ছিলেন না, তিনি তা পছন্দও করতেন না, তিনি উঁচু আওয়াজে তথা চিৎকার করে ও কঠোর ভাষায় কথা বলতেন না। সম্মানী ব্যক্তি নয়- এমন ব্যক্তির জন্য তিনি উত্তম শব্দ ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন। আর সম্মানী ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপছন্দনীয় শব্দ ব্যবহার করাও তিনি সমর্থন করতেন না।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ হল মুনাফিক লোককে কখনই সাইয়্যেদ (নেতা) বলা যাবেনা এবং আঙ্গুরকে কারাম বলা যাবেনা। এর উপর ভিত্তি করেই আবু জাহেলকে আবুল হাকাম বলা যাবেনা। তিনি সাহাবীদের মধ্যে আবুল হাকামের (বিচারকদের বিচারক) নাম পরিবর্তন করে আবু শুরাইহ রেখেছেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন- প্রকৃত বিচারক তো একমাত্র আল্লাহ্। তাঁর পক্ষ থেকেই ফয়সালা আসে। তিনি চাকরকে আদেশ দিয়েছেন, সে যেন তার মনিবকে রাব্বী তথা আমার প্রভু না বলে। এমনিভাবে মনিবকে বলেছেন সে যেন স্বীয় চাকরকে আবদী তথা আমার বান্দা এবং আমার বান্দী না বলে।

এক ব্যক্তি নিজেকে ডাক্তার (চিকিৎসক) হিসাবে দাবী করলে নাবী ﷺ বললেন- তুমি হলে রফীক (রোগীর প্রতি দয়াকারী)। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার প্রকৃত চিকিৎসক।[১৫৫] চিকিৎসা শাস্ত্রে সামান্য জ্ঞানের অধিকারী কাফেরদেরকেও জাহেলরা হাকীম (মহা চিকিৎসক, মহা জ্ঞানী) বলে থাকে। অথচ প্রকৃত হাকীম হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক মূর্খ হচ্ছে কাফেরের দল। রসূল ﷺ কোন এক বক্তাকে বলতে শুনলেনঃ

﴿وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى﴾

"যে ব্যক্তি তাদের উভয়ের (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের) নাফরমানী করল সে ব্যক্তি গোমরাহ হল"। এ কথা শুনে তিনি বললেন- তুমি খুব নিকৃষ্ট বক্তা। আসলে তার বলা উচিত ছিল এভাবেঃ

﴿مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে সে সুপথ প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে, সে গোমরাহ হবে। ঐ লোকটি প্রথমে আল্লাহর নাম উল্লেখ করে এবং রসূল কথাটি পরে উল্লেখ না করে সর্বনামের মাধ্যমে সরসূরি অর্থাৎ 'তাদের উভয়ের' কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ্ এবং রসূলকে সমান করে দেয়ায় রসূল ﷺ তাকে নিকৃষ্ট বক্তা বলেছেন। এরই অন্তর্ভূক্ত নাবী ﷺ এর বাণীঃ তোমরা এ কথা বলোনা যে, مَا شَاءَ الله وشَاءَ فُلَانٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ যা চান

---

১৫৫. অর্থাৎ রোগ ও রোগীর প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না এবং তিনিই রোগীকে সুস্থ করার ক্ষমতা রাখেন। এই হিসেবে প্রকৃত চিকিৎসক হচ্ছেন আল্লাহ্। এমনটি নয় যে, ডাক্তার বা চিকিৎসক আল্লাহর অন্যতম নাম।

'এবং' অমুক, আপনি বা সে যা চায়। বরং বলতে হবে যদি আল্লাহ চান কিংবা যদি আল্লাহ্ চান অতঃপর আপনি যদি চান। 'এবং'-এর মাধ্যমে উভয়কে একই বিষয়ে একত্রিত করা হলে উভয়েই সমান ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। অতঃপর-এর মাধ্যমে সেটি করা হলে তেমন কোন সন্দেহ হবেনা। যে ব্যক্তি শিরক থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করেনা তার কথাও অনুরূপ। তার কথাঃ আমি আল্লাহর ভরসায় এবং তোমার ভরসায় আছি, আমি আল্লাহ্ এবং তোমার হেফাজতে আছি, আমার জন্য আল্লাহ্ এবং তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, আমি আল্লাহর উপর এবং তোমার উপর ভরসা করছি, এটি আল্লাহ্ এবং তোমার পক্ষ হতে, আল্লাহর শপথ এবং তোমার হায়াতের শপথ ইত্যাদি। এ ধরণের অসংখ্য কথার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সাথে সৃষ্টিকে (মানুষকে) শরীক করে থাকে। এই কথাগুলো 'আল্লাহ্ যা চান এবং সে যা চায়' বলা থেকেও অধিক নিকৃষ্ট।

তবে যখন বলবে যে, আমি আল্লাহর সাথে অতঃপর আপনার সাথে আছি, আল্লাহ্ যা চান অতঃপর আপনি যা চান তাহলে কোন সমস্যা নেই। যেমন তিন ব্যক্তির হাদীছে এসেছে, এখন আমি আল্লাহর অনুগ্রহ অতঃপর আপনার সাহায্য ব্যতীত ঘরে ফিরতে পারবনা।[১৫৬]

---

১৫৬. **তিন ব্যক্তির হাদীসটির বিস্তারিত বিবরণঃ** আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ বনী ইসরাঈলে তিন জন লোক ছিল। একজন ছিল শ্বেত রোগী, দ্বিতীয়জন মাথায় টাক ওয়ালা এবং তৃতীয়জন অন্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। তাই তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেনঃ কোন্ জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে বললঃ সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া। কেননা মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ অতঃপর ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার রোগ চলে গেল। তাকে সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া দেয়া হল। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ ধরণের সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বললঃ উট। তাকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী দেয়া হল। ফেরেশতা বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য এর মধ্যে বরকত দান করুন।

অতঃপর ফেরেশতা টাকওয়ালার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ জিনিষ তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে বললঃ সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ টাক চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার টাক চলে গেল। তার মাথায় সুন্দর চুল গজাল। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ ধরণের সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বললঃ গরু। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দিয়ে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য এর মধ্যে বরকত দান করুন।

অতঃপর ফেরেশতা অন্ধের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃকোন্ জিনিষ তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে বললঃ আল্লাহ্ যেন আমার চোখে জ্যোতি ফিরিয়ে দেন। আমি যেন মানুষ দেখতে পারি। ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলা তার চোখ ফিরিয়ে দিলেন। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ ধরণের সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বললঃ ছাগল। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন।

অতঃপর তিনজনের পশুগুলোই বাচ্চা দিল। অল্প দিনের মধ্যে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে চারণভূমি ভরে গেল এবং তৃতীয়জনের ছাগলে উপত্যকা ছেয়ে গেল।

পুনরায় সেই ফেরেশতা পূর্বের আকৃতি ও সুরত ধরে প্রথমে শ্বেতরোগীটির নিকট আসলেন এবং বললেনঃ আমি একজন নিঃস্ব গরীব লোক। আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি আল্লাহর অনুগ্রহ অতঃপর আপনার সাহায্য ব্যতীত ঘরে ফিরতে পারব না। আমি আপনার কাছে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে একটি উট চাচ্ছি, যিনি আপনাকে সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া দান করেছেন এবং সম্পদ দান করেছেন। আপনি একটি উট দিলে তার উপর আরোহন করে আমি বাড়ি পৌঁছে যাব। তখন লোকটি বললঃ আরো অনেকের হক রয়েছে। (সওয়ালকারী তো অনেক। কি করে তোমাকে একটি উট দিয়ে দেই?)

ফেরেশতা বললেনঃ আমার মনে হয় তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি কি শ্বেতরোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তোমাকে বিপুল সম্পদ দিয়েছেন। সে বললঃ আমি তো এগুলো আমার বাপ-দাদা থেকে

আর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিন্দার হকদার নয় তার ক্ষেত্রে নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করার উদাহরণ হচ্ছে, নাবী ﷺ যুগকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন- আল্লাহই হচ্ছেন যুগ তথা যুগের ও তার ভাল-মন্দের সৃষ্টিকারী এবং যুগের পরিবর্তনকারী। যুগকে গালি দেয়াতে তিনটি সমস্যা রয়েছে।

(১) যে গালির হকদার নয়, তাকে গালি দেয়া। (২) যুগকে গালি দেয়া শির্কের অন্তর্ভূক্ত। কেননা যুগকে গালি দাতা এই মনে করেই গালি দেয় যে, উহা লাভ ও ক্ষতির মালিক এবং যুগ বা যামানা হচ্ছে জালেম। অনেক কবিই তাদের কবিতার মাধ্যমে যামানাকে গালি দেয় এবং বহু সংখ্যক অজ্ঞ লোকও যামানাকে লানত ও দোষারোপ করে থাকে। (৩) যারা যামানাকে গালি দেয়, দোষারোপ করে, মূলতঃ গালি তাদের উপরই পতিত হয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা যদি মানুষের মনের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করেন, তাহলে আসমান-যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। কারণ তাদের অবস্থা যখন তাদের চাহিদা অনুযায়ী হয় তখন তারা যুগের প্রশংসা করে এবং তার গুণগুণ প্রকাশ করে। আর যখন তাদের অবস্থা এর বিপরীত হয় তখন তারা যুগকে গালি দেয়।

নাবী ﷺ বলেন- তোমাদের কেউ যেন (হোঁচট খেলে বা পা পিছলে পড়ে গিয়ে কিংবা কারও হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে) এ কথা না বলে যে, শয়তান ধ্বংস হোক! কেননা এ কথা বললে তা শুনে শয়তান মোটা হতে থাকে। এমনকি ঘরের মত বড় হয়ে যায় এবং বলতে থাকে আমি স্বীয় শক্তিতে তাকে পরাজিত করেছি। বরং সে যেন বলেঃ বিসমিল্লাহ। কেননা এ কথা বললে শয়তান ছোট হতে হতে মাছির ন্যায় হয়ে যায়।[১৫৭]

অন্য হাদীছে আছে, বান্দা যখন শয়তানকে লানত করে তখন সে বলে তুমি তো একজন অভিশপ্তকেই অভিশাপ করছ। উপরের কথাটির মতই এ কথাটি বলা যে, আল্লাহ্ শয়তানকে লাঞ্ছিত করুক, শয়তানের মুখকে কালো করুক এ জাতিয় সকল কথাতেই শয়তান খুশী হয়। সে বলেঃ বনী আদম জানে যে, আমার শক্তির মাধ্যমে আমি তাদের ক্ষতি করি। এ রকম বললে কোন উপকার তো

ওয়ারিছ সূত্রেই পেয়েছি। তখন ফেরেশতা বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে আগের মতই করে দেন।

অতঃপর ফেরেশতা পূর্বের সুরত ও আকৃতিতে টাকওয়ালার নিকট আসলেন একই কথা বললেন। টাকওয়ালা একই উত্তর দিল। তখন ফেরেশতা বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে আগের মতই করে দেন।

পুনরায় সেই ফেরেশতা পূর্বের আকৃতি ও সুরত ধরে অন্ধ লোকটির নিকট আসলেন এবং বললেনঃ আমি একজন নিঃস্ব গরীব লোক। আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি আল্লাহর অনুগ্রহ অতঃপর আপনার সাহায্য ব্যতীত ঘরে ফিরতে পারব না। আমি আপনার কাছে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে একটি ছাগল চাচ্ছি, যিনি আপনার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং সম্পদ দান করেছেন। আপনি একটি ছাগী দিলে তা দিয়ে সফরের কাজ শেষ করতে পারব। তিনি বললেনঃ আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে বিপুল সম্পদ দিয়েছেন। আপনার মন যা চায় তাই নিয়ে যান। আল্লাহর কসম! আল্লাহর ওয়াস্তে আজ তুমি যা নিবে আমি তাতে বাঁধা দেব না। ফেরেশতা বললেনঃ তোমার সম্পদ তুমি রেখে দাও। তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হল মাত্র। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সাথী দু'জনের উপর হয়েছেন নারাজ।

১৫৭. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব।

হয়না; বরং শয়তানকে গোমরাহ করার কাজে সহায়তা করা হয়। যার উপর শয়তানের প্রভাব পড়ে তাকে নাবী ﷺ আল্লাহর নাম, আল্লাহর যিকির, আল্লাহর নাম উচ্চারণ এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন। এটিই তার জন্য অধিক উপকারী এবং শয়তানের ক্রোধ বৃদ্ধিকারী।

নাবী ﷺ মানুষকে এও বলতে নিষেধ করেছেন যে, خبثت نفسي 'খাবুছাত নাফসী' অর্থাৎ আমার অন্তর নোংরা হয়ে গেছে। বরং সে যেন বলেঃ لقست نفسي 'লাকিসাত নাফসী' অর্থাৎ আমার অন্তর দুষ্ট হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ কাছাকাছি। তা হচ্ছে মন বিনষ্ট হয়ে গেছে। নাবী ﷺ خبث শব্দটি প্রয়োগ করা অপছন্দ করেছেন। কারণ তা কদর্যতা ও নোংরামীর মাত্রাতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে।

যদি এমন করতাম, তাহলে এমন হত, যদি এমন না করতাম, তাহলে এমন হতনা- এ ধরণের কথা বলা নিষেধ

কোন কিছু অর্জন করতে ব্যর্থ হলে তিনি এ কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে, যদি এমন করতাম তাহলে এমন হত। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে 'যদি' কথাটি শয়তানের কাজকে সহজ করে দেয়। তিনি এর চেয়ে উত্তম কথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং এ কথা বলার আদেশ দিয়েছেন যে, قَدَرُ اللهِ ومَاشَاءَ فَعَلَ এটি ছিল আল্লাহর ফয়সালা, তিনি যা চান তাই করেন। কেননা মানুষের কথা, আমি যদি এ রকম করতাম, তাহলে এ বস্তুটি আমার হাত ছাড়া হতনা, এমনটি না করলে আমি এই বিপদে পড়তামনা। এ জাতীয় কথায় কোন উপকার নেই। কেননা যা চলে গেছে তা পুনরায় ফেরত আসবেনা এবং 'যদি' কথাটি ব্যবহার করে ভবিষ্যতেও কোন উপকার পাওয়া যাবেনা।

মানুষ মনের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় স্থির ও নির্ধারণ করে, তা যদি সেভাবেই সংঘটিত হয় তাহলে এমন জিনিষ সংঘটিত হওয়াকে আবশ্যক করবে যা আল্লাহর নির্ধারণের (তাকদীরের) বাইরে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ের বিপরীত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং মিথ্যা, মূর্খতা এবং অসম্ভব বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই এ রকম চিন্তার উদ্ভব হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাকদীরকে অস্বীকার করার দোষ থেকে মুক্ত হলেও 'যদি' বলার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবেনা।

যদি বলা হয় 'যদি' কথাটি বলার মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয় কামনা করছে, তাও তো তাকদীরেই নির্ধারিত? উত্তরে বলা হবে যে, এ কথা সঠিক। কিন্তু নির্ধারণকৃত অপছন্দনীয় বিষয়টি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে বললে লাভ হত। সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর তা বললে অপছন্দনীয় বিষয়টি দূর হবেনা বা তার প্রভাব কমানোও সম্ভব নয়। বরং এ অবস্থায় বান্দা ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে, যার মাধ্যমে সে অপছন্দনীয় বিষয়টি দূর করতে পারবে এবং তার ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো কমানো সম্ভব হবে। যা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, তা সংঘটিত হওয়ার আশা করাতে কোন লাভ নেই। কেননা এটি শুধু অপারগতার দিকেই নিয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা অপারগতা-অক্ষমতা প্রকাশ করাকে অপছন্দ করেন এবং সতর্কতা অবলম্বন ও কর্মঠ হওয়াকে ভালবাসেন। যা করলে কল্যাণের পথ খুলবে তিনি তা করার আদেশ দিয়েছেন। আর لو (যদি) বলা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা শয়তানের কাজকেই সহজ

করে দেয়। কেননা উপকারী কাজ করা থেকে বিরত থাকলে বান্দা বাতিল ও অস্পষ্ট আশা-আকাঙ্খার দিকে ধাবিত হয়। এই জন্যই নাবী ﷺ অপারগতা-অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। এ দু'টিই সকল অকল্যাণের দ্বারকে উন্মুক্ত করে। এ থেকেই দুঃশ্চিন্তা, হতাশা, পেরেশানী, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণগ্রস্ত হওয়া, পুরুষদের পরাজয় ইত্যাদি দোষণীয় বিষয়ের সূচনা হয়। এ সবের উৎস হচ্ছে অপরসূতা-অক্ষমতা ও অলসতা। আর لو (যদি) কথাই এই পথের সূচনা করে।[১৫৮]

---

১৫৮. لو (যদি) শব্দ ব্যবহারের হুকুমঃ লাও শব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। (১) অতীতে হাত ছাড়া হয়েছে এমন জিনিসের জন্য বিষণ্ন , চিন্তিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে কিংবা অতীতে সংঘটিত কোন দুর্ঘটনার জন্য আফসোস করে এবং তাকদীরের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে লাও لو শব্দটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যেমন কেউ বললঃ আমি যদি এমন করতাম তাহলে এমন হত, এমন না করলে এমন হতনা, সেখানে না গেলে আমি দুর্ঘটনার কবলে পড়তাম না ইত্যাদি। এ ধরণের কথা বলতে নাবী ﷺ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জেহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে তারা মারা যেতনা, আহতও হতনা। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশিলিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ্ সবকিছুই দেখেন।"। (সূরা আল-ইমরান-৩:১৫৬) এই আয়াতে বর্ণিত যেভাবে লাও (যদি) ব্যবহার করা হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেভাবে তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেনঃ আল-ইমরান-৩:

«وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»

তোমার কোন বিপদ হলে তুমি এ রকম বলো না যে, যদি এমন করতাম তাহলে এমন হত। বরং তুমি বল যে قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ এটি ছিল আল্লাহর ফয়সালা, তিনি যা চান তাই করেন। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে 'যদি' কথাটি শয়তানের কাজকে সহজ করে দেয়। অর্থাৎ তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও বিষণ্নতা চলে আসে। এতে তোমার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। তুমি জেনে রেখো যে, তুমি যা অর্জন করেছ, তা হারানোর ছিল না। আর যা তুমি অর্জন করতে পার নি, তা তোমার পাওয়ার ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-

আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা তাগাবুন-৬৪:১১) আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেনঃ সেই প্রকৃত মুমিন, যে বিপদে আক্রান্ত হওয়ার সময় বিশ্বাস করে, উহা আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তাকদীরের লিখন মেনে নেয়। (২) লাও (যদি) ব্যবহারের দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, উপকারী ইলম বর্ণনা, এবং কল্যাণকর কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য 'লাও' ব্যবহার করা জায়েয। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ -

"যদি নভোমন্ডল ও ভূগুলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র"। (সূরা আম্বীয়া-২১:২২) আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। এই কথাটি শিক্ষা দেয়ার জন্য এখানে লাও ব্যবহার করা হয়েছে। নাবী ﷺ বলেনঃ মুসা (আলাইহিস সালাম) যদি আরও সবুর করতেন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য তাদের আরও ঘটনা বর্ণনা করতেন। সুতরাং নাবী ﷺ এখানে হতাশা ও আফসোস অর্থে লাও (যদি) কথাটি ব্যবহার করেন নি। বরং তিনি ধৈর্য ও সবুরের প্রতি তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করেছেন।

যে ব্যক্তি কাজ করেনা এবং শুধু আশা-ভরসা করে বসে থাকে, সেই সবচেয়ে বেশী দরিদ্র ও অক্ষমে পরিণত হয়। অক্ষমতা-অপারগতা থেকেই সকল পাপ কাজের সূচনা। কেননা অক্ষমতা প্রকাশ করেই বান্দা সৎকাজ করার রাস্তা থেকে দূরে থাকে এবং যে সমস্ত পন্থা তার মাঝে এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা এবং পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার উপায়-উপকরণ অবলম্বন করাও বর্জন করে। পরিণামে সে অপরাধের সাগরে প্লাবিত হয়। এ জন্যই নাবী ﷺ উপরোক্ত হাদীস শরীফে ('যদি' কথাটি বলা নিষিদ্ধ করার হাদীছে) অন্যায়ের সকল শেকড়, শাখা, সূচনা, প্রবেশ পথ এবং সকল উৎস একত্রিত করেছেন। এই হাদীস আটটি খারাপ অভ্যাসকে অন্তর্ভূক করেছে। প্রত্যেক দু'টি অভ্যাস পরস্পর সম্পৃক্ত। নাবী ﷺ দু'আয় বলতেন-

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»

"হে আল্লাহ, আমি উদ্বিগ্ন হওয়া, বিষণ্ন হওয়া, অক্ষম হওয়া, অলসতা করা, কৃপণতা করা, ভীরু হওয়া, এবং ঋণের আধিক্য এবং পুরুষদের অন্যায় প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[১৫৯]

হাম্ম ও হুযন অর্থাৎ উদ্বিগ্ন হওয়া ও বিষণ্ন হওয়া পরস্পর সম্পৃক্ত। এ দু'টি একসাথেই আপতিত হয়। কেননা অন্তরে যে অপছন্দ আপতিত হয় তা হয়ত অতীতে কোন বস্তু হারানোর কারণেই হয়। আর এটিই হুয্ন তথা বিষণ্নতার সৃষ্টি করে অথবা ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে আর এটিই উদ্বিগ্নতার জন্ম দেয়। বিষণ্নতা ও উদ্বিগ্নতা আসে অপরসূতা-অক্ষমতা থেকে। যে বস্তু অতীতে হাত ছাড়া হয়ে গেছে বা যে বিপদ হয়েছে তা দুঃশ্চিন্তার মাধ্যমে ফেরত আসবেনা বা এর মাধ্যমে কোন বিপদ দূর হবেনা। বরং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর প্রশংসা করা, ধৈর্যধারণ করা এবং তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে মেনে নিতে হবে এবং এ কথা বলার মাধ্যমে যে, قَدَرُ اللهِ وَمَاشَاءَ فَعَلَ অর্থাৎ এটি ছিল আল্লাহর ফয়সালা, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেছেন।

ভবিষ্যতে যে অপছন্দনীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, উদ্বিগ্ন হওয়ার মাধ্যমে তা দমন করা যাবে না। বরং তা দূর ও দমন করার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তা দূর করার জন্য কৌশল নির্ধারণে কখনই অক্ষমতা ও অপরসূতা প্রকাশ করবেনা। আর যদি এমন হয় যে, কৌশল অবলম্বন করেও তা দূর করা সম্ভব নয়, তাহলে হতাশা ও বিরক্তি প্রকাশ করা যাবেনা। বরং তাওহীদ, তাওয়াক্কুল এবং সুখে-দুঃখে আল্লাহকে প্রভু হিসাবে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে সকল বিপদাপদ বরদাস্ত করতে হবে। দুঃশ্চিন্তা-বিষণ্নতা ও উদ্বিগ্নতা মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে, অন্তরকে রেসূাক্রান্ত করে দেয় এবং বান্দা ও কল্যাণকর কাজের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই দৃষ্টিকোন থেকে দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা কল্যাণের পথে চলতে আগ্রহীর পিঠে বিরাট এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

মুসা (আলাইহিস সালাম) সবুর করলে আরও অনেক কল্যাণকর বিষয় জানা যেত।

১৫৯. বুখারী, কিতাবুত দাওয়াত, বুখারী, তাও. হা/৬৩৬৯, ইফা. ৫৮১৬, আপ্র. ৫৯২৩, সহীহ আত তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪৮৪, মিশকাত, হা/ ২৪৫৮, সহীহ, আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে, তিনি এই দুটি শত্রুকে (দুঃশ্চিন্তা-বিষণ্ণতা ও উদ্বিগ্নতাকে) আল্লাহ্ বিমুখ এবং তাঁর ভালবাসা ও ভয় থেকে শূণ্য অন্তরসমূহের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে তিনি এর মাধ্যমে অন্তরসমূহকে বিপদগ্রস্ত করে তাঁর বান্দাদেরকে অনেক নাফরমানী পাপাচারিতা থেকে বিরত রাখতে পারেন।

তাওহীদের প্রশস্ত ময়দানে না আসা এবং আল্লাহমুখী না হওয়া পর্যন্ত অন্তরগুলো সর্বদা দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতার কষ্টের বন্ধীখানায় আটকে থাকে। এই বন্ধীশালা ও দুঃখ-ক্লেশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য অন্তরের সামনে তাওহীদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই এবং একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছারও কোন সুযোগ নেই। আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্যে আল্লাহর সাহায্য জরুরী। তা ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়, আল্লাহ্ ব্যতীত সেই পথ দেখানোর জন্য অন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই, তিনি ছাড়া সৎকাজের তাওফীক দাতা ও অন্যায় কাজ থেকে বাধা দানকারী অন্য কেউ নেই।

আল্লাহ্ যখন তাঁর কোন বান্দাকে কোন স্থানে রাখেন তখন তিনি স্বীয় ইচ্ছা ও বিশেষ হিকমতের কারণেই সেখানে রাখেন। বান্দাকে কোন হক থেকেই আল্লাহ্ বঞ্চিত করেন না। যদি কোন কোন ক্ষেত্রে বঞ্চিত করেনও তাহলে উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দা যাতে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে তা অর্জন করার চেষ্টা করে, তারই ইবাদত করে এবং তাঁর সামনেই নত হয়। পরিণামে আল্লাহ্ তাকে উহা দান করেন। আল্লাহ্ কখনও তাঁর বান্দাকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কোন কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকেন, তাকে সম্মানিত করার জন্য অপমানিত করেন, তাকে ধনী করার জন্য তাঁর দিকে মুখাপেক্ষী করেন, তাকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর সামনে তাকে দুর্বল করেন, ভাল ও মূল্যবান পদ থেকে অপসারণের মাধ্যমে তাকে স্বীয় বন্ধুত্বের পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং বঞ্চিত করার তিক্ততা আস্বাদন করানোর মাধ্যমে তার দরবারে বিনয়ী হওয়ার স্বাদ উপভোগ করান। সুতরাং আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর বান্দাকে বঞ্চিত করাও দান, তার শাস্তি হচ্ছে শিক্ষা এবং শত্রুকে তার উপর শক্তিশালী করা বান্দাকে তাঁর দিকেই পরিচালনা করার অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ্ স্বীয় দানের পাত্র ও হকদার সম্পর্কে অধিক অবগত আছেন এবং স্বীয় রিসালাত রাখার পাত্র সম্পর্কেও অধিক জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلاَءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّن بَيْنِنَا، أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾

"আর এভাবেই আমি কিছু লোককে অন্য কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি- যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন?"[১৬০] আল্লাহ্ তা'আলা দান করার জন্য উপযুক্ত কিংবা অনুপোযুক্ত স্থান ও ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। আল্লাহ্ কাউকে বঞ্চিত করলে সে যদি আল্লাহর দিকে ফেরত আসে তাহলে এটিই উক্ত বান্দার জন্য দান হিসাবে পরিগণিত হয়, কাউকে দান করার কারণে যদি সে বিপথগামী হয় তাহলে সে প্রকৃত পক্ষে (আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত থেকে) বঞ্চিত হল।

---

১৬০. সূরা আনআম-৬:৫৩

সুতরাং যে সব বিষয় ও বস্তু বান্দাকে আল্লাহ থেকে দূরে রাখে তা মূলতঃ তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি স্বরূপ আর যেসব বিষয় তাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী করে সেগুলো তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত স্বরূপ। যদিও তা দুনিয়ার কোন নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে হয়।

আল্লাহ্ চেয়েছেন যে, বান্দা আমল করবে। আর সে কখনও আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত আমল করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তিনি আমাদেরকে সঠিক পথে থাকার আদেশ দিয়েছেন এবং সেই পথে টিকে থাকার মাধ্যম গ্রহণ করারও উপদেশ দিয়েছেন। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, এই উদ্দেশ্যটি (বান্দার আমল) ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ না তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও কার্য সম্পাদনে সহায়তা করবেন এবং আমাদের দ্বারা কাজটি সম্পাদিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন। সুতরাং দু'টি ইচ্ছা থাকতে হবে। একটি হচ্ছে বান্দার ইচ্ছা। বান্দা কাজ করার ইচ্ছা করবে। অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, তিনি তার বান্দাকে কাজ করতে সাহায্য করবেন। আল্লাহর এই ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"তোমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারনা"।[১৬১] সার কথা হচ্ছে নাবী ﷺ দুঃশ্চিন্তা-বিষণ্ণতা ও উদ্বিগ্ন হওয়া থেকে আশ্রয় চেয়েছেন। এ দু'টি হচ্ছে পরস্পর বন্ধু। আর তিনি অক্ষম-অপারগতা প্রকাশ করা থেকেই আশ্রয় চেয়েছেন। এরাও পরস্পর সম্পৃক্ত। কেননা বান্দা সংশোধন ও সফলকাম না হতে পারলে তা কখনও তার শক্তি ও ক্ষমতা না থাকার কারণেই হয়ে থাকে। আর এটিকেই বলা হয় অক্ষমতা-অপারগতা। আবার কখনও সংশোধন ও সফলকাম হওয়ার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু সে সফলকাম হতে ইচ্ছা করেনা। এটিকেই বলা হয় আলস্য। এ দু'টি খারাপ অভ্যাসের কারণেই সকল প্রকার কল্যাণ ছুটে যায় এবং সকল অকল্যাণ চলে আসে। এই অকল্যাণের কারণেই মানুষ তার শারিরীক শক্তি থাকতেও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা। এটিকেই বলা হয় কাপুরুষতা। এই কারণেই মানুষের সম্পদ থাকা সত্বেও তা দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা। তা হচ্ছে কৃপণতা। এ থেকেই দু'টি কর্তৃত্ব তৈরী হয়। একটি হচ্ছে কারও হকের উপর নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এটিই হচ্ছে ঋণের আধিক্য। আরেকটি হচ্ছে অন্যায়ভাবে মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এটিই হচ্ছে মানুষের উপর দুষ্ট পুরুষদের প্রাধান্যতা ও কর্তৃত্ব। এই সবগুলোই অপরসূতা ও অক্ষমতার ফলাফল। এ অর্থেই সহীহ হাদীছে নাবী ﷺ-এর সেই কথা ব্যবহৃত হয়েছে, যা তিনি এমন ব্যক্তির জন্য বলেছনে, যার বিরুদ্ধে ফয়সালা করা হয়েছিল। এতে সেই লোকটি বলেছিল-

﴿حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার পক্ষে কাজ করার জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার"। নাবী ﷺ তখন বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষম ও অপারগ হওয়াকে দোষারোপ করেন। তোমার উচিৎ

১৬১. সূরা তাকবীর-৮১:২৯

ছিল বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কর্মঠ হওয়া এবং নিজের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করা। চেষ্টা করার পরও যদি পরাজিত হয়ে যাও তখন বলঃ

﴿حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার পক্ষে কাজ করার জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার"। এই ব্যক্তি বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করেই এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ না করেই কথাটি বলেছে। এতে করে বিচার ফয়সালা বা রায় তার বিরুদ্ধে গিয়েছে। সে যদি স্বীয় হক প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করত এবং যথাযথ দলীল-প্রমাণ পেশ করত, যুক্তি দিয়ে কথা বলত তাহলে রায় তার পক্ষে যেত। উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর এবং বিজয়ী হওয়ার প্রচেষ্টা চালানোর পর পরাজিত হয়ে কথাটি বললে তা আসল স্থানে বলা হয়েছে বলে বিবেচিত হত। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত উপায় ও কৌশল গ্রহণ করেছেন এবং কোন প্রচেষ্টাই তিনি বাদ দেন নি। অতঃপর যখন শত্রুরা তাঁর উপর জয়ী হল এবং তারা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করল তখন তিনি বললেন-

﴿حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার পক্ষে কাজ করার জন্য তিনিই উত্তম যিম্মাদার"। তাই তাঁর কথা যথাস্থানে প্রয়োগ হয়েছিল এবং তাঁর কথাটি বলার সাথে সাথেই ফল দিয়েছে। এমনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণকে উহুদ যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর যখন বলা হল যে,

﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾

"তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়েছে সুতরাং তাদের ভয় কর" (সূরা আল ইমরান-৩:১৭৩) তখন সাহাবীগণও প্রস্তুতি নিলেন। অতঃপর তারাও কাফেরদের মুকাবেলা করার জন্য বের হলেন এবং বললেন-

﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

"আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার"।[১৬২] তাদের এই কথা সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে হওয়ার কারণে পরিপূর্ণ প্রভাব ও ফলাফল দেখা দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾

"আর যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট"।[১৬৩] সুতরাং যে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট। এখানে তাকওয়ার পর তাওয়াক্কুল তথা ভরসার কথা বলা হয়েছে। তাকওয়া হচ্ছে আসবাব তথা এমন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা, যা গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর তা গ্রহণ করার পর ভরসা করলে আল্লাহ্ সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

---

১৬২. সূরা আল ইমরান-৩:১৭৩
১৬৩. সূরা তৃলাক-৬৫:২-৩

﴿وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

"আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মুমিনদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত"।[১৬৪] সুতরাং প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যয় করা ছাড়াই ভরসা করা এবং সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহকেই যথেষ্ট মনে করা শুধু ব্যর্থতা ও অক্ষমতারই নামান্তর। যদিও এখানে আল্লাহর উপর ভরসা করার বিষয়টি প্রস্ফুটিত হচ্ছে তথাপিও এটি হচ্ছে অক্ষম-অপারগতার তাওয়াক্কুল (ভরসা)। সুতরাং বান্দার উচিত নয় যে, সে তার ভরসাকে অক্ষমতায় পরিণত করে এবং অপারগতাকে ভরসায় পরিণত করে নেয়। বরং আল্লাহর উপর ভরসাকেও যেন ঐ সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমের অন্তর্ভূক্ত মনে করে, যার সবগুলো একসাথে ব্যয় না করলে লক্ষ্যবস্তু অর্জিত হয়না। এই মাসআলায় মানুষের দু'টি দল ভুল করেছে। একদল মনে করছে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করাই যথেষ্ট। তাই তারা আল্লাহর নির্দেশিত কাজ সম্পাদন করা বর্জন করেছে, যা উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যম ছিল। সুতরাং তারা অলসতা ও অক্ষমতা-অপারগতার দোষে দুষিত হয়েছে। পরিশ্রম বিহীন ভরসাকে তারা শক্তিশালী মনে করার পরও আল্লাহর উপর তাদের ভরসা দুর্বল হয়েছে। যখনই পরিশ্রম বিহীন ভরসা শক্তিশালী হবে তখনই অলসতা তার কাজের স্পৃহাকে দুর্বল করে দিবে। যেই কর্মটি ছিল ভরসার মহল (স্থান)।

যেই কৃষক যমীনে চাষ করে এবং তাতে বীজ বপন করে এবং ফসল উৎপন্ন হওয়াতে আল্লাহর উপর ভরসা করে সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং তাওয়াক্কুলের হক আদায় করে। সে যমীনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়ে আল্লাহর ভরসাকে নষ্ট করে দেয়না। এ রকমই হওয়া উচিত পথ চলার সাথে সাথে আল্লাহর উপর মুসাফিরের ভরসা। আল্লাহর শাস্তি হতে রেহাই পাওয়া এবং তাঁর ছাওয়াব অর্জনের মাধ্যমে সফলকাম হওয়ার জন্য আল্লাহর আনুগত্যে সর্বদা শ্রম ব্যয় করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করা জরুরী। এটিই হচ্ছে ঐ তাওয়াক্কুল, যার ফলাফল পাওয়া যায় এবং এভাবে যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করেন। অলস ও অক্ষম ব্যক্তির ভরসা আদৌ কোন ফল বয়ে আনেনা। আল্লাহও তাকে সাহায্য করেন না।

দ্বিতীয় বিভ্রান্ত দলটি হচ্ছে, যারা উপায়-উপকরণ ও পরিশ্রমের উপরই সম্পূর্ণরূপে ভরসা করেছে। তাদের (বাস্তবাদীদের) বিশ্বাস হল পরিশ্রমই একমাত্র সফলতার চাবি। তারা আল্লাহর উপর ভরসা করা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ। এই দলটি যদিও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রচুর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু তারা আল্লাহর উপর ভরসাকারীদের ন্যায় শক্তিশালী নয়, তাদের জন্য আল্লাহর কোন সাহায্য নেই এবং তাদের বিপদাপদও তিনি দূর করেন না। বরং আল্লাহর উপর ভরসা ছেড়ে দেয়ার কারণে এই দলটি দুর্বল ও অক্ষমে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলেই (ভরসাতেই) প্রকৃত শক্তি। কোন কোন সালাফ বলেছেন- যে ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী হতে চায় সে যেন আল্লাহর উপর ভরসা করে। তাই আল্লাহর উপর ভরসাকারী শক্তিশালী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত।

১৬৪. সূরা মায়িদা-৫:১১

মোটকথা নাবী ﷺ বান্দাকে এমন বিষয়ের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে রয়েছে তার পরিপূর্ণ সফলতা এবং তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। সুতরাং এই সফলতা অর্জনের প্রচেষ্টা করা উচিত এবং এ জন্য শ্রম ব্যয় করা জরুরী। তাহলেই হাসবীয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল বলা উপকারী হবে। কিন্তু যে অলসতা করবে এবং অক্ষমতা প্রকাশ করবে ও লক্ষ্যবস্তু অর্জনের সুযোগ চলে যাওয়ার পর

﴿حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার পক্ষে কাজ করার জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার" এ কথা বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। এই অবস্থায় তাকে আল্লাহ্ সাহায্য করেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি আমল করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর উপর ভরসা করে তিনি তাকেই সাহায্য করেন।

যিকির তথা আল্লাহর স্মরণের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর সুন্নাত

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর যিকির তিনিই সবচেয়ে বেশী করতেন। মূলতঃ তার সকল কথাই আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভূক্ত ছিল। উম্মাতের জন্য তাঁর আদেশ, নিষেধ, শরীয়ততের বিভিন্ন বিধান নির্ধারণ করা, আল্লাহর নাম ও সিফাত সম্পর্কে সংবাদ দেয়া, আল্লাহর হুকুম-আহকাম, আল্লাহর কর্মসমূহ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া, সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা এবং অপরাধীদের জন্য তাঁর শাস্তির ভীতি প্রদর্শনও রসূল ﷺ এর সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করা, তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া এবং তাঁর প্রশংসা করাও যিকির। তিনি যখন চুপ থাকতেন তখনও অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করতেন। আল্লাহর কাছে দু'আ করা, কিছু চাওয়া, এবং আল্লাহকে ভয় করাও যিকিরের মধ্যে গণ্য। দাঁড়ানো, বসা, শায়িত, চলন্ত, আরোহন, ভ্রমণ এবং নিজ দেশে অবস্থানসহ সকল অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর যিকির করতেন।

ঘুম থেকে জেগে তিনি পাঠ করতেনঃ

﴿الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

উচ্চারণঃ *'আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর'*

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জাগ্রত করেছেন। তাঁর দিকেই সকলকে একত্রিত হতে হবে"।[১৬৫]

---

১৬৫. বুখারী, তাও.হা/৬৩১৪ ইফা. হা/৫৭৬২, আপ্র. হা/৫৮৬৯, আবু দাউদ, আলএ, হা/৫০৪৯, সহীহ ইবনে মাযাহ, মাশা. হা/৩৮৭০, তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪১৭, মিশকাত, মাশা. হা/২৩৮২

অতঃপর গ্রন্থকার এখানে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পঠিতব্য অন্যান্য দু'আ, সলাত শুরু করার দু'আ, ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ, মাসজিদে প্রবেশের দু'আ, সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দু'আ, কাপড় পরিধান করার দু'আ, ঘরে প্রবেশের দু'আ, টয়লেটে প্রবেশের দু'আ, ওযূর দু'আ, নতুন চাঁদ দেখার দু'আ, পানাহারের দু'আ এবং হাঁচি দেয়ার সময় পড়ার দু'আ বর্ণনা করেছেন।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বলতেন-

«بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ»

"বিসমিল্লাহ্ (আমি আল্লাহর নামে ঘর থেকে বের হচ্ছি)। আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা যায়না এবং আল্লাহর তাওফীক ছাড়া আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায়না"। [১৬৬]

সফর থেকে ফেরত এসে গৃহে প্রবেশের পূর্বে যা করণীয়

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগাম সংবাদ না দিয়ে হঠাৎ করে গৃহে প্রবেশ করতেন না। বরং তিনি সফর থেকে আগমণের সংবাদ আগেই জানিয়ে দিতেন। ঘরে প্রবেশের সময় গৃহবাসীকে সালাম দিতেন। প্রথমেই তিনি মিসওয়াক করতেন। তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। কখনও তিনি জিজ্ঞেস করতেনঃ তোমাদের কাছে খাবার কিছু আছে কি? কখনও তিনি কিছু না বলে চুপ থাকতেন। ইতিমধ্যেই খানা উপস্থিত করা হত।

ঘরে প্রবেশের সময় তিনি বলতেন-

«بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا»

"আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম। আল্লাহর নামেই বের হয়েছিলাম। আর আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই ভরসা করলাম"।[১৬৭]

টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে তিনি এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»

"হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি-যাবতীয় নোংরা জিন ও জিন্নী থেকে"।[১৬৮] সেখান থেকে বের হয়ে পাঠ করতেনঃ غُفْرَانَــكَ "তোমার ক্ষমা চাই হে প্রভু!" নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশাব-পায়খানার সময় কিবলা সামনে বা পিছনে রাখতেন না। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তা থেকে নিষেধ

---

১৬৬. আবু দাউদ, আলএ, হা/৫০৯৫, সহীহ আত- তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪২৬, মিশকাত, মাশা. হা/২৪৪৩, সহীহ, আলবানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১৬৭. আবু দাউদ, আলএ, হা/৫০৯৫, যঈফ: আলবানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১৬৮. বুখারী, তাও. হা/৬৩১৪, ইফা. হা/৫৭৬২, আপ্র. হা/৫৮৬৯, মুসলিম, হাএ. হা/৭১৭, ইফা. হা/৭১৫, ইসে. হা/৭৩০, তিরমিযী, মাপ্র. হা/৬, নাসায়ী, মাশা. হা/১৯, সহীহ ইবনে মাযাহ, মাশা. হা/২৯২, মিশকাত, হা/ ৩৩৭

করেছেন। আরও বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁকে পেশাবরত অবস্থায় সালাম দিলে তিনি তার উত্তর দেন নি।[১৬৯] রসূল ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি পেশাব-পায়খানা করার সময় কথা বলে আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

মাসজিদে প্রবেশের সময় তিনি বলতেন-

«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ»

"আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, দুরূদ ও সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর ওযূর শুরুতে নাবী ﷺ শুধু বিসমিল্লাহ বলতেন। আর শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন।

«أَشْهدُ أَنْ لا إله إلاَّ اللهُ وحْدَه لا شَريكَ لهُ وأَشْهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبْدُهُ وَرسُولُه اللّٰهُمَّ اجْعلْني من التَّوَّابِينَ واجْعلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ»[১৭০]

হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাসমুহ আমার জন্য খুলে দাও। হে আল্লাহ! আমার পাপরাশী ক্ষমা কর"।

মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বলতেন-

«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ»

"বের হচ্ছি আল্লাহর নামে, দুরূদ ও সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক রসুলুল্লাহ ﷺ উপর । হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি"। হে আল্লাহ! আমার পাপরাশী ক্ষমা কর।" নতুন চাঁদ

দেখার সময় তিনি এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

«اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ»

"আল্লাহ সবচেয়ে বড়, হে আল্লাহ্! তুমি এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি এবং ইসলামের সাথে উদিত কর। হে চাঁদ! আমাদের এবং তোমার একমাত্র রব হচ্ছেন আল্লাহ্।

---

১৬৯. তবে পরবর্তীতে পবিত্র হয়ে উত্তর দিয়েছেন।

১৭০. সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৫৫, ইফা. হা/৫৫, মাশা. হা/৫৫, সহীহ : আলবানী রহিমাহুল্লাহ

সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করার কতিপয় যিকির

- **ক. একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে।**
- **খ. সূরাতুল ইখলাস, সূরাতুল ফালাক ও সূরা নাস তিন বার করে পাঠ করবে।**
- **গ. তিনবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ»

"শুরু করছি সেই আল্লাহ্‌র নামে, যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তুই কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, তিনি মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী"।

- **ঘ. তিনবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ»

"আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণবাণী সমূহের মাধ্যমে। তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে"।[১৭১]

- **ঙ. তিনবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«رَضِيْتُ بِاللهِ ربًّا وبالإسلاَمِ دِيْناً وبِمُحمدٍ نبيّاً ورسولاً»

"আমি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহ্‌কে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে নাবী ও রসূল হিসেবে"।[১৭২]

- **চ. সাতবার এই দু'আটি বলবেঃ**

«حَسْبِيَ اللهُ لا إله إلا هو عَليه تَوَكَّلْتُ وهو رَبُّ الْعَرشِ الْعَظِيْمِ»

"আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই, তাঁর প্রতিই ভরসা করেছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

- **ছ. একবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«أَصْبَحْناَ على فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ وَ عَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاَصِ وعلى دِيْنِ نَبِيِّناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْناَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيْفاَ مُسْلِماً وما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ»

"আমাদের সকাল হল ফিতরাতের (ইসলামের) উপর, একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর মিল্লাতের উপর। তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না"।

---

১৭১. মুসলিম, হাএ. হা/৬৭৭২, ইফা. হা/ ৬৬৩২, ইসে.হা/ ৬৬৮৬, আবু দাউদ, আলএ, হা/৩৮৯৮, সহীহ তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪৩৭, মিশকাত, মাশা. হা/২৪২৩

১৭২. আবু দাউদ, আলএ, হা/১৫২৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. হা/৫১৯, সিলসিলাতুস আহাদীসুস সহীহা লিল আলবানী, মাশা.হা/৩৩,

❖ **সন্ধ্যায় পাঠ করার সময় এভাবে পাঠ করবেঃ**

«أَمْسَيْنَا على فِطْرَةِ الإسلامِ وَ على كَلِمَةِ الإِخْلاصِ وعلى دِيْنِ نَبِيِّناَ محمد وعلى مِلَّةِ أَبِيْنَا إبراهيمَ حَنِيْفاَ مُسْلِماً وماَ كاَنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ»

"আমাদের বিকাল হল ফিতরাতের (ইসলামের) উপর, একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এর মিল্লাতের উপর তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।

➢ **জ. একবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«أَصْبَحْناَ واصْبَحَ المُلْكُ للهِ والْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هذا الْيَوْمِ وخَيْرَ ماَ بَعْدَهُ وأعوذُ بِك منْ شَرِّ ما فِيْ هذا اليومِ وَشَرِّ ما بَعْدَهُ ربِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وسُوْءِ الكِبَرِ ربِّ أعوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِيْ النَّارِ وعَذَابٍ في القَبْرِ»

"আমরা সকাল করেছি এমন অবস্থায় যে, রাজত্ব এককভাবে আল্লাহ্‌র জন্য, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই অধিকারে এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে প্রভু আজকের দিন এবং পরবর্তী দিনের মঙ্গল তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে আজকের দিন এবং পরবর্তী দিনের অমঙ্গল থেকে। হে প্রভু! আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে অলসতা থেকে এবং অধিক বয়সের অনিষ্টতা থেকে। হে প্রভু! আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে দোযখের শাস্তি এবং কবরের আযাব হতে।

➢ **সন্ধার সময় এভাবে বলবেঃ**

«أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

➢ **ঝ. একবার এই দু'আটি বলবেঃ**

«اللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْناَ وبِكَ أمسَيْناَ وبِكَ نَحْياَ وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ»

"হে আল্লাহ্‌! তোমার অনুগ্রহে সকাল করেছি এবং তোমার অনুগ্রহে সন্ধা করেছি, তোমার করুনায় জীবন লাভ করি এবং তোমার ইচ্ছায় আমরা মৃত্যু বরণ করব, আর কিয়ামত দিবসে তোমার কাছেই পুনরত্থিত হতে হবে"।

❖ **সন্ধার সময় দু'আটি এভাবে বলবেঃ**

«اللّٰهُمَّ بِكَ أمسَيْنا وبِكَ أَصْبَحْنا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ»

"হে আল্লাহ্ তোমার অনুগ্রহে বিকাল করেছি এবং তোমার অনুগ্রহে সন্ধা করেছি, তোমার করুনায় জীবন লাভ করি এবং তোমার ইচ্ছায় আমরা মৃত্যু বরণ করবো, আর কিয়ামত দিবসে তোমার কাছেই পুনরত্থিত হতে হবো"।

- **ঞ. একবার বা দুইবার অথবা তিনবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«اللّٰهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلٰهَ إِلا أَنتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ محمداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ»

"হে আল্লাহ্! তোমার নামে আমি সকাল করেছি। তোমাকে সাক্ষী রাখছি, তোমার আরশ বহন কারী ফিরিস্তা,সকল ফেরেশতাকুল এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তোমার বান্দা ও রসূল"।[১৭৩]

- **সন্ধার সময় দু'আটি এভাবে বলবেঃ**

«اللّٰهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلٰهَ إِلا أَنتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ محمداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ»

"হে আল্লাহ্! তোমার নামে আমি বিকাল করেছি। তোমাকে সাক্ষী রাখছি, তোমার আরশ বহন কারী ফিরিস্তা,সকল ফেরেশতাকুল এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তোমার বান্দা ও রসূল"।

- **ট. একবার এই দু'আটি বলবেঃ**

«اللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ»

"হে আল্লাহ্! আমার কাছে তোমার যে নে'য়ামত সকালে আগমণ করেছে অথবা তোমার সৃষ্টি জগতের কারও কাছে আগমণ করেছে, তা সবই এককভাবে তোমার পক্ষ থেকেই। তোমার কোন শরীক নেই। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসামাত্রই তোমার জন্য"।

- **সন্ধার সময় উক্ত দু'আটি এভাবে বলবেঃ**

«اللّٰهُمَّ مَا أَمْسَى بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ»

- **ঠ. একবার এই দু'আটি বলবেঃ**

«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِكَ أَسْتَغِيْثُ فَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ»

"হে চিরঞ্জিব, চিরস্থায়ী তোমার কাছে আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি, সুতরাং আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে এবং এক পলকের জন্য হলেও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিওনা।

---

১৭৩. ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন, সিলসিলাহ যঈফা, মাশা. হা/১০৪১।

➢ **ড. তিনবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«اللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لا إِلٰهَ إِلا أَنْتَ»

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান কর, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে নিরাপদ রাখ। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই"।

➢ **ঢ. তিনবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ والْفَقْرِ وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لا إِلٰهَ إِلا أَنتَ»

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি ক্বরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই"।

➢ **ণ. একবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسأَلُكَ العَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا والآخِرَةِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسأَلُكَ العَفْوَ والعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ ودُنْيَايَ وَأَهْلِي ومَالِيْ اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وآمِنْ رَوْعَاتِيْ ، اللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وعَنْ شِمَالِيْ ، وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ»

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ্ আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমা এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও সম্পদের নিরাপত্তা। হে আল্লাহ্! আমার গোপন বিষয় সমূহ (দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার সম্মুখ থেকে, পিছন থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে। আর তোমার মহত্বের উসিলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিচ দিক থেকে মাটি ধ্বসে আমার আকস্মিক মৃত্যু হতে।

➢ **ত. একবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ ، اَشْهَدُ أَنْ لاإِلٰهَ إِلا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءً أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ»

"হে আল্লাহ্! তুমি আসমান-যমীনের সৃষ্টি কর্তা, তুমি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জান। তুমি সকল বস্তুর প্রভু এবং সব কিছুর মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে এবং আশ্রয় কামনা করছি নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোন মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে।

➢ **থ. একবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ** «اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً طَيِّباً وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً»

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি উপকারী বিদ্যা, পবিত্র জীবিকা এবং মাকবুল (গ্রহণীয়) আমলের"।[১৭৪]

➢ **দ. একবার এই দু'আটি পাঠ করবেঃ**

«اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لا إله إلا أنتَ خَلَقْتَنِيْ وَأنَا عَبْدُكَ وأنا على عَهْدِكَ، وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ ملَ صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إلاَّ أَنْتَ»

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রভু প্রতিপালক তুমি ছাড়া প্রকৃত পক্ষে ইবাদতের যোগ্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করছি। আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়া'মত স্বীকার করছি এবং তোমার নিকট আমার পাপকর্মেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর, কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশী অন্য কেউ ক্ষমা করতে পারেনা।

নাবী ﷺ বলেন- যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাকারার শেষের আয়াত দু'টি পাঠ করবে, আয়াত দু'টি তার জন্য (ঐ রাতের জন্য) যথেষ্ট হবে।

❖ **দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবেঃ**

«اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى محمدٍ وَعَلَى آلِ مُحمدٍ كَماَ صَلَّيْتَ على إبْرَاَهِيْمَ وَ على آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ»

"হে আল্লাহ্ তুমি রহমত নাযিল কর মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর, যেমন তুমি রহমত নাযিল করেছো ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত"।

আযান ও ইকামতের ক্ষেত্রে রসূল ﷺ এর সুন্নাত

নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তারজীসহ এবং তারজী ছাড়া- এ দু'টি পদ্ধতিতেই আযান দেয়া সুন্নাত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।[১৭৫] একামতের শব্দগুলো একবার করে বলা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে দুইবার করে অর্থাৎ আযানের ন্যায় বলাও জায়েয আছে।[১৭৬] (কিন্তু

১৭৪. *সহীহ ইবনে মাজাহ. মাশা. হা/৭৫৩, বাইহাক্বী, মাশা. হা/১৭৮২, মেশকাত, মাশা. হা/২৪৯৮, সহীহ, তাহ: আলবানী (রহ.)।*

১৭৫. আযান দেয়ার সময় আশহাদু আল-লা-ইল্লাল্লাহ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ- এই বাক্য দু'টির প্রত্যেকটি প্রথমে ছোট আওয়াজে দুইবার করে মোট চারবার বলার পর পুনরায় আওয়াজ উঁচু করে চারবার উচ্চারণ করে আযান দেয়াকে তারজীর আযান বলা হয়।

১৭৬. **আযান ও ইকামতের বাক্যসমূহের ক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও এর সর্বাধিক বিশুদ্ধ পদ্ধতিঃ** আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

«أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ»

বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জুড় বাক্যে আযান এবং বেজোড় বাক্যে ইকামত দিতে আদেশ করা হয়েছে। তবে ইকামতের ক্ষেত্রে কাদ কামাতিস্ সালাহ বাক্যটি দুইবার বলার আদেশ দেয়া হয়েছে। (বুখারী তাও হা/৬০৫) ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ

«إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»

আযানের বাক্যগুলো দু'বার করে বলা হত এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলা হত। তবে (কাদকামাতিস্ সালাহ) বাক্যটি দুইবার বলা হত। (আবু দাউদ আলএ.হা/৫১০)

একবার করে বলার হাদীসগুলোর সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে)। তবে قد قامت الصلاة 'কাদকামাতিস সালাহ' বাক্যটি একবার বলা মোটেও প্রমাণিত নয়। এমনিভাবে আযানের শুরুতে চারবার আল্লাহু আকবার বলা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, দুইবার বলাকে যথেষ্ট মনে করা সহীহ নয়। তিনি উম্মাতের জন্য আযানের সময় এবং আযানের পরে পাঁচ পদ্ধতির দু'আ নির্ধারণ করেছেন।

প্রথম দু'আঃ আযান শ্রবণকারী মুআযযিনের সাথে সাথে আযানের শব্দগুলোই উচ্চারণ করবে। তবে হাইয়্যা আলাসসালাহ, হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ বলার সময় বলবেঃ لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إلاَّ بِـالله 'লা-হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হইতে বিরত থাকা সম্ভব নয় এবং আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। শ্রোতার জন্য حَيَّ عَلَى الصَّـلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَـلاَحِ এবং لاَحَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إلاَّ بِـالله - এর উভয়টি একসাথে বলার বিষয়টি নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়নি। তেমনি শুধু মুআযযিনের সাথে حَيَّ عَلَى الصَّـلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَـلاَحِ বলাকেই যথেষ্ট মনে করার বিষয়টিও প্রমাণিত নয়। এটিই যুক্তি সম্মত। কারণ আযানের বাক্যগুলো হচ্ছে যিকির। حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَـلاَحِবাক্যদ্বয় দ্বারা সলাতের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। তাই শ্রোতার জন্য সুন্নাত হচ্ছে সে আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইবে অর্থাৎ لاَحَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إلاَّ بِـالله বলবে, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় এবং তাঁর তাওফীক ব্যতীত সৎকাজে যোগদান করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় দু'আঃ শ্রোতার জন্য এই দু'আটি পাঠ করাও সুন্নাত। নাবী ﷺ বলেন- যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। দু'আটি হচ্ছেঃ

«رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وبالإِسلاَمِ دِيْناً وبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَرَسُوْلاً»

উপরে বর্ণিত হাদীছ দু'টিতে আযান ও একামতের বাক্যগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়নি। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, আযানের বাক্যগুলো দু'বার করে বলা হত এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলা হত। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, হাদীছ দু'টি সংক্ষিপ্ত। তাই আমাদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে যে, আযান-ইকামতের শব্দগুলো কোথায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে? আযান ও ইকামতের ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদের হাদীসটিই হচ্ছে মূল। সেখানে আযানের শব্দগুলো এভাবে উল্লেখ আছেঃ

«اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»

এবং ইকামতের শব্দগুলো এভাবে উল্লেখ আছেঃ

«اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»

সুতরাং উল্লেখিত আলোচনায় আযানের বাক্য এবং ইকামতের বাক্য সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল যে, আযানের মোট বাক্য ১৭ টি এবং ইকামতের মোট বাক্য ১১ টি। তবে ফজরের আযানের সময় হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্ বলার পর الصلاة خير من النوم আস্সালাতু খাইরুম মিনান্নাওম ২ বার বলবে। (ইবনে মাজাহ্)

"আমি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহ্‌কে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে নাবী ও রসূল হিসেবে"।

তৃতীয় দু'আঃ মুআযযিনের উত্তর দেয়ার পর নাবী ﷺ-এর উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ দুরূদ হচ্ছে, যা তিনি তাঁর উম্মাতকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা হচ্ছে দুরূদে ইবরাহীম, যা আমরা সলাতে পাঠ করি।

চতুর্থ দু'আঃ রসূল ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠ করার পর এই দু'আটি পাঠ করবে।

«اللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَ الفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ»

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত্ তা'ম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল কায়িমাহ। আ'তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ। ওয়াব্‌আসহু মাকামাম মাহমূদানিল্লাযি ওয়াআদ্ তাহু।

"হে আল্লাহ্ এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই প্রতিষ্ঠিত সলাতের তুমিই প্রভু। মুহাম্মাদ ﷺকে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার অঙ্গীকার তুমি তাঁকে দিয়েছো। তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে"।

পঞ্চম দু'আঃ তারপর নিজের জন্য দু'আ করবে। সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ বলেন- আযান ও ইকামতের মাঝখানে দু'আ ফেরত দেয়া হয় না। সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাতে কি বলব? তিনি বললেন- দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল বিপদ যেমনঃ রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। এই হাদীসটি সহীহ।

পানাহার গ্রহণের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত কতিপয় আদব

তিনি যখন খাবারে হাত রাখতেন তখন (بِسْمِ اللهِ) বিসমিল্লাহ্ বলতেন। তিনি তা বলারও আদেশ দিতেন। বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে- «بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ»

"বিসমিল্লাহ বলে শুরু করছি এবং শেষেও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করছি"।[১৭৭] এই হাদীসটি সহীহ। সুতরাং খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা উচিত। যে ব্যক্তি পানাহার করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলবেনা, শয়তান তার পানাহারে অংশীদার হবে। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ ওয়াজিব হওয়ার হাদীসগুলো সহীহ এবং সুস্পষ্ট। এর বিপরীতে কোন হাদীস বা ইজমায়ে উম্মাত বর্ণিত হয়নি।

একসাথে একাধিক ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করার সময় একজনের বিসমিল্লাহ্ বলাই কি যথেষ্ট হবে এবং শয়তান অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে কি? এ ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর বক্তব্য হচ্ছে, এমতাবস্থায় একজনের বিসমিল্লাহ বলাই যথেষ্ট। এও বলা হয় যে, সম্মিলিতভাবে খাদ্য গ্রহণ করার

---

১৭৭. আবুদাউদ, মাপ্র. হা/ ৩৭৬৭, সহীহ আত- তিরমিযী, হা/১৮৫৮, সহীহ ইবনে মাজাহ, হা/৩২৫৫, মিশকাত, মাশা. হা/৪২০২, হাসান সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।

সময় সকলকেই বিসমিল্লাহ্ বলতে হবে। যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলবে শয়তান কেবল তার সাথে অংশ গ্রহণ করা থেকেই বঞ্চিত হবে। অন্যদের সাথে অংশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হবেনা।

ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে সহীহ সাব্যস্ত করে বর্ণনা করেন যে, একদা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ছয়জন সাহাবীকে নিয়ে খাদ্য গ্রহণ করছিলেন। এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক এসে দুই লুকমায় সমস্ত খানা সাবার করে ফেলল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন- এই লোকটি যদি খাবার সময় বিসমিল্লাহ্ বলত তাহলে এই খানা সকলের জন্য যথেষ্ট হত। ইহা জানা কথা যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ বিসমিল্লাহ্ বলেছিলেন। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এক হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন- আমরা একবার খাদ্য গ্রহণ করার জন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে উপস্থিত হলাম। তখন হঠাৎ একটি বালিকা এসে খাদ্যে হাত প্রবেশ করাতে লাগল। মনে হচ্ছিল কে যেন তাকে খানার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর একটি গ্রাম্য লোক আসলে তিনি তার হাতও ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি বললেন- যে খাদ্যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না (বিসমিল্লাহ বলা হয়না) শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল মনে করে। খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করতে (খাওয়ার জন্যে) শয়তান এই বালিকাটিকে সাথে নিয়ে এসেছে। আমি তার হাত ধরে ফেলেছি। একই উদ্দেশ্যে সে এই গ্রাম্য লোকটিকেও নিয়ে এসেছে। আমি তার হাতও ধরে ফেলেছি। ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তখন বালিকা ও গ্রাম্য লোকটির হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার হাতেই ছিল। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে খাদ্য গ্রহণ শুরু করলেন।

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, সম্মিলিত হয়ে খাদ্য গ্রহণ করার সময় সকলকেই বিসমিল্লাহ্ বলতে হবে। একজনের বিসমিল্লাহ যথেষ্ট হলে শয়তান খাদ্যে হাত রাখার সুযোগ পেতনা। তবে এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখনও খাদ্য গ্রহণ শুরু করেন নি। বালিকাটি প্রথমেই বিসমিল্লাহ্ না বলেই শুরু করে দিয়েছিল। গ্রাম্য লোকটিও তাই করেছিল। তাই উভয়ের সাথেই শয়তান যোগ দিয়েছিল।

সালাম ও হাঁচির জবাব দেয়া

সালাম ও হাঁচির জবাব দেয়া ওয়াজিব কি না সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলবে তখন প্রত্যেক শ্রবণকারী মুসলিমের উপর আবশ্যক হল হাঁচির জবাব দেয়া। অর্থাৎ يرحمك الله 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা আবশ্যক। যদি ধরেও নেয়া হয় যে সালাম ও হাঁচির জবাব দেয়া আবশ্যক, তথাপিও হাঁচি ও সালামের জবাব দেয়া এবং খাদ্য গ্রহণ করার মাসআলার মধ্যে প্রকাশ্য পার্থক্য রয়েছে। খাদ্য গ্রহণকারী খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না বললে শয়তান তার সাথে শরীক হয়। সুতরাং এখানে একজনের বিসমিল্লাহ্ সকলের জন্য যথেষ্ঠ নয়। অপর পক্ষে সকলের পক্ষ হতে একজন সালামের ও হাঁচির জবাব দিলে যথেষ্ট হবে। সকলেই বিসমিল্লাহ না বলে শুধু একজনের বিসমিল্লাহ পাঠ শয়তানের অংশ গ্রহণ এবং খাওয়া ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট নয়। সর্বোচ্চ এত টুকু বলা যেতে পারে যে, সম্মিলিত অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করার সময় কতিপয়ের বিসমিল্লাহ বলার কারণে শয়তানের অংশগ্রহণ সীমিত হয় এবং যে বিসমিল্লাহ পাঠ করল না, তার সাথে শয়তানের অংশ গ্রহণ থেকেই যায়। আল্লাহই ভাল জানেন।

তিন নিঃশ্বাসে পান করা

নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি যখন পাত্র থেকে কিছু পান করতেন তখন তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন। প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সময় আল্লাহর প্রশংসা করতেন। তিনি পানাহারের শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলতেন। নাবী ﷺ থেকে খাদ্য গ্রহণ শেষে এই দু'আটি পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়েছেঃ

«الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَطْعَمَنِى هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ»

"আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাকে বিনা পরিশ্রমে, সহজভাবে এবং আমার পক্ষ হতে শক্তি ব্যয় করা ছাড়াই এই রিযিক প্রদান করেছেন"। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমার নিজের জন্য কোন কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব নয়। হাদীছের শেষাংশে এসেছে, যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ শেষে এই দু'আ পাঠ করবে তার জীবনের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে।[১৭৮] নাবী ﷺ থেকে নিম্নের দু'আটিও বর্ণনা করা হয়ঃ

«الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ»

"সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলিম করেছেন।" এই বর্ণনায় দুর্বলতা থাকলেও ভাবার্থ ঠিক আছে।[১৭৯] নাবী ﷺ কখনও কোন খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। বরং তিনি কোন খাদ্য অপছন্দ করলে তা বর্জন করতেন এবং চুপ থাকতেন। কখনও তিনি বলতেন- এটির প্রতি আমার আগ্রহ নেই। তিনি কখনও কোন কোন খাদ্যের প্রশংসা করতেন। যেমন তিনি বলেছেন- সির্কা হচ্ছে সর্বোত্তম তরকারি। তিনি ঐ ব্যক্তির অন্তরকে খুশী করার জন্য কথাটি বলেছিলেন, যে নাবী ﷺ এর জন্য সির্কা পেশ করে বলেছিল- আমাদের কাছে খাল্ তথা সির্কা (ফলের রস বিশেষ) ব্যতীত অন্য কোন তরকারি নেই। সকল প্রকার খাদ্যের উপর সির্কার মর্যাদা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁর কাছে সিয়াম অবস্থায় খাদ্য পেশ করা হলে তিনি বলতেন- আমি সায়িম। কোন সিয়ামদারের নিকট খাদ্য পেশ করা হলে তিনি সায়িমকে আদেশ দিতেন, সে যেন খাদ্য পেশকারীর জন্য দু'আ করে। যার নিকট খাদ্য পেশ করা হবে সে যদি সায়িম না হয়ে থাকে তাহলে তার উচিত সেখান থেকে খাওয়া।

পানাহার গ্রহণের সময় প্রয়োজনীয় কথা বলা

কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হলে অন্য কেউ যদি বিনা দাওয়াতেই তার সাথে চলে আসে তাহলে মেজবানকে তথা নিমন্ত্রণকারীকে বলতে হবে যে, এই লোকটি বিনা দাওয়াতে আমাদের সাথে চলে এসেছে। আপনি ইচ্ছা করলে তাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারেন। আর যদি তা না করেন তাহলে সে ফেরত যাবে। নাবী ﷺ খাদ্য গ্রহণ করার সময় প্রয়োজনীয় কথাও বলতেন। যেমন তিনি একবার খাদেমকে বলেছিলেন- বিসমিল্লাহ্ বল এবং খাও। আতিথেয়তায় অভ্যস্থ এবং দানশীল লোকদের ন্যায় কখনও তিনি মেহমানদের কাছে বেশী পরিমাণ খাওয়ার জন্য একাধিকবার আবেদন

---

১৭৮. সহীহ আত-তিরমিযী, হা/৩৪৫৮, সহীহ ইবনে মাজাহ, হা/৩২৭৬, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/১৫৬৩২, মিশকাত, মাশা. হা/৪৩৪৩, হাসান সহীহ: আলবানী।

১৭৯. আবুদাউদ, আলএ. হা/ ৩৮৫০, সহীহ আত- তিরমিযী, হা/৩৪৫৭, মিশকাত, মাশা. হা/৪২০৪, **ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন।**

করতেন। যেমনটি এসেছে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত দুধ পান করার ঘটনায়। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে তিনি একাধিকবার বলেছেন- اشـــرب তুমি আরও পান কর। কথাটি তিনি বলতেই থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ কথা বলতে বাধ্য হলেন যে, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমার পেটে আর কোন জায়গা খালি নেই।[১৮০]

কারও বাড়ীতে দাওয়াত খেলে বাড়ী ওয়ালার জন্য দু'আ করাঃ

তিনি কারও বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেলে বাড়ি ওয়ালার জন্য দু'আ না করে ফেরত আসতেন না। ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আবুল হাইছাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘটনায় উল্লেখ করেছেন যে, আবুল হাইছাম তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে দাওয়াত করলেন। খাওয়া শেষে তিনি বললেন- তোমাদের ভাইকে ছাওয়াব দান কর। তারা বললেন- কিভাবে আমরা তাকে ছাওয়াব প্রদান করব? তিনি বললেন- কাউকে যখন কোন ঘরে খাওয়ার জন্য ডাকা হবে তখন পানাহার করার পর সে যদি মেজবানের জন্য (নিমন্ত্রণকারীর জন্য) দু'আ করে তাহলে এটিই হবে ঘর ওয়ালাকে ছাওয়াব দেয়ার নামান্তর।

বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একবার সাদ বিন উবাদার ঘরে দাওয়াত খেয়ে এই দু'আ করেছেনঃ

«أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ»

"রোযাদারগণ তোমাদের নিকট ইফতার করেছে, সৎ লোকেরা তোমাদের খাবার গ্রহণ করেছেন এবং ফিরিস্তাগণ তোমাদের জন্য দু'আ করেছে"।[১৮১]

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একবার রাত্রিতে স্বীয় ঘরে প্রবেশ করলেন এবং খানা তালাশ করলেন। কিন্তু কিছুই পেলেন না। তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করলেন-

«اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي»

"হে আল্লাহ্ যে আমাকে খাওয়াবে, তুমি তার খাদ্যে বরকত দান কর আর যে আমাকে পান করাবে, তুমি তাকেও পান করাও"।[১৮২] যারা ফকীর-মিসকীনদেরকে খাদ্য খাওয়াত তিনি তাদের জন্য দু'আ করতেন এবং তাদের প্রশংসা করতেন। তিনি ছোট-বড়, স্বাধীন-ক্রীতদাস সকলের সাথেই বসে খাবার খেতে পছন্দ করতেন। সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি কুষ্ঠরোগীর হাত ধরে তাঁর সাথে একই থালায় খেতে বসিয়ে বলেছেন- বিসমিল্লাহ্ বলে খাও। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কর এবং তাঁরই উপর ভরসা কর।

তিনি ডান হাতে খেতে আদেশ করেছেন এবং বাম হাতে খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলতেন- শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে। এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাম হাতে খাওয়া হারাম। এটিই সঠিক মত। কিছু লোক তাঁর কাছে অভিযোগ করল যে, তারা খায়, কিন্তু পরিতৃপ্ত হয়না। তিনি তাদেরকে একত্রিত হয়ে খাওয়ার আদেশ দিলেন এবং বললেন- তারা যেন পৃথক হয়ে না

---

১৮০. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক।

১৮১ . আবু দাউদ, আলএ. হা/ ৩৮৫৪,

১৮২. মুসলিম, হাএ. হা/৫২৫৭ ইফা.৫১৮৯, ইসে. হা/৫২০, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/২৩৮০৯

Contents

খায়। আর তিনি তাদেরকে খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে তথা বিসমিল্লাহ্ বলতে আদেশ করেছেন।

নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- "তোমরা আল্লাহর যিকির এবং সলাতের মাধ্যমে খাবার হজম কর। খেয়েই ঘুমিয়ে যেওনা"। এতে তোমাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে যাবে। হাদীসটি সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বিষয়টি অভিজ্ঞতা দ্বারা সত্যায়িত ও প্রমাণিত।[১৮৩]

সালাম ও সালামের উত্তর প্রদানে নাবী ﷺ এর হিদায়াত

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন-

«أَفْضَلُ الإِسْلَامِ أن تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»

"ইসলামের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, খাদ্য প্রদান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া"। বুখারী ও মুসলিমে আরও বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেন-

«خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ»

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল ষাট গজ। অতঃপর তাঁকে বললেন- তুমি যাও এবং ঐ সমস্ত ফিরিস্তাদেরকে সালাম কর এবং তাঁরা তোমার সালামের জবাবে যা বলে তা শুন। সেটিই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের পদ্ধতি। সুতরাং আদম (আলাইহিস সালাম) তাদের নিকট গিয়ে বললেন- (السلام عليكم)। ফিরিস্তাগণ জবাবে বললেন- আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জবাবে তারা 'রাহমাতুল্লাহ্' বৃদ্ধি করলেন। যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন, সে আদমের আকার বিশিষ্ট হবেন। আদমের পর থেকে বনী আদমের দৈর্ঘ্য কমতে কমতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে"। বুখারী ও মুসলিমে আরও এসেছে যে, তিনি সালামের প্রসার ঘটানোর আদেশ দিয়েছেন। আর যখন তারা সালামের প্রচলন ও প্রসার ঘটাবে তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা তৈরি হবে। আর লোকেরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবেনা। আর পরস্পরের মাঝে ভালাবাসা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা ঈমানদার হতে পারবে না। ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বলেন- আম্মার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, তিনটি গুণ যে ব্যক্তি অর্জন করতে পেরেছে, সে ঈমানের গুণাবলী অর্জন করতে পেরেছে। নিজের উপর ইনসাফ করা, পৃথিবী বাসীর জন্য সালামের প্রসার ঘটানো এবং অভাবের সময় সম্পদ খরচ করা।

---

১৮৩. এই হাদীসটি সহীহ নয়। ইবনুস সুন্নী দিবা-রাত্রির আমলে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিব্বানও যুআফাতে (১/১৯৯) উল্লেখ করেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম হাদীসের বক্তব্য সঠিক সাব্যস্ত করার ইচ্ছা পোষণে উপরোক্ত মন্তব্য করে থাকবেন বলে মনে করি। নচেৎ অভিজ্ঞতা দ্বারা হাদীসের সনদ যাচাই করা নির্ভরযোগ্য সকল হাদীছ বিশারদগণের নিকট অগ্রায্য। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে অর্থটি শক্তিশালী। (দেখুনঃ তালখীসুল আযকার)

উপরোক্ত তিনটি কথা কল্যাণের সকল প্রকার মূলনীতি ও শাখাকে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। কেননা ইনসাফের দাবী হচ্ছে বান্দা আল্লাহর হকসমূহ পূর্ণ আকারে আদায় করবে, মানুষের হকও আদায় করবে এবং মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করবে যেমন ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে। নিজের নফসের উপর ইনসাফ করাও এর অন্তর্ভূক্ত হবে। নিজের জন্য এমন কিছু দাবী করবে না, যা তার মধ্যে নেই এবং অপকর্মের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে অপবিত্র করবে না।

সার কথা এই যে, বান্দা নফসের উপর ইনসাফ করার মাধ্যমেই আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর হক এবং বান্দা নিজের পরিচয় এবং তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। বান্দা যখন নিজের উপর ইনসাফ করবে এবং নিজের পরিচয় ও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে তখন সে তার মালিক ও সৃষ্টিকর্তার অধিকার ও হকের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেনা। আল্লাহ্ তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তাতে নিজের জন্য বা অন্য কোন মাখলুকের (অলী-আওলীয়ার জন্য) কোন অংশ নির্ধারণের চেষ্টা করবেনা। নিজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য বাতিল করার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার দুঃসাহস দেখাবেনা অথবা নিজের উদ্দেশ্যকে স্রষ্টার উদ্দেশ্যের উপর প্রাধান্য দিবেনা। অর্থাৎ রুবুবীয়াত ও উলুহীয়াতের কোন বৈশিষ্টের দাবী করবেনা এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা নিজের মধ্যে ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে বণ্টন করতে চাইবেনা। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের একাংশ বান্দাদের মধ্য হতে কোন বান্দার জন্য এবং আরেক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَـذَا لِلّٰهِ بِـزَعْمِهِمْ وَهَـذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

"আল্লাহ্ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে। অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহ্র জন্য এবং ওটা আমাদের অংশীদারদের জন্য। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহ্র দিকে পৌঁছেনা এবং যা আল্লাহ্র, তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার (বণ্টন) কতইনা মন্দ"। (সূরা আনআম-৬: ১৩৬)

বান্দার চিন্তা করা উচিত, সে যেন নিজের অজান্তে অসতর্কতা বশতঃ এই শ্রেণীর বণ্টনকারীদের অন্তর্ভূক্ত না হয়। যারা অজ্ঞতা বশতঃ অন্যায়ভাবে আল্লাহ্ এবং কল্পিত ও বাতিল মাবুদের মধ্যে (ইবাদতের বিভিন্ন অংশ) ভাগ-বণ্টন করেছে। মানুষ কিভাবে সঠিক বণ্টন করবে? অথচ তাদেরকে জালেম ও মূর্খ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যাদেরকে জালেম ও মূর্খ হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে ইনসাফের আসা করা যায় কিভাবে? যে ব্যক্তি মাখলুকের (নিজের উপর এবং আল্লাহর বান্দাদের উপর) ইনসাফ করতে পারেনা, স্রষ্টার সাথে কৃত আচরণে সে ইনসাফ করবে কিভাবে? (সুতরাং মুশরিকরা সবচেয়ে বড় জালেম সম্প্রদায়)। এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা হাদীছে কুদসীতে বলেন-

«يَا ابْنَ آدَمَ مَا تُنْصِفُنِي أَتَحَبَّبُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَتَتَمَقَّتُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي خَيْرِي إِلَيْكَ يَنْزِلُ وَشَرُّكَ إِلَيَّ صَاعِدٌ»

হে বনী আদম! তুমি আমার প্রতি অবিচার করছ। নেয়ামত প্রদানের মাধ্যমে আমি তোমার প্রিয় হতে চাই, কিন্তু তুমি পাপাচারের মাধ্যমে আমার কাছে ঘৃণিত হিসাবে পরিগণিত হচ্ছ। আমার কল্যাণ

তোমার কাছে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার অকল্যাণ আমার কাছে আসছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- হে বনী আদম! তুমি আমার সাথে ইনসাফ করনি। আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। অথচ তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করছ। আমি তোমাকে রিযিক দেই। অথচ তুমি অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ (আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করে মারাত্মক জুলুম করছ)।[১৮৪] যে ব্যক্তি নিজের উপর ইনসাফ করতে পারেনা, সে অপরের উপর কিভাবে ইনসাফ করবে? অনেকেই ভাবছে যে, সে নিজের উপর ও অন্যের উপর ইনসাফ করছে। মূলতঃ সে নিজের উপর এবং অন্যের উপর মারাত্মক জুলুম করছে।

সুতরাং আম্মার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কথাঃ যে ব্যক্তি তিনটি বিষয় অর্জন করতে পেরেছে, সে ঈমানের গুণাবলী অর্জন করতে পেরেছে। নিজের উপর ইনসাফ করা, পৃথিবীবাসীকে সালাম দেয়া এবং অভাবের সময় খরচ করা। এই কথাটি সকল প্রকার কল্যাণের মূল বিষয় ও শাখাগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

যে ব্যক্তি পৃথিবী বাসীকে সালাম দেয় সে বিনয়ী-নম্র হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি মানুষকে সালাম দেয় সে কারও উপর অহংকার করেনা। বরং সে ছোট, বড়, উঁচু, নীচু, পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়। অহংকারী ব্যক্তি এর বিপরীত। সে অহংকারের কারণে সকলের সালামের উত্তরই দেয়না। সুতরাং সে কিভাবে মানুষের জন্য সালাম ব্যয় করবে?

একজন লোক অভাবে থাকা সত্ত্বেও তখনই অন্যের জন্য খরচ করতে পারে যখন সে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসাকারী হয়, তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হয়, দানশীলতা, দয়া ও রহমতের গুণে গুণান্বিত হয় এবং যেই শয়তান তাকে ফকীর হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় ও পাপ কাজের আদেশ দেয় সেই শয়তানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদা একদল বালকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একবার এক দল মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম দিলেন। ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আসমা বিনতে ইয়াজীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের এক দল মহিলার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদেরকে সালাম দিলেন। তিরমিযীতেও তাই বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ উভয় বর্ণনাতে ঘটনা একটিই এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতের ইশারাতেই সালাম দিয়েছেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ জুমআর সলাত হতে ফেরার পথে একজন বৃদ্ধ মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তারা মহিলাটিকে সালাম দিতেন। সেই বৃদ্ধা তাদের জন্য খানা পেশ করতেন।

---

১৮৪. বর্ণনা দুটি ঠিক নয়। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনাটি মাওযুআতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সিলসিলায়ে যঈফা, হা/৩২৮৭। তবে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছ থেকে এর মূল বক্তব্য সঠিক বলে প্রমাণিত। কিন্তু তদোপরি সনদ বিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমরা একে হাদীছ হিসাবে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকব। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে আমার পক্ষ থেকে সন্দেহের লেশমাত্র থাকা অবস্থায় কোন কিছু বর্ণনা করল সে মিথ্যাবাদীদের একজন।

মহিলাদের সালাম দেয়ার ব্যাপারে এটিই সঠিক মাসআলা। বৃদ্ধা ও মাহরামদেরকে (যাদেরকে বিবাহ করা চিরতরে হারাম) সালাম দেয়া যাবে; অপরিচিত মহিলাদেরকে নয়।[১৮৫] সহীহ বুখারীতে আরও বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেন-

«يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ»

"ছোট বড়কে সালাম দিবে, পথচারী উপবিশষ্ট লোককে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দিবে।"[১৮৬] তিরমিযীতে এসেছে, পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে। মুসনাদে বায্যারে বর্ণিত হয়েছে, পায়ে হেটে চলন্ত দু'জন ব্যক্তির মধ্য হতে যে আগে সালাম দিবে সেই উত্তম। সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর সবচেয়ে অধিক নিকটবর্তী লোক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আগে সালাম দেয়।

কোন গোত্রের কাছে গিয়ে প্রথমেই সালাম দেয়া নাবী ﷺ-এর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তিনি তাদের কাছ থেকে ফেরত আসার সময়ও সালাম দিতেন। তাঁর থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসবে সে যেন মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে সালাম দেয় এবং যখন সে দাঁড়াবে তখনও যেন সালাম দেয়। প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের চেয়ে অধিক হকদার নয়। ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের কেউ যখন তার সাথীর সঙ্গে দেখা করবে তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। একবার সালাম দেয়ার পর একটি গাছের বা দেয়ালের আড়ালে গিয়ে পুনরায় ফেরত এসে যদি সাক্ষাৎ করে তথাপিও যেন সালাম দেয়। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- রসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ পথ চলতেন। তাদের সামনে কোন গাছ বা টিলা পড়লে তারা ডানে ও বামে আলাদা হয়ে যেতেন। কিন্তু তা পার হয়ে পুনরায় যখন তারা পরস্পর সামনাসামনি হতেন তখন তাদের একজন অন্যজনকে সালাম দিতেন।

নাবী ﷺ-এর পবিত্র সুন্নাত হচ্ছে, মাসজিদে প্রবেশকারী প্রথমে দু'রাকআত সলাত (তাহিয়াতুল মাসজিদ) পড়বে। অতঃপর উপস্থিত লোকদেরকে সালাম দিবে। এতে তাহিয়াতুল কাওমের পূর্বেই তাহিয়াতুল মাসজিদ তথা উপস্থিত লোকদেরকে সম্মান করার পূর্বেই মাসজিদের সম্মান করা হবে। কেননা সলাত হচ্ছে আল্লাহর হক। আর সালাম দেয়া মানুষের হক। এ ক্ষেত্রে বান্দার হকের উপর আল্লাহর হককে প্রাধান্য দিতে হবে। তবে আর্থিক হকের বিষয়টি আলাদা। অর্থাৎ বান্দার সম্পদের উপর যদি মানুষের হক ও আল্লাহর হক একত্রিত হয় তাহলে বান্দার হক প্রথমে পরিশোধ করতে হবে। কেননা তাতে ঝগড়া-বিবাদ হয়। আর এ ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনের বিষয়টি দেখতে হবে। সেই সাথে

---

১৮৫. আল্লামা আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেনঃ অপরিচিত মহিলাকে সালাম দেয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা নারী-পুরুষ এবং ছোট-বড় সকলকে সালাম দেয়া সুন্নাত। মহিলাকে যদি সালাম দেয়া হয় কিংবা মহিলা যদি পুরুষকে সালাম দেয় এবং এতে যদি কোন ফিতনার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে মহিলার সাথে সালাম বিনিময় করাতে কোন অসুবিধা নেই। পথ চলার সময় বেপর্দা কোন মহিলা দেখলে উপদেশ দিবে এবং হিজাব পরতে বলবে। মহিলা যদি একা থাকে তাহলে তার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করবে না। তার পাশ দিয়ে যাবে এবং সালাম দিবে। তার সাথে বসবে না এবং তার সাথে দাঁড়িয়েও থাকবে না। শুধু সালাম দিবে এবং চলে যাবে।

১৮৬. বুখারী তাও. হা/৬২৩১, আবু দাউদ, আলএ. হা/৫১৯৮, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৭০৪, মিশকাত, হাএ. হা/৪৬৩৩

দেখতে হবে মানুষের হক এবং আল্লাহর হক আদায় করার মত যথেষ্ট মাল আছে কি না? যদি উভয় হক আদায় করার মত সম্পদ না থাকে তাহলে মানুষের হকই আদায় করতে হবে।

নাবী ﷺ-এর যামানায় লোকদের অভ্যাস এ রকম ছিল যে, তাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত সলাত পড়ত। অতঃপর অগ্রসর হয়ে নাবী ﷺ কে সালাম দিত। সুতরাং মাসজিদে লোকজন থাকলে তাতে প্রবেশকারী ধারাবাহিকভাবে তিনটি কাজ করবেঃ

প্রথমে ডান 'পা' রেখে বিসমিল্লাহ্ ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা রসূলিল্লাহ্ বলবে। ২) অতঃপর দু'রাকআত তাহিয়াতুল মাসজিদ সলাত পড়বে। ৩) অতঃপর উপস্থিত লোকদেরকে সালাম দিবে। নাবী ﷺ যখন রাত্রে ঘরে প্রবেশ করতেন তখন এমনভাবে সালাম দিতেন, যাতে ঘরে ঘুমন্ত লোকদের নিদ্রার কোন ব্যঘাত না ঘটে। শুধু জাগ্রত লোকদেরকেই সালাম শুনাতেন। ইমাম মুসলিম এ রকমই উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেনঃ السلام قبل الكلام অর্থাৎ কথা বলার পূর্বেই সালাম দিতে হবে।[১৮৭] ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কেউ কারও নিকট কিছু জিজ্ঞেস করার পূর্বে সালাম দিতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাম না দিয়ে তোমাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করবে, তোমরা তার কথার উত্তর দিবেনা।[১৮৮] তিনি যখন কারও ঘরের দরজার সামনে যেতেন তখন দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না। বরং ডান দিকে কিংবা বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর বলতেন- السلام عليكم । যাকে সামনে পেতেন তাকে তিনি নিজেই সালাম দিতেন এবং অনুপস্থিত লোকদের জন্য তিনি সালাম পাঠিয়ে দিতেন। তিনি অন্যের সালামও বহন করতেন এবং পৌঁছিয়ে দিতেন। যেমন তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে খাদীজার কাছে সালাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি আয়িশা সিদ্দিকাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) কে বলেছিলেন- এই তো জিবরীল ফিরিস্তা আগমণ করেছেন। তিনি তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তাঁর পবিত্র সুন্নাত এই ছিল যে, তিনি সালাম দেয়ার সময় ওয়া বারাকাতুহু পর্যন্ত বলতেন। অর্থাৎ এভাবে বলতেন যে, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। ইমাম নাসাঈ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, একজন লোক এসে বলল- আস্ সালামু আলাইকুম। নাবী ﷺ উত্তর দিলেন এবং বললেন- সে দশটি নেকী পেয়েছে। অতঃপর সেই লোকটি বসল। দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি এসে বলল- আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন- সে বিশটি নেকী পেয়েছে। তৃতীয় আরেকজন এসে বলল- আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবার তিনি বললেন- এই ব্যক্তি ত্রিশটি নেকী পেয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনবার সালাম দেয়া রসূল ﷺ এর পবিত্র সুন্নাত ছিল। সম্ভবতঃ তিনি ঐ সময় এ রকম করতেন যখন লোক সংখ্যা অধিক হত এবং প্রথমবার

---

১৮৭. তবে এই হাদীসটি সহীহ নয়। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এটিকে মাওযুআতে উল্লেখ করেছেন, সিলসিলা আহাদিসুস যঈফা হা/১৭৩৬

১৮৮. ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। উক্ত প্রসঙ্গটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদাহরণ। যা হচ্ছে হাদীসের বক্তব্য কিভাবে সঠিক হয়? এ প্রশ্নের জবাব এখানে রয়েছে। যেহেতু ইতিপূর্বের হাদীছ ও বক্ষমান বক্তব্য একই অথচ পূর্বের হাদীছ সনদের দিক থেকে জাল কিন্তু আলোচ্য হাদীছ সহীহ। ফলে এরই ভিত্তিতে বলা হবে উপরোক্ত হাদীছ সাব্যস্ত নয়। তবে তার বক্তব্য সুসাব্যস্ত।

সকলের কাছে সালামের আওয়াজ পৌঁছত না। তিনি যখন মনে করতেন যে, প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বারেও আওয়াজ পৌঁছেনি তখন তিনি তৃতীয়বার সালাম দিতেন। যে ব্যক্তি তাঁর সুন্নাতগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে সে বুঝতে পারবে যে, বিশেষ কোন কারণেই তিনি একাধিকবার সালাম দিতেন।

নাবী ﷺ লোকদের সাথে সাক্ষাতের সময় প্রথমেই সালাম দিতেন। কেউ তাকে আগেই সালাম দিয়ে ফেললে তিনি অনুরূপ বাক্য দিয়ে অথবা তার চেয়ে উত্তম বাক্য দিয়ে দ্রুত উত্তর দিতেন। আর কোন কারণ যেমন পেশাব-পায়খানা বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে উত্তর দিতে দেরী করতেন। তিনি হাতের ইশারায় সালামের জবাব দিতেন না। মাথা ঝুকিয়েও না এবং আঙ্গুলের ইশারাতেও না। তবে সলাতরত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে তিনি ইঙ্গিতের মাধ্যমে জবাব দিতেন।

প্রথমে সালাম দিলে তিনি আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলতেন। যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দিবে তার জন্য তিনি عليك السلام বলা অপছন্দ করেছেন। মুসলিমদের সালামের জবাবে তিনি وعليكم السلام বলতেন। ওয়া (وَ) বাদ দিয়ে শুধু عليكم السلام বললে ফরয আদায় হবেনা বলে এক দল লোক মত প্রকাশ করেছেন। কেননা এ রকমভাবে জবাব দেয়া সুন্নাত বিরোধী। কেননা এতে জানা যাবেনা যে, সে সালাম দিল? না সালামের উত্তর দিল? অন্য এক দল আলেম মনে করেন, عليكم السلام বলে জবাব দিলেও সঠিক হবে। ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে এ রকমই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর বাণীঃ

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾

"হে আল্লাহর রসূল! তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে? যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন: সালাম, তখন তিনি বললেন- সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক"- এর দ্বারা তিনি দলীল গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ سلام عليكم তোমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি। কিন্তু ওয়া (وَ) বাদ দেয়ার কারণ হচ্ছে, বাক্যের শুরুতেই এখানে কিছু বিষয় উহ্য রয়েছে। তাই এখানেও তা উহ্য করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈর মতের সমর্থনে আদম (আলায়হিস সালাম)-এর সালামে ফেরশতাদের জবাবকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। সেখানে ওয়াও ছিলনা।

ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে সালাম দেয়ার ব্যাপারে নাবী ﷺ এর সুন্নাত

নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন-

«لاَ تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلاَمِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ»

"তোমরা ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে আগে সালাম দিওনা। আর তোমরা যখন তাদের সাথে রাস্তায় সাক্ষাত করবে তখন তাদেরকে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তার দিকে যেতে বাধ্য কর"।[১৮৯] কিন্তু বলা হয় যে, এই হাদীসটি একটি বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেটি হচ্ছে, নাবী ﷺ যখন বনী কুরায়যায় গেলেন

১৮৯. আবু দাউদ, আধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, আলএ. হা/৫২০৫

Contents

তখন তিনি বললেন- তোমরা তাদেরকে প্রথমে সালাম দিওনা। এখন প্রশ্ন হল এই হুকুম কি সকল যিম্মী তথা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল অমুসলিমদের জন্য? না যাদের অবস্থা চুক্তি ভঙ্গকারী বনী কুরায়যার ন্যায় শুধু তাদের জন্যেই? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন- তোমরা ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে আগে সালাম দিওনা। আর যখন তাদের সাথে রাস্তায় সাক্ষাত করবে তখন তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণতম স্থান দিয়ে যেতে বাধ্য কর। সুতরাং প্রাধান্যপ্রাপ্ত কথা হচ্ছে সকল ইহুদী-খৃষ্টানদের জন্য এই হুকুম। অর্থাৎ তাদেরকে আগে সালাম দেয়া যাবেনা।

তাদের সালামের জবাব দেয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সঠিক মত হচ্ছে তাদের সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। ইহুদী-খৃষ্টান ও বিদআতীদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আমাদেরকে বিদআতীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলা হয়েছে। যাতে তারা বিদআত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একবার একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে মুসলিম-অমুসলিম সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। তিনি তাদের সকলকে সালাম দিলেন।

তিনি রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস এবং অন্যান্য অমুসলিম সম্রাটদের নিকট প্রেরিত চিঠির শুরুতে লিখতেনঃ السلام على من اتبع الهـــدى "হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের উপরই আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি বর্ষিত হোক"। নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, চলন্ত কাফেলার একজন যদি সালাম দেয় তাতেই যথেষ্ঠ হবে। মজলিসে উপস্থিত একজন সালামের জবাব দিলেই যথেষ্ট হবে। যারা সালামের জবাব দেয়াকে ফরযে কেফায়া মনে করেন তারা এ মতই পোষণ করেছেন। এই মতটি খুবই সুন্দর। কিন্তু এই মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা এই বর্ণনার সনদে সাঈদ বিন খালেদ নামক একজন রাবী আছেন। আবু যুরআ ও আবু হাতেম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে যঈফ বলেছেন।

তাঁর পবিত্র সুন্নাত এই ছিল যে, কেউ যদি তাঁকে অন্যের পক্ষ হতে সালাম পৌঁছিয়ে দিত, তিনি তার জবাব দিতেন এবং যে সালাম পৌঁছিয়ে দিত তারও জবাব দিতেন। শরীয়ত বিরোধী এবং কোন পাপ কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে তাওবা না করা পর্যন্ত তিনি আগে সালাম দিতেন না। সে সালাম দিলে তিনি তার জবাবও দিতেন না।

কারও কাছে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনার ক্ষেত্রে রসূল ﷺ এর সুন্নাত

নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- কারও বাড়িতে বা ঘরে প্রবেশের পূর্বে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে অনুমতি চাওয়ার পর যদি বাড়ির মালিক অনুমতি দেয় তাহলে প্রবেশ করতে হবে। অন্যথায় ফেরত আসতে হবে।[১৯০] নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

«إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ»

১৯০. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইস্তিযান।

(বিনা অনুমতিতে হঠাৎ কারও গৃহে প্রবেশ করলে গৃহবাসীর উপর অপছন্দনীয় অবস্থায়) "দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে বলেই অনুমতি চাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"[১৯১] সহীহ সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ঐ ব্যক্তির চোখে লোহার গরম কাঠি ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যে তাঁর কামরায় উঁকি মেরে তাঁর দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তিনি উপরোক্ত কথাটি বলেছেন। তিনি আরও বলেন- অনুমতি গ্রহণ ছাড়াই কেউ যদি তোমার ঘরে প্রবেশ করে এবং তোমার দিকে তাকিয়ে দেখে তাহলে তুমি যদি পাথর নিক্ষেপ করে তার চোখ কানা করে ফেল তাতে তোমার কোন দোষ নেই। নাবী ﷺ-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, তিনি অনুমতি চাওয়ার আগে সালাম দিতেন। তিনি উম্মাতকে এই শিক্ষাও দিয়েছেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে অনুমতি চেয়ে বলল- আমি কি প্রবেশ করব? রসূল ﷺ তখন এক ব্যক্তিকে বললেন- তুমি এই আগমণকারীর কাছে যাও এবং তাকে অনুমতি প্রার্থনার আদব শিক্ষা দাও। তুমি তাকে প্রথমে আস্সালামু আলাইকুম বলতে বল। তারপর সে যেন বলেঃ আমি কি প্রবেশ করতে পারি। ইতিমধ্যেই লোকটি নাবী ﷺ-এর কথা শুনে ফেলল এবং সেভাবেই বলল। তখন তিনি তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। সে প্রবেশ করল। এই হাদীছে ঐ সমস্ত লোকদের কথা ভুল প্রমাণিত হল, যারা বলে সালামের আগে অনুমতি চাইতে হবে।

তাদেরও প্রতিবাদ হল, যারা বলে গৃহবাসীর উপর যদি ঘরে প্রবেশের পূর্বেই আগমণকারীর দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে আগে সালাম দিবে। অন্যথায় সালামের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা করবে।

নাবী ﷺ-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর যদি অনুমতি না পেতেন, তাহলে তিনি ফেরত আসতেন। এতে ঐ সমস্ত লোকদের দাবী ভুল বলে প্রমাণিত হল, যারা বলে আগন্তুক যদি ধারণা করে যে, গৃহবাসী তার কথা শুনে নাই, তাহলে তিনবারের বেশী অনুমতি চাইতে পারে। তাদেরও প্রতিবাদ হল, যারা বলে তিনবার অনুমতি চেয়েও জবাব পাওয়া না গেলে অনুমতি চাওয়ার বাক্য পরিবর্তন করে পুনরায় অনুমতি চাইবে।

তাঁর পবিত্র সুন্নাতে এটিও রয়েছে যে, গৃহবাসী যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? উত্তরে আগন্তুক বলবেঃ আমি অমুকের পুত্র অমুক। অর্থাৎ নাম বলে পরিচয় দিবে অথবা উপনাম বলবে। আর এ কথা বলবে নাঃ আমি আমি (এ রকম বলা অপছন্দনীয়)।

ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি আগন্তুকের কাছে দূত পাঠায় তাহলে এটিই অনুমতি প্রদানের প্রমাণ। নতুন করে অনুমতি নিতে হবেনা। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই হাদীসটি মুআল্লাক হিসাবে (বিনা সনদে) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা প্রমাণ করে দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনলেও প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে। সেটি হচ্ছে আহলে সুফ্ফার লোকদেরকে দাওয়াত দেয়ার হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে যে, তারা আসলেন এবং প্রবেশের পূর্বে অনুমতি চাইলেন।

একটি দল বলে থাকেঃ হাদীস দু'টি ভিন্ন দু'টি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে। আহুত ব্যক্তি যদি অবিলম্বে চলে আসে, তাহলে অনুমতির প্রয়োজন নেই; দেরী করে আসলে অনুমতি নিতে হবে। অন্যরা বলেন- বাড়ি ওয়ালার কাছে যদি আগে থেকেই এমন লোক থাকে যাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাহলে নতুন আগন্তুকের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। অন্যথায় অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে।

---

১৯১. বুখারী , তাও. হা/৬২৪১, মিশকাত, হাএ. হা/৩৫১৫

তিনি যদি কোন স্থানে একাকী অবস্থান করার ইচ্ছা করতেন তখন দরজায় একজন লোক নিয়োগ করতেন। যাতে বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

ফজর, যোহর এবং রাতে ঘুমানোর সময় গৃহকর্তার নিকট প্রবেশ করার পূর্বে খাদেম এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা পালন করার আদেশ দিতেন এবং বলতেন- মানুষেরা এই আদেশের প্রতি আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সলাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার সলাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হবে। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"।[১৯২]

একদল বলেছেঃ এই আয়াতটি মানসুখ তথা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তারা কোন দলীল পেশ করতে পারেনি। আরেক দল বলেছেঃ আদেশটি মুস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের জবাবে বলা যেতে পারে যে, কোন বিষয়কে আবশ্যক করে দেয়ার জন্য আদেশ সূচক বাক্য (আমর) ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এখানে আদেশ সূচক বাক্যকে বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে অন্য অর্থে নিয়ে যাওয়ার মত কিছুই পাওয়া যায়নি। সুতরাং আদেশটি ওয়াজিব অর্থেই বিদ্যমান রয়েছে।

অপর একটি দল বলেছেঃ এখানে বিশেষভাবে মহিলাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে। পুরুষদের প্রতি এই আদেশ নয়। এ কথাটিও সম্পূর্ণ ভুল। আরেক দল বলেছেঃ এই আদেশ শুধু পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য নয়। তারা পুরুষদের জন্য ব্যবহৃত الذين শব্দের প্রতি খেয়াল করেই এ কথা বলেছেন। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে।

আরেক দল বলেন- বিশেষ প্রয়োজন ও কারণে এই আদেশটি (তিন সময়ে অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টি) ছিল। আর প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আদেশটি অকার্যকর হয়ে গেছে। ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সুনানে আবু দাউদে বর্ণনা করেন যে, কতিপয় লোক আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করলঃ এই আয়াতটি (তিন সময়ে অনুমতি প্রার্থনা আবশ্যক হওয়ার আয়াতটি) সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? এই আয়াতের উপর তো কেউ আমল করছেনা। উত্তরে তিনি বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের প্রতি বড় দয়াশীল। তিনি পর্দার আবরণে আবৃত থাকাকে পছন্দ করেন। ইসলামের

১৯২.সূরা নূর-২৪:৫৮

প্রথম যুগে মুসলিমদের ঘরে পর্দার ব্যবস্থা ছিলনা। অধিকাংশ সময় খাদেম, বালক-বালিকা এবং লোকদের ঘরে পালিত ইয়াতিম বালিকারা এমন সময় ঘরে প্রবেশ করত যখন পুরুষ (গৃহকর্তা) তার স্ত্রীর সাথে ঘুমিয়ে থাকত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত সময়গুলোতে অনুমতি চাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। পরবর্তীতে মুসলিমদের অবস্থার উন্নতি হল। তারা ঘরে পর্দা টানানোর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন। পরে এই আয়াতের উপর কাউকে আমল করতে দেখিনি।

কেউ কেউ এই হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে এবং হাদীসটি বর্ণনায় ইকরিমার সততায় আঘাত করেছেন। কিন্তু এতে কিছুই যায় আসেনা। এমনিভাবে আমর বিন আবু আমরের সততাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। অথচ আমর বিন আবু আমর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাদের আক্রমণ অর্থহীন এবং ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মতই সঠিক।

কেউ কেউ বলেছেন- আয়াতটি মুহকাম (আমলযোগ্য এবং এর হুকুম পরিবর্তন হয়নি)। কারণ এর বিপরীত কোন কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে সঠিক কথা হচ্ছে, আয়াতের হুকুম এমন একটি কারণের সাথে সম্পৃক্ত, যার প্রতি আয়াতেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেখানে যদি এমন কিছু পাওয়া যায়, যা অনুমতির স্থলাভিষিক্ত, যেমন দরজা খোলা রাখা বা পর্দা উঠিয়ে রাখা কিংবা মানুষের অবিরাম আসা-যাওয়া করা বা অনুরূপ আরও কিছু পাওয়া যায় তাহলে প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে বলে ধরে নিতে হবে এবং অনুমতির কোন প্রয়োজন হবেনা। এরূপ কিছু পাওয়া না গেলে অনুমতি নেওয়া জরুরী। শরীয়তের যেই হুকুমকে কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে, সেই কারণ বর্তমান থাকলে হুকুম বলবৎ থাকবে। আর কারণ চলে যাওয়ার সাথে সাথে হুকুমও বাতিল হবে।

হাঁচি বের হওয়ার সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত

সহীহ বুখারীতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন-

«إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ؛ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ»

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বলবেঃ তখন যে সকল মুসলমান তা শুনবে, তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে, ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে তার জবাব দেয়া। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কেউ যখন হাই তুলবে, তখন সে যেন সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কেননা তোমাদের কেউ যখন হাই তোলার সময় হা বলে আওয়াজ করে তখন তার এ কাজে শয়তান হাসে"।[১৯৩] সহীহ বুখারীতে আরও উল্লেখ আছে, তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিবে, তখন সে যেন বলে 'আলহামদু লিল্লাহ'। তার ভাই বা সাথী (যে তা শুনবে সে) যেন বলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। যখন হাঁচি

---

১৯৩. বুখারী, তাও. হা/৬২২৩

দাতার উদ্দেশ্যে 'ইয়ারহাকামুল্লাহ্' বলবে, তখন হাঁচি দাতা যেন বলেঃ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করুন।[১৯৪]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ﷺ বলেন- তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তখন তোমরা তার উত্তর দাও। সে যদি আলহামদু লিল্লাহ না বলে তাহলে তোমরা তার উত্তর দিওনা। সহীহ মুসলিমে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের ছয়টি হক রয়েছে। যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম দাও, যখন সে তোমাকে দাওয়াত দিবে তখন তার দাওয়াত গ্রহণ কর, তোমার কাছে উপদেশ চাইলে তাকে উপদেশ দাও, হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ্ বললে তার জবাব দাও, কোন মুসলিম ভাই মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হও এবং সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাও। তিরমিযীতে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদেরকে রসূল ﷺ হাঁচি দিয়ে «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» (সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলতে শিক্ষা দিয়েছেন। ইমাম মালেক নাফে থেকে আর নাফে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে যখন তাকে বলা হবে يَرْحَمُكَ اللهُ (আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন) তখন সে যেন বলে يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের উপর রহম করুন এবং আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।

এই অধ্যায়ের শুরুতে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে বুঝা যায় হাঁচির জবাব দেয়া ফরজে আইন। ইবনে আবু যাইদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ মতকেই পছন্দ করেছেন। কোন আলেমই এ মতের বিরোধীতা করেন নি।

হাঁচির উপকারিতা

হাঁচির মাধ্যমে হাঁচি দাতার জন্য বিরাট নিয়ামাত অর্জিত হয়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভাল। কেননা এর মাধ্যমে শরীরে আটকে পড়া ধোঁয়া ও গ্যাস বের হয়ে যায়, যা শরীরের জন্য উপকারী। হাঁচি দেয়ার পর শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরত যায়। তাই এই নিয়ামাতটি অর্জিত হওয়ার জন্য আল্লাহর

---

১৯৪. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) খাত্তাবীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচিকে পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। এর কারণ হল হাঁচির মাধ্যমে শরীর হালকা হয় এবং তাতে কর্মদ্যোগ সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এটিকে ভালবাসেন। এ জন্যই আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলার আদেশ করা হয়েছে। অপর পক্ষে হাই এর বিপরীত। প্রচুর খাদ্য গ্রহণের কারণে শরীরে জড়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়, শরীর ভারী হয়ে যায় এবং শরীরে অলসতা সৃষ্টি হয়। এর ফলশ্রুতিতে হাই আসে। পরিণামে ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহ দেখা দেয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা হাইকে অপছন্দ করেন। শয়তানও এতে খুশী হয়। তাই হাই আসলে যথা সম্ভব হাত বা রুমাল দিয়ে তা আটকিয়ে রাখতে বলা হয়েছে।

প্রশংসা করার বিধান নির্ধারিত হয়েছে। যমীনে ভূমিকম্প হলে তা যেমন কেঁপে উঠে তেমনই হাঁচির মাধ্যমে শরীরে ভূমি কম্পের সৃষ্টি হয়।[১৯৫]

রসূল ﷺ-এর যখন হাই আসত, তখন মুখে হাত অথবা কাপড় রাখতেন এবং আওয়াজ নীচু রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁর থেকে আরও বর্ণনা করা হয় যে, উঁচু আওয়াজের হাই এবং হাঁচি শয়তানের পক্ষ হতে।

নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর সামনে হাঁচি দিল। তিনি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন। সে পুনরায় হাঁচি দিল। তখন তিনি বললেন- লোকটির ঠান্ডা (সর্দি) লেগেছে। মুসলিম শরীফে হাদীসটি এই শব্দেই বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি তৃতীয়বার হাঁচি দিলে কথাটি বলেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনার পর সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ শরীফে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তুমি তিনবার তোমার ভাইয়ের হাঁচির জবাব দাও। এর বেশী হলে মনে করবে সেটি হাঁচি নয়; ঠান্ডা ও সর্দি জণিত অসুখ।

কেউ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সর্দিতে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তো আরও বেশী দু'আর করা দরকার তাহলে উত্তর কী হবে? উত্তরে বলা হবে যে, রোগীর জন্য যেমন দু'আ করা হয়, তার জন্যও অনুরূপ দু'আ করতে হবে। আর যেই হাঁচি আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং যা নিয়ামাত স্বরূপ তা সর্বোচ্চ তিনবার পর্যন্ত হতে পারে। নাবী ﷺ-এর বাণীঃ লোকটির সর্দি লেগেছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তার জন্য সুস্থতার দু'আ করা জরুরী এবং এর মাধ্যমে জানা গেল যে, তিনবারের বেশী হাঁচি দিলে তার জবাব না দিলেও চলবে।

কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বললে কেউ যদি তা শুনে আর অন্যরা না শুনে তাহলে সঠিক কথা হচ্ছে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলে হাঁচির জবাব দিতে হবে। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন- সে যদি 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলে তাহলে তার জবাব দাও। ইবনুল আরাবী বলেন- আর যদি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তাহলে হাঁচি দাতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবেনা। হাদীছের শব্দ এই মতকেই সমর্থন করে। নাবী ﷺ এ রকম পরিস্থিতিতে কাউকে স্মরণ করিয়ে দেন নি। নাবী ﷺ এই সুন্নাতের উপর আমল করা এবং তা শিক্ষা দেয়ার পরও ভুলবশত 'আলহামদুলিল্লাহ্' পরিত্যাগ কারীকে স্মরণ করিয়ে দেন নি।

---

১৯৫. সমকালীন ডাক্তারগণ বলেনঃ হাই তোলার সময় মুখ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী পরিমাণ উন্মুক্ত হয় এবং প্রচন্ড বেগে বাতাস ভিতরের দিকে আসা-যাওয়া করে। অথচ নাকের ন্যায় বাতাস গ্রহণ ও বর্জনের জন্য মুখ সব সময় প্রস্তুত থাকে না, মুখের মূল কাজও এটি নয়। তাই হাই তোলার সময় যখন মুখের স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী পরিমাণ খুলে যায় তাই বাতাসের সাথে বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণু, ময়লা এবং ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। এ জন্যই পবিত্র সুন্নাতে হাই তোলার সময় মুখ ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। হাঁচি এর বিপরীত। এর মাধ্যমে মুখ ও নাক দিয়ে শ্বাসযন্ত্র থেকে প্রচন্ড বেগে বাতাস বের হয়ে যায়। সেই সাথে শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশকারী ধুলোবালি, ময়লা এবং বিভিন্ন রোগ জীবাণু বের হয়ে যায় এবং শরীর পরিষ্কার হয়। তাই এটি আল্লাহর পক্ষ হতে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ এতে শরীরের উপকার রয়েছে। অপর পক্ষে হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে বলে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এ জন্যই সাধ্যানুযায়ী তা ঠেকাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সহীহ হাদীছের মাধ্যমে প্রমাণিত আছে যে, ইহুদীরা নাবী ﷺ-এর কাছে এসে ইচ্ছা করেই হাঁচি দিত। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে রসূল ﷺ তাদের জবাবে « يَرْحَمُكُمُ اللهُ » বলেন। কিন্তু নাবী ﷺ তা না বলে «يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» বলতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করুন।

নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত সফরের আদবসমূহ

সহীহ সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে তখন সে যেন কাজটি শুরু করার পূর্বে দু'রাকআত সলাত পড়ে নেয়। এর মাধ্যমে তিনি জাহেলী যামানার অভ্যাসকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অন্ধকার যুগের লোকেরা সফরে বের হওয়ার পূর্বে পাখি উড়িয়ে এবং তীরের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করত। এ রকমই মুশরিকরা লটারীর মাধ্যমে ভবিষ্যতের ঐ সমস্ত বিষয় জানার চেষ্টা করে, যা তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কাজটিকে ভাগ্য পরীক্ষা বলে নাম দেয়া হয়।[১৯৬]

ইসলাম এসে পূর্বের এই প্রথাগুলো পরিবর্তন করে এমন একটি দু'আ নির্ধারণ করেছে, যাতে রয়েছে তাওহীদ, আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষীতা, ইবাদত, একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা এবং সেই আল্লাহর কাছে কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা, যার হাতেই রয়েছে সকল প্রকার কল্যাণ, যিনি ব্যতীত অন্য কেউ কল্যাণ দিতে পারেনা এবং অন্যায়কে প্রতিহত করতে পারে না। তিনি যদি তাঁর কোন বান্দার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেন, কেউ তা বন্ধ করতে পারেনা এবং তিনি যদি তা বন্ধ করে দেন পাখি উড়িয়ে, তারকা গণনা করে কিংবা নক্ষত্রের উদয়াস্তাচল নির্ণয় করে কেউ তা খুলে দিতে পারবে না। এটি হচ্ছে সেই বরকতময় দু'আ যা সৌভাগ্যবানদের জন্য সৌভাগ্যের নিশানা স্বরূপ; যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকেও মাবুদ সাব্যস্ত করে সেই সমস্ত মুশরিকের জন্য নয়। এই দু'আতে রয়েছে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ সিফাত, রুবুবীয়াত, আল্লাহর উপর ভরসা করার ঘোষণা এবং বান্দার এ কথার স্বীকৃতি প্রদান যে, সে নিজেও নিজের কল্যাণ সম্পর্কে অজ্ঞ ও তা অর্জনে অক্ষম।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কাছেই কল্যাণ প্রার্থনা করা ও তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা বান্দার সৌভাগ্যের লক্ষণ এবং আল্লাহর কাছে ইস্তেখারা না করা (কল্যাণ না চাওয়া) ও তাকদীরের নির্ধারণের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকা বান্দার দুর্ভাগ্যের আলামত।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যানবাহনে আরোহন করে তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। অতঃপর এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

---

১৯৬. এ রকমই আমাদের সমাজেও অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরে দেখা যায় কিছু লোক টিয়া পাখি নিয়ে বসে থাকে। তার সাথে থাকে কয়েকটি চিঠির খাম। লোকেরা টিয়া পাখির মাধ্যমে ভাগ্যের পরীক্ষা করার জন্য ঐ লোকের কাছে গিয়ে ভীড় জমায়। আমি গুলিস্তানে এই ভন্ডামী নিজ চোখে দেখেছি। প্রশ্ন হল টিয়া পাখির মাধ্যমে যদি সত্যিই ভবিষ্যতের খবর জানা যেত এবং এর মাধ্যমে যদি ভাগ্য পরিবর্তন করা যেত তাহলে ঐ লোকটি প্রথমে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করে না কেন? মানুষের কাছ থেকে দু/চার টাকা রোজগার করার জন্য রোদ/বৃষ্টি উপেক্ষা করে সারা দিন রাস্তার মোড়ে বসে থাকে কেন? তার পালিত টিয়া পাখিটির মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন করে রাতারাতি ধনী হয়ে যায়নি কেন?

«سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ»

"পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য এসব জিনিষকে বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাবো এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলামনা"। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে এই সফরে নেকী ও তাকওয়া প্রার্থনা করছি। আর তোমার কাছে এমন আমল করার তাওফীক প্রার্থনা করছি, যাতে তুমি খুশী হও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর এই সফরকে সহজ করে দাও, এর দূরত্বকে কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই আমাদের সাথী এবং ঘরে অবস্থানকারী স্বজনদের দেখা-শুনাকারী। হে আল্লাহ্! তুমি সফরে আমাদের সাথে থাক এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের হেফাজত কর। ভ্রমণ থেকে ফেরত এসে তিনি এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

«آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

"আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী"। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন শহরে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন-

«تَوْبَاً تَوْباً، لِرَبِّنَا أَوْباً لا يُغادِرُ عَلَيْنَا حَوْباً»

"আমরা সফর থেকে ফেরত আসছি, আমাদের প্রভুর কাছে তাওবা করছি, তিনি আমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন"।

তিনি যখন বাহনে পা রাখতেন তখন বিসমিল্লাহ্ বলতেন এবং তাতে সোজা হয়ে বসে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলতেন। অতঃপর বলতেন-

«سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ»

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তার কোন সাহাবীকে সফরে যাওয়ার সময় বিদায় জানাতেন তখন বলতেন-

«أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَواتِيمَ عَمَلِكَ»

"আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং শেষ আমল আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দিচ্ছি"। এক লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলল- আমি সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি। তিনি তখন বললেন- আমি তোমাকে আল্লাহর ভয় এবং প্রতিটি উঁচু স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলার উপদেশ দিচ্ছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ সফর অবস্থায় যখন উঁচু স্থানে উঠতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং যখন নীচু স্থানে অবতরণ করতেন তখন 'সুবহানাল্লাহ্' বলতেন। সলাতেও এভাবেই তাকবীর ও তাসবীহ পাঠ করা হয়। অর্থাৎ রুকু ও সিজাদাতে মাথা ও শরীর নত করা হয় বলেই তাতে 'সুবহানা রাব্বীয়াল আলা' পাঠ করা হয় আর সিজদা ও বসা হতে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলার বিধান রাখা হয়েছে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন যমীনের কোন উঁচু স্থানে উঠতেন তখন বলতেন-

«اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

"হে আল্লাহ্! সকল বড়র (উচ্চতার) উপর তোমার বড়ত্ব এবং সকল অবস্থায় তোমার প্রশংসা"। তিনি বলেছেন- যেই কাফেলার সাথে কুকুর এবং ঘন্টা থাকে সেই কাফেলায় ফিরিস্তাগণ অংশগ্রহণ করেনা।

নাবী ﷺ রাতে একা ভ্রমণ করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন- একা ভ্রমণ করার ক্ষতি সম্পর্কে মানুষেরা যদি জানতে পারত তাহলে রাতে কেউ একা ভ্রমণ করতনা। শুধু তাই নয়, তিনি একা ভ্রমণ করতে নিষেধও করতেন। তিনি বলেছেন- একা ভ্রমণকারী একটি শয়তান, দু'জন ভ্রমণকারী দু'টি শয়তান এবং তিন জন মিলে একটি কাফেলা তৈরী হয়।[১৯৭] তিনি বলতেন- তোমাদের কেউ যখন কোন স্থানে অবতরণ করে তখন সে যেন এই দু'আটি পাঠ করেঃ

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

"আল্লাহর কলেমাসমূহের উসীলায় আমি সেই অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। এই দু'আটি পাঠ করলে সেই স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবেনা।

নাবী ﷺ বলতেন- যখন তোমরা ঘাস ও তৃণলতা বিশিষ্ট যমীনের উপর দিয়ে চলবে তখন তোমরা যমীন থেকে উটের হক প্রদান কর (উটকে ঘাস খাওয়ার সুযোগ দাও)। আর যখন বিরান ভুমির উপর দিয়ে যাবে তখন সেই স্থানের উপর দিয়ে দ্রুত চল। যখন তোমরা রাতে কোথাও যাত্রা বিরতি করবে তখন রাস্তার উপর অবস্থান করবেনা। কেননা রাতে জীব-জানোয়ারও পথ দিয়ে চলাচল করে এবং ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ রাতের বেলায় তাতে আশ্রয় নেয়।

তিনি এই আশঙ্কায় শত্রুদের দেশে কুরআন নিয়ে ভ্রমণ করতে নিষেধ করতেন, যাতে শত্রুরা কুরআনকে অপদস্ত করার সুযোগ না পায়। যেই পথ অতিক্রম করতে এক দিন এক রাত সময় লাগে সেই পরিমাণ দূরত্বে তিনি মহিলাদেরকে মাহরাম ছাড়া একা ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। সফরের কাজ শেষ করে তিনি মুসাফিরকে দ্রুত ঘরে ফেরার আদেশ করতেন। দীর্ঘ দিন নিজ বাসস্থানের বাইরে থাকার পর তিনি আগন্তুককে রাতের বেলায় বিনা খবরে হঠাৎ করে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন।[১৯৮]

---

১৯৭. একা সফর করা মাকরুহ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা সফর করাকে শয়তানের কাজ বলেছেন। কারণ শয়তান লাগামহীনভাবে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই চলে, যা ইচ্ছা তাই করে। এমনিভাবে একা ভ্রমণকারীর জন্য সফর অবস্থায় কোন সাহায্যকারী থাকে না, ভুল করলে সংশোধন করে দেয়ার মত কেউ থাকে না এবং পথ হারিয়ে ফেললে পথ দেখিয়ে দেয়ার লোক খুঁজে পায়না। তা ছাড়া একা ভ্রমণকারী বিপদাপদে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় অসুস্থ হলে সেবা করার জন্য কাউকে পাবে না। সে মারা গেলে তার কাফন-দাফন ও স্বজনদেরকে খবর দেয়ারও কেউ থাকে না। মূলতঃ অবস্থাভেদে একা ভ্রমণের হুকুম ভিন্নও হতে পারে। বিশেষ করে যখন কোন সাথী পাওয়া যাবে না এবং ভ্রমণ করা অত্যন্ত জরুরী তখন একা ভ্রমণ করা জায়েয। দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ করার অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন বিপদাপদে পরস্পর সহযোগিতা করা, কাফেলার কেউ অসুস্থ হলে অন্যদের সেবা করা, জামআতে সলাত পড়া ইত্যাদি।

১৯৮. এমতাবস্থায় যদি হঠাৎ করে গৃহে প্রবেশ করা হয় তাহলে নিজ স্ত্রীকে এলোকেশে ও অপছন্দীয় অবস্থায় দেখার আশঙ্কা রয়েছে। পরিণামে স্বামীর পক্ষ হতে এমন আচরণ প্রকাশ পেতে পারে, যা কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ হতে কামনা করে না। তাই রাতের বেলা হঠাৎ প্রবেশ না করে যদি আগাম সংবাদ দেয়া হয়, তাহলে স্ত্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাজগোজ গ্রহণ করার সুযোগ

নাবী ﷺ যখন সফর থেকে ফেরত আসতেন তখন নিজ পরিবারের শিশুদের সাথে সর্বাগ্রে মিলিত হতেন। আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ) বলেন- তিনি একবার সফর থেকে ফিরলেন। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আমাকে বাহনে তার সামনে বসালেন। অতঃপর ফাতেমা (রাঃ) এর কোন একটি ছেলে হাসান বা হুসাইনকে আনয়ন করা হলে তিনি তাকে বাহনে তাঁর পিছনে বসালেন। আমরা তিনজন মিলে একটি বাহনে আরোহন করে মদীনায় প্রবেশ করলাম। সফর থেকে আগমণকারীর সাথে তিনি কোলাকুলি করতেন। পরিবারের কোন লোক হলে তিনি তাকে চুম্বন করতেন। ইমাম শাবী (রহঃ) বলেন- রসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন সফর থেকে ফিরতেন তখন তারা কোলাকুলি করতেন। সফর থেকে ফিরে তিনি মাসজিদ থেকে কাজ শুরু করতেন। তিনি তাতে দু'রাকআত সলাত পড়তেন।

নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত খুতবাতুল হাজাতের পদ্ধতি

নাবী ﷺ সাহাবীদেরকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে খুতবাতুল হাজাত শিক্ষা দিয়েছেনঃ

- «الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه
- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا»

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁর কাছেই গুনাহসমূহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নফসের অনিষ্ট ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ যাকে সুপথ দেখাবেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারবেনা আর যাকে গোমরাহ করবেন, তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক থাকবেনা। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল।

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনি ভয় করতে থাক এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা। (সূরা আল-ইমরান-৩:১০২)

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্কে ভয় কর, যার নামে তোমরা

পাবে এবং স্বামীকে প্রফুলণ্ড মনে গ্রহণ করতে পারবে। তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ করে রাতের বেলায় স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

একে অপরের নিকট যাচনা করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর (তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে সাবধান থাক)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসা-৪:১)

হে মুমিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তার রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব-৩৩:৭০-৭১)

ইমাম শু'বা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- আমি আবু ইসহাককে বললামঃ এটি কি বিবাহের খুতবা? না অন্যান্য বিষয়েরও খুতবা? তিনি বললেন- প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করার খুতবা।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- তোমাদের কেউ যদি কোন মহিলা, খাদেম অথবা চতুষ্পদ জন্তুর মালিক হয় তখন সে যেন তার কপালে হাত রাখে তাতে বরকতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করে এবং 'বিসমিল্লাহ্' বলে। অতঃপর এই দু'আটি পাঠ করে।

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ»

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ এবং একে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছ তার কল্যাণ কামনা করছি। আর আমি তোমার কাছে এর অনিষ্ট এবং যে বিষয় দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছ তার অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।[১৯৯]

তিনি নব বিবাহিত ব্যক্তির জন্য দু'আ করার সময় বলতেন-

«بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বরকত দান করুন, তোমাদের উপর বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত করুন"।[২০০]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন- কেউ যদি রোগে আক্রান্ত কোন লোককে দেখে এই দু'আটি পাঠ করে তবে সেই রেসূটি তাকে কখনই আক্রমণ করবে না, তা যত বড়ই হোক। দু'আটি হচ্ছে এইঃ

«الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً»

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আমাকে ঐ রেসূ থেকে হেফাজত করেছেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন এবং আমাকে অনেক মানুষের উপর বিশেষ ফযীলত দান করেছেন"।[২০১]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তিয়ারা তথা পাখি উড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন- এ ক্ষেত্রে ফাল (ভাল ধারণা করা, ভাল কথা শ্রবণ করে ভাল কিছু কামনা করা ইত্যাদি) হচ্ছে সর্বোত্তম। এটি মুসলিমের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যখন তুমি খারাপ লক্ষণের কিছু দেখবে তখন বলবেঃ

---

১৯৯. আবু দাউদ, আলএ, হা/২১৬০,সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/২২৪৩, মিশকাত, মাশা. হা/২৪৪৬, হাসান সহীহ: আলবানী।
২০০. আবু দাউদ, আলএ, হা/২১৩০, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/১০৯১,মিশকাত, মাশা. হা/২৪৪৫, সহীহ: আলবানী।
২০১. সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪৩১, সুনান ইবনে মাজাহ, তাও. হা/৩৮৯২, মিশকাত, হাএ. হা/২৩২৯

«اللَّهُمَّ لا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلا أَنْتَ وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلا أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ»

"হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া অন্য কেউ কল্যাণ দিতে পারেনা, তুমি ছাড়া অন্য কেউ কষ্ট দূর করতে পারেনা। তোমার সাহায্য ব্যতীত কেউ গুনাহ হইতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা রাখে না"।

স্বপ্নের বিষয়ে নাবী ﷺ এর সুন্নাত

নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে এবং অপছন্দনীয় স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে। সুতরাং যে ব্যক্তি অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে সে যেন বাম দিকে থুথু ফেলে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আর সে যেন সেই স্বপ্নের বিষয় কাউকে না বলে। আর যদি ভাল ও পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে সে যেন খুশী হয় এবং একান্ত প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে স্বপ্নের বিষয় না বলে।[২০২] যে ব্যক্তি অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখবে তিনি তাকে পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করার আদেশ দিয়েছেন এবং সলাত পড়তে বলেছেন। সব মিলিয়ে দেখা যায় যে ব্যক্তি অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখবে তার জন্য তিনি পাঁচটি আদেশ দিয়েছেন।

- ১. বাম দিকে থুথু ফেলবে।
- ২. আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম পাঠ করবে।
- ৩. কাউকে সে বিষয়ে সংবাদ দিবেনা।
- ৪. পার্শ্ব পরিবর্তন করবে এবং
- ৫. সলাত আদায় করবে।

নাবী ﷺ বলেন- ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত স্বপ্নের বিষয়টি স্বপ্ন দর্শকের উপরই উড়তে থাকে। ব্যাখ্যা করা হলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। সুতরাং স্বপ্নের কথা শুধু প্রিয়তম ব্যক্তি অথবা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও কাছে বলবেনা। নাবী ﷺ থেকে আরও বর্ণনা করা হয় যে, তিনি স্বপ্ন দর্শককে বলতেন- তুমি ভালই দেখেছ। অতঃপর তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন।

ওয়াসওয়াসা তথা শয়তানের কুমন্ত্রনার কবলে পতিত ব্যক্তি কিভাবে রেহাই পাবে?

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত রসূল ﷺ বলেছেন- বনী আদমের অন্তরে ফেরেশতার পক্ষ হতে ইলহাম হয়। শয়তানও বনী আদমের অন্তরে কুমন্ত্রনা ঢেলে দেয়। ফিরিস্তা তার সাথে কল্যাণের ওয়াদা করে, সত্যের সত্যায়ন করে এবং অন্তরে ভাল কাজের বিনিময়ে ছাওয়াবের আশা-আকাঙ্খা জাগ্রত করে। শয়তানের কুমন্ত্রনা হচ্ছে অন্যায় কাজের ওয়াদা করা, সত্যকে অস্বীকার করা এবং কল্যাণ অর্জন থেকে নিরাশ করা। সুতরাং তোমরা যখন অন্তরে ফিরিস্তার ইলহাম অনুভব কর তখন আল্লাহর প্রশংসা কর এবং আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা কর।

---

২০২. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তাবীর।

আর যখন শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভব কর তখন আল্লাহর কাছে শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।[২০৩]

উছমান বিন আবুল আস নাবী ﷺ কে বললেন- আমার মাঝে এবং আমার সলাত ও কিরাআতের মাঝে শয়তান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

নাবী ﷺ তখন বললেন- এই শয়তানের নাম হচ্ছে খিনযাব। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ কর।[২০৪]

সাহাবীগণ নাবী ﷺ এর কাছে অভিযোগ করলেন যে, তাদের অন্তরে এমন জিনিসের উদয় হয়, যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে তার কাছে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া অধিক প্রিয় বলে মনে হয়। নাবী ﷺ তখন বললেন- আল্লাহু আকবার। ঐ আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি শয়তানের চক্রান্তকে ওয়াসওয়াসার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যার কাছে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে ওয়াস্ওয়াসা এবং একের পর এক যদি এভাবে প্রশ্নের উদয় হয় যে, এই তো আল্লাহ্ সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তাহলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে? এমন পরিস্থিতিতে তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করার আদেশ দিয়েছেনঃ

﴿هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"তিনিই সর্বপ্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত"। (সূরা হাদীদ-৫৭:৩) এমনিভাবে আবু যামীল ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে প্রশ্ন করেছিল, এ কি জিনিস যা আমার বক্ষদেশে কিছু (ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রনা) অনুভব করছি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- সেটি কী? তিনি বলেন- আমি বললামঃ আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যাপারে কথা বলবনা। ইবনে আব্বাস তখন বললেন- সেটি কি কোন সন্দেহ? আমি বললামঃ হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল না করা পর্যন্ত কেউ এ থেকে রেহাই পায়নি। সুতরাং তুমি যখন তোমার অন্তরে এমন কিছু অনুভব কর তখন এই আয়াতটি পাঠ করবেঃ

﴿الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"তিনিই সর্বপ্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত"। (সূরা হাদীদ-৫৭:৩) এই আয়াতের মাধ্যমে নাবী ﷺ মুসলিমদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, স্বচ্ছ বিবেক তাসালসুল তথা আদি-অন্তহীন সৃষ্টির অস্তিত্বকে বাতিল সাব্যস্ত করে। সৃষ্টির প্রারম্ভ এমন এক প্রথম সত্তা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়, যার পূর্বে আর কোন সৃষ্টি নেই। এমনিভাবে এমন এক শেষ সত্তা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়, যার পরে আর কোন সৃষ্টি নেই। অর্থাৎ যখন কোন মাখলুকের (সৃষ্টির) অস্তিত্ব ছিল না তখন আল্লাহ্ ছিলেন আবার যখন কোন কিছুই থাকবেনা, সব কিছুই ধ্বংস হবে তখনও একমাত্র আল্লাহই অবশিষ্ট থাকবেন। তিনিই 'যাহের' এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহর উপরে অন্য কোন বস্তু বা সৃষ্টি নেই। তিনি জ্ঞান ও শক্তির মাধ্যমে উর্ধ্ব জগতের সবকিছু বেষ্টন করে আছেন। আর

---

২০৩. এই হাদীসটি সহীহ নয়। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) মিশকাতুল মাসাবীহ। তাহকীক আলবানী, হা/৭৪। হাঁ বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তাই আমল করা উচিত। কিন্তু হাদীছ মনে করে নয়। বরং উপদেশ মূলক বাণী হিসাবে।

২০৪. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাম।

তিনিই বাতেন, এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে তিনি নিম্নজগতের সকল মাখলুককে (সৃষ্টিকে) এমনভাবে বেষ্টন করে আছেন, যার বাইরে অন্য কিছু নেই। এক কথায় ظاهر বলতে উর্ধ্বজগতের (আসমান ও তার মধ্যকার) সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর কর্তৃত্বকে বুঝানো হয়েছে আর باطن বলতে নিম্নজগতের (যমীন ও তার মধ্যকার) সকল বস্তুর উপর তাঁর কর্তৃত্বকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর পূর্বে যদি কোন বস্তু থাকত, তাহলে তা স্রষ্টার উপর প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে যেত এবং সেই বস্তুই হত মহান সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক।

সুতরাং তিনিই সর্বপ্রথম, যার পূর্বে আর কেউ নেই, তিনিই শেষ, যার পরে আর কেউ নেই। সৃষ্টির ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিকাশ এমন এক সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত গিয়ে অবশ্যই শেষ হবে, যিনি অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু সবকিছুই তাঁর দিকে মুখাপেক্ষী, যিনি স্বনির্ভর, সকল বস্তু তাঁর উপর নির্ভরকারী, তিনি নিজেই অস্তীত্বশীল, কিন্তু অন্যসব বস্তু তাঁর কারণেই অস্তীত্বশীল। তিনি আদি থেকেই আছেন এবং তাঁর কোন শুরু নেই। তিনি ব্যতীত বাকী সবই অস্তীত্বহীন থেকে অস্তীত্বে এসেছে। তাঁর সত্তা স্থায়ী থাকবে এবং প্রত্যেক বস্তুর স্থায়িত্ব তাঁর কারণেই। সুতরাং তিনিই প্রথম, তাঁর পূর্বে আর কেউ নেই। তিনিই শেষ, তাঁর পরে আর কেউ নেই। তিনিই সবার উপরে, তাঁর উপরে আর কেউ নেই। তিনি আকাশের উপর আরশে সমুন্নত। তিনিই সকলের নিকটে, তার চেয়ে অধিক নিকটে আর কেউ নেই।[২০৫]

---

২০৫. আল্লাহর অন্যতম গুনবাচক নাম الظاهر والباطن এর বাংলা অনুবাদ করা হয় প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য শব্দ দিয়ে। এভাবে অনুবাদের মাধ্যমে এই নাম দু'টির যথাযথ অর্থ প্রকাশিত হয় না। আলেমগণ এই নাম দু'টির যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে কোন বই-পুস্তকে খোলাসা করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তাই বাংলাভাষী মুসলিম ভাইদের জন্য এখানে এই গুরুত্বপূর্ণ নাম দু'টির অর্থ বর্ণনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের আলেমদের মতামত তুলে ধরছি।

১. কেউ কেউ বলেনঃ الظاهر অর্থ হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء হে আল্লাহ্! তুমি সবার উপরে তোমার উপরে আর কিছু নেই। সুতরাং যাহের নামের মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অবস্থান সকল মাখলুকের উপর। সাত আসমানের উপরে আরশে আযীমে তিনি সমুন্নত। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতেও তিনি সকল সৃষ্টির উপরে।

২.কেউ কেউ বলেনঃ যাহের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ উর্ধ্বজগতের সকল বিষয়কে বেষ্টন করে আছেন। সুতরাং সাত আসমান ও তাতে যা আছে তার সবকিছুই আল্লাহ্ তআলা স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে আছেন। উর্ধ্ব জগতের কোন কিছুই তার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে নয়।

আর الباطن বাতেন অর্থ হচ্ছে, (১) যা সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, وأنت الباطن فليس دونك شيء হে আল্লাহ্! তুমিই বাতেন তথা সকল গোপন বিষয়কে পরিবেষ্টনকারী। তোমার বেষ্টনীর বাইরে কেউ নেই। সুতরাং অধঃস্তন ও নিম্ন জগতের সকল বিষয়কে তিনি জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে বেষ্টন করে আছেন। সাত যমীন ও তার মধ্যে অবস্থানকারী কোন বস্তুই তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে নয়। তিনি যমীনের সকল মাখলুকের গোপন রহস্যও সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয় সম্পর্কেও অবগত আছেন।

(২) কোন কোন আলেম বলেনঃ الباطن অর্থ হচ্ছে নিকটে। এই অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মাখলুকের নিকটে। তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির অতি নিকট থেকে তাদেরকে বেষ্টন করে আছেন। তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ

তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। (সূরা ওয়াকিআঃ ৮৫) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

নাবী ﷺ বলেন- লোকেরা পরস্পর জিজ্ঞেস করতে থাকবে। এক পর্যায়ে তাদের কেউ বলবে, এই তো আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে আল্লাহ্কে সৃষ্টি করেছে কে? যে ব্যক্তির হৃদয়ে এ ধরণের প্রশ্নের উদয় হবে, সে যেন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এ ধরণের কিছু চিন্তা করা হতে থেমে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

"যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তুমি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তবে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[২০৬]

শয়তান হচ্ছে দুই প্রকার। এক প্রকার শয়তানকে মানুষ চর্মচোখের মাধ্যমে দেখতে পায়। এরা হচ্ছে মানব জাতির অন্তর্ভূক্ত শয়তান। আরেক প্রকার শয়তান হচ্ছে, যা মানুষ চোখে দেখতে পায়না। এটি হচ্ছে জিন জাতির শয়তান (ইবলীস ও তার চেলারা)। মানুষ শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নাবীকে তাদের থেকে দূরে অবস্থান করতে বলেছেন, সুকৌশলে এবং উত্তমভাবে তাদের মুকাবেলা করতে বলেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের আচরণে চোখ বন্ধ করে থাকার আদেশ দিয়েছেন। আর জিন শয়তানের অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। কারণ সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে বলে বাহ্যিকভাবে তার মুকাবেলা করা সম্ভব নয়। মানুষ তার মুকাবেলা করতে সক্ষমও নয়। তাই তার মুকাবেলায় এমন শক্তির প্রয়োজন, যিনি তার লাগাম ধরে টান দিতে সক্ষম এবং তার চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে খুবই পরাক্রমশালী। তিনি হচ্ছেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা। সুতরাং এই প্রকার শয়তান থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চাইতে হবে। কারণ তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তার উপর শক্তিশালী নয়। এ ক্ষেত্রে সুন্নাতে বর্ণিত সূরা নাস, ফালাক এবং বিভিন্ন যিকির-আযকার পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা সুরা আ'রাফ, মুমিনূন এবং ফুস্‌সিলাতে এই উভয় প্রকার শয়তানকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। সূরা আরাফে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

"এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি তোমার প্রতিপালক চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করতনা"। (সূরা আনআম-৬:১১২) কোন এক আরব কবি বলেন-

---

আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (সূরা কাফ-৫০:১৬) এমনি আরও যে সমস্ত আয়াতে দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার নিকটে থাকার কথা বলা হয়েছে, তার মর্ম হচ্ছে তিনি জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সকলের অতি নিকটে। অথচ তিনি স্বীয় সত্তায় সকল মাখলুকের উপরে আরশে আযীমে সমুন্নত। উভয় প্রকার আয়াতের মধ্যে আলেমগণ এভাবেই সমন্বয় করেছেন। তিনি মাখলুকের সাথে মিশে একাকার হয়ে থাকা হতে পবিত্র। আল্লাহই ভাল জানেন।

২০৬. সূরা হা-মীম সাজদাহ-৪১: ৩৬

فما هو إلا الإستعاذة ضارعاً

أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب

فهذا دواء الداء من شر ما يرى

وذاك دواء الداء من شر محجوب

"বিনয়ের সাথে আউযুবিল্লাহ পড়া কিংবা উত্তমভাবে প্রতিহত করাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঐ রোগের মহৌষধ, যা চোখে দেখা যায়। আর প্রথমটি হচ্ছে এমন রোগের চিকিৎসা, যা থাকে চোখের আড়ালে"।

ক্রোধান্বিত হওয়ার সময় যা করণীয়

নাবী ﷺ ক্রোধান্বিত ব্যক্তিকে ক্রোধের আগুন নির্বাপন করার জন্য ওযূ করার আদেশ করেছেন।[২০৭] আর যদি ক্রোধান্বিত ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে বসার আদেশ দিয়েছেন। আর বসা থাকলে শয়ন করতে বলেছেন আর শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ক্রোধ ও লোভ (নারী, সম্পদ, নের্তৃত্ব ইত্যাদির প্রতি আসক্তি ও লোভ) যেহেতু মানুষের অন্তরে আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার তাই উপরোক্ত পদ্ধতিতে নিবারন করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না"? (সূরা বাকারা-২:৪৪)

সকল প্রকার পাপ যেহেতু রসূ ও প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণেই হয়ে থাকে আর রাগের বশবর্তী হয়েই যেহেতু মানুষ খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয় এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার জন্যই ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাই আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আনআম, বনী ইসরাঈল ও সূরা ফুরকানে হত্যা এবং ব্যভিচারের বিষয়টি একসাথে উল্লেখ করেছেন এবং তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

---

২০৭. এ বিষয়ে হাদীসটি দুর্বল। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তা স্বীকৃত। এমন কি পুরানোকালে মানসিক রোগের চিকিৎসা হিসাবে গোসল ছিল অন্যতম একটি ব্যবস্থা। তা ছাড়া রাগে রয়েছে গরম আর পানিতে রয়েছে ঠান্ডা। ফলে বিষয়টি বুঝানোর জন্যে আর বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন হয়না। আর কোন বিষয় বাস্তবসম্মত হলেই তা হাদীছ হয়ে যায়না।

“তুমি বলোঃ এসো, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবেনা, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে, দারিদ্রের ভয়ে স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই। আর নির্লজ্জতার (ব্যভিচারের) কাছেও যেয়োনা, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, ন্যায় সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করোনা। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ কর”। (সূরা আনআম-৬:১৫১) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

“এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করেনা, আল্লাহ্ যাকে হত্যা হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গোনাহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন”।[২০৮] নাবী ﷺ কোন পছন্দনীয় বিষয় দেখলে বলতেন-

«الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যার নেয়ামতেই সকল ভাল কাজ পরিপূর্ণ হয়”। আর অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন-

«الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

“সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য”। কেউ কোন ভাল জিনিষ তাঁর সামনে রাখলে বা তাঁর খেদমত করলে তিনি তার জন্য দু'আ করতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন তাঁর সামনে ওযূর পানি রাখলেন তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন-

«اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»

“হে আল্লাহ্! তুমি তাঁকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর এবং কুরআনের তাফসীর শিক্ষা দাও”। রাত্রে পথ চলার সময় ঘুমের কারণে তিনি যখন উট থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন তখন আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে সাহায্য করলে তিনি বললেন- আল্লাহর নাবীকে হেফাজত করার কারণে আল্লাহ্ তোমাকেও হেফাজত করুন। নাবী ﷺ বলেন- কোন ব্যক্তির উপকার করা হলে সে যদি উপকারী জন্য বলেঃ جَزَاكَ الله خَيْراً আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, তাহলে সে উপকারীর খুব ভাল প্রশংসা করল। যে ব্যক্তি তাঁকে ঋণ দিয়েছিলেন তিনি তা পরিশোধ করার সময় বলেছিলেন-

«بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ»

---

২০৮. সূরা আল-ফুরকান-২৫: ৬৮

“আল্লাহ্ তোমার সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের (সন্তানদের) মধ্যে বরকত দান করুন”। নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রশংসা ও সময় মত পরিশোধ করে দেয়াই ঋণের একমাত্র বদলা। নাবী ﷺ-এর জন্য কেউ হাদীয়া পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং তার চেয়ে বেশী বদলা দিতেন। আর কারও হাদীয়া ফেরত দিলে তিনি ফেরত দেয়ার কারণ বলে দিতেন। সা'ব বিন জাছ্ছামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন তাঁকে বন্য গাধা শিকার করে গোশত হাদীয়া দিলেন তখন তিনি তাকে বলেছেন- তোমার হাদীয়া এই জন্য ফেরত দিচ্ছি যে, আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি।[২০৯]

মোরগের ডাক শুনে আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাওয়া

তিনি তাঁর উম্মাতকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন গাধার ডাক শুনে ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম’ পাঠ করে এবং মোরগের ডাক শুনে যেন আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করে। বর্ণনা করা হয় যে, তিনি আগুন লাগলে ‘আল্লাহু আকবার’ বলার আদেশ দিয়েছেন। তাকবীর আগুনকে নিভিয়ে ফেলবে।[২১০]

মজলিসে একত্রিত ব্যক্তিদের জন্য তিনি অপছন্দ করতেন যে, তাদের মজলিস আল্লাহ্ তা'আলার যিকির থেকে শূণ্য হবে। তিনি এ ব্যাপারে বলেছেন- যে ব্যক্তি কোন জায়গায় বসবে এবং তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবেনা, সেখানে আল্লাহর পক্ষ হতে বিষণ্নতা (দুঃখ, ক্লান্তি ও বেদনা) নেমে আসবে। আর যে ব্যক্তি শয়ন করবে, কিন্তু আল্লাহর স্মরণ করবেনা তার উপরও আল্লাহর পক্ষ হতে পেরেশানী নেমে আসবে।[২১১] তিনি আরও বলেন- যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসবে যেখানে অনর্থক বাজে কথা (গোলমাল) হয় সেই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে সে যদি এই দু’আ পাঠ করেঃ

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أشهد أن لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

অর্থঃ “হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতাসহ আমি তোমার প্রশংসা করছি। তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।” তাহলে সেই মজলিসে যত ভুল-ত্রুটি হবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।[২১২]

সুনানে আবু দাউদে আছে, মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে তিনি এই দু'আটি পাঠ করতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন- এটি হচ্ছে ঐ মজলিসে যা কিছু হবে তার কাফ্ফারা।

---

২০৯. তাই আমার জন্য এই গোশত খাওয়া হালাল নয়। তাই ফেরত দিচ্ছি। আসল কথা হচ্ছে, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষেধ। কেউ মুহরিমের জন্য শিকার করলে তা থেকে খাওয়াও নিষেধ। সা'ব বিন জুসামা যেহেতু মুহরিমদের জন্য শিকার করেছিল বা এরূপ করার সন্দেহ ছিল তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীয়া ফেরত দিয়েছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

২১০. এই হাদীসটি যঈফ। সিলসিলায়ে যঈফা, হা/২৬০২।

২১১. সিলসিলায়ে সহীহা, হা/৭৭।

২১২. আবু দাউদ, আলএ, হা/৪৮৫৭, সহীহ তিরমিযী, মাপ্র.হা/৩৪৩৩, মিশকাত, মাশা.হা/২৪৩৩, সহীহ, তাহ্ব: আলবানী

নাবী ﷺ যে সমস্ত কথা অপছন্দ করতেন

তিনি যে সমস্ত শব্দ ও বাক্য পছন্দ করতেন না তার অন্যতম হচ্ছে, خبثت نفسي 'খাবুছাত নাফসী' অর্থাৎ আমার চরিত্র নোংরা হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে তিনি لقست نفسي 'লাকিসাত নাফসী' বলার উপদেশ দিয়েছেন। উভয় বাক্যের অর্থ কাছাকাছি। তা হচ্ছে অভ্যাস ও চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। নাবী ﷺ خبث শব্দটি প্রয়োগ করা অপছন্দ করেছেন। কারণ তা কদর্যতা ও নোংরামীর মাত্রাতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে। তিনি আঙ্গুর ফলকে কারাম বলতেও নিষেধ করেছেন। কারণ কারাম হচ্ছে মুমিনের গুণ। তিনি কাউকে এ কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে, هَلَكَ النَّاسُ 'মানুষেরা ধ্বংস হয়ে গেছে'। নাবী ﷺ বলেন- যে ব্যক্তি এরূপ বলল, মূলতঃ সেই যেন লোকদেরকে ধ্বংস করে দিল। এমনি فَسَدَ النَّاسُ وَفَسَدَ الزَّمَانُ 'লোকেরা নষ্ট হয়ে গেছে, যামানা খারাপ হয়ে গেছে' বলাও অপছন্দনীয়। তিনি অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি বলতেও নিষেধ করেছেন।[২১৩]

আর তিনি ما شاء الله وشئت 'আল্লাহ্ যা চান' এবং 'তুমি যা চাও' বলতেও নিষেধ করেছেন।[২১৪] রসূল ﷺ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। নাবী ﷺ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন-

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে শিরক করল"।[২১৫] এমনি শপথের মধ্যে এ কথাও বলা নিষিদ্ধ যে, সে যদি এমন করে তাহলে ইহুদী হয়ে যাবে। তিনি বাদশাহকে মালিকুল মুল্ক তথা শাহানশাহ বা রাজাধিরাজ বলতে নিষেধ করেছেন। চাকর ও খাদেমকে আমার বান্দা বা আমার বান্দী বলাও নিষিদ্ধ। বাতাসকে গালি দেয়া, জ্বরকে (রেসূকে) দোষারোপ করা, মোরগকে গালি দেয়ার ব্যাপারেও নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।

আইয়্যামে জাহেলীয়াত তথা অন্ধকার যুগের সকল আহবান ও শ্লোগানকে তিনি বর্জন করার আদেশ দিয়েছেন। মুসলিমদেরকে গোত্র, বংশ এবং জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করতে এবং এর ভিত্তিতে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ মাজহাব ভিত্তিক দলাদলি, বিভিন্ন তরীকা ও মাশায়েখের অনুসরণ করাও নিষিদ্ধ।

---

২১৩. বৃষ্টি আল্লাহর বিশেষ একটি নেয়ামত ও রহমত। আল্লাহই এটিকে মানুষের কল্যাণের জন্য বর্ষণ করেন। সুতরাং বৃষ্টি বর্ষিত হলে আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করা উচিত। তা না করে যদি কেউ বলে আমরা উমুক উমুক তারকার কারণে কিংবা পহেলা বৈশাখের কারণে বা অন্য কোন কারণে বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি, তাহলে আল্লাহর নেয়ামতকে অন্য কিছুর দিকে সম্পৃক্ত করার কারণে কথাটি কুফরীর অন্তর্ভূক্ত হবে। সুতরাং মুমিনের জন্য এ ধরণের শব্দ ও বাক্য পরিহার করে তাওহীদের সাথে সামঞ্জস্য ও সংগতিপূর্ণ কথা বলা জরুরী।

২১৪. এতে (এবং) শব্দের মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর ইচ্ছাকে সমান করে দেয়া হয়। তাই (এবং) শব্দ পরিহার করে অতঃপর শব্দটি প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ এভাবে বলতে হবে যে, আল্লাহ্ যা চান অতঃপর সে যা চায়।

২১৫. মুসনাদে আহমাদ।

তিনি অধিকাংশ মুসলিমের নিকট পরিচিত 'এশা' সলাতের নাম বর্জন করে 'আতামাহ' রাখাকে অপছন্দ করেছেন।[২১৬] এমনি মুসলিমকে গালি দেয়া, তিনজন এক সাথে থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দুইজন মিলে গোপনে আলাপ করা এবং মহিলাকে তার স্বামীর কাছে অন্য মহিলার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِـئْتَ "হে আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা কর"- এইভাবে দু'আ করতে নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে দৃঢ়তার সাথে চাওয়ার আদেশ করেছেন। তিনি বেশী বেশী শপথ করা, কাওসে কাযাহ (রংধনু) বলা, আল্লাহর চেহারার উসীলায় কিছু চাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি মদীনাকে ইয়াছরিব বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিনা প্রয়োজনে কোন লোককে এ কথা জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করেছেন যে, কেন সে তাঁর স্ত্রীকে প্রহার করেছে। তবে প্রয়োজন বশত জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। আমি পূর্ণ রমযান মাস সিয়াম রেখেছি এবং পূর্ণরাত তাহাজ্জুদ সলাত পড়েছি- এ কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

যে সমস্ত বিষয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে বলা উচিত, তা সুস্পষ্ট করে এবং খোলাখুলিভাবে বলাও অপছন্দনীয়। কথা-বার্তার অন্তর্ভূক্ত। أطال الله بقـاءك আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘ দিন জীবিত রাখুক বা অনুরূপ কথা বলা মাকরূহ। সায়িমকে তিনি এ কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে, ঐ আল্লাহর শপথ যার সীলমোহর আমার মুখের উপর রয়েছে। কেননা কাফেরের মুখের উপরই রয়েছে আল্লাহর সীলমোহর। জোরপূর্বক আদায়কৃত সম্পদকে হক বা অধিকার বলা অন্যায়। আল্লাহর রাস্তায় ও আল্লাহর আনুগত্যে খরচ করার পর এ কথা বলা অন্যায় যে, আমি এত এত সম্পদ নষ্ট করেছি, দুনিয়াতে আমি অনেক সম্পদ খরচ করেছি ইত্যাদি। ইজতেহাদী মাসআলায় মুফতীর এ কথা বলা নিষিদ্ধ যে, আল্লাহ্ তা'আলা এটি হালাল করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এটি হারাম করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর কোন দলীলকে মাজায (রূপকার্থবোধক) বলা ঠিক নয়। এমনিভাবে দার্শনিকদের সন্দেহসমূহকে অকাট্য যুক্তি বলা অযৌক্তিক। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, উপরোক্ত দু'টি বাক্য ব্যবহার করার কারণে দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য ক্ষতি হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সমস্ত কাজ (সহবাস বা অন্যান্য বিষয়) হয় তা মানুষের মাঝে বলে বেড়ানো নিষিদ্ধ। যেমনটি করে থাকে নির্বোধ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা।

আরও যে সমস্ত অপছন্দনীয় শব্দ লোকেরা উচ্চারণ করে থাকে তার মধ্যে এও রয়েছে যে, তারা ধারণা করে থাকে, তারা বলে থাকে, তারা আলোচনা করে থাকে ইত্যাদি। শাসককে خليفـة الله অর্থাৎ আল্লাহর খলীফা (প্রতিনিধি) বলা নিষিদ্ধ। কেননা খলীফা মূলতঃ অনুপস্থিত লোকের পক্ষ হতে নিযুক্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ নিজেই তো অনুপস্থিত মুমিন ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের খলীফা (দেখাশুনাকারী)। সুতরাং মানুষ আল্লাহর খলীফা হয় কিভাবে?

আমি, আমার, আমার নিকট ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করা থেকে সতর্ক থাকা উচিত। কেননা এই তিনটি শব্দ বলার কারণেই ইবলীস, ফেরাউন এবং কারুন ধ্বংস হয়েছে। ইবলীস বলেছিল-

---

২১৬. গ্রাম্য লোকেরা সে সময় এশার সলাতকে আতামার সলাত বলত। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিমগণ তখন এশার সলাত বলত। তাই নাবী ﷺ গ্রাম্য লোকদের অভ্যাস মোতাবেক এশার সলাতের নাম বর্জন করে আতামার সলাত বলা অপছন্দ করেছেন।

﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ﴾

"আমি তার (আদম) থেকে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে। আর তাঁকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে"। (সূরা আরাফ-৭:১২) ফেরাউন বলেছিল- ﴿أَلَـيْسَ لِي مُلْـكُ مِصْرَ﴾ "মিশরের রাজত্ব কি একমাত্র আমার নয়?"। (সূরা যুখরুফ-৪৩:৫১) কারুন বলেছিল- ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُـهُ عَلَى عِلْـمٍ عِنْـدِيْ﴾ "এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি"। (সূরা কাসাস-২৮:৭৮)

أَنَـا 'আমি' শব্দটি সবচেয়ে অধিক সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে ঐ বান্দার কথার মধ্যে, যে বান্দা বলেছিল-

«أَنَا العَبْدُ المُذْنِبُ المُخْطِئُ المُسْتِغْفِرُ المُعْتَرِفُ»

"আমি অপরাধী, পাপী, অপরাধ স্বীকারকারী ক্ষমাপ্রার্থী একজন বান্দা"। لِي 'আমার' শব্দটিও খুবই সুন্দর রূপে ব্যবহৃত হয়েছে ঐ বান্দার কথায়, যে বলেছিল-

«لِي الذَّنْبُ وَلِي الْجُرْمُ وَلِي الْمَسْكَنَةُ وَلِي الْفَقْرُ وَالذُّلُّ»

"গুনাহ, অপরাধ, অভাব, দারিদ্র এবং হীনতা এ সবের সবই আমার মধ্যে রয়েছে"। এমনি عنـــدي 'আমার নিকট' কথাটিও নিম্নের দু'আয় অতি সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

«اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جِدِّىْ وَهَزْلِيْ وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ»

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার অসতর্কতা বশতঃ কৃত গুনাহ, অজ্ঞতা বশতঃ অপরাধ, আমার কাজের ক্ষেত্রে সীমালংঘন এবং তুমি আমার ঐ সমস্ত অপরাধও ক্ষমা করে দাও যে সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে অধিক অবগত আছ। হে আল্লাহ্! তুমি আমার উদ্দেশ্যমূলক, হাসি-ঠাট্টা প্রসূত, ভুলবশত এবং ইচ্ছাকৃত সকল গুনাহ্ মা'ফ করে দাও।

জিহাদ ও গাযওয়ার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর হিদায়াত

জিহাদ যেহেতু ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া এবং জান্নাতে যেহেতু রয়েছে মুজাহিদদের সর্বোত্তম মর্যাদা ও দুনিয়াতে রয়েছে তাদের জন্য সর্বোচ্চ আসন তাই রসূল ﷺ ছিলেন এ বিষয়ে সর্বাধিক সফল। তিনি সকল প্রকার জিহাদেই উত্তমভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় অন্তর, জবান, দাওয়াত, বর্ণনা, তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে যথাযথ জিহাদ করেছেন। মূলতঃ তিনি তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত জিহাদে কাটিয়েছেন। এ জন্যই তাঁর জন্য রয়েছে আল্লাহর দরবারে জগতবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রিসালাত দান করার সাথে সাথেই জিহাদের হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً﴾

"অতএব তুমি কাফেরদের আনুগত্য করবেনা এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম কর। (ফুরকান-২৫:৫২) এটি হচ্ছে মক্কী সূরা। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের মাধ্যমে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে মুনাফিকদের সাথে দলীল-প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে জিহাদ করতে হবে। কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে জিহাদ করার চেয়েও এই প্রকারের জিহাদ অধিক কঠিন। এটি হচ্ছে জগতের বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং তাদের সহযোগীদের জিহাদ। এই শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা কম হলেও আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা অপরিসীম।

বিরোধীদের সামনে বিশেষ করে প্রভাবশালী জালেমের সামনে সত্য কথা বলা যেহেতু সর্বোত্তম জিহাদের অন্তর্ভূক্ত তাই নাবী-রসূলদের জন্য রয়েছে এই প্রকার জিহাদের যথেষ্ট অংশ। আর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন এ বিষয়ে সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ স্থানের অধিকারী। আল্লাহর প্রকাশ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আভ্যন্তরীণ শত্রু তথা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের একটি শাখা। রসূল ﷺ বলেন-

«المجاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةِ الله والمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عنه»

"প্রকৃত মুজাহিদ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে নফসের সাথে জিহাদ করে। আর আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে যে ব্যক্তি বিরত থাকে সেই প্রকৃত মুহাজির"।[২১৭] সুতরাং নফসের সাথে জিহাদ করাকে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। এই দু'টি (নফস ও কাফের) হচ্ছে বনী আদমের শত্রু। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে এই দু'টি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। এই দুই শত্রুর মাঝখানে তৃতীয় একটি শত্রু রয়েছে। এর বিরুদ্ধে জিহাদ করা ব্যতীত নফস ও কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্ভব নয়। এই তৃতীয় শত্রু হচ্ছে শয়তান। সে নফস ও শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের সময় বান্দার সামনে চলে আসে এবং বান্দাকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

"শয়তান তোমাদের শত্রু অতএব তাকে শত্রু রুপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়"। (সূরা ফাতির-৩৫:৬)

শয়তানকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করার আদেশ দেয়ার মধ্যে তার বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং এই তিনটি শত্রুর বিরুদ্ধে বান্দাকে জিহাদ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। (১) নফসের বিরুদ্ধে, (২) শয়তানের বিরুদ্ধে ও (৩) কাফেরদের বিরুদ্ধে। এটি আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য একটি পরীক্ষা। বান্দাকে এগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ করার শক্তি ও সামর্থ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুকেও শক্তি ও সামর্থ দিয়েছেন। এক দলকে অন্য দল দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং কাউকে দিয়ে অন্য কাউকে ফিতনায় ফেলেন। এর মাধ্যমে তিনি যাচাই করতে চান কে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে আর কে শয়তানকে বন্ধু বানায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

---

২১৭. মুসনাদে আহমাদ। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সিলসিলায়ে সহীহা হা/৫৪৯।

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ﴾

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না জানতে পারি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি"। (সূরা মুহাম্মাদ-৪৭: ৩১) সুতরাং তিনি তাঁর বান্দাদেরকে চক্ষু, কর্ণ, বিবেক ও শক্তি দিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য কিতাব নাযিল করেছেন, নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন এবং ফিরিস্তাদের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করেছেন। তিনি তাদেরকে এমন বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন, যা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদেরকে সর্বাধিক শক্তি যোগাবে। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা যদি আল্লাহর আনুগত্য করে তাহলে তারা তাদের শত্রুদের উপর পৃথিবীতে সদা বিজয়ী থাকবে। আর যদি তারা আল্লাহর আনুগত্য বর্জন করে এবং পাপ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তিনি শত্রুদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করে দিবেন। আর শত্রুদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করলেও তিনি তাদেরকে সে অবস্থায় রেখে দিবেন না; বরং তারা যদি আবার সঠিক পথে ফিরে আসে, ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নেয় এবং ধৈর্যের মাধ্যমে তারা যদি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাহলে তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং বিজয় দান করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুত্তাকী, সৎকর্মশীল, ধৈর্যশীল এবং মুমিনদের সাথে আছেন। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে এমন সময় রক্ষা করেন যখন তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে অক্ষম হয়ে যায়। আল্লাহর এই সাহায্যের ফলেই তারা শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করে থাকে। অন্যথায় শত্রুরা তাদের মূলোৎপাটন করে ফেলত।

ঈমান অনুযায়ীই আল্লাহর সাহায্য আসে। ঈমান যদি মজবুত হয়, তাহলে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতাও হবে মজবুত। এর মাধ্যমে কোন কল্যাণ (বিজয়) আসলে মুমিনদের উচিত আল্লাহর প্রশংসা করা। আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে সে যেন শুধু নিজেকেই দোষারোপ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর পথে জিহাদের হক আদায় করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে যথাযোগ্য আল্লাহর ভয় অর্জন করার আদেশ দিয়েছেন। তখনই যথাযোগ্য আল্লাহর ভয় অর্জন করা সম্ভব হবে যখন তাঁর আনুগত্য করা হবে; তার নাফরমানী করা হবে না, তাঁর স্মরণ করা হবে; তাঁকে ভুলা হবেনা এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে; তাঁর নেয়ামতের কুফরী করা হবে না। তাঁর পথে জিহাদের হক তখনই আদায় করা হবে, যখন বান্দা তার নফসের সাথে জিহাদ করে সফল হবে, যাতে তার অন্তর, জবান এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর অনুগত হয়ে যায় (তার সবকিছুই আল্লাহর হয়ে যায়) নিজের নফসের আয়ত্তে কিছুই থাকেনা। আল্লাহর পথে যথাযোগ্য জিহাদ তখনই করা সম্ভব হবে, যখন বান্দা তার বিরুদ্ধে নিয়োজিত শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সফল হতে পারবে, শয়তানের ওয়াদাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে এবং তার আদেশ অমান্য করতে পারবে। কেননা সে মিথ্যা ওয়াদা করে, মিথ্যা আশ্বাস দেয়, অন্যায় কাজের আদেশ দেয়, হিদায়াত এবং ঈমানের পথ হতে বিরত রাখে।

বান্দা যখন নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করে জয়লাভ করবে তখন তার মাঝে এমন শক্তি তৈরী হবে, যার মাধ্যমে সে কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহর পথে এবং আল্লাহর প্রকাশ্য দুশমনদের বিরুদ্ধে অন্তর, জবান, জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করতে সক্ষম হবে।

পূর্ব যামানার বিদ্বানগণ জিহাদের সংজ্ঞায় বিভিন্ন কথা বলেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় পরিপূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনায় ভয় না করা। আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- জিহাদ হচ্ছে নফস ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনি ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা”। (সূরা আল-ইমরান-৩:১০২) তিনি আরও বলেন-

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

“এবং তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যথার্থ জিহাদ কর। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি”। (সূরা হাজ্জ-২২:৭৮) যারা বলে- এই দু'টি আয়াত রহিত হয়ে গেছে, কারণ এখানে যথাযোগ্য ভয় করতে এবং যথার্থ রূপে জিহাদ করতে বলা হয়েছে, আর বান্দারা দুর্বল হওয়ার কারণে তা করতে অক্ষম, তাদের কথা সঠিক নয়। কেননা বান্দাদের সকলের অবস্থা এক নয়। যে ব্যক্তি যথার্থরূপে জিহাদ করার ক্ষমতা রাখে সে পরিপূর্ণভাবেই জিহাদ করবে আর যে ব্যক্তি সেই ক্ষমতা রাখেনা তার ব্যাপারে কথা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা কারও উপর সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। আমরা যদি দ্বিতীয় আয়াতটির শেষাংশের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে বলেছেন-

﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

“তিনি তোমাদেরকে বাছাই করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি”।

আল্লাহ্ দ্বীনকে প্রশস্ত রেখেছেন। সকলের জন্যই দ্বীন পালন করা সহজ। প্রত্যেক জীবের রিযিক প্রশস্ত করেছেন। বান্দা যা করতে পারবে তিনি তাই ফরয করেছেন। বান্দার জন্য যে পরিমাণ রিযিক যথেষ্ট তিনি তাই দিয়েছেন। বান্দার দ্বীন প্রশস্ত এবং তার রিযিকও প্রশস্ত। সুতরাং কোনভাবেই তিনি তাঁর বান্দার উপর দ্বীনের ব্যাপারে সাধ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন নি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- আমি পবিত্র ও সহজ দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছি। তাওহীদের মাধ্যমে দ্বীনকে পবিত্র করা হয়েছে আর দ্বীনের হুকুম-আহকাম ও আমলসমূহকে সহজ করা হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর খুব সহজ করেছেন। তিনি তাঁর দ্বীনকে, জীবিকাকে, তাঁর ক্ষমা ও মাগফিরাতকেও প্রশস্ত করেছেন। যতদিন দেহের মধ্যে রূহ বিদ্যমান থাকবে ততদিন তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন, প্রতিটি গুনাহর কাফফারার ব্যবস্থা করেছেন। তাওবা, সাদকাহ ও সৎকাজ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। বিপদাপদও গুনাহ্-এর কাফ্ফারা স্বরূপ। আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তার বিনিময়ে তিনি এমন হালাল বস্তু দান করেছেন যা তাদের জন্য উপকারী, পবিত্র ও সুস্বাদু। সুতরাং এগুলোকে তিনি হারামের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। বান্দা এগুলোর মাধ্যমে হারাম থেকে বাঁচতে পারবে। সুতরাং হালালই তার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাঁর বান্দার উপর সংকীর্ণ করেন নি। যে সমস্ত কঠিন বিষয়ের মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন তার প্রত্যেকটির পূর্বেও রয়েছে অতি সহজ বিষয় এবং

তার পরেও রয়েছে সহজ বস্তু। সুতরাং দু'টি সহজ বিষয়ের উপর একটি কঠিন বিষয় কখনই জয়লাভ করতে পারেনা। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে তাঁর বান্দার উপর সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব দেন না, সেখানে বান্দা যে সমস্ত কাজ করার ক্ষমতা একেবারেই রাখে না তা তিনি কিভাবে তার উপর চাপিয়ে দিবেন?

জিহাদের প্রকার ও স্তরসমূহ

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর আমাদের জানা উচিত যে, জিহাদের চারটি প্রকার রয়েছে। (১) নফসের সাথে জিহাদ, (২) শয়তানের সাথে জিহাদ, (৩) কাফের ও মুনাফেকদের সাথে জিহাদ এবং (৪) জালেম, গুনাহগার ও বিদআতীদের সাথে জিহাদ।

নফসের সাথে জিহাদ

নফসের সাথে জিহাদের চারটি স্তর রয়েছে। (১) ইলম, দ্বীনে হক ও হিদায়াতের তালাশের চেষ্টা করা এবং এর উপর নফসকে বাধ্য করা। কারণ দ্বীনে হকের জ্ঞান অর্জন ছাড়া সাফল্য অর্জনের কোন সুযোগ নেই। বান্দা তা অর্জনে ব্যর্থ হলে ইহকাল ও পরকালে সে হতভাগ্য হবে। (২) বান্দা ইলম অর্জন করার পর ইলমকে আমলে পরিণত করবে। কারণ আমল ছাড়া ইলম তার কোন উপকারে আসবেনা। (৩) ইলম ও আমলের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিবে। অজ্ঞদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবে। অন্যথায় সে আল্লাহর নাযিলকৃত হিদায়াত ও সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবে এবং তার ইলম অন্যের উপকার করলেও তার নিজের কোন উপকার করবে না এবং তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাও করবেনা। (৪) আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের কাজে যে সমস্ত বিপদ আসে বান্দা তার উপর নফসকে সবর করতে বাধ্য করবে। মানুষেরা তাকে কষ্ট দিলেও সে ধৈর্যধারণ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সে সব কিছুই মাথা পেতে মেনে নিবে। যার ভিতরে এই চারটি গুণ পাওয়া যাবে সে রাব্বানী তথা আল্লাহ্র প্রিয় অলী হতে পারবে।

সালাফগণের সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, কোন আলেমই ততক্ষণ পর্যন্ত রাব্বানী হওয়ার যোগ্য হয় না যতক্ষণ না সে সত্যকে ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়, সে অনুযায়ী আমল করে এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়। সুতরাং যে শিখল, আমল করল এবং শিক্ষা দিল তাকে উর্ধ্বাকাশে (জান্নাতে) মহা সম্মানের সাথে ডাকা হবে।

শয়তানের সাথে জিহাদ

শয়তানের সাথে জিহাদের দু'টি স্তর রয়েছে। (১) ঈমান নষ্ট করার জন্য শয়তান যে সমস্ত সন্দেহ এবং ওয়াসওয়াসা বান্দার অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয় তা প্রতিহত করার সংগ্রাম করা। (২) শয়তান মানুষের অন্তরে পাপ কাজের প্রতি যে আগ্রহ ও আসক্তি নিক্ষেপ করে তা প্রতিহত করার সংগ্রামে সদা প্রচেষ্টা চালানো। মজবুত ঈমান ও দৃঢ় মনোবল দিয়ে প্রথমটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং ধৈর্যের মাধ্যমেই দ্বিতীয়টির মোকাবেলা করা সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾

"তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (সূরা সাজদাহ-৩২: ২৪) সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, দৃঢ় বিশ্বাস ও সবরের মাধ্যমেই নের্তৃত্ব পাওয়া যাবে, ধৈর্যই খারাপ নিয়ত ও কুপ্রবৃত্তিকে প্রতিহত করে এবং মজবুত ঈমান সন্দেহ বিদূরিত করে।

কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদেরও চারটি স্তর রয়েছে। (১) অন্তরের মাধ্যমে জিহাদ, (২) জবানের মাধ্যমে জিহাদ, (৩) মালের সাহায্যে জিহাদ ও (৪) জান ও হাতের মাধ্যমে জিহাদ। কাফেরদের সাথে জিহাদ করতে হবে অস্ত্রের সাহায্যে। আর জবানের সাহায্যে জিহাদ করতে হবে মুনাফেকদের সাথে।

যালেম, পাপী ও বিদআতীদের সাথে জিহাদ

এই প্রকার লোকদের সাথে জিহাদের তিনটি স্তর রয়েছে। (১) ক্ষমতা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে জিহাদ করতে হবে। (২) হাত দিয়ে করতে অক্ষম হলে জবান দিয়ে করতে হবে। (৩) আর তাতেও অক্ষম হলে অন্তর দিয়ে করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জিহাদের সর্বমোট ১৩টি স্তর খুঁজে পাচ্ছি। নাবী ﷺ বলেন-

«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النَّفَاقِ»

"যে ব্যক্তি জিহাদ না করে কিংবা নিজের মনের মধ্যে জিহাদের আকাঙ্খা না রেখেই মারা গেল সে নিফাকীর একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মারা গেল"।[২১৮]

হিজরত ব্যতীত জিহাদ পূর্ণ হয় না। ঈমান ব্যতীত জিহাদ ও হিজরত উভয়টিই মূল্যহীন। আল্লাহর রহমতকামীগণই এই তিনটি গুণে গুণান্বিত হয় এবং তা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ، وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহ্র পথে লড়াই (জিহাদ) করেছে, তারা আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়"। (সূরা বাকারা-২:২১৮)

ঈমান আনয়ন করা যেমন প্রতিটি মানুষের উপর ফরয ঠিক তেমনই প্রত্যেক মুমিনের উপর প্রতি মুহূর্তে দু'টি হিজরত করা আবশ্যক। এককভাবে ও ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, আল্লাহর উপর ভরসা করা, আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর কাছেই আশা-আকাঙ্খা করা, আল্লাহকে ভালবাসা এবং একনিষ্ঠভাবে তাওবা করার মাধ্যমেই আল্লাহর দিকে হিজরত করতে হবে। আর রসূলের অনুসরণ, তাঁর আদেশের সামনে নত হওয়া, তিনি যেই সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা

---

২১৮. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাত।

এবং তাঁর আদেশকে অন্যদের আদেশের উপর প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে রসূলের দিকে হিজরত করতে হবে। রসূল ﷺ বলেন-

«فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ومَن كانت هِجْرتُهُ إلى دُنيا يُصيبها أو امرأةٍ يتزوَّجُها فَهِجْرته إلى ما هاجر إليه»

"কারো হিজরত যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ﷺ এর উদ্দেশ্যেই হিজরত বলে গণ্য হবে। আর কারো হিজরত যদি দুনিয়া অর্জন অথবা কোন নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার হিজরত সেভাবেই গৃহীত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।[২১৯]

ঠিক তেমনই আল্লাহর আনুগত্যে নফসকে বাধ্য রাখতে এবং শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্য জিহাদ করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজে আইন। এখানে একজন অন্যজনের স্থলাভিষিক্ত হবে না।

কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে উম্মাতের কোন একটি দল এই প্রকারের জিহাদে আঞ্জাম দিলে এবং তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলে অন্যদের উপর হতে ফরযিয়াত উঠে যাবে।

আল্লাহর যেই বান্দা সর্বোত্তম জিহাদ করেছেন

সেই বান্দা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক কামেল যিনি জিহাদের সকল স্তর ও প্রকার বাস্তবায়ন করেছেন। এ জন্যই আল্লাহর সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক কামেল ও মর্যাদাবান। কারণ তিনি জিহাদের সকল স্তরই বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় যথার্থরূপে জিহাদ করেছেন। নবুওয়াত ও রিসালাত পাওয়ার পর থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। যখন তাঁর উপর কুরআনের এই আয়াত গুলো নাযিল হল-

﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلاَتَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾

"হে চাদরাবৃত! উঠ, সতর্ক কর। তোমার প্রভুর বড়ত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেনা এবং তোমার পালন কর্তার উদ্দেশ্যে সবর কর। (সূরা মুদ্দাস্‌সির-৭৪:১-৭) তখনই তিনি দাওয়াতের কাজে লেগে গেলেন এবং ভালভাবে উঠে দাঁড়ালেন। দিনে ও রাতে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে দাওয়াতী কাজে মশগুল থাকলেন। আর যখন তাঁর উপর কুরআনের এই বাণী অবতীর্ণ হল-

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

"অতএব তুমি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দাও যা তোমাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেনা।" (সূরা হিজর-১৫:৯৪) তখন তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন এবং আল্লাহর কথা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন। তাঁর জাতির লোককে খোলাখুলি দাওয়াত দিলেন। এতে কোন নিন্দুকের

---

২১৯. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল অহী।

নিন্দা এবং সমালোচকের সমালোচনার ভয় করেন নি। ছোট-বড়, স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ, সাদা-কালো এবং জিন-ইনসান সকলকেই আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করার আহবান জানালেন। তাদের মূর্তীসমূহের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলেন এবং তাদের প্রতিমাগুলোর অক্ষমতার ব্যাপারে নানা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন। তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা এবং শির্কের ভয়াবহতার বর্ণনা দিতে লাগলেন। এতে মক্কাবাসী চরম ক্রোধে ফেটে পড়ল। শুরু হল ইসলামের বিরোধীতা। রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং মুসলিমগণ মুশরিকদের থেকে নানা প্রকারের শত্রুতা, অত্যাচার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের সম্মুখিন হতে লাগলেন।

এটিই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগত সুন্নাত (বৈশিষ্ট্য)। যে কেউ হকের দাওয়াত দিবে তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾

"আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রসূলগণকে। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। (সূরা ফুস্সিলাত-৪১:৪৩) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾

"এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে" (সূরা আনআম-৬:১১২) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّنْ رَسُولٍ إِلاَّ قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾

"এমনিভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলেছেঃ যাদুকর, না হয় উম্মাদ। তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুতঃ ওরা দুষ্ট সম্প্রদায়"।(সূরা যারিয়াত-৫১: ৫২-৫৩) এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীকে সান্তনা দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী নাবীগণ হচ্ছেন তাঁর আদর্শ। আর আল্লাহ্ তা'আলা নাবীর অনুসারীদেরকেও এই বলে সান্তনা দিয়েছেন যে,

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِنْ قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ﴾

"তোমরা কি এই ধারণা করে নিয়েছ যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ তোমাদের সামনে সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করেনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নাবী ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য। তোমরা শুনে নাও, আল্লাহ্র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী"। (সূরা বাকারা-২:২১৪) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ * أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * مَنْ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ

لَغَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ العَالَمِينَ﴾

“মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করেছি। ফলে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। তদ্বারা আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকেও। যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। যে আল্লাহ্র সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। যে জিহাদ করে (কষ্ট স্বীকার করে), সে তো নিজের জন্যেই জিহাদ করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে অমূখাপেক্ষী। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব। আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করোনা। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎ লোকদের অন্তর্ভূক্ত করব। কিছু লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্র আযাবের মত মনে করে। যখন তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন? (সূরা আনকাবুত-২৯:২-১০)

বান্দার উচিত উপরোক্ত আয়াতগুলো, তার বর্ণনাভঙ্গি এবং তার মধ্যকার হুকুম-আহকামগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। কেননা মানব জাতির কাছে যখন নাবী-রসূল প্রেরণ করা হয়েছে তখন তাদের সামনে দু'টি সুস্পষ্ট কথা চলে এসেছে। তাদের কেউ বলেছে- আমরা ঈমান আনয়ন করলাম। আবার অন্য একদল বলেছেঃ না, আমরা ঈমান আনয়ন করবনা। এই বলে তারা কুফরী ও অন্যায়ের পথে অবিচল রয়ে গেছে। যারা বলেছে, আমরা ঈমান আনয়ন করলাম, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ফিতনায় ফেলেছেন। এখানে ফিতনা অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে ফেলে পরীক্ষা করা। যাতে করে সত্যবাদীগণ মিথ্যুকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর যারা ঈমান আনয়ন করেনি; বরং কুফরীতেই রয়ে গেছে তারা যেন এ কথা না ভাবে যে, আমরা আল্লাহকে অক্ষম করে দিয়েছি এবং তাঁকে পরাজিত করে ফেলেছি। অচিরেই তাকে তিনি টান দিবেন এবং পাকড়াও করবেন।

যারা নাবী-রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের আনুগত্য করেছে, শত্রুরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে ও কষ্ট দিয়েছে। সুতরাং তারা এমন বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছেন, যা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। আর যারা নাবী-রসূলদের প্রতি ঈমান আনেনি এবং তাদের আনুগত্যও করেনি, তাদেরকে

উভয় জগতে শাস্তি দেয়া হয়েছে বা হবে। তাদের এই শাস্তি ও কষ্ট নাবী-রসূলদের অনুসারীদের কষ্টের চেয়ে অধিক যন্ত্রনাদায়ক ও দীর্ঘতম।

মোটকথা বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সকল মানুষকেই কষ্ট ভোগ করতে হবে। কিন্তু বিশ্বাসীর কষ্ট আর অবিশ্বাসীর কষ্টের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুমিনগণ দুনিয়াতে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হবেন। অতঃপর দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের পরিণাম খুবই ভাল হবে। আর ঈমান থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে প্রথমে তারা অল্প দিনের জন্য সুখ ও শান্তি পেলেও অচিরেই তারা স্থায়ী কষ্ট ও আযাবের দিকে ধাবিত হবে।

ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে জিজ্ঞেস করা হল- বান্দার জন্য কোন্‌টি উত্তম? কষ্টের মধ্যে ফেলে পরীক্ষা ছাড়াই তাকে প্রতিষ্ঠিত করা? না বিপদাপদে ফেলে পরীক্ষা করার পর প্রতিষ্ঠা দান করা? ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) জবাবে বললেন- প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে পরীক্ষা না করে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করেন না। তিনি উলুল আযম তথা সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী রসূলদেরকেও বিপদাপদের সম্মুখীন করেছেন। তারা যখন ধৈর্য ধারণ করেছেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। সুতরাং কোন মুমিন যেন কখনই এ কথা না ভাবে যে, সে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ হতে রেহাই পাবে। যে সমস্ত মুমিন বিপদাপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তাদের বুদ্ধি ও বিবেকের মধ্যেও পার্থক্য হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হচ্ছে ঐ মুমিন, যে অস্থায়ী সামান্য কষ্টের বিনিময়ে বিরাট এবং স্থায়ী কষ্টকে বিক্রি করে দিল আর সবচেয়ে নির্বোধ ও হতভাগ্য হল ঐ ব্যক্তি যে অস্থায়ী এবং সামান্য কষ্টের বদলে চিরস্থায়ী বিরাট কষ্টকে ক্রয় করে নিল।

যদি বলা হয় বিবেকবান ব্যক্তি কিভাবে এটি (মহা সাফল্যের বিনিময়ে ক্ষুদ্র বস্তু) নির্বাচন করতে পারে? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, নগদ ও বাকীর বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নফস সবসময় সামনে যা উপস্থিত আছে তাই গ্রহণ করতে চায়। দূরবর্তী কোন জিনিষের জন্য অপেক্ষা করতে চায়না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ العَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ﴾

"কখনও না,বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং পরকালকে উপেক্ষা কর"।(সূরা কিয়ামাহ-৭৫:২০২১) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ العَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً﴾

"নিশ্চয়ই এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে"। (সূরা ইনসান-৭৬:২৭) মানুষ সমাজের অন্যান্য লোকদের সাথে বসবাস করে। মানুষের রয়েছে অনেক ইচ্ছা ও স্বপ্ন। যে মুমিন বান্দা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করে সেও মানুষ। সমাজের অন্যান্য মানুষেরা সাধারণতঃ চাইবে যে, সেও তাদের ইচ্ছানুপাতে চলুক। সে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক না চললে; বরং তাদের বিরোধীতা করলে তারা তাকে কষ্ট ও শাস্তি দিবে। এটিই বাস্তব। আর সে যদি তাদের মর্জী অনুযায়ী চলে তাতেও সে কষ্ট পাবে। কখনও তাদের পক্ষ হতে আবার কখনও অন্যদের পক্ষ হতে। যেমন কোন দ্বীনদার ও মুত্তাকী লোক যদি ফাসেক ও জালেম সম্প্রদায়ের মাঝখানে বাস করে তাহলে সে ঐ সমস্ত জালেম ও পাপিষ্ঠদের পাপ কাজে সমর্থন ও সম্মতি দেয়া ব্যতীত কিংবা ফাসেকদের কর্মকান্ডে চুপ থাকা ব্যতীত কখনই তাদের অত্যাচার হতে রেহাই পাবেনা। সে যদি তাদেরকে সম্মতি

দেয় কিংবা চুপ থাকে তাহলে প্রথমে হয়ত সে তাদের অনিষ্ট হতে রেহাই পাবে, কিন্তু অচিরেই তারা তার উপর চড়াও হবে, তারা তাকে কষ্ট দিবে এবং লাঞ্ছিত করবে। প্রথমে সে যেই পরিমাণ অত্যাচারের ভয় করেছিল এখন তাদের প্রতিবাদ করার কারণে সে আরও বহুগুণ বেশী অপমানের শিকার হবে। সে যদি তাদের অত্যাচার হতে বেঁচেও যায়, কিন্তু অন্যদের হাতে অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে ও শাস্তি পাবে।

সুতরাং প্রথম হতেই মুমিন ও দ্বীনের দাঈদেরকে সাবধান হতে হবে এবং দৃঢ়তার সাথে ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে হবে। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে যেই উপদেশ দিয়েছিলেন তার উপরই আমল করতে হবে। তিনি মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন-

«مَنْ أَرْضَى اللهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِوَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ لم يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا»

"যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে মানুষের কষ্ট হতে তাঁকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করবে মানুষেরা তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবেনা"।

যে ব্যক্তি পৃথিবী ও তার মধ্যে বসবাসকারী মানুষের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করবে সে ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে যারা জালেম শাসক এবং বিদআতীদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সাহায্য করে। আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করেন, সঠিক পথ দেখান এবং কুপ্রবৃত্তির অকল্যাণ থেকে বাঁচান সেই কেবল তাদের হারাম ও অন্যায় কাজে সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকে এবং তাদের জুলুম নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করে। পরিণামে দুনিয়া ও আখিরাতে সে সুফল প্রাপ্ত হয়। যেমন সাফল্য অর্জিত হয়েছে নাবী-রসূল ও তাদের অনুসারীদের জন্য, আনসার ও মুহাজিরদের জন্য এবং পরীক্ষার কবলে পতিত উলামায়ে কিরামদের জন্য।

দ্বীনের দাঈগণ যেহেতু কষ্ট ও নির্যাতন হতে রেহাই পাবেনা তাই আল্লাহ্ তা'আলা এই অস্থায়ী কষ্ট ভোগকারীদেরকে শান্তনা দিয়ে বলেন-

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

"যে আল্লাহ্র সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। যে ব্যক্তি জিহাদ করে (কষ্ট স্বীকার করে), সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে অমূখাপেক্ষী"। (সূরা আনকাবুত-২৯:৫-৬) সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই অস্থায়ী কষ্টের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করেছেন। আর সেটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত দিবস। বান্দা যেই স্বাদ উপভোগ করার জন্য কষ্ট ভোগ করেছে সেই কারণে সে দিন বান্দা অফুরন্ত স্বাদ গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে স্বীয় সাক্ষাত প্রদানের ওয়াদা করেছেন। যাতে বান্দা তাঁর সাক্ষাতের আশায় ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট সহজেই ভোগ করতে পারে। বরং কখনও কোন কোন বান্দার অবস্থা এ রকম হয় যে, সে আল্লাহর সাক্ষাতের আগ্রহের মধ্যে ডুবে গিয়ে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায় এবং তা অনুভব করেনা। এ জন্যই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রভুর সাক্ষাতের আকাঙ্খা করেছেন। আল্লাহর সাক্ষাতের

ইচ্ছা ও কামনা অন্তরে জাগ্রত হওয়া বিরাট একটি নিয়ামাত। তবে এই নিয়ামাতটি পাওয়ার জন্য কিছু মৌখিক ও শারীরিক আমল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সেই কথাগুলো শুনেন এবং সেই আমলগুলো সম্পর্কে অবগত আছেন। যারা এই নিয়ামাতটি পাওয়ার হকদার আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কেও অবগত আছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾

"আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি- যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন"? (সূরা আনআম-৬:৫৩) বান্দার কাছ থেকে কোন নিয়ামাত ছুটে গেলে সে যেন এই আয়াতের এই অংশটি পাঠ করে- আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদেরকে অন্য আরেকটি শান্তনা এভাবে দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় তাদের জিহাদ মূলতঃ তাদের নিজেদের জন্যই। এর ফল তারাই ভোগ করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসীদের প্রতি সম্পূর্ণ অমূখাপেক্ষী। এই জিহাদের ফায়দা তারাই হাসিল করবে। আল্লাহ্ তা'আলার এতে কোন লাভ নেই।

আর মহান আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর পথে জিহাদ এবং তাঁর প্রতি অবিচল ঈমান তাদেরকে সালেহীনদের কাতারে শামিল করবে।

অতঃপর যারা বিনা ইলমে এবং না বুঝে ঈমান আনয়ন করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদেরকে যখন আল্লাহর পথে কষ্ট দেয়া হয় তখন তারা মানুষের দেয়া কষ্টকে আল্লাহর সেই আযাবের মতই মনে করে, যা থেকে বাঁচার জন্যই তারা ঈমান আনয়ন করেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন তার সৈনিক ও বন্ধুদেরকে বিজয় দান করেন তখন তারা বলে আমরা তোমাদের সাথেই ছিলাম। তাদের অন্তরে যে নিফাক রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন।

মোটকথা আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতের দাবী হচ্ছে, তিনি অবশ্যই মানুষদেরকে পরীক্ষা করবেন। এর মাধ্যমে পবিত্র আত্মা অপবিত্র আত্মা থেকে আলাদা হয়ে যাবে, কে তার বন্ধুত্ব ও সম্মান পাওয়ার হকদার আর কে তা পাওয়ার হকদার নয় তাও পরিস্কার হয়ে যাবে। কেননা নফস্ মূলতঃ জাহেল ও জালেম হয়ে থাকে। অজ্ঞতার কারণে নফসের মধ্যে এমন অপবিত্রতা প্রবেশ করে যা থেকে আত্মাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা জরুরী। যদি এই দুনিয়া হতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আত্মা নিয়ে যেতে পারে তাহলে তো ভাল। অন্যথায় তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। বান্দা যখন পাক ও পবিত্র হবে তখনই তাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

নাবী ﷺ এর দাওয়াত এবং ইসলাম গ্রহণে যারা অগ্রগামী ছিলেন

যখন তিনি আল্লাহর দিকে আহবান করলেন তখন প্রত্যেক কবীলা (গোত্র) থেকেই লোকেরা সেই দাওয়াত কবুল করল। এই উম্মাতের সিদ্দীক (মহা সত্যবাদী) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং সত্য দ্বীন প্রচারে রসূলের সহযোগী হলেন এবং তাঁর সাথে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। আবু বকরের আহবানে উছমান, তালহা এবং সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করলেন তাঁর সত্যবাদীনী জীবন

সঙ্গীনি খাদিজা । তিনিও সত্যবাদীনী উপাধি পেলেন এবং একজন সত্যবাদীনী হিসেবে পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রসূল একবার খাদীজাকে বললেন- আমি নিজের উপর ভয় করছি। তখন খাদীজা বললেন- আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ কখনই আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। অতঃপর তিনি তাঁর এমন কতিপয় গুণাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করলেন, যার মধ্যে সেই সমস্ত গুণাবলী থাকলে আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করেন না। খাদীজা তাঁর সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত যোগ্যতা এবং পূর্ণ প্রজ্ঞার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, সৎকাজ ও উত্তম চরিত্র আল্লাহর সম্মান ও অনুগ্রহ পাওয়ার মাধ্যম; যারা এ সমস্ত গুণাবলীতে ভূষিত হবেন তারা অপমান ও লাঞ্ছনার হকদার নন। এই পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও পূর্ণ প্রজ্ঞার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ এবং জিবরীলের মাধ্যমে তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন।

অতঃপর কিশোরদের মধ্যে আলী ইবনে আবী তালিব সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ্ এর চাচাত ভাই। তিনি তাঁরই তত্বাবধায়নে থাকতেন। মক্কায় দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের পারিবারিক ব্যয়ভার হালকা করার জন্য আলীর প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে নেন।

ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ বিন হারেছা সর্বাগ্রে ইসলাম কবুল করেন। সে ছিল খাদীজার কেনা গোলাম। খাদীজা তাকে রসূল এর জন্য দান করে দিলেন। একবার যায়েদের পিতা ও চাচা তাকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে আগমণ করল। তখন রসূল বললেন- তার ব্যাপারে আমি কি অন্য কিছু করতে পারি? যায়েদের পিতা ও চাচা বলল- সেটি কি? রসূল বললেন- আমি তাকে দু'টি বিষয়ের একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিব। সে যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের কাছে যেতে চায় তাহলে সে যেতে পারে। তোমরা তাকে নিয়ে নিবে। আর যদি আমার কাছে থাকাকে পছন্দ করে তাহলে আমি তাকে কখনই তোমাদের কাছে ফেরত দিতে পারব না। তারা বলল- আপনি খুব ভাল ও ইনসাফপূর্ণ কথা বলেছেন। তখন যায়েদকে ডাকলেন এবং তাকে পিতার সাথে চলে যাওয়ার ও তাঁর কাছে থেকে যাওয়ার ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দিলেন।

যায়েদ তখন বললেন- আপনাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। তারা বলল- হে যায়েদ! অকল্যাণ হোক তোমার। স্বাধীনতা ও পরিবার-পরিজনকে বাদ দিয়ে তুমি দাসত্বকেই বেছে নিলে? যায়েদ তখন বলল- আমি এই ব্যক্তির রসূল এর কাছ থেকে এমন সুন্দর আচরণ পেয়েছি, যার কারণে তাঁকে ছেড়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

রসূল যখন যায়েদের এই মনোভাবের কথা জানতে পারলেন তখন তাকে হিজির নামক স্থানে (কাবার নিকটে) ডেকে নিয়ে ঘোষণা দিলেন- তোমরা সাক্ষী থাক। যায়েদ আমার ছেলে। আমি তার ওয়ারিছ। সেও আমার ওয়ারিছ। যায়েদের পিতা ও চাচা এই দৃশ্য দেখে খুশী মনে ফেরত চলে গেল। অতঃপর তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মাদ বলেই ডাকা হচ্ছিল। অতঃপর যখন ইসলাম আগমণ করল এবং কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল-

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾

"তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্র কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে"। (সূরা আহযাবঃ ৫) সেদিন থেকেই যায়েদ বিন হারেছা বলে ডাকা শুরু হয়।

ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে মা'মার বলেন- যায়েদের পূর্বে অন্য কেউ ইসলাম কবুল করেছে বলে আমাদের জানা নেই। পাদ্রী ওয়ারাকা বিন নাওফালও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, নাবী ﷺ স্বপ্নে ওয়ারাকা বিন নাওফালকে সুন্দর অবস্থায় দেখেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন।

লোকেরা একের পর এক আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে থাকল। তখনও কুরাইশরা কোন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি তাদের বাতিল ও বানোয়াট ধর্মের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে লাগলেন এবং তাদের কল্পিত মাবুদদেরকে এইভাবে কটুক্তি করলেন যে, এগুলো কোন উপকার ও ক্ষতির মালিক নয় তখন তারা শক্তভাবে তাঁর দাওয়াতের বিরোধীতা শুরু করল এবং নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে হেফাজত করলেন। আবু তালেব ছিল কুরাইশদের মধ্যে সম্মানিত ও ভদ্র একজন নেতা। তার পরিবার ও মক্কাবাসীরা তাকে সম্মান করত। মক্কাবাসীরা তাকে সামান্যতম কষ্ট দেয়ার সাহসিকতা প্রদর্শন করতনা। তবে সে তার দ্বীনেই থাকবে এবং স্বীয় ভাতিজাকে সহযোগিতা করবে, এটিই ছিল মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার কৌশল। যে ব্যক্তি আবু তালেবের অবস্থার মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করবে, সে এ কথা অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, আবু তালেবের কুরাইশদের ধর্মের উপর স্থির থাকাতেই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য বিরাট উপকার ও কল্যাণ নিহিত ছিল।

দ্বীনের পথে সাহাবীদের জুলুম-নির্যাতন সহ্যের কিছু দৃষ্টান্ত

সাহাবায়ে কেরামদের অবস্থা এই ছিল যে, যার গোত্রীয় শক্তি ছিল, সে তার গোত্রের সাহায্য পেত এবং স্বীয় গোত্রের লোকেরা তাকে অন্যান্য কাফেরদের কষ্ট হতে রক্ষা করত। কিন্তু বহু সংখ্যক সাহাবীর এ রকম কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারা দ্বীনের পথে কুরাইশদের পক্ষ হতে কঠিক যন্ত্রনা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা ভোগ করেছেন নানা ধরণের শাস্তি ও জুলুম-নির্যাতন। তাদের মধ্যে ছিলেন আম্মার বিন ইয়াসির, তাঁর মাতা সুমাইয়া এবং তাঁর পরিবার। তারা আল্লাহর পথে কঠোর শাস্তি ভোগ করেছেন।

যখন মরুর বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠত তখন তাদেরকে চিৎ করে শায়িত করে শাস্তি দিত। সে অবস্থায় একদা রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেছিলেন- "হে ইয়াসের পরিবার ধৈর্য ধারণ করো, তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।" অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইয়াসের ইন্তেকাল করেন।

দুর্বৃত্ত আবু জাহল সুমাইয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর লজ্জাস্থানে তীর দিয়ে আঘাত হানলে তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। তারা আম্মারের উপরও শাস্তি কঠোর করে, কখনও তাকে তারা উত্তপ্ত রোদ্রে ফেলে শাস্তি দিত, কখনও ভারি প্রস্তর তার উপরে চাপিয়ে রাখতো, আবার কখনও আগুনে দগ্ধকরে শাস্তি দিত এবং বলতোঃ যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদ ﷺ কে গালি না দিবে অথবা "লাত" ও "উয্যা" সম্পর্কে ভালো কথা না বলবে ততক্ষণ আমরা তোমাকে ছাড়বনা। তিনি বাধ্য হয়েই তাদের কথায় সম্মতি দেন এবং পরবর্তীতে ক্রন্দনরত অবস্থায় ও রসূল ﷺ এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করেন-

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

"যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর যদি আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয়------- তাদের উপর পতিত হবে আল্লাহর গযব"। (সূরা নাহল- ২৭:১০৬)

যেসমস্ত সাহাবী কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের অন্যতম। তাকে আল্লাহর রাস্তায় কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর জন্য নিজের জানকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্বজাতির কাছে নিজেকে ছেড়ে রেখেছিলেন। মুশরিকরা তাঁকে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছিল। ওরা তাঁকে মক্কার গলিতে টেনে নিয়ে বেড়াত, আর তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ। ওরাকা বিন নাওফাল তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন- হ্যাঁ, বিলাল। ঠিক বলছ। আহাদ, আহাদ। আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক। আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি তাঁকে হত্যা করে ফেল আমি তাঁর হত্যায় মমতা প্রকাশ করব।

বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উমাইয়া বিন খাল্ফের দাস ছিলেন। উমাইয়া তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করত, উত্তপ্ত রৌদ্রে অভূক্ত অবস্থায় ফেলে রাখত। যখন দ্বি-প্রহরের কঠিন রোদে বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠতো তখন তাকে মক্কার মরুভূমিতে নিয়ে যেত, অতঃপর চিৎ করে শুইয়ে তার বক্ষদেশে বিশাল একটি পাথর চাপিয়ে দিত। তখন তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)। একদা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে সময় তার শাস্তি হচ্ছিল। তিনি তাকে একটি কৃষ্ণ দাসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। মতান্তরে তিনি তাকে পাঁচ উকিয়া (দু'শ দিরহাম) রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়ে ছিলেন।

কুরাইশদের নির্যাতন কঠোর হলে আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের হিজরত

মুসলিমদের উপর যখন কুরাইশদের নির্যাতন কঠোর থেকে কঠোরতর হতে লাগল এবং তাদেরকে যখন বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেয়া শুরু করল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর দয়া করলেন এবং মুশরিকদের নির্যাতন হতে মুক্তি দান কল্পে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজাশী ছিলেন একজন ন্যায় পরায়ণ ও দয়ালু বাদশাহ। তাদের দলনেতা ছিলেন উসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তাঁর সাথে ছিলেন নাবী নন্দিনী রুকাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। তারা ছিলেন সংখ্যায় ১২জন পুরুষ ও ৪জন মহিলা। তারা গোপনে মক্কা থেকে বের হলেন। লোহিত সাগরের তীরে গিয়ে আল্লাহর তাওফীক মোতাবেক তারা দু'টি নৌকা পেয়ে গেলেন। নৌকার মাঝিরা তাদেরকে উঠিয়ে নিলেন।

এটি ছিল নবুওয়াতের ৫ম সনের রজব মাসের ঘটনা। কুরাইশরা তাদের সন্ধানে বের হয়ে সাগরের তীর পর্যন্ত পৌঁছল। কিন্তু তারা তাদের সন্ধান পেলনা। তারা আবিসিনিয়ায় পৌঁছে উত্তমভাবে অবস্থান করতে শুরু করলেন। এদিকে আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদের নিকট এই মর্মে খবর পৌছে যায় যে, কুরাইশরা মুসলিমদের উপর নির্যাতন বন্ধ করেছে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তারা ঐ বছরের শাওয়াল মাসে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন তারা মক্কায় এসে পৌঁছেন তখনই আসল তথ্য অবগত হতে সক্ষম হন। তারা জানতে পারেন যে, কুরাইশরা আগের চেয়ে আরও বেশী নির্যাতন চালাচ্ছে। তখন তাদের কেউ কেউ পুনরায় আবিসিনিয়া ফেরত চলে যায় আবার কেউ কেউ গোপনে অথবা কুরাইশদের কারো নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

তখনই আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ আবিসিনিয়া থেকে ফেরত আসার পর নাবী এর নিকট প্রবেশ করে সালাম দেন। তিনি তখন সলাতে ছিলেন। তাই উত্তর দেন নি। ইবনে মাসউদ এতে খুব কষ্ট পেলেন। পরে নাবী তাঁকে বললেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা অহীর মাধ্যমে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা সলাতরত অবস্থায় কথা বলোনা। এটিই সঠিক কথা। যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক। ইবনে সা'দ এবং অন্য একটি দল মনে করেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ মক্কায় প্রবেশ করেন নি; বরং তিনি হাবশায় ফিরে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি অন্য সাহাবীদের সাথে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এই বর্ণনা ঠিক নয়। কারণ ইবনে মাসউদ বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনিই আবু জাহেলকে কাবু করেছিলেন। আর যারা আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তারা জা'ফর বিন আবু তালেবের সাথে বদরের যুদ্ধের চার বা পাঁচ বছর পর মদীনায় আগমন করেছিলেন।

যদি বলা হয় ইবনে সা'দের বর্ণনা তো যায়েদ বিন আরকামের উক্তিকে সমর্থন করে। যায়েদ বিন আরকাম বলেন- আমরা সলাতরত অবস্থায় কথা বলতাম। সলাত অবস্থায় যে কেউ তার পাশের লোকের সাথে কথা বলত। অতঃপর কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলেঃ وَقُوْمُــوْا لله قَـانِتِيْنَ "আর আল্লাহ্র সামনে একান্ত আনুগত্যের (নিরবতার) সাথে দাঁড়াও"। (সূরা বাকারা-২:২৩৮) তখন আমাদেরকে চুপ থাকার আদেশ দেয়া হল এবং আমাদেরকে সলাতরত অবস্থায় কথা বলতে নিষেধ করা হল। যায়েদ বিন আরকাম ছিলেন আনসারী সাহাবী। আর সূরাটি হচ্ছে মাদানী। সুতরাং ইবনে মাসউদ এই ঘটনার পর নাবী এর কাছে আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় এসে সলাতরত অবস্থায় সালাম দিলে তিনি তার উত্তর দেননি। সলাতের সালাম ফিরিয়ে তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন এবং সলাত অবস্থায় কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। সুতরাং ইবনে সা'দের বর্ণনা যায়েদ বিন আরকামের বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। আবিসিনিয়া থেকে দ্বিতীয়বার যারা এসেছিলেন তারা কেবল খায়বার যুদ্ধের বছর জা'ফর বিন আবু তালেব ও তাঁর সাথীদের সাথেই আগমন করেছিলেন। তিনি যদি বদরের যুদ্ধের পূর্বে আবিসিনিয়া হতে মদীনায় আগমণ করতেন তাহলে অবশ্যই এ ব্যাপারে আলোচনা হত।

অথচ আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মাত্র দুইবার আগমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন আগমনের কথা কেউ বর্ণনা করেননি। একবার তাদের একদল মক্কায় আগমন করেছেন। আরেকদল জা'ফরের সাথে খায়বারের বছর মদীনায় আগমন করেছেন। সুতরাং এই দুইবারের বাইরে ইবনে মাসউদ কখন ও কার সাথে আগমন করলেন?

সুতরাং আমরা যা উল্লেখ করেছি ইবনে ইসহাকের বর্ণনাও অনুরূপ। ইবনে ইসহাক বলেন- আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবীদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই খবর পেয়ে তারা চলে আসল। মক্কার কাছে এসে তারা জানতে পারলেন যে, খবরটি বানোয়াট। সুতরাং তাদের কেউ কারও আশ্রয় নিয়ে আবার কেউ অতি সংগোপনে মক্কায় প্রবেশ করলেন। যারা মক্কায় ফেরত আসলেন তারা এখানেই বসবাস করতে থাকলেন। পরে তারা রসূল এর আদেশে

মদীনায় হিজরত করেছেন এবং বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছিলেন এই দলের অন্তর্ভূক্ত।

যদি বলা হয় যায়েদ বিন আরকামের হাদীছের জবাব কী হবে? সেখানে তো বলা হয়েছে যে, মদীনাতেই সলাত অবস্থায় কথা বলার নিষিদ্ধতা এসেছে।

এর উত্তর দুইভাবে দেয়া যেতে পারে। (১) প্রথমে মক্কায় নিষিদ্ধতা এসেছে। অতঃপর মদীনায় আসার পর সলাত অবস্থায় কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। পরে আবার নিষেধ করেছেন। (২) যায়েদ বিন আরকাম কম বয়সের সাহাবী ছিলেন। ছোট হিসেবে তিনি এবং তার মতই অন্য একদল লোক অভ্যাস মোতাবেক সলাত অবস্থায় কথা বলত। নিষিদ্ধতার বিষয়টি তাদের জানা ছিলনা। যখন তারা বিষয়টি জানতে পারলেন তখন সলাত অবস্থায় কথা বলা থেকে বিরত থাকলেন।

অতঃপর যারা হাবশা থেকে ফেরত আসলেন তাদের উপর এবং অন্যান্য মুসলিমদের উপর কুরাইশদের পক্ষ হতে নতুনভাবে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল। তারা কুরাইশদের হাতে কঠোর শাস্তি ভোগ করলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। দ্বিতীয়বার বের হওয়া তাদের জন্য আরও কঠিন ছিল। আর বিশেষ করে কুরাইশরা যখন মুসলমানদের প্রতি নাজ্জাশীর সদ্ব্যবহারের কথা জনতে পারল, তখন তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন আরও বাড়িয়ে দিল।

এবার যারা হিজরত করল তাদের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন। আম্মার বিন ইয়াসিরকেও তাদের মধ্যে গণনা করা হয়। আর তাদের সাথে ১৯ জন মহিলাও ছিল।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ্ আলায়হি) বলেন- আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী দ্বিতীয় দলের মধ্যে উছমান বিন আফ্‌ফান এবং একদল বদরী সাহাবীর নামও উল্লেখ করা হয়। এটি একটি ধারণা মাত্র। অথবা এও হতে পারে যে, আবিসিনিয়া হতে সাহাবীদের একটি দল বদরের যুদ্ধের পূর্বেও একবার ফেরত এসেছেন। তাদের মধ্যে উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ছিলেন। তাহলে মোট তিনবার ফেরত আসা হল। একবার হিজরতের পূর্বে, আরেকবার হিজরতের পর এবং বদরের যুদ্ধের পূর্বে এবং অন্যবার ৭ম হিজরিতে খায়বারের যুদ্ধের বছর। এই জন্যই ইবনে সা'দ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেন- তারা যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিজরতের কথা জানতে পারলেন তখন ৩৩ জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলা আবিসিনিয়া হতে ফেরত আসলেন। তাদের দুই জন মক্কায় মারা গেলেন। ৭ জনকে মক্কায় আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। আর ১৪ জন বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

৭ম হিজরীর শাওয়াল মাসে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি চিঠি লিখে আমর বিন উমাইয়ার মাধ্যমে নাজ্জাশীর বরাবর পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাকে এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। নাজ্জাশী ইসলাম কবুল করলেন এবং তিনি জানিয়ে দিলেন যে, আমি যদি আপনার কাছে আসতে সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই চলে আসতাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজ্জাশীকে এও লিখেছিলেন যে, তিনি যেন উম্মে হাবীবাকে তাঁর কাছে বিয়ে দেন। উম্মে হাবীবা তাঁর স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ সেখানে গিয়ে ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যায় এবং খৃষ্টান থাকা অবস্থাতেই সে হাবাশায় মারা যায়।

সুতরাং নাজ্জাশী তাঁকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বিয়ে দিলেন এবং তাঁর নিজের পক্ষ হতে চারশ দীনার মোহারানা পরিশোধ করলেন। খালেদ বিন সাঈদ বিন আস এই বিয়েতে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নাজ্জাশীর কাছে আরও লিখেছিলেন যে, তিনি যেন সেখানে অবস্থানকারী সকল

মুসলিমকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন এবং যাতায়াতের খরচাদিও বহন করেন। তাই নাজ্জাশী আমর বিন উমাইয়ার সাথে দু'টি নৌকায় করে তাদেরকে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তারা খায়বারে এসে নাবী ﷺ এর সাথে মিলিত হলেন। তারা এসে দেখলেন যে, তিনি খায়বার জয় করে ফেলেছেন।

এর মাধ্যমে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) এর হাদীছের মধ্যকার সমস্যা দূর হয়ে গেল এবং জানা গেল যে, মদীনায় হিজরতের পর সলাতরত অবস্থায় কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যদি বলা হয় যে, এই সমাধান খুবই সুন্দর। তবে ইবনে ইসহাকের ঐ বর্ণনার জবাব কী হবে, যেখানে তিনি বলেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ মক্কাতেই ছিলেন? জবাব হল ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ মক্কাতে অল্প কয়েক দিন অবস্থান করার পর হাবশায় চলে যান। এটিই সুস্পষ্ট কথা। কেননা মক্কাতে তাঁর কোন সাহায্যকারী ছিলনা। এই বিষয়টি ইবনে ইসহাকের কাছে অস্পষ্ট ছিল। ইবনে ইসহাক তাঁর বর্ণনার সূত্র উল্লেখ করেন নি। আর ইবনে সা'দ মুত্তালিব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হানতাবের সনদে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং কোন সমস্যা অবশিষ্ট রইলনা।

ইবনে ইসহাক আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী দলের মধ্যে আবু মুসা আশআরীকেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ওয়াকেদী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলেন এ বিষয়টি ইবনে ইসহাকের মত পন্ডিতের নিকট কিভাবে অস্পষ্ট রয়ে গেল?

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন- আমার কথা হচ্ছে এই বিষয়টি ইবনে ইসহাকের চেয়ে কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের কাছেও অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। কিন্তু উপরোক্ত সন্দেহের কারণ হচ্ছে, আবু মুসা আশআরী (রাঃ) ইয়ামান থেকে হিজরত করে প্রথমে আবিসিনিয়ায় জা'ফর ও তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হন। সেখান থেকে তারা মদীনায় ফেরত আসেন। সহীহ বুখারীতে এটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এটিকে ইবনে ইসহাক আবু মুসার জন্য হিজরত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ কথা বলেন নি যে, তিনি মক্কা হতে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন, যাতে তার প্রতিবাদ করা হয়।

নাজ্জাশীর রাজ্যে মুসলিমদের নিরাপদ বসবাস এবং কুরাইশদের ষড়যন্ত্র

মুসলিমগণ নাজ্জাশীর দেশে নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করছিলেন। কুরাইশরা এই খবর জানতে পেরে তাদেরকে সেখান থেকে ফেরত আনার জন্য আব্দুল্লাহ বিন আবী রাবিআ এবং আমর বিন আসকে পাঠাল। তাদের সাথে নাজ্জাশীর মন জয় করার জন্য অনেক মূল্যবান উপঢৌকনও দিয়ে দিল। কিন্তু নাজ্জাশী তাদেরকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করলেন।

কুরাইশ প্রতিনিধিরা রাজ্যের বড় বড় সেনাপতির মাধ্যমেও সুপারিশ করাল। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হলনা। অতঃপর তারা নাজ্জাশীর কাছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক নতুন ফন্দি বের করল। তারা বলল- মুসলিমরা ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে এক বিরাট কথা বলে থাকে। মুসলিমরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র না বলে আল্লাহর বান্দা বলে। নাজ্জাশী তাদেরকে পুনরায় স্বীয় দরবারে ডেকে পাঠালেন। জা'ফর বিন আবু তালেব ছিলেন তাদের দলনেতা। নাজ্জাশীর দরবারে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে জা'ফর বললেন- আপনার নিকট হিজবুল্লাহ্ তথা আল্লাহর দল প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছে। নাজ্জাশী দারোয়ানকে বললেন- তুমি তাঁকে পুনরায় অনুমতি চাইতে বল। জা'ফর (রাঃ) পুনরায় অনুমতি

চাইলেন। তারা নাজ্জাশীর কাছে প্রবেশ করলে নাজাশী জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা ঈসার ব্যাপারে কি বল? জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূরা মারইয়ামের প্রথমাংশ তিলাওয়াত করলেন। তিলাওয়াত শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি কাষ্ঠখন্ড উঠিয়ে বললেন- আল্লাহর কসম! ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর চেয়ে একটুও বেশী বলেননি। এ কথায় দরবারে উপস্থিত নাজ্জাশীর সভাসদ ও পাদ্রীরা পেরেশান হয়ে গেল এবং বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করল। নাজ্জাশী বললেন- তোমরা যাই বল, এটিই আমার কথা। অতঃপর তিনি মুসলিমদেরকে বললেন- তোমরা নিরাপদে আমার রাজ্যে বসবাস করতে থাক। যারা তোমাদের অসুবিধা করবে তাদেরকে আমি শাস্তি দিব। এরপর তিনি কুরাইশদের প্রেরিত দূত দু'জনকে বললেন- তোমরা যদি আমাকে স্বর্ণের একটি পাহাড়ও দান কর তাতেও আমি মুসলিমদেরকে তোমাদের কাছে হস্তান্তর করবনা। অতঃপর তাদেরকে নাজ্জাশীর দরবার হতে তাদের উপঢৌকন ফেরত দিয়ে বের করে দেয়া হল। তারা লজ্জিত হয়ে মক্কায় ফেরত আসল।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও বনী হাশেমকে কুরাইশদের বয়কট

অতঃপর (নবুওয়াতের ৬ষ্ট বছর) হামজাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং অপর একটি দল ইসলাম গ্রহণ করল। এতে ইসলাম দ্রুত প্রসার হতে লাগল। কুরাইশরা যখন দেখল রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাওয়াত উন্নত হচ্ছে এবং মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তারা দাওয়াত প্রতিরোধে এক নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করল। তারা সকলেই বনী হাশেম এবং বনী আব্দুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হল যে, মুহাম্মাদকে হত্যা করার জন্য তাদের হাতে সোপর্দ না করা পর্যন্ত নিম্ন লিখিত বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ বলবৎ থাকবে।

- বনী হাশেম ও আব্দুল মোত্তালেব গোত্রের সাথে সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ থাকবে।
- তাদের সাথে বিবাহ-সাদী বন্ধ থাকবে।
- এমন কি তাদের সাথে কোন প্রকার কথা-বার্তাও বলবেনা।
- তাদের সাথে উঠাবসা ও চলা-ফেরা বন্ধ থাকবে।

চুক্তি পত্রটি লিখে তারা কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। কথিত আছে ঐ চুক্তিপত্রটি বাগীয বিন আমের বিন হাশেম লিখে ছিল। তাই তিনি তার উপর বদ দু'আ করেছিলেন যার ফলে তার একটি হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল।

এই চুক্তিপত্র লিখার পর আবু লাহাব ব্যতীত বনী হাশেম এবং বনী আব্দুল মোত্তালেব গোত্রের সকল মুসলিম-কাফের শিআবে আবু তালেব তথা দুই পাহাড়ের মধ্যবতী একটি স্থানে আশ্রয় নিল। আবু লাহাব বনী হাশেমের লোক হওয়া সত্ত্বেও সে কুরাইশদের পক্ষ নিয়েছিল।

এটি ছিল নুবওয়াতের ৭ম বছর মুহাররাম মাসের প্রথম দিকের ঘটনা। তারা সেখানে অবরুদ্ধ কোণঠাসা অবস্থায় তিন বছর যাবৎ বসবাস করতে থাকলেন। তারা প্রচন্ড অভাবের সম্মুখীন হলেন। প্রচন্ড খাদ্যাভাবে এবং ক্ষুধার তাড়নায় তারা এক পর্যায়ে গাছের পাতা এবং জীব-জন্তুর চামড়া খেতে বাধ্য হলেন। প্রায়ই ঘাটির অপর প্রান্ত হতে ক্ষুধার যন্ত্রনায় শিশু ও মহিলার ক্রন্দন শুনা যেত।

আবু তালেব কুরাইশদের বয়কটের বিবরণ দিয়ে একটি সুপ্রসিদ্ধ কবিতা রচনা করেন। ইতিহাসের কিতাবগুলোতে তার সেই বিখ্যাত কবিতাটি উল্লেখিত হয়েছে। কুরাইশরা এই বয়কটকে কেন্দ্র করে

দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদল এই বয়কটকে অপছন্দ করেছিল। আরেকদল এটিকে সমর্থন করেছিল। যারা এটিকে অপছন্দ করেছিল তারা এটি ছিড়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ঐ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে চুক্তিপত্রটির বিষয়ে অবগত করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে একটি পোঁকা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও জুলুম-নির্যাতনের বাক্যগুলো খেয়ে ফেলেছে। শুধু আল্লাহ্ তা'আলার বরকতময় নামটিই অবশিষ্ট রয়েছে। রসূল ﷺ তাঁর চাচা আবু তালেবকে এই সংবাদ জানালেন। আবু তালেব কুরাইশদের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালেন এবং বললেন তাঁর কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমরা তাঁর উপর থেকে সমর্থন উঠিয়ে নেব এবং তাঁকে তোমাদের জন্য ছেড়ে দেব। আর যদি তাঁর কথা সত্য হয়, তাহলে তোমাদের সিদ্বান্ত পরিবর্তন করা উচিত। কুরাইশরা বলল- আপনি ঠিক বলেছেন। সুতরাং তারা চুক্তিটি নামিয়ে এনে দেখল যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর সংবাদ হুবহু সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এতে তাদের কুফরী আরও বেড়ে গেল।

অতঃপর কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগে চুক্তিপত্রটি ছিড়ে ফেলার পর রসূল ﷺ ঘাটি থেকে বের হলেন। এর ছয় মাস পর আবু তালেব মৃত্যু বরণ করেন। তার তিন দিন পর রসূল ﷺ এর স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মৃত্যু বরণ করেন। এ বিষয়ে অন্য কথাও বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে এই বছরকে আমুল হুজ্‌ন তথা দুঃখের বছর বলা হয়।

নাবী ﷺ এর তায়েফ গমন

অল্প সময়ের ব্যবধানে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবু তালেবের মৃত্যুর পর মূর্খ কুরাইশরা রসূল ﷺ এর উপর প্রকাশ্যে নির্যাতন শুরু করল। তাই তিনি এই আশায় তায়েফ গমণ করলেন যে, তায়েফবাসী হয়ত তাঁকে আশ্রয় দিবে এবং সাহায্য করবে। তায়েফ গিয়ে তিনি সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করলেন। কিন্তু তিনি সেখানে কোন সাহায্যকারী পেলেন না এবং তাকে কেউ আশ্রয়ও দিল না। এমনকি একজন লোকও তাঁর দাওয়াত কবুল করল না। বরং তারা তাঁকে আরও বেশী কষ্ট দিল। এত কষ্ট তিনি ইতিপূর্বে তাঁর জাতির লোকদের থেকেও ভোগ করেন নি। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরই মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেসা। রসূল ﷺ তায়েফে দশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি তায়েফের সকল গোত্রীয় সর্দারদের কাছে গমণ করেন এবং প্রত্যেককে দ্বীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু সবাই একই কথা বলল যে, তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হয় নি; বরং তারা দুষ্ট বালকদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ফেরার পথে তায়েফের মূর্খ ও দুষ্টরা তাঁর পিছে লাগল। তারা আল্লাহর রসূলকে গালি দিচ্ছিল, তাঁর পিছনে হৈ চৈ করছিল এবং পাথর নিক্ষেপ করছিল। পাথরের আঘাতে তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরে পায়ের জুতা দু'টি লাল হয়ে গেল। যায়েদ ইবনে হারেছা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রিয় নাবীকে রক্ষা করছিলেন। একটি পাথর এসে তাঁর মাথায় লেগে গেল। এতে তাঁর মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

নাবী ﷺ তায়েফ থেকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মক্কায় ফেরত আসলেন। ফেরার পথে তিনি আল্লাহর দরবারে এই প্রসিদ্ধ দু'আটি করলেন-

«اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي وهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَوْ إِلى عَدوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ

غَضَبٌ عَلَيَّ فَلاَ أُبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ هِي أَوْسَعُ لِى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ أَنْ يَحِلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ أَوْ أَنْ يَنْزِلَ بِى سَخَطُك، لك العُتبى حَتَّى تَرْضَى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِكَ»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে স্বীয় দুর্বলতা, (মানুষকে বুঝাতে) আমার কলা-কৌশলের স্বল্পতা এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতার অভিযোগ করছি। হে সর্বাধিক দয়ালু! তুমি দুর্বলদের প্রভু, আমারও প্রভু। তুমি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছ? তুমি কি আমাকে দূরের এমন অচেনা কারও হাতে ন্যস্ত করছ, যে আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করবে? নাকি কোন শত্রুর হাতে সোপর্দ করছ, যাকে তুমি আমার বিষয়ের মালিক করে দিয়েছ? তুমি যদি আমার উপর রসূান্বিত না হও তাহলে আমি কোন কিছুই পরওয়া করিনা। তবে নিঃসন্দেহে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সর্বাধিক প্রশস্ত ও প্রসারিত। আমি তোমার সেই চেহারার আলোর আশ্রয় চাই, যা দ্বারা অন্ধকার দূরিভূত হয়ে যায় এবং যা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় সংশোধন হয়। এই কথার মাধ্যমে আমার উপর তেমার ক্রোধা নেমে আসা হতে অথবা আমার উপর তোমার অসন্তুষ্টি নাযিল হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমার সকল প্রচেষ্টা। তোমার সাহায্য ব্যতীত অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় এবং তোমার তাওফীক ও শক্তি ছাড়া তোমার আনুগত্য করা অসম্ভব"।[২২০]

ফেরার পথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তা প্রেরণ করলেন। ফিরিস্তা তাঁর কাছে তায়েফবাসীদের উপর মক্কার বড় দু'টি পাহাড় নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। উত্তরে নাবী ﷺ বললেন বরং আমি চাই আল্লাহ তাদের বংশধর হতে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা।

'ওয়াদীয়ে নাখলা' নামক জায়গায় এসে কয়েক দিন অতিবাহিত করলেন। তিনি রাত্রে সেখানে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিনদের একটি দল তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তারা নাবী ﷺ এর কুরআন তিলাওয়াত শুনল। কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি তাদের আগমণ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আমি তোমার প্রতি প্রেরণ করেছিলাম একদল জিনকে। যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হলো, ওরা একে অপরকে বলতে লাগল- চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল ওরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল, এক একজন সতর্ককারীরূপে"। (সূরা আহকাফ-৪৬:২৯-৩১) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾

"বলোঃ আমার প্রতি এই মর্মে অহী প্রেরিত হয়েছে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি"।[২২১]

---

২২০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ এই বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন। ফিকহুস্ সীরাতঃ (১/১২৫)।
২২১. সূরা জিন-৭২:১

'নাখলা' নামক জায়গায় কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর যায়েদ তাঁকে বললেন- মক্কার কুরাইশরা আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আপনি কিভাবে সেখানে প্রবেশ করবেন? তিনি বললেন- হে যায়েদ! তুমি যেই মসীবত প্রত্যক্ষ করছ, আল্লাহ্ তা'আলা তা অবশ্যই বিদূরিত করবেন, তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন এবং তাঁর নাবীকে সাহায্য করবেন।

মক্কার নিকটবর্তী হয়ে তিনি খোযা'আ গোত্রের একজন লোকের মাধ্যমে মুতইম বিন আদীর কাছে আশ্রয় চাইলেন। তিনি মুতইমকে বললেন- আমি তোমার আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে চাই। সে রাজী হল এবং ঘোষণা দিল যে, আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিচ্ছি। সে তার ছেলেদেরকে ডেকে বলল- তোমরা অস্ত্র হাতে নাও এবং কাবার চারপাশে দাঁড়িয়ে যাও। আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিচ্ছি।

যায়েদকে সাথে নিয়ে তিনি মুতইম বিন আদীর আশ্রয়ে কাবায় প্রবেশ করলেন। মুতইম বিন আদী স্বীয় বাহনের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল যে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছি। সুতরাং কেউ যেন তাঁর উপর আক্রমন না করে।

অতঃপর নাবী ﷺ হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তাতে চুম্বন করলেন এবং দু'রাকাত সলাত আদায় করলেন। মুতইম বিন আদী এবং তার ছেলেরা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাবী ﷺ কে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন।[২২২]

নাবী ﷺ এর মি'রাজ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে মি'রাজ হয়েছিল সশরীরে। তিনি প্রথমে বুরাকে আরোহন করে মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন। জিবরীল ফিরিস্তা সাথেই ছিলেন। মাসজিদের দরজার হাতলের সাথে বুরাক বেঁধে সেখানে নেমে তিনি নাবীদের ইমাম হয়ে সলাত পড়লেন। কেউ কেউ বলেছেন- তিনি বেতেলহামে (জেরুজালেমে) যাত্রা বিরতি করেছিলেন এবং সেখানেই নাবীদের ইমামতি করেছেন। এটি মোটেও সঠিক নয়। মাসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণকে 'ইসরা' অর্থাৎ রাতের ভ্রমণ বলা হয়। সে রাত্রেই বাইতুল মাকদিস হতে উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়।

দুনিয়ার আকাশের নিকটবর্তী হলে জিবরীল ফিরিস্তা তাঁর জন্য আকাশের দরজা খোলার আবেদন করলে তা খুলে দেয়া হয়। প্রথম আকাশে তিনি মানব জাতির পিতা আদম (আলায়হিস সালাম)কে দেখতে পেলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং স্বাগত জানালেন। আদম (আলায়হিস সালাম) মুহাম্মাদ ﷺ এর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সেখানে আদমের সৌভাগ্যবান সন্তানদেরকে তাঁর ডান পাশে এবং হতভাগ্যদেরকে বাম পাশে দেখালেন।

অতঃপর তাঁকে দ্বিতীয় আকাশে উঠানো হল। সেখানে গিয়ে তিনি ঈসা এবং ইয়াহইয়া (আলায়হিস সালাম) কে দেখতে পেলেন। তৃতীয় আকাশে ইউসূফ (আলায়হিস সালাম) কে দেখতে পেলেন। এমনিভাবে চতুর্থ আকাশে গিয়ে

---

২২২. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতইমের এই উপকার কখনও ভুলতে পারেন নি। বদর যুদ্ধের দিন বন্দীদের ব্যাপারে আলোচনা চলার সময় তিনি বললেনঃ মুতইম বিন আদী যদি আজ জীবিত থাকতো এবং এই পঁচা লোকদের (কাফেরদের) ব্যাপারে শাফায়া'ত করতো তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দিতাম। (বুখারী)

ইদ্রীছ, পঞ্চম আকাশে হারুন এবং ষষ্ঠ আকাশে মূসা আলায়হিস্ সালাম এর সাথে দেখা করলেন। মূসা আলায়হিস্ সালাম কে সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন- এই ছেলেটিকে আমার অনেক পরে নাবী করে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু আমার উম্মাতের চেয়ে অধিক সংখ্যক উম্মাত নিয়ে আমার পূর্বেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পরিশেষে তাঁকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তিনি ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এর সাথে সাক্ষাত করলেন। অতঃপর তাঁর সামনে সিদরাতুল মুনতাহা তথা সিমান্তের কূল বৃক্ষ এবং বাইতুল মা'মূর উন্মুক্ত করা হল।[২২৩] অতঃপর তাঁকে মহা প্ররাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উঠানো হল। তিনি তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে গেলেন। তখন মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। অতঃপর তাঁর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হল। ফেরত আসার সময় তাঁর সাথে মূসা আলায়হিস্ সালাম এর সাথে সাক্ষাত হল। মূসা আলায়হিস্ সালাম জিজ্ঞেস করলেন- আপনাকে কিসের আদেশ দেয়া হয়েছে? নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হয়েছে। মুসা আলায়হিস্ সালাম বললেন- আপনার উম্মাত এত সলাত আদায় করতে পারবেনা। আপনি ফেরত যান এবং কমাতে বলেন। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলের দিকে তাকালেন। মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন। জিবরীল হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত দিলেন এবং বললেন- আপনি ইচ্ছা করলে যেতে পারেন। সুতরাং জিবরীল তাঁকে নিয়ে পুনরায় উপরে উঠলেন এবং মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে গেলেন। সহীহ বুখারীতে এভাবেই উল্লেখ আছে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তাঁর উপর থেকে দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। চল্লিশ করা হল। তিনি নেমে এসে মূসার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তাঁকে খবর দিলেন। তিনি বললেন- আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান এবং কমাতে বলুন। এভাবে মুসা আলায়হিস্ সালাম এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যাওয়া-আসা করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত করা হল। মুসা আলায়হিস্ সালাম আবারও যেতে বললেন এবং কমানোর আবেদন করার পরামর্শ দিলেন। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার বললেন- আমি পুনরায় আমার রবের কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি। আমি এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাত নিয়ে সন্তুষ্ট আছি এবং তা মেনে নিচ্ছি। এই বলে যখন তিনি চলতে লাগলেন তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিলেনঃ আমার ফরয ঠিক রাখলাম। কিন্তু বান্দাদের উপর থেকে সংখ্যা কমিয়ে দিলাম।

মি'রাজের রাত্রে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আল্লাহকে দেখেছেন?

মিরাজের রাতে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুকে দেখেছেন কি না, এই ব্যাপারে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রভুকে দেখেছেন। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে সহীহ সনদে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রভুকে অন্তর দিয়ে দেখেছেন। আয়িশা এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ দেখার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তারা

২২৩. বায়তুল মা'মূর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন। এক বার যারা সেখান থেকে বের হয়ে আসেন কিয়ামতের পূর্বে তারা আর তাতে প্রবেশের সুযোগ পাবেন না।

উভয়েই বলেন- وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى "নিশ্চয়ই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছেন"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জিবরীল। আবু যার (রাঃ) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছেনঃ আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বলেছেন- আমি তো নূর দেখেছি। তাঁকে কিভাবে দেখব? অর্থাৎ রসূল ﷺ এর মাঝে এবং তাঁর রবের মাঝে নূরের একটি পর্দা অন্তরায় হয়েছিল। অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ﷺ বলেন- আমি একটি নূর দেখেছি। ইমাম দারামী না দেখার ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা বর্ণনা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) বলেন- ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কথা, তিনি তাঁর প্রভুকে দেখেছেন এবং তিনি তাঁকে তাঁর অন্তর দিয়ে দেখেছেন- এই কথা দু'টি পরস্পর বিরোধী নয়। কেননা রসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন- আমি আমার সুমহান ও বরকতময় প্রভুকে দেখেছি। এটি মিরাজের রাতের ঘটনা নয়; এটি মদীনায় হিজরতের পর স্বপ্নযোগে সংঘটিত হয়েছে।

এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন- নাবী ﷺ সত্যিই তাঁর প্রভুকে দেখেছেন। কেননা নাবীদের স্বপ্নও সত্য হয় এবং অবশ্যই তা বাস্তবে পরিণত হয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) এটি বলেন নি যে, তিনি জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষু দিয়ে দেখেছেন। যারা তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, তারা ভুল করেছেন। কিন্তু তিনি একবার বলেছেন- মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রভুকে দেখেছেন। আরেকবার বলেছেন- অন্তর দিয়ে দেখেছেন। সুতরাং তাঁর থেকে দু'টি বর্ণনা এসেছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল থেকে তৃতীয় আরেকটি বর্ণনা এসেছে যে, তিনি তাঁর প্রভুকে কপালের চোখ দিয়ে দেখেছেন। এটি তাঁর কতিপয় ছাত্রের অতিরঞ্জিত বর্ণনা। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে তৃতীয় বর্ণনাটি পাওয়া যায়না।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- তিনি তাঁর প্রভুকে অন্তর দিয়ে দুইবার দেখেছেন। তিনি আল্লাহর এই বাণী দিয়ে দলীল গ্রহণ করেছেনঃ

﴿كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى - وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾

"রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল"। (সূরা নাজম-৫৩:১১-১৩) প্রকাশ্য কথা এই যে, তিনি এই আয়াতগুলো দিয়েই দলীল গ্রহণ করেছেন। নাবী ﷺ থেকে এ বিষয়ে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন জিবরীল। নাবী ﷺ তাঁকে আসল আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন। ইবনে আব্বাসের এ কথাই অর্থাৎ তিনি তার প্রভুকে অন্তর দিয়ে দুইবার দেখেছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের দলীল। তিনি বলেন- মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রভুকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখেছেন; কপালের চোখ (চর্মচোখ) দিয়ে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى "অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল"। এখানে যেই নিকটবর্তী হওয়ার কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্ক সূরা ইসরাতে বর্ণিত মিরাজের ঘটনার সাথে নয়। সুতরাং কুরআনে বর্ণিত নিকটবর্তী হওয়া দ্বারা জিবরীলের নিকটবর্তী হওয়া উদ্দেশ্য। আয়িশা (রাঃ) ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বিবরণ থেকেও তাই বুঝা যায়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এর আগে বলেন-

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى - ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى - وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾

"তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফিরিস্তা। সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। তখন সে ছিল উর্ধ্ব দিগন্তে"। (সূরা নাজম-৫৩: ৫-৭)

আর হাদীছে যেই নিকটবর্তী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে সুস্পষ্ট যে, তিনি তাঁর মহান প্রভুর নিকটবর্তী হয়েছিলেন। সুতরাং সূরা নাজমের ঘটনার সাথে হাদীছে বর্ণিত মিরাজের ঘটনার কোন দ্বন্দ নেই। সূরা নাজমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ জিবরীলকে দুইবার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। একবার আকাশে সিদরাতুল মুনতাহায়। আরেকবার যমীনে।

মিরাজের রাতে আল্লাহর যে সকল বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন সকাল বেলা তিনি তা লোকদেরকে বলতে লাগলেন। তারা এই ঘটনাকে কঠোরভাবে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁকে কষ্ট দিল। কুরাইশরা তাকে বাইতুল মাকদিসের বর্ণনা দিতে বলল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সামনে বাইতুল মাকদিস উন্মুক্ত করলেন। তিনি তাতে দৃষ্টি দিয়ে সব বলে দিলেন। তারা তাঁর একটি কথাও অস্বীকার করতে পারলনা। তিনি কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তন সম্পর্কেও খবর দিলেন, যেই কাফেলাকে তিনি মিরাজের রাতে যাত্রা পথে দেখে এসেছিলেন। তিনি কুরাইশদেরকে এ কথাও বলে দিলেন যে, উমুক দিন তারা ফেরত আসবে। এমন কি তিনি কাফেলার উটের বহরের সামনে যে উটটি ছিল সে সম্পর্কেও খবর দিলেন। দেখা গেল তিনি যেভাবে খবর দিয়েছিলেন সেভাবেই সত্যে পরিণত হল। কিন্তু তাতেও তারা মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে নি। বরং তাদের সীমালংঘন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইবনে ইসহাক আয়িশা এবং মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করে বলেন- মিরাজ হয়েছিল রূহানীভাবে। তবে রূহ তাঁর শরীর থেকে আলাদা হয়নি। হাসান বসরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। মিরাজ 'স্বপ্নে হয়েছিল' এবং 'রূহের মাধ্যমে হয়েছিল'; সশরীরে নয়-এই কথা দু'টির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা অবগত হওয়া জরুরী। উভয় কথার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আয়িশা এবং মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ কথা বলেন নি যে, স্বপ্নের মাধ্যমে মিরাজ হয়েছে। বরং তারা বলেছেন- 'রূহের মাধ্যমে মিরাজ হয়েছে, কিন্তু রূহ শরীরকে হারায়নি। সুতরাং উভয়টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখে, তা কখনও জানা ও পরিচিত বিষয়ই দেখে। ঘুমন্ত ব্যক্তি কখনও দেখে যে, সে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে অথবা দেখে যে, তাকে মক্কার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অথচ তার রূহ আকাশের দিকেও উঠেনি এবং মক্কার দিকেও যায়নি। বরং স্বপ্নের ফিরিস্তা তার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করে মাত্র।

যারা বলে রূহের মাধ্যমের মিরাজ হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, তা ছিল স্বপ্নে। বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতপক্ষেই 'রূহের মাধ্যমে মিরাজ হয়েছে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যে রকম অবস্থার সম্মুখীন হবে নাবী ﷺ এর রূহ মুবারকও মিরাজের রাত্রিতে সে রকম অবস্থারই সম্মুখীন হয়েছিল। আর এটি অবশ্যই ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখে তার অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু নাবী ﷺ এর অবস্থা ছিল সাধারণ ও চিরাচরিত নিয়ম ও অভ্যাসের বাইরে। এ জন্য জীবিত অবস্থায়ই তাঁর পেট ফাড়া হয়েছে। অথচ তিনি ব্যথা অনুভব করেন নি। মৃত্যু ছাড়াই তাঁর রূহকে

আসলেই উপরে উঠানো হয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কারও রূহ মৃত্যু ব্যতীত এ রকম অবস্থায় পৌঁছতে পারবেনা। কেননা নাবীদের মৃত্যুর পর তাদের রূহগুলো দেহ থেকে আলাদা হয়ে আসমানে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যায় এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। মিরাজের রাতে নাবী ﷺ এর রূহ মুবারক উপরে উঠেছিল। অতঃপর ফেরত এসেছে। মৃত্যুর পর নাবীদের 'রূহের সাথে এবং তাঁর মহান বন্ধুর সাথে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে। তারপরও তাঁর রূহ মুবারকের রয়েছে তার পবিত্র দেহের সাথে বিশেষ এক প্রকার সম্পর্ক। কেউ তাঁর উপর সালাম দিলে এর মাধ্যমেই তিনি তার উত্তর দেন। এই সম্পর্কের কারণেই তিনি মুসা (আলায়হিস সালাম)কে কবরে সলাতরত দেখেছেন এবং আকাশেও তাঁকে দেখেছেন।

এটি জানা কথা যে, মিরাজের রাতে মুসা (আলায়হিস সালাম) কে কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে পরে তাতে ফেরত দেয়া হয়নি; বরং আসমান হচ্ছে তাঁর 'রূহের স্থায়ী বসবাসের জায়গা। আর কবর হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর দেহের অবস্থানের জায়গা। সুতরাং তিনি তাঁকে কবরে সলাতরত দেখেছেন। আকাশেও দেখেছেন। এমনি প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ আসমানে সর্বোচ্চ আসনে আছেন। তাঁর দেহ রয়েছে তাঁর কবরে। কোন মুসলিম তাঁকে সালাম দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র দেহে তাঁর রূহ মুবারক ফেরত দেন। তিনি সেই সালামের জবাব দেন। কিন্তু রূহ আসমান থেকে চলে আসেনা। কেউ যদি এই কথা বুঝতে অক্ষম হয় তাহলে সে যেন সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখে। সূর্য অনেক উপরে থেকেও কিভাবে সে যমীনকে আলোকিত করছে এবং সকল জীব-জন্তু ও উদ্ভিদকে আলো দিয়ে তাদেরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে। নাবী ﷺ এর 'রূহের অবস্থা ও মর্যাদা এর চেয়েও অনেক বেশী। সুতরাং 'রূহের এক অবস্থা। শরীরের আরেক অবস্থা।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- হিজরতের এক বছর একমাস পূর্বে মিরাজ ও ইসরা সংঘটিত হয়েছিল।[২২৪] আর মিরাজ হয়েছিল মাত্র একবার। কেউ কেউ বলেছেন- দুইবার। একবার সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়। আরেকবার স্বপ্নে। যারা দুইবারের কথা বলেছেন- সম্ভবতঃ তারা শারীকের হাদীস এবং নাবী ﷺ এর বাণী- অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম। তখন আমি মাসজিদে ছিলাম এবং অন্যান্য সকল বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করতে চেয়েছেন।

আবার কেউ বলেছেন- মিরাজ হয়েছিল দুইবার। একবার নবুওয়াতের পূর্বে। যেমন শারীকের হাদীছে এসেছে, وذلك قبل أن يُوحَى إليه অর্থাৎ এটি ছিল তাঁর নিকট অহী নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আরেকবার হয়েছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে। যেমনটি প্রমাণ করে অন্যসব হাদীস।

আবার কেউ বলেছেন মিরাজ হয়েছে তিনবার। একবার অহী নাযিল শুরু হওয়ার পূর্বে। দুইবার নবুওয়াত পাওয়ার পরে। এ সব কথা শুধু অনুমান ভিত্তিক। এগুলো যাহেরী মাজহাবের দুর্বল বর্ণনাকারীদের কাজ। তারা যখন কোন ঘটনায় বর্ধিত কোন শব্দ পেয়েছে সেটিকেই আলাদা একটি বর্ণনা মনে করেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধপূর্ণ বর্ণনাগুলোর প্রত্যেকটিকে তারা আলাদা আলাদা ঘটনা বলে বর্ণনা করেছে।

---

২২৪. মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণকে ইসরা বলা হয়। এটি হয়েছিল বুরাকের উপর আরোহন অবস্থায়। আর বাইতুল মাকদিস থেকে সাত আসমান পর্যন্ত ভ্রমণকে বলা হয় মিরাজ। এটি হয়েছিল সিড়ির মাধ্যমে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

সঠিক কথা হচ্ছে মক্কাতে নবুওয়াতের পর মাত্র একবার মিরাজ হয়েছে। এটিই মুহাদ্দেছীন ও গ্রহণযোগ্য ইমামদের মত। সুতরাং যারা বলে একাধিকবার মিরাজ হয়েছে, তাদের জন্য আফসোস। তারা কিভাবে ধারণা করতে পারে যে, নাবী ﷺ এর উপর প্রত্যেকবার পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হয়েছে? অতঃপর তিনি তাঁর রব ও মুসার মাঝে যাওয়া-আসা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত হয়েছে। মিরাজের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীছের হাফিয ও বিশেষজ্ঞগণ শারীককে ভুলকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম মুসলিম সেই হাদীসকে সনদ সহকারে বর্ণনা করে বলেন- শারীক এই হাদীছের শব্দসমূহের একটিকে অন্যটির পূর্বে বা পরে এবং বাড়িয়ে ও কমিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সঠিক এবং অত্যন্ত উত্তম কথা বলেছেন।[২২৫]

---

২২৫. মি'রাজের রাত্রিতে নাবী ﷺ যে সমস্ত নিদর্শন দেখেছেন

মেরাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا (মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল) তাঁকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্যে। (সূরা বাণী ইসরাঈল-১৭:১) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রাত্রিতে অসংখ্য বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন। তম্মধ্যেঃ

১. মানব জাতির পিতা আদম (আলায়হিস সালাম) কে দেখেছেন। তার ডান পাশে ছিল শহীদদের (জান্নাতীদের) রূহ এবং বাম পাশে ছিল জাহান্নামীদের রূহ।

২. রসূল ﷺ বলেনঃ অতঃপর আমার সামনে বায়তুল মামূর উম্মুক্ত করা হলো। বায়তুল মামূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরীল বললেন- এটি হলো বায়তুল মামূর। এতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা সলাত আদায় করে। এক বার যে সেখান থেকে বের হয়ে আসে কিয়ামতের পূর্বে সে আর তাতে প্রবেশের সুযোগ পাবেনা।

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- অতঃপর আমার জন্যে সিদরাতুল মুনতাহা তথা সিমান্তের কূল বৃক্ষ উম্মুক্ত করা হল। এই বৃক্ষের ফলগুলো ছিল কলসীর ন্যায় বড়। গাছের পাতাগুলো ছিল হাতীর কানের মত বৃহদাকার।

৪. তিনি গাছের গোড়াতে চারটি নদী দেখতে পেলেন। দু'টি চলে গেছে ভিতরের দিকে এবং দুটি চলে গেছে বাহিরের দিকে। জিবরীলকে আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- ভিতরের দিকে প্রবাহিত নদী দুটি জান্নাতে চলে গেছে এবং বাহিরের নদী দুটি হলো ফোরাত ও নীল। ফোরাত ও নীল দেখার অর্থ হল নাবী ﷺ এর মিশন অচিরেই ঐ নদী দুটির অঞ্চলে পৌঁছে যাবে এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা যুগে যুগে ইসলামের পতাকা বহন করবে। অর্থ এই নয় যে এদু'টি নদী জান্নাত থেকে বের হয়ে এসেছে।

৫. মিরাজের রাত্রিতে তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরীল ফেরেশতাকে আসল আকৃতিতে দেখলেন। অথচ ইতিপূর্বে তিনি আরেকবার দুনিয়াতে তাঁকে দেখেছিলেন।

৬. তিনি বে-সলাতীর শাস্তি দেখেছেন। সহীহ বুখারীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দীর্ঘ হাদীছে এসেছে,

«وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى»

"আমরা এক শায়িত ব্যক্তির কাছে আসলাম। তার মাথার কাছে পাথর হাতে নিয়ে অন্য একজন লোক দাড়িয়ে ছিল। দাঁড়ানো ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির মাথায় সেই পাথর নিক্ষেপ করছে। পাথরের আঘাতে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি বলের মত গড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনতে আনতে আবার তার মাথা ভাল হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ানো ব্যক্তি প্রথমবারের মত আবার আঘাত করছে এবং তার মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সফরসঙ্গী ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি অপরাধের কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বললেনঃ এব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করেছিল। কিন্তু কুরআন অনুযায়ী আমল করেনি এবং সে ফরজ সলাতের সময় ঘুমিয়ে থাকত। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী তাও হা/৭০৪৭)

৭. তিনি সুদখোরের শাস্তি দেখেছেন। সহীহ বুখারীতে সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে রসূল ﷺ এর দীর্ঘ হাদীছে এসেছে,

«فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُل قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا»

“আমরা একটি রক্তের নদীর কাছে আসলাম। দেখলাম নদীতে একটি লোক সাঁতার কাটছে। নদীর তীরে অন্য একটি লোক কতগুলো পাথর একত্রিত করে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাঁতার কাটতে কাটতে লোকটি যখন নদীর কিনারায় পাথরের কাছে দাড়ানো ব্যক্তির নিকটে আসে তখন দাড়ানো ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। পাথর মুখে নিয়ে লোকটি আবার সাঁতরাতে শুরু করে। যখনই লোকটি নদীর তীরে আসতে চায় তখনই তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কারণ জানতে চাইলে ফেরেশতাদ্বয় বললেনঃ এরা হলো আপনার উম্মতের সুদখোর”। (সহীহ বুখারী মাশা হা/৬৬৪০)

৮. তিনি ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারীকেও দেখেছেন। তাদের ঠোঁটের আকার আকৃতি ছিল উটের ঠোঁটের মত। তারা পাথরের টুকরোর মত আগুনের ফুলকী মুখের মধ্যে পুরতেছিল এবং সেগুলো পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হচ্ছিল।

৯. তিনি ব্যভিচারী নারী পুরুষের শাস্তি দেখেছেন। সহীহ বুখারীতে সামুরা বিন জুনদুব ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দীর্ঘ হাদীছে কবরে ব্যভিচারীর ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেনঃ

«فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللهَبُ ضَوْضَوْا»

“আমরা একটি তন্দুর চুলার নিকট আসলাম। যার উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশ ছিল প্রশস্ত। তার ভিতরে আমরা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখতে পেলাম তাতে রয়েছে কতগুলো উলঙ্গ নারী-পুরুষ। তাদের নিচের দিক থেকে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত করা হচ্ছে। অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার সাথে সাথে তারা উচ্চঃস্বরে চিৎকার করছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জানতে চাইলে ফেরেশতাদ্বয় বললেনঃ এরা হলো আপনার উম্মতের ব্যভিচারী নারী-পুরুষ”। (বুখারী)

ব্যভিচারীর শাস্তির অন্য একটি চিত্র

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাত্রিতে একদল লোকের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তাদের সামনে একটি পাত্রে গোশত রান্না করে রাখা হয়েছে। অদূরেই অন্য একটি পাত্রে রয়েছে পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচা গোশত। লোকদেরকে রান্না করে রাখা গোশত থেকে বিরত রেখে পঁচা এবং দুর্গন্ধযুক্ত, কাঁচা গোশত খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা চিৎকার করছে এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা থেকে ভক্ষণ করছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এরা কোন শ্রেণীর লোক? জিবরীল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত পুরুষ লোক যারা নিজেদের ঘরে পবিত্র এবং হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অপবিত্র এবং খারাপ মহিলাদের সাথে রাত্রি যাপন করত। (আল-খুতাবুল মিম্বারিয়াহ, ডঃ সালেহ ফাওযান) এই হাদীসের মূল বিষয় বস্তু অন্য এক বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। তবে উল্লেখিত হাদীসটি দুর্বল।

৯) তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন

১০) তিনি সেই রাত্রে জাহান্নামের প্রহরী মালেক ফেরেশতাকে দেখেছেন। তাঁর দিকে ফিরে তাকাতেই তিনি আমাকে প্রথমেই সালাম দিলেন। (বুখারী, কিতাবু আহাদীছুল আম্বীয়া, হা/৩১৮২, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, হা/২৫১)

১১) বায়তুল মাকদিসে নাবীদের ইমাম হয়ে সলাত পড়েছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে সে রাত্রিতে দেখে আসা নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যখন কুরাইশদেরকে সংবাদ দিলেন, তখন তারা এই ঘটনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উপর তারা অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। তারা তাঁর নিকট বায়তুল মাকদিসের বর্ণনা পেশ করার দাবী জানালো। আল্লাহ বায়তুল মাকদিসের দৃশ্য তার চোখের সামনে উম্মুক্ত করলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখে দেখে সেখানকার সকল নিদর্শন বলে দিলেন। তারা একটি কথাও অস্বীকার করতে পারলনা।

আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি একদা কাবার প্রাঙ্গনে ছিলাম। কুরাইশরা আমাকে বায়তুল মাকদিসের এমন জিনিষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল যা আমার স্মরণ ছিলনা। এতে আমি সংকটে পড়ে গেলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ আমার জন্যে বায়তুল মাকদিসকে চোঁখের সামনে উঠিয়ে ধরলেন। দেখে দেখে আমি তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলাম।

মি'রাজের শিক্ষাঃ

১) ঈমানী পরীক্ষাঃ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল মাকদিস ভ্রমণ করে এসে সকালে মানুষের কাছে তা বলতে শুরু করলেন। এ ঘটনা শুনে কতিপয় দুর্বল ঈমানদার মুরতাদ হয়ে গেল। মুশরিকদের কিছু লোক দৌড়িয়ে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট গিয়ে বললঃ তোমার বন্ধুর খবর শুনবে কি? সে বলছে, আজ রাতের ভিতরেই সে নাকি বায়তুল মাকদিস ভ্রমণ করে চলে এসেছে। তিনি বললেনঃ আসলেই কি মুহাম্মাদ তা বলছে? তারা এক বাক্যে বললঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ যদি বলেই থাকে, তাহলে সত্য বলেছেন। তারা আবার বললঃ তুমি কি বিশ্বাস কর যে, সে এক রাতের ভিতরে বায়তুল মাকদিস ভ্রমণ করে সকাল হওয়ার পূর্বেই আবার মক্কায় চলে এসেছে? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি এর চেয়েও দূরের সংবাদকে বিশ্বাস করি। তাঁর কাছে সকাল-বিকাল আকাশ থেকে সংবাদ আসে। আমি তা বিশ্বাস করি। সে দিনই আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পরম সত্যবাদী তথা সিদ্দীক উপাধীতে ভূষিত করা হয়। (হাকেম, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৮১, হা/ ৩১৮২, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২) দাঈদের জন্য শিক্ষাঃ

মিরাজের ঘটনায় দ্বীনের দাঈদের জন্য এক বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। তিনি প্রচারক মিরাজ থেকে ফেরত এসে মানুষের কাছে ঘটনা খুলে বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) তাঁকে বললেনঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে, লোকেরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তাদের কাছে ঘটনা খুলে বলবো। আমাকে তারা মিথ্যাবাদী বললেও। সুতরাং দ্বীনের দাঈগণের উচিত, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করবে না এবং মানুষ সেটাকে গ্রহণ করবে কি করবে না- এ ধরণের কোন চিন্তা-ভাবনা করবে না; বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে মানুষের সামনে সত্যকে তুলে ধরবে।

৩) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয হয়ঃ

মেরাজের রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরজ করা হয়েছে। মিরাজ থেকে ফেরত আসার সময় ৬ষ্ঠ আসমানে মূসা (আলাইহিস সালাম) এর সাথে সাক্ষাৎ হল। মূসা (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি আপনার প্রভুর পক্ষ হতে কি নিয়ে আসলেন? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরজ করা হয়েছে। মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেনঃ আমি মানুষের অবস্থা তোমার চেয়ে অনেক বেশী অবগত। বানী ইসরাঈলকে আমি ভালভাবেই পরীক্ষা করে দেখেছি। তোমার উম্মাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত পড়তে পারবে না। তুমি ফেরত যাও এবং কমাতে বল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি মূসা (আলাইহিস সালাম) এর পরামর্শ মোতাবেক ফেরত গিয়ে কমাতে বললাম। চলিশ্চশ করা হলো। আবার মূসা আলাইহিস সালামের পরামর্শ মোতাবেক ২য় বার আবদারের প্রেক্ষিতে ত্রিশ করা হলো। পুনরায় যাওয়ার প্রেক্ষিতে বিশ ওয়াক্ত করে দেয়া হলো। অতঃপর দশে পরিণত হলো। মূসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে দশ ওয়াক্ত নিয়ে ফেরত আসলে তিনি আবার যেতে বললেন। এবার পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত নিয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে আগমণ করলাম। তিনি আমাকে আবার যেতে বললেন। আমি তাঁকে বললামঃ আমি গ্রহণ করে নিয়েছি। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষণা করা হলোঃ আমার ফরজ ঠিক রাখলাম। কিন্তু বান্দাদের উপর থেকে সংখ্যা কমিয়ে দিলাম। আর আমি প্রতিটি সৎআমলের বিনিময় দশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিব। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত সঠিকভাবে আদায় করলে তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্তের ছওয়াব দেয়া হবে। *(বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু বাদইল খাল্ক, হা/ ৪৪৫৮, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, হা/ ২৩৮)*

৪) আল্লাহ্ তা'আলা যে আরশে আযীমে সমুন্নত মিরাজের ঘটনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা আরশে এবং আসমানে না হলে উপরের দিকে মিরাজ হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

৫) সকল ইবাদতের মধ্যে সলাত হচ্ছে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ইবাদত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য ইবাদত যমীনে ফরয করেছেন। আর সলাত ফরজ করেছেন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে কাছে ডেকে নিয়ে সাত আসমানের উপরে। এতে সলাতের গুরুত্বের কথাটি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

৬) সলাত পরিত্যাগ করা কঠিন অপরাধ। তাই বেসলাতীর শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর।

৭) ব্যভিচার একটি ঘৃণিত কাজ। এর শাস্তিও অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

৮) সুদখোরের ভয়াবহ পরিণতি।

মিরাজ সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত বিশ্বাস ও তার প্রতিবাদঃ

ক) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ ২৭ বছর পর্যন্ত মিরাজে থাকার গল্প কাল্পনিক।

খ) বড় পীরের ঘাড়ে চরে সিদরাতুল মুন্তাহা পার হয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছার কিচ্ছা বানোয়াট।

নাবী ﷺ এর মদীনায় হিজরতের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

নাবী ﷺ এর মদীনায় হিজরত এমন একটি ঘটনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেছেন। এর মাধ্যমেই তাঁর দ্বীনকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর রসূলকে সাহায্য করেছেন।

ইমাম যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- মুহাম্মাদ বিন সালেহ আসেম বিন উমার ও ইয়াযিদ বিন রুমান এবং অন্যান্য রাবীর মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রসূল ﷺ মক্কাতে নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর গোপনে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। চতুর্থ বছর প্রকাশ্যে দাওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর থেকে দশ বছর পর্যন্ত মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন। প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে হাজীদের তাঁবুতে গমণ করতেন। এমনি উকায, মাজিন্নাহ এবং যুল মাজাযের বাজারে ও বিভিন্ন মেলার মৌসুমেও লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং তাঁকে হেফাজত করার আবেদন করতেন। যাতে তিনি আল্লাহর পয়গাম নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে পারেন। এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। কিন্তু তিনি কোন সাহায্যকারী ও সাড়াদানকারী পেলেন না। পরিশেষে তিনি প্রত্যেক কবীলার (গোত্রের) কাছে এবং তাদের বাসস্থানে যেতে লাগলেন। তিনি বলতেন- হে লোক সকল! তোমরা লা-ইলাহা

গ) ২৭ রজবে বিশেষ ইবাদত পালন করা বা রজব দিবস পালন করা বিদআত। কারণ রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ শবে মিরাজ উপলক্ষে কোন ইবাদত করেন নি বা করতে বলেন নি। সুতরাং দ্বীনের ক্ষেত্রে সকল নব আবিস্কৃত বিষয়ই বিদআত, যা থেকে দূরে থাকা সকল মুসলিমের উপর আবশ্যক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»
"যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরী করবে যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরও বলেনঃ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»
"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে বিষয়ে আমাদের অনুমোদন নেই, তা আমলকারীর উপর প্রত্যাখ্যাত হবে। (সহীহ মুসলিম)
ঘ) আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখার কথাটি সঠিক নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আলেমদের মতবিরোধ বর্ণনা করেছেন। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, তিনি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেন নি। কারণ কোন সাহাবী স্বচক্ষে দেখার পক্ষে কোন বর্ণনা উল্লেখ করেন নি। ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে যে বর্ণনা এসেছে, আল্লাহকে দেখার অর্থ হলো অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখা। কপালের চক্ষু (চর্মচক্ষু) দিয়ে দেখা উদ্দেশ্য নয়। (যাদুল মাআদ, (৩/৩০) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার ব্যাপারে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস:
«عن عَائِشَةَ فَقَالَتْ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ قَالَ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ وَاللهُ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ وَاللهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ»
আয়েশা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেনঃ যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবকে স্বচক্ষে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর বিরাট মিথ্যারোপ করল। যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ গোপন করেছেন, সে আল্লাহর উপর বিরাট মিথ্যা রটনা করল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে রসূল! পৌঁছে দাও তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি তুমি এরূপ না করো, তবে তুমি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেনা। (সূরা মায়িদাঃ ৬৭) আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (গায়েবের) আগাম খবর দিতে পারতেন সেও আল্লাহর উপর চরম মিথ্যা রটনা করল।" (তিরমিযী-সহীহ) তিনি আল্লাহর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং অন্তর দিয়ে তা অনুভব করেছেন। কিন্তু স্বচক্ষে দেখার কোন দলীল পাওয়া যায় না।
ঙ) মিরাজের রাতে খাজা বাবা রূহানী বেশে আগমণ করে বুরাকে হাত দিয়ে বুরাককে শান্ত করার কাহিনী বানোয়াট। সুতরাং মিরাজ সম্পর্কে এ সকল কাল্পনিক ও মিথ্যা ঘটনা পরিহার করে তা থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের সকলের জন্য জরুরী।

ইল্লাল্লাহ্ বল। তাহলেই তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে তোমরা আরবদের শাসক হতে পারবে। অনারবরা তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। আর মৃত্যুর পর তোমরা জান্নাতে রাজকীয় জীবন যাপন করতে পারবে। আবু লাহাব তাঁর পিছনে পিছনে চলত এবং লোকদেরকে বলতঃ তোমরা এর অনুসরণ করোনা। সে বেদ্বীন ও মিথ্যুক। ফলে লোকেরা মুহাম্মাদ ﷺ এর কথা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করত এবং তাঁকে কষ্ট দিত। লোকেরা বলতঃ তোমার গোত্রের লোকেরাই তোমার সম্পর্কে অধিক অবগত। তারা তো তোমার অনুসরণ করেনি। তারপরও তিনি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতেন এবং বলতেন- হে আল্লাহ্! তুমি চাইলে এরূপ হতনা। বর্ণনাকারী বলেন- তিনি যে সমস্ত গোত্রের কাছে নিজেকে পেশ করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে বনী আমের বিন সা'সাআ, বনী মুহারিব বিন খাসফাহ, বনী ফাযারাহ, বনী গাস্‌সান, বনী মুর্‌রা, বনী হানীফাহ, বনী সুলাইম, বনী আব্‌স, বনী নযর, বনী আল-বুকা, বনী কেনদাহ, বনী কালব, বনী হারিছ, বনী উযরাহ এবং বনী হাযারেমাহ অন্যতম। কিন্তু এ সমস্ত গোত্রের কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দেয় নি।

তবে খুশীর সংবাদ হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীর জন্য যা আগে থেকেই তৈরী করে রেখেছিলেন, তা হচ্ছে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে দীর্ঘ দিন যাবৎ শুনে আসছিল যে, অচিরেই একজন নাবী আসবেন। ইহুদীরা বলতঃ আমরা সেই নাবীর অনুসরণ করব এবং তার সাথে যোগ দিয়ে আমরা আদ ও ইরাম জাতির ন্যায় তোমাদেরকে (আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে) অকাতরে হত্যা করব। মদীনার আনসারগণ[২২৬] আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় কা'বা ঘরের হাজ্জ করত। তবে ইহুদীরা তা করতনা। হজ্জের মৌসুমে আনসারগণ যখন দেখলেন আল্লাহর রসূল ﷺ মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করছেন তখন তারা তাঁর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করল এবং পরস্পর প্রশ্ন করল- আল্লাহর কসম! হে লোক সকল! তোমরা কি জান এই ব্যক্তিই কি তিনি যার মাধ্যমে ইহুদীরা তোমাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকে? এ রকম যেন না হয় যে, তারা তোমাদের পূর্বেই তাঁর অনুসারী হয়ে যায়।

আওস গোত্রের সুয়ায়েদ ইবনুস সামেত নামক একজন লোক মক্কায় আগমণ করেছিল। রসূল ﷺ তাঁকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসলাম কবুল করেনি এবং সরসূরি তা প্রত্যাখ্যানও করে নি। ইতিমধ্যেই আনাস বিন রাফে আবুল হাইস বিন আব্দুল আশহাল গোত্রের একদল যুবকসহ কোন একটি বিষয়ে চুক্তি করার জন্য আগমণ করল। নাবী ﷺ তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। তখন তাদের মধ্যকার ইয়াস বিন মুআয নামক এক যুবক ব্যক্তি বলতে লাগল- হে আমার গোত্রীয় লোক সকল! আল্লাহর শপথ! আমরা যেই উদ্দেশ্যে আগমণ করেছি তার চেয়ে এটিই (ইসলাম কবুলই) আমাদের জন্য অনেক উত্তম। এ কথা শুনে আনাস তাকে প্রহার করল এবং ধমকাল। এতে সে চুপ হয়ে গেল। অতঃপর তারা সন্ধি চুক্তি পরিপূর্ণ না করেই মদীনায় ফেরত গেল।

---

২২৬. তখন তারা মুসলিম ছিলনা, কিন্তু মদীনাবাসীরাই যেহেতু পরবর্তীতে মুসলমান হওয়ার মাধ্যমে আনসার হয়েছিল, তাই তাদেরকে সাধারণভাবে আনসার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আকাবার প্রথম বায়আত

অতঃপর নাবী হজ্জের মৌসুমে মিনার 'আকাবায়' (গিরি পথে) মদীনার আনসার গোত্রের ছয় জন লোকের সাথে মিলিত হলেন। তাদের সকলেই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। তারা হচ্ছেন আসআদ বিন যুরারা, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্, আওফ বিন হারিছ, রাফে বিন মালিক, কুতবা বিন আমের এবং উকবা বিন আমের। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মদীনায় ফেরত গিয়ে তারাও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করল। মদীনায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রতিটি ঘরেই ইসলাম প্রবেশ করল। পরের বছর মদীনা থেকে ১২ জন লোক আসল। জাবের ব্যতীত আগের বছরের সকলেই এই দলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাদের সাথে আওফের ভাই মুআয বিন হারিছ, যাকওয়ান বিন আবদে কাইসও ছিল। যাকওয়ান মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কাতেই ছিল। এই জন্যই তাকে একই সাথে আনসারী মুহাজেরী বলা হয়। তাদের মধ্যে আরও ছিল উবাদা বিন সামিত, ইয়াযিদ বিন ছা'লাবাহ্, আবুল হাইছাম ইবনুত তাইহান এবং উয়াইমির বিন সায়েদাহ।

জাবের হতে বর্ণনা করে আবুয যুবাইর বলেন- মক্কায় অবস্থানকালে নাবী নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর গোপনে দাওয়াত দেয়ার পর একটানা দশ বছর পর্যন্ত হজ্জের মৌসুমে হাজীদের তাঁবুতে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে তিনি মাজিন্নাহ ও উকায মেলায় গিয়ে বলতেন- এমন কেউ আছে কি যে আমাকে আশ্রয় দিবে? এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে আল্লাহর রিসালাত পৌঁছিয়ে দিতে সাহায্য করবে? বিনিময় স্বরূপ সে জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু তিনি কোন সাহায্যকারী বা আশ্রয় দানকারী পান নি। পরিস্থিতি এই পর্যন্ত গিয়ে গড়াল যে, লোকেরা মিশর ও ইয়ামান থেকে মক্কায় তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে আসত। কুরাইশরা এই নবাগত লোকদের কাছে গিয়ে বলতঃ আমাদের এই যুবক লোকটি (মুহাম্মাদ) থেকে সাবধান! সে যেন তোমাদেরকে ফিতনায় না ফেলে। তারপরও তিনি তাদের কাছে যেতেন এবং আল্লাহর দিকে আহবান জানাতেন। কুরাইশরা রসূল এর দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে লোকদেরকে দেখিয়ে দিত এবং তাঁর দাওয়াত থেকে বিরত রাখত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াছরিব (মদীনা) হতে আমাদেরকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। আমাদের কেউ তাঁর কাছে গিয়ে ঈমান আনয়ন করত। তিনি কুরআন পড়ে শুনাতেন। সে তার পরিবারের লোকদের নিকট (মদীনায়) ফেরত আসত। তার পরিবারের লোকেরাও তার মতই মুসলমান হয়ে যেত। এক পর্যায়ে অবস্থা এ রকম হল যে, আনসারদের সব ঘরেই ইসলাম প্রবেশ করল। তারা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিল।

জাবের বলেন- অতঃপর আমরা একত্রিত হয়ে বললামঃ আর কত দিন এভাবে আল্লাহর রসূলকে মক্কায় ফেলে রাখব? তিনি মক্কার পাহাড়ি ভূমিতে নির্যাতিত হবেন এবং ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবেন! সুতরাং আমরা হজ্জের মৌসুমে মক্কায় গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তিনি আমাদের সাথে আকাবায় মিলিত হওয়ার ওয়াদা করলেন।

আকাবার দ্বিতীয় বায়আত

আমরা নির্দিষ্ট সময়ে মিনার আকাবায় তাঁর সাথে মিলিত হলাম। সেখানে রসূল ﷺ এর চাচা আব্বাসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন- হে ভাতিজা! তোমার কাছে আগত এই লোকগুলো কারা? ইয়াছরিব তথা মদীনাবাসীদের সাথে আমার পরিচয় রয়েছে। একজন দুইজন করে আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। এই সময় আব্বাস আমাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন- এদেরকে তো আমি চিনি না। এরা সকলেই যুবক। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা কিসের উপর আপনার হাতে বাইআত করব? তিনি বললেন- খুশীতে অখুশীতে আমার কথা শুনবে ও মানবে, স্বচ্ছলতায় অস্বচ্ছলতায় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে, আল্লাহর হক আদায় করবে, এ ব্যাপারে কোন সমালোচকের সমালোচনায় ও নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবেনা, আমি তোমাদের কাছে চলে গেলে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং তোমরা যেভাবে নিজেদেরকে, স্ত্রী-সন্তানদেরকে হেফাজত কর, সেভাবেই তোমরা আমাকে হেফাজত করবে। এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আমরা বায়আত করার জন্য দাঁড়ালাম। তখন আসআদ বিন যুরারা তাঁর হাত ধরে বললেন- হে মদীনাবাসী! একটু থাম। আমরা এ কথা জেনেই উটের উপর আরোহন করে তাঁর কাছেই এসেছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল। তিনি আমাদের কাছে চলে আসার অর্থই হচ্ছে সমগ্র আরবের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ, তোমাদের সম্মানী ব্যক্তিগণ অকাতরে নিহত হবে এবং তলোয়ার তোমাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করবে। সুতরাং তোমরা যদি তারপরও সবুর করতে পার, তাহলে তাঁকে তোমাদের কাছে নিয়ে চল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিনিময় দিবেন। আর তোমরা যদি তোমাদের জানের ভয় কর তাহলে তাঁকে এখনই বর্জন কর। এতে তোমরা আল্লাহর কাছে দুর্বলতার ওযূহাত পেশ করতে পারবে। তারা বললেন- হে আসআদ! তোমার হাত সরাও। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনই এই অঙ্গিকার ভঙ্গ করবনা এবং বায়আত ফেরতও দিবনা। সুতরাং আমরা একজন একজন করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আল্লাহর রসূল আমাদের থেকে উপরোক্ত বিষয়ে বায়আত নিলেন এবং তার বিনিময়ে আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে থাকলেন।

অতঃপর লোকেরা মদীনায় ফেরত গেল। আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এবং মুসআব বিন উমাইরকে পাঠালেন। তারা মদীনার লোকদেরকে কুরআন পড়াতে লাগলেন এবং আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহবান করতে থাকলেন। তারা উভয়ে আসআদ বিন যুরারার নিকট অবতরণ করলেন। মুসআব সলাতে মুসলিমদের ইমামতি করতেন। তাদের সংখ্যা চল্লিশে পরিণত হলে তিনি তাদেরকে নিয়ে জুমআর সলাতও শুরু করলেন। মুসআব বিন উমায়ের ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমের দাওয়াতে উসাইরাম ব্যতীত বনী আব্দুল আশহাল গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে গেল। তিনি বিলম্ব করে উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন। কালেমা পাঠ করেই তিনি যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন। রসূল ﷺ তাঁর ব্যাপারেই বলেছেন- সে অল্প আমল করেছে এবং বিরাট পুরস্কার অর্জন করেছে।

মদীনায় দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল এবং ইসলামের বিজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হতে লাগল। অতঃপর মুসআব মক্কায় ফেরত গেলেন।

এই বৎসর হজ্জের মৌসুমে মুসলিম অমুসলিম মিলে মদীনার আনসারদের থেকে প্রচুর সংখ্যক লোক মক্কায় আগমণ করল। তাদের দলনেতা ছিলেন বারা বিন মারুর।

তারা রাতের অন্ধকারে পূর্ব নির্ধারিত সময় মোতাবেক রসূল ﷺ এর সাথে গোপনে মিলিত হলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। এবার আকাবার (দ্বিতীয়) বাইআত সংঘটিত হল। বারা বিন মা'রুর সর্বপ্রথম বাইআত করলেন। সুতরাং সর্বপ্রথম বাইআত করার ফযীলতটি তিনিই অর্জন করলেন। সেই রাত্রে নাবী ﷺ তাদের থেকে ১২ জন নকীব (অধিনায়ক) নিযুক্ত করলেন। বায়আত শেষে তারা তলোয়ার হাতে নিয়ে মিনায় বসবাসকারী মুশরিকদের উপর হামলা করার জন্য রসূল ﷺ এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। কিন্তু তিনি তাদেরকে সেই অনুমতি দেননি।

শয়তান তথ্য ফাঁস করে দিল

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর শয়তান উঁচু একটি টিলার উপর উঠে চিৎকার করে বলল- হে মীনাবাসী! মুহাম্মাদ এবং বে-দ্বীন লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে একত্রিত হয়েছে। তোমরা কি তা অবগত আছ? আওয়াজ শুনে নাবী ﷺ বললেন- এটা হচ্ছে এই ঘাঁটির শয়তান। ওরে আল্লাহর দুশমন অচিরেই আমি তোর জন্যে সময় পাবো। অতঃপর তিনি লোকদেরকে নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যেতে বললেন।

পরদিন সকাল হতে না হতেই কুরাইশদের একদল বিশিষ্ট লোক মদীনাবাসীদের তাঁবুর কাছে গিয়ে বলল- আমাদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, গতরাতে তোমরা আমাদের এই লোকটির সাথে সাক্ষাত করেছ এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছ। আল্লাহর শপথ! আরবের যে কোন গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য অধিক অপছন্দনীয়। অর্থাৎ আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে মোটেই প্রস্তুত নই। যেহেতু খাযরাজ গোত্রের মুশরিক লোকেরা এই বায়আতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত ছিলনা তাই তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে লাগল- এ রকম কিছুই হয়নি। আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানিনা। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফেকও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলতে লাগল- এটি বানোয়াট খবর। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে না জানিয়ে এমন কিছু করতে পারেনা। আর আমি যদি মদীনাতেও থাকতাম তারপর তারা আমার সাথে পরামর্শ না করে এ রকম কোন সিদ্বান্ত নিতনা। (মুসলমানগণ একজন অন্যজনের দিকে আড়চোখে তাকালেন এবং তারা ছিলেন চুপচাপ। কাফেরদের কথা তারা সমর্থনও করলেন না এবং প্রত্যাখ্যানও করলেন না) কুরাইশরা মদীনার মুশরিকদের কথায় বিশ্বাস করে ফেরত চলে গেল। এভাবেই শান্তিপূর্ণভাবে আকাবার দ্বিতীয় বায়আত সমাপ্ত হলো।

বারা বিন মারুর স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে ইয়াজিজ উপত্যকার দিকে রওয়ানা দিলেন। তাদের রওয়ানা দেয়ার পর বায়আতের খবর কুরাইশদের নিকট সত্য বলে প্রমাণিত হল। কুরাইশরা তাদের সন্ধানে বের হল। তারা ধাওয়া করে সা'দ বিন উবাদাকে পাকড়াও করে ফেলল এবং প্রহার করতে করতে মক্কায় নিয়ে গেল। মুতইম বিন আদী এবং হারিছ বিন হারব এসে তাকে উদ্ধার করে মদীনার পথে ছেড়ে দিল।

ঐদিকে সা'দকে না পেয়ে পিছনে ফেরত আসার ব্যাপারে পরামর্শ করল। এমন সময় সা'দ এসে তাদের সাথে যোগ দিলেন। এবার তারা সকলেই মিলে মদীনার পথে যাত্রা করলেন।

নাবী ﷺ এবং মুসলিমদের মদীনায় হিজরত

আল্লাহর রসূল ﷺ মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। মুসলিমগণ দ্রুত মদীনায় হিজরত করতে লাগলেন। আবু সালামা এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা সর্বপ্রথম মদীনার পথে বের হলেন। কিন্তু আবু সালামার শ্বশুর গোত্রের লোকেরা এসে উম্মে সালামাকে এবং শিশু সন্তান সালামাকে আটকিয়ে দিল। ঐ দিকে আবু সালামার গোত্রের লোকেরা এসে উম্মে সালামার কাছ থেকে নিজেদের গোত্রের সন্তান দাবী করে তারাও সালামাকে ছিনিয়ে নিল। আবু সালামা কঠিন ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং স্ত্রী-সন্তান ফেলে একাই মদীনায় চলে গেলেন। এক বছর পর উম্মে সালামা তার শিশু সন্তান নিয়ে মদীনায় হিজরত করলেন। উছমান বিন আবু তালহা তাকে মদীনায় পৌঁছিয়ে দিলেন।

আবু সালামার পথ ধরে লোকেরা একের পর এক মদীনায় হিজরত করতে থাকল। এক পর্যায়ে মক্কাতে রসূল ﷺ, আবু বকর এবং আলী (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন মুসলিম অবশিষ্ট রইলনা। আবু বকর ও আলী রসূল ﷺ-এর আদেশেই মক্কায় রয়ে গেলেন। এ ছাড়া যে সমস্ত মুসলিমকে কুরাইশরা আটকিয়ে রেখেছিল তারাও রয়ে গেলেন। রসূল ﷺ হিজরতের জন্য প্রস্তুত হয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। আবু বকরও প্রস্তুত ছিলেন।

মুশরিকরা যখন দেখল রসূল ﷺ এর সাথীগণ বের হয়ে যাচ্ছেন এবং সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ নিয়ে মদীনায় পাড়ি জমাচ্ছেন তখন তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে নিল, মুসলিমগণ অচিরেই মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন। তারা জানত যে, মদীনা সুরক্ষিত একটি দেশ এবং তার অধিবাসীরা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী। অচিরেই মদীনায় মুসলিমগণ শক্তিশালী হয়ে যাবে। তাই তারা আশঙ্কা করল যে, রসূল ﷺ ও মদীনায় চলে যাবেন। সুতরাং বিষয়টি তাদের কাছে খুব বড় হয়ে দেখা দিল। তারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দারুন্ নাদওয়ায় একত্রিত হল। তাদের বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোকদের কেউ অনুপস্থিত রইলনা। তাদের বন্ধু ও মুরব্বী ইবলীসও একজন নজদী শাইখের বেশ ধরে এবং শরীরে লম্বা চাদর জড়িয়ে বৈঠকে যথাসময়ে উপস্থিত হল। তারা রসূল ﷺ এর ব্যাপারে পরামর্শ শুরু করল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু ইবলীস কোন রায়কেই পছন্দ করছিলনা। পরিশেষে আবু জাহেল বলল- আমি মনে করি প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে শক্তিশালী যুবককে আমরা বেছে নিব। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধাঁরালো তলোয়ার থাকবে। তারা সকলে মিলে এক সাথে এক আঘাতেই মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলবে। এতে সকল গোত্রের মধ্যে তার রক্ত ভাগ হয়ে যাবে। তারপর আব্দে মানাফ গোত্রের (মুহাম্মাদেও গোত্রের) লোকেরা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেনা। তাদের পক্ষে সকল গোত্রের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আর দিয়ত দেয়ার প্রয়োজন হলে আমরা সকলে মিলেই তা পরিশোধ করে দিব।

এই প্রস্তাব শুনে শয়তান বলল- আল্লাহর শপথ! এটিই হচ্ছে সঠিক প্রস্তাব। সুতরাং তারা সকলে এই প্রস্তাবের উপরেই একমত হয়ে মজলিস ত্যাগ করল। ঐ দিকে জিবরীল ফিরিস্তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে অহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের কথা রসূল ﷺ কে জানিয়ে দিলেন এবং সেই রাত্রে তাকে নিজ বিছানায় শয়ন করতে নিষেধ করলেন।

পরের দিন রসূল ﷺ স্বীয় চেহারা মুবারক আবৃত করে দিবসের মধ্যভাগে আবু বকরের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। অথচ তিনি এ রকম সময়ে ইতিপূর্বে কখনই আবু বকরের বাড়িতে আসতেন না।

তিনি সেখানে গিয়ে বললেন- তোমার কাছে যারা আছে তাদের সকলকে বের করে দাও। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- হে আল্লাহর রসূল! এরা তো আপনারই পরিবার। তিনি তখন বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। আবু বকর তখন বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমিও আপনার সাথে যেতে চাই। তিনি বললেন- হ্যাঁ, তাই হবে। আবু বকর বললেন- আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! এই দু'টি বাহনের যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করুন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- হ্যাঁ, তবে মূল্য পরিশোধ করেই তা গ্রহণ করব। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সেই রাত্রে তাঁর বিছানায় ঘুমাতে বললেন।

ঐ দিকে সন্ধ্যা নেমে আসতেই কুরাইশদের নির্বাচিত যুবকেরা একত্রিত হল। তারা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘরের দরজায় পাহারা দিতে লাগল এবং তিনি কখন ঘরে প্রবেশ করে নিদ্রা যাবেন সেই সময়ের অপেক্ষা করতে লাগল। তারা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল যে, কোন্ বদ নসীব যুবকটি সর্বাগ্রে আক্রমণ করার ঘৃণিত কাজটি সম্পন্ন করবে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘর থেকে বের হয়ে এক মুষ্ঠি মাটি হাতে নিয়ে কাফেরদের মাথায় নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তারা তাঁকে দেখতেই পায় নি। তিনি মাটি নিক্ষেপ করছিলেন আর কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করছিলেনঃ

﴿وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴾

"এবং আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখেনা"। (সূরা ইয়াসীন-৩৬:৯) তিনি আবু বকরের বাড়ির দিকে গেলেন। তারা উভয়েই রাতের অন্ধকারে ঘরের জানালা দিয়ে বের হয়ে পড়লেন।

তারা উভয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর এক লোক এসে দেখল- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘরের দরজায় লোকেরা অপেক্ষা করছে। সে জিজ্ঞেস করল- তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা বলল- আমরা মুহাম্মাদের অপেক্ষা করছি। সে বলল- তোমরা ব্যর্থ হয়েছ ও তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার নয়। আল্লাহর শপথ! সে তোমাদের পাশ দিয়েই বের হয়ে গেছে। সে তোমাদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে চলে গেছে। তারা দাঁড়িয়ে নিজেদের মাথা হতে মাটি ঝেড়ে ফেলতে লাগল। সকাল হলে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। তারা তাঁকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা।

অতঃপর তিনি এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) গারে ছাওরের কাছে গিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর গুহার মুখে মাকড়শা জাল বুনিয়ে ফেলল।[২২৭]

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মদীনার রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ব হতেই আব্দুল্লাহ্ ইবনে উরাইকীত লাইছীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। সে মদীনার রাস্তা সম্পর্কে খুব পারদর্শী ছিল এবং সে তার গোত্রের ধর্মের উপরই ছিল। সে ছিল একজন বিশ্বস্ত লোক। তাই তার কাছে তাদের বাহন দু'টি সোপর্দ করলেন এবং তিন দিন পর গারে ছাওরের নিকট আসতে বললেন।

---

২২৭. মাকড়শার জাল বুনানো এবং তাতে কবুতরের ডিম পাড়ার ঘটনা সঠিক নয়। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন মুজেযাও প্রমাণিত হয়না। কারণ তা দেখে যে কোন সাধারণ লোক বলবে এখানে কোন মানুষ নেই। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা বলে তাদেরকে অন্ধ করে দেন। ফলে তারা দেখতে পায়নি।

ঐদিকে কুরাইশরা তাদের সন্ধানে কোন প্রকার অলসতা করলনা। 'কাফা' তথা পদচিহ্ন দেখে যারা পথচারীর পরিচয় ও গতিপথ জানতে পারে তারা এমন লোককে সাথে নিয়েও অনুসন্ধান চালালো। অনুসন্ধান করতে করতে তারা একদম গুহার দরজায় এসে দাঁড়াল।
সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- হে আল্লাহর রসূল! তাদের কেউ যদি তার দৃষ্টি একটু নীচু করে তাহলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। এ কথা শুনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- হে আবু বকর! চুপ থাক। সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ। তুমি চিন্তা করনা। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আবু বকর এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মাথার উপরে কাফেরদের কথা শুনছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন। আমের বিন ফুহায়রা আবু বকরের ছাগল চরাত। আবু বকর ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে মক্কায় যা বলা হত সে তা শ্রবণ করত এবং গুহায় এসে তাদের কাছে সেই খবর পৌঁছে দিত। কিন্তু শেষ রাতে সে মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীদের সাথেই রাত্রি যাপন করত এবং সকালে তাদের সাথেই ঘর থেকে বের হত।

তারা গুহায় তিন দিন অবস্থান করলেন। কুরাইশদের অনুসন্ধানের আগুন যখন নিভে গেল তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উরাইকীত বাহন দু'টি নিয়ে গুহার নিকট এসে উপস্থিত হল। তারা মদীনার পথে যাত্রা শুরু করলেন। আমের ইবনে ফুহায়রা আবু বকরের পিছনে আরোহন করলেন। পথপ্রদর্শক ছিল তাদের সামনে। আল্লাহর চোখ তাদেরকে পাহারা দিচ্ছিল, তাঁর সাহায্য তাদের সঙ্গী ছিল এবং আল্লাহর রহমত ও দয়ার ছায়ায় নাবীর কাফেলা মদীনার পথে অগ্রসর হতে লাগল।

মক্কার মুশরিকরা যখন নিরাশ হল তখন তারা আবু বকর ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গ্রেপ্তারের বিনিময়ে বিরাট পুরস্কারের ঘোষণা দিল। লোকেরা পুরস্কারের আশায় তাদের অনুসন্ধানে কঠোর পরিশ্রম করল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাই বিজয়ী হবে। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাফেলা যখন কুদাইদের উপর দিয়ে বনী মুদলাজ গোত্রের বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন বস্তির একজন লোক তাদেরকে দেখে ফেলে। সে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল- আমি এই মাত্র সাগরের তীর বেয়ে একটি কাফেলাকে অতিক্রম করতে দেখেছি। আমার মনে হয় মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীরা এই কাফেলায় রয়েছে। কথাটি শুনেই সুরাকা বিন মালেক বুঝে ফেলল এবং নিজেই সেই পুরস্কারটি অর্জন করতে চাইল। অতীতে এ রকম অনেক পুরস্কারই সে পেয়েছে। সে অন্যদের থেকে বিষয়টি গোপন রাখার মানসে বলতে লাগল- তোমার এই কথা বাদ দাও তো, তারা হচ্ছে উমুক এবং উমুক। তারা তাদের প্রয়োজনে বের হয়েছে। এই বলে সে সামান্য সময় অবস্থান করল। অতঃপর সে তার তাঁবুতে প্রবেশ করে খাদেমকে বলল- তাঁবুর পিছন দিয়ে ঘোড়াটি নিয়ে বের হও। টিলার পিছনে একটু পরেই আমি তোমার সাথে মিলিত হব। অতঃপর সে বর্শা হাতে নিয়ে বর্শার উপরের অংশ মাটির সাথে লাগিয়ে তা দিয়ে দাগ টানতে টানতে অগ্রসর হতে লাগল। ঘোড়ার নিকট পৌঁছে তাতে লাফ দিয়ে আরোহন করল এবং দ্রুত গতিতে চলতে লাগল। দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সে একদম তাদের কাছে চলে গেল এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেল। তিনি ডানে বামে তাকাচ্ছিলেন না। আর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খুব বেশী এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আবু বকর তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন- হে আল্লাহর রসূল! এই তো সুরাকা আমাদের কাছে এসে গেছে। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। তার ঘোড়ার সামনে পা দু'টি মাটিতে দেবে গেল। সুরাকা বলল- আমি অবশ্যই জানি, তোমাদের বদ

দু'আর কারণেই এমনটি হয়েছে। আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু'আ কর। আমি অঙ্গিকার করছি যে, যারা তোমাদের সন্ধানে বের হয়েছে আমি তাদেরকে ফিরিয়ে দিব।

রসূল ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। ঘোড়ার পা উঠে গেল। এবার সুরাকা রসূল ﷺ এর কাছে একটি পত্র লিখে দেয়ার আবেদন করল। রসূল ﷺ এর আদেশে আবু বকর (রাঃ) এক খন্ড চামড়ার উপর (নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কে) কিছু লিখে দিলেন। পত্রটি মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত তার সাথেই ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন সুরাকা পত্রটি নিয়ে আসলে রসূল ﷺ তার সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করলেন এবং বললেন- আজ ওয়াদা-অঙ্গিকার পূর্ণ করার দিন, আজ উত্তম আচরণের দিন। সুরাকা রসূল ﷺ এবং আবু বকরের জন্য পাথেয় এবং বাহন পেশ করলে তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তারা বললেন- আমাদের তালাশে যারা বের হয়েছে তুমি শুধু তাদেরকে দূরে রাখ এবং তাদের কাছে আমাদের খবর গোপন রাখ। সে বলল- অবশ্যই তা করব। সে ফেরত গিয়ে দেখল- অনেকেই তাদের সন্ধান করছে। সুরাকা তাদেরকে বলতে লাগল-। আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট খবর নিয়ে এসেছি। তারা এই দিকে নয়। সুরাকা দিনের প্রথমভাগে রসূলের শত্রু ছিল। আর দিবসের শেষভাগে তাঁর বন্ধু এবং রক্ষকে পরিণত হল।

তারা চলতে লাগলেন। চলার পথে উম্মে মা'বাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। উম্মে মা'বাদ ছিল একজন সদাচরণকারী মহিলা। তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী লোকদেরকে সে পানাহার করাত। রসূল ﷺ এবং আবু বকর (রাঃ) তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? সে বলল- আল্লাহর শপথ! আমার কাছে খাবার কিছু থাকলে আমি আপনাদের মেহমানদারী করতে মোটেই কার্পণ্য করতামনা। সেটি ছিল অভাবের বছর। খাদ্যাভাবে উম্মে মা'বাদের বকরীগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। রসূল ﷺ তাঁবুর এক পার্শ্বে একটি বকরী দেখতে পেলেন। তিনি বললেন- ওহে উম্মে মা'বাদ! এই বকরীটি এখানে কেন? উম্মে মা'বাদ বলল- দুর্বলতার কারণে এটি অন্যান্য বকরীর সাথে চলতে পারেনা। তাই এটি পিছনে রয়ে গেছে। নাবী ﷺ বললেন- বকরীটি কি দুধ দেয়? উম্মে মা'বাদ বলল- এটি দুর্বলতার কারণে চলতেই পারছেনা। দুধ আসবে কোথা হতে? তিনি বললেন- তুমি কি আমাকে এটি দোহন করার অনুমতি দিবে? সে বলল- আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি যদি তাতে কোন দুধ দেখেন তাহলে দোহন করতে পারেন। রসূল ﷺ বকরীর স্তনে হাত লাগালেন, বিসমিল্লাহ্ পাঠ করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। দুধে বকরীর স্তন ভর্তি হয়ে গেল। তিনি পাত্র আনয়ন করতে বললেন। পাত্র আনয়ন করা হলে তাতে দুধ দোহন করলেন। পাত্র ভর্তি হয়ে দুধের ফেনা উপরে উঠতে লাগল। রসূল ﷺ তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করলেন এবং তাঁর সাহাবীগণও পান করলেন। তিনি পুনরায় পান করলেন। দ্বিতীয়বারও তিনি পাত্র ভর্তি করে দুধ দোহন করে উম্মে মা'বাদের তাঁবু ত্যাগ করলেন।

কিছুক্ষণ পর উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ বকরীগুলো চালিয়ে নিয়ে ফেরত আসল। তাঁবুতে দুধ দেখে আবু মা'বাদ আশ্চার্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল- তুমি দুধ কোথায় পেলে? বকরীগুলো খাদ্যাভাবে শুকিয়ে রয়েছে। বাড়ীতে কোন দুধেল ছাগলও নেই। সে বলল- আল্লাহর শপথ! আমাদের কাছ দিয়ে একজন বরকতময় লোক অতিক্রম করেছেন। তার ঘটনা ছিল এই এই। তার অবস্থা ছিল এ রকম এ রকম। আবু মা'বাদ বলল- আল্লাহর শপথ! আমার ধারণা এই লোকটিকেই কুরাইশরা খুঁজছে। হে উম্মে মা'বাদ আমার কাছে তার গুণাগুণ বর্ণনা কর। সুতরাং উম্মে মাবাদ আবু মাবাদের কাছে

অত্যন্ত চমৎকার ও সুন্দরভাবে এবং হৃদয়গ্রাহী করে রসূলের গুণাগুণ ও পরিচয় তুলে ধরল। সে বলল- উজ্জল রং, জ্বলজ্বলে মুখ, সুমধুর আচরণ----এভাবে শেষ পর্যন্ত। উম্মে মা'বাদের কাছে রসূল ﷺ এর প্রশংসা ও গুণাবলী শুনে আবু মা'বাদ বলল- আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই এই ব্যক্তিই হচ্ছেন তিনি যার সম্পর্কে কুরাইশরা বলাবলি করছে এবং যাকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি তাঁর সাথী হয়ে যাব। আমি যদি সুযোগ পাই তাহলে অবশ্যই তার সঙ্গী হব।

ঐদিকে মক্কায় উঁচু কণ্ঠে একটি কবিতা আবৃত্তির আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল, কিন্তু কে তা আবৃত্তি করছে, তাকে দেখা যাচ্ছিল না, যার প্রথম লাইন হচ্ছে,

جزى الله رب العرش خير جزائه + رفيقين حلا خيمتي أم معبد

"আরশের প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দুইজন বন্ধুকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন, যারা উভয়েই উম্মে মাবাদের তাঁবুতে অবতরণ করেছেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন- আমরা জানতাম না যে রসূল ﷺ কোন দিকে গিয়েছেন। কিন্তু মক্কার নীচু ভূমিতে একটি জিন এসে কবিতার এই লাইনগুলো আবৃত্তি করতে লাগল। লোকেরা সেই আওয়াজ শুনে পিছে পিছে চলা শুরু করল। তবে তারা সেই জিনকে দেখতে পাচ্ছিলনা। পরিশেষে জিন মক্কার উঁচু ভূমি দিয়ে বের হয়ে গেল। আসমা বলেন- এই কবিতা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুহাম্মাদ ﷺ মদীনার দিকে চলে গেছেন।

মদীনায় মুহাম্মাদ ﷺ

রসূল ﷺ মক্কা হতে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছেন, এ কথা আনসারগণ যথা সময়েই জানতে পেরেছেন। তারা প্রতিদিন সকালে মদীনার বাইরে হাররায় তথা কালো কালো পাথর বিশিষ্ট ভূমিতে এসে দুপুর পর্যন্ত রসূল ﷺ এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সূর্যের তাপ বেড়ে গেলে তারা ঘরবাড়িতে চলে যেত।

নবুওয়াতের ১৩তম বর্ষে রবীউল আওয়াল মাসের সোমবারের দিন প্রতিদিনের অভ্যাস মোতাবেক আল্লাহর রসূলকে সম্মানিত মেহমানের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য তারা মদীনার বাইরে বের হলেন। এ দিনও রসূলের আগমণের অপেক্ষায় থেকে সূর্যের তাপ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই তারা ফেরত গেলেন।

ঐদিকে একজন ইহুদী তার কোন প্রয়োজনে মদীনার কোন একটি টিলার উপর উঠল। টিলার উপর উঠেই সে আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সাথীদেরকে আগমণ করতে দেখল। তাদের আলোকময় চেহারাগুলো চমকাচ্ছিলণ্ড এবং মরিচিকা তাদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছিল। সেই ইহুদী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলঃ হে বনী কায়লা (আওস ও খাজরায গোত্রের লোকেরা)! এই তো তোমাদের নেতা চলে এসেছেন, যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। আনসারগণ দ্রুত অস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য অগ্রসর হলেন। বনী আমর বিন আওফ গোত্রের দিক থেকে তাকবীর ধ্বনি শুনা গেল। রসূলের আগমণে মুসলিমগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাকবীর পাঠ করলেন। তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য বের হয়ে পড়লেন, নবুওয়াতের মহা সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে সুন্দর সুন্দর বাক্যের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নাবীকে স্বাগত জানালেন। আনসারগণ চতুর্দিক থেকে তাঁকে পাহারা দিচ্ছিলেন এবং

তাঁর প্রতি স্বজাগ দৃষ্টি রাখছিলেন। এ সময় প্রশান্তি ও স্বস্তির এক ছায়াঘন পরিবেশ তাঁকে ঢেকে রাখছিল। এ সময় তাঁর উপর কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল-

﴿فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾

"(আর যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখো) আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফিরিস্তাগণও তাঁর সাহায্যকারী"। (সূরা তাহরীম-৬৬:৪)

অতঃপর রসূল ﷺ চলতে লাগলেন। কুবায় পৌঁছে তিনি বনী আমর বিন আওফ গোত্রে এসে কুলছুম বিন হাদমের নিকট অবতরণ করলেন। কেউ বলেছেন- তিনি সা'দ বিন খাইছামার বাড়িতে অবতরণ করেছিলেন। তিনি কুবাতে ১৪ দিন অবস্থান করলেন। তিনি সেখানে কুবা মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করলেন। নবুওয়াতের পর এটিই ছিল প্রথম মাসজিদ। জুমআর দিন আল্লাহর অনুমতিক্রমে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বনী সালেম গোত্রের নিকট পৌঁছলে জুমআর সলাতের সময় হয়ে গেল। বনী সালেমের উপত্যকায় তিনি সাহাবীদের নিয়ে জুমআর সলাত আদায় করলেন। সলাতের পর তিনি আবার আরোহন করলেন। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে লোকেরা উটের লাগাম ধরে ধরে বলতে লাগল- আপনি আমাদের কাছে অবতরণ করুন। আমাদের কাছে রয়েছে সকল প্রকার প্রস্তুতি, রয়েছে অস্ত্র ও প্রতিরোধ ক্ষমতা। তিনি বললেন- উটনীকে যেতে দাও। কারণ সে আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ প্রাপ্ত, তাকে ছেড়ে দাও, সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবতরণ করবে।

উটনীটি তাঁকে নিয়ে চলতেই থাকল। যখনই কোন আনসারীর বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখনই তারা এই কামনা করত যে, আল্লাহর রসূল তাদের কাছেই অবস্থান করুক। আর তিনি একই কথা বলতেন- উটনীকে যেতে দাও। কারণ সে আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ প্রাপ্ত। সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবতরণ করবে।

উটনী চলতেই থাকল। অতঃপর আজ যেখানে রসূলের মাসজিদ রয়েছে সেখানে এসে উটনী বসে পড়ল। নাবী ﷺ উটনীর উপরেই বসে রইলেন। উটনী পুনরায় দাঁড়াল এবং একটু অগ্রসর হল। অতঃপর আগের জায়গায় এসে পুনরায় বসে পড়ল। তিনি এবার উটনীর পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। এই স্থানেই ছিল রসূল ﷺ এর মামাদের বাসস্থান। আল্লাহ্ তা'আলা উটনীকে সঠিক স্থান নির্ধারণের তাওফীক দিয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছিলেন যে, তাঁর রসূলের মেহমানদারীর সম্মানটি তাঁর মামাদের জন্যই অর্জিত হোক। সুতরাং তারা রসূল ﷺ কে তাদের বাসস্থানে অবতরণ করার আবেদন করতে লাগলেন। আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) দ্রুত সামনে এগিয়ে রসূল ﷺ এর ভ্রমণ সামগ্রী ও মালপত্র নিজের ঘরে ঢুকিয়ে ফেললেন। রসূল ﷺ তখন বলতে লাগলেন- কোন লোক তাঁর সফর সামগ্রীর সাথেই চলে থাকে। ঐ দিকে আসআদ বিন যুরারা রসূল ﷺ এর উটনীকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিলেন। পরে সেটি তাঁর কাছেই ছিল।

মদীনায় প্রিয় নাবীর আগমনে আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। কবিতা ও ছন্দের মাধ্যমে তারা আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। এ মর্মে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। আবু কাইস সিরমাহ আনসারী (রাঃ) এর কবিতায় সেই আনন্দের কিছু অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর কাছে গিয়ে কবিতাংশটি মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। সেই কবিতার কয়েকটি লাইন হচ্ছে,

1- ثَوَى فِى قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْـرَةَ حِجَّةً + يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَى حَبِيباً مُوَاتِـيَا

2- وَيَعْـرِضُ فِى أَهْلِ المَوَاسِـمِ نَفْسَهُ + فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤْوِي وَلَمْ يَرَ دَاعِـيَا

3- فَلَمَّا أَتَانَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهِ النَّـوَى + وأَصْبَـحَ مَسْرُوراً بِطَيْبَةَ رَاضِيَا

4- وَأَصْبَحَ لاَ يَخْشَى ظُلاَمَةَ ظَـالِمٍ + بَعِيدٍ وَلاَ يَخْشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِيَا

5- بَذَلْنَا لَهُ الأَمْـوَالَ مِنْ حِلِّ مَالِنـا + وَأَنْفُسَنَا عِنْدَ الوَغَى والتآسِـيَا

6- نُعَادِى الَّذِى عَادَى مِنَ النَّاس كُلِّهِمْ + جَمِيعاً وَإِنْ كَانَ الحَبِيبَ المُصَافِيَا

7- وَنَعْلَـمُ أَنَّ اللهَ لاَ رَبَّ غَيْـرُهُ + وَأَنَّ كِتَابَ اللهِ أَصْبَـحَ هَادِيَا

(১) তিনি (রসূল ﷺ) মক্কার কুরাইশদের মাঝে ১৩ বছর অবস্থান করে লোকদের নসীহত করেছেন। এই আশায় হয়ত কোন সাহায্যকারী বা বন্ধু পাবেন।

(২) হাজ্জ কিংবা অন্যান্য মৌসুমে মানুষের কাছে নিজেকে পেশ করেছেন, কিন্তু কোন আশ্রয়দাতা পেলেন না এবং তাঁকে কেউ আহবানও করল না।

(৩) তিনি যখন আমাদের নিকট চলে আসলেন তখন থেকে মদীনায় খুশী মনে ও সন্তুষ্ট চিত্তে বসবাস করতে থাকলেন।

(৪) কোন জালেমের জুলুম এবং মানুষের মধ্যে কোন সীমালংঘন কারীরও ভয় রইলনা।

(৫) আমরা তাঁর জন্য জান ও হালাল সম্পদ উৎসর্গ করলাম। বিশেষ করে লড়াইয়ের ময়দানে এবং অন্যান্য স্থানে যখন তা ব্যয় করার প্রয়োজন হয়েছিল।

(৬) সকল মানুষের মধ্য হতে আমাদের যে ব্যক্তি তাঁর সাথে দুশমনী করে আমরা তাঁকে শত্রু মনে করি। যদিও সে আমাদের বন্ধু হয়ে থাকে।

(৭) আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহই আমাদের প্রভু, তিনি ছাড়া আমাদের অন্য কোন রব নেই। আর আল্লাহর কিতাবই আমাদের পথ প্রদর্শক।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- নাবী ﷺ মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেছেন। অতঃপর তাঁকে হিজরত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তখন তাঁর উপর কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়-

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾

"বলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দাখিল কর সঠিক স্থানে এবং আমাকে বের কর সঠিক রূপে এবং দান কর আমাকে নিজের কাছ থেকে রাজকীয় সাহায্য"। (সূরা ইসরা-১৭:৮০)

বিশিষ্ট তাবেয়ী কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে মক্কা থেকে মদীনায় উত্তম স্থানে বের করলেন। আল্লাহর নাবী জানতেন যে, শক্তি ও সাহায্য ছাড়া এই পৃথিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর কাছে শক্তি ও সাহায্যকারী প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মক্কাতে অবস্থান কালেই দারুল হিজরত দেখালেন। তখন তিনি সাহাবীদেরকে বললেন- আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। তা হচ্ছে লবণাক্ত ভূমি, তাতে রয়েছে খেজুর গাছ, এবং কালো পাথর দিয়ে ঢাকা দু'টি ভূখন্ডের মাঝখানে তা অবস্থিত।

বারা বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম আমাদের কাছে মুসআব বিন উমাইর এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম আগমণ করলেন। তারা উভয়েই লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে লাগলেন। অতঃপর আম্মার বিন ইয়াসির, বিলাল বিন রাবাহ এবং সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আসলেন। তাদের পথ ধরেই ২০ জনের একটি কাফেলা নিয়ে উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আগমন করলেন। সকলের শেষে হিজরত করলেন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

বারা বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- রসূলের আগমণে মদীনাবাসীগণ যে রকম খুশী হয়েছিলেন অন্য কোন সময় তাদেরকে এত খুশী হতে দেখিনি। এমনকি নারী, শিশু এবং দাস-দাসীদেরকেও বলতে শুনেছি, এই তো আল্লাহর রসূল আমাদের কাছে চলে এসেছেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেদিন মদীনায় এসে পৌঁছলেন সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি যেদিন আমাদের কাছে মদীনায় প্রবেশ করলেন সেদিনের চেয়ে অধিক আলোকিত ও সুন্দর দিন আর কখনও দেখিনি। আর আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর দিনও উপস্থিত ছিলাম। ঐদিনের চেয়ে অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুঃখের দিন আর কখনও দেখিনি।

অতঃপর তাঁর মাসজিদ এবং বাসগৃহ নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আবু আইয়্যুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকলেন। আবু আইয়্যুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বাড়িতে অবস্থান কালেই তিনি যায়েদ বিন হারেছা এবং আবু রাফে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দু'টি উটসহ এবং পাঁচশ দিরহাম দিয়ে মক্কায় পাঠালেন। তারা মক্কায় গিয়ে তাঁর কন্যা ফাতেমা, উম্মে কুলছুম, তাঁর স্ত্রী সাওদা, উসামা বিন যায়েদ এবং উসামার মাতা উম্মে আয়মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে মদীনায় নিয়ে আসলেন। কিন্তু রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আরেক কন্যা যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবুল আসের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। সে তাঁকে আটকিয়ে রেখেছিল। ঐদিকে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ছেলে আব্দুল্লাহ্ আবু বকরের পরিবারের সকলকে নিয়ে বের হল। তাদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও ছিলেন। তারা এসে হারেছা বিন নু'মানের বাড়িতে অবতরণ করলেন।

মাসজিদে নববীর নির্মাণ

ইমাম যুহরী বলেন- বর্তমানে যেখানে মাসজিদে নববী অবস্থিত সেখানে এসেই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উটনী বসে পড়েছিল। সেই স্থানেই তাঁর হিজরতের পূর্বে মুসলিমগণ সলাত আদায় করতেন। এই জায়গাটি ছিল আসআদ বিন যুরারার প্রতিপালনাধীন সাহল ও সুহাইল নামক দুইজন ইয়াতীম বালকের। তাতে সে সময় উট বাঁধা হত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জায়গাটি খরীদ করে তাতে মাসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে কথা বললেন। বালক দু'টি বলল- বরং আমরা তা বিনা মূল্যে দান করতে চাই। কিন্তু নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা বিনা মূল্যে নিতে অস্বীকার করলেন। পরিশেষে তিনি উহা দশ দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন।

সে সময় মাসজিদে নববীর চারটি দেয়াল ছিল। কোন ছাদ ছিলনা। কিবলা ছিল বাইতুল মাকদিস। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মদীনায় আগমনের পূর্বে আসআদ বিন যুরারা সেখানে মুসলিমদেরকে সলাত ও জুমআ পড়াতেন। সেখানে ছিল গারকাদ ও খেজুর গাছ এবং মুশরিকদের কবর। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশে মুশরিকদের কবরগুলোকে উঠিয়ে ফেলা হয় এবং খেজুর ও অন্যান্য গাছগুলোকে কেটে কিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে রেখে দেয়া হয়। মাসজিদটি কিবলার দিক থেকে পিছনের দেয়াল পর্যন্ত একশ হাত লম্বা

ছিল। বাকী দুই দিকেও অনুরূপ বা তার চেয়ে একটু কম ছিল। ভিত্তিমূল ছিল তিন হাত পরিমাণ। এর উপরই মুসলিমগণ তা কাঁচা ইট দিয়ে তৈরী করেছেন। রসূল ﷺ ও তাদের সাথে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং পাথর ও ইট বহন করেছেন। এ সময় তিনি নিম্নের লাইনগুলো পাঠ করতেন-

اللّهم لا عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرةْ + فَاغْفِـرْ للأَنْصَارِ وَالمُهَـاجِـرَةْ

"হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা কর"। তিনি আরও বলতেন-

هَذَا الحِمَالُ لا حِـمَالُ خَيْبَرَ + هَـذَا أَبَـرُّ رَبَّـنَا وَأَطْهَرُ

"এগুলো খায়বার থেকে আগত খেজুর বা পণ্যের বোঝা নয়; বরং এগুলো ইটের বোঝা এবং এই কাজ আমাদের প্রভুর আনুগত্যের প্রতি ও পবিত্র জীবনের প্রতি উৎসাহ দানকারী"। সাহাবীগণও রসূল ﷺ-এর সাথে ইট বহন করতেন আর এই ধরণের ছন্দ পাঠ করতেন। তাদের কেউ কেউ বলতেন-

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالرَّسُولُ يَعْمـل + لَـذَاكَ مِـنَّا العَـمَلُ المُضَـلَّلُ

"আমরা যদি বসে থাকি, আর আল্লাহর রসূল কাজ করেন, তাহলে আমাদের জন্য হবে এটি মারাত্মক ভুল।

তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে মাসজিদের কিবলা নির্ধারণ করেন। পিছনের দিকে তিনটি দরজা রাখেন। আরেকটি দরজা রাখেন, যার নাম ছিল বাবে রহমত। তৃতীয় আরেকটি দরজা রাখেন, যা দিয়ে রসূল ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করতেন। খেজুরের কাঠ দিয়ে এর খুঁটি নির্মাণ করেন আর ছাদে খেজুর গাছের শাখা স্থাপন করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল- আপনি কি এর উপর ছাদ নির্মাণ করবেন না? তিনি বললেন- না, বরং এটি মুসা (আলাইহিস সালাম) এর চালাঘরের ন্যায়ই থাকবে।

মাসজিদে নববীর পাশেই তিনি তাঁর স্ত্রীদের ঘরও কাঁচা ইট দিয়ে তৈরী করেন। খেজুরের শাখা ও কাঠ দিয়ে তার ছাদ নির্মাণ করেন। গৃহ নির্মাণ শেষে তিনি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে সেই নব নির্মিত ঘরে বাসর করেন, যেটি তিনি মাসজিদে নববীর পূর্ব প্রান্তে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সাওদার জন্য আরেকটি গৃহ নির্মাণ করেন।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা

অতঃপর নাবী ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করলেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৯০ জন। তাদের অর্ধেক ছিলেন মুহাজির ও বাকী অর্ধেক ছিলেন আনসার। পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও মৃত্যুর পরে তারা একে অন্যের সম্পদের ওয়ারিছ হতেন। বদরের যুদ্ধের ঘটনা পর্যন্ত এই নিয়ম বলবৎ ছিল। পরবর্তীতে যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল-

﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾

"বস্তুতঃ আত্মীয়দের কতক কতকের চেয়ে আল্লাহ্‌র বিধান মতে অধিক হকদার"। (সূরা আনফাল-৮:৭৫) তখন থেকে মৃত্যুর পর ওয়ারিছ হওয়ার বিষয়টি শুধু আত্মীয়দের মাঝেই সীমিত হয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন- দ্বিতীয়বার তিনি শুধু মুহাজিরদের কতকের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেন।

এইবার তিনি আলীকে নিজের ভাই বানিয়ে নিলেন। কিন্তু প্রথম বার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনার ঘটনাটিই প্রমাণিত। দ্বিতীয়বার তিনি যদি কাউকে ভাই বানাতেন তাহলে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু, হিজরতের ও গারে ছাওরের সাথী এবং সর্বোত্তম সাহাবী আবু বকরই তাঁর ভাই হওয়ার অধিক হকদার হতেন। তাঁর ব্যাপারে রসূল ﷺ বলেছেন-

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي

"আমি যদি যমীনের কাউকে বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম। কিন্তু সে আমার ভাই ও সাথী"। এটি ইসলামের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব হলেও আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছিলেন এর সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। যেমন ছিলেন তিনি সাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। রসূল ﷺ বলেন- আমার আগ্রহ হয় যে আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন- তোমরা আমার সাহাবী। আমার ভাই হচ্ছে এমন ব্যক্তিগণ, যারা আমার পরে আসবে এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। তারা এখনও আমাকে দেখেনি।

মদীনার ইহুদীদের সাথে চুক্তি

নাবী ﷺ মদীনার ইহুদীদের সাথে একটি সন্ধি চুক্তি রচনা করলেন। এই মর্মে নাবী ﷺ ও তাদের মাঝে একটি লিখিত চুক্তিও সম্পাদিত হল। ইহুদীদের একজন বড় আলেম ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম। তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। অন্যরা কুফরীর মধ্যেই রয়ে গেল। মদীনাতে ছিল তিনটি ইহুদী গোত্র। বনু কায়নুকা, বনু নযীর এবং বনু কুরায়যা। এই তিনটি ইহুদী গোত্র রসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তিনি অনুগ্রহ করে বনু কায়নুকাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে বনু নযীরকে মদীনা হতে বহিস্কার করেছেন এবং বনু কুরায়যাকে হত্যা করেছেন। আর বনু কুরায়যার অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদেরকে দাসে পরিণত করেছেন। বনু নযীরের ব্যাপারে সূরা হাশর এবং বনু কুরায়যার ব্যাপারে সূরা আহযাব নাযিল হয়েছে।

কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা

মদীনায় হিজরতের পর তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করেই সলাত আদায় করতেন। তিনি জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কে বলেছিলেন- আমার আশা, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার চেহারা ইহুদীদের কিবলা হতে ফিরিয়ে দেন। জিবরীল বললেন- আমি তো আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। আপনি আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন এবং তাঁর কাছেই বিষয়টি বলুন। তিনি কিবলা পরিবর্তনের আশায় আকাশের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন-

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি তোমাকে সেই কিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যাকে তুমি পছন্দ কর। এখন তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ কর এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকেই মুখ কর"। (সূরা বাকারা-২:১৪৪) এটি ছিল হিজরতের ১৬ মাস পরের এবং বদরের যুদ্ধের মাত্র দুই মাস পূর্বের ঘটনা।

কিবলা পরিবর্তনের এই ঘটনায় বড় বড় অনেকগুলো হিকমত রয়েছে এবং এটি ছিল মুসলিম, মুশরিক, ইহুদী এবং মুনাফিক সকল সম্প্রদায়ের জন্যই পরীক্ষা। মুসলিমদের তো কোন সমস্যাই ছিলনা। আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়াত পাওয়ার কারণে তারা বললেন- আমরা ঈমান এনেছি, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। তাই আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। তাদের কাছে বিষয়টি তেমন বড় ছিলনা।

মুশরিকরা বলতে লাগল, সে যেমন আমাদের কিবলার (কাবার) দিকে ফেরত এসেছে তেমন অচিরেই আমাদের দ্বীনে ফেরত আসবে। আমাদের কিবলাকে সত্য মনে করেই সেদিকে ফিরে এসেছে। ইহুদীরা বলতে লাগল- সে তাঁর পূর্বের সকল নাবীদের কিবলার বিরোধীতা করছে।

মুনাফিকরা বলতে লাগল- জানিনা, এই লোক কোথায় যাচ্ছে? প্রথম কিবলা সঠিক হয়ে থাকলে সে একটি সত্য বিষয় পরিত্যাগ করেছে। আর দ্বিতীয়টি সঠিক হয়ে থাকলে প্রথমে সে বাতিলের উপর ছিল। এ ছাড়া মূর্খরা আরও অনেক কথাই বলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾

"নিশ্চয়ই এটা (কিবলা পরিবর্তন) কঠিন বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছেন"। (সূরা বাকারা-২:১৪৩)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এটি মুমিন বান্দাদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষাও ছিল। যাতে তিনি দেখে নেন কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিবলার বিষয়টি যেহেতু একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই আল্লাহ্ তআলা কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ নাসেখ-মানসুখ তথা শরীয়তের কোন বিষয়কে রহিত করার বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি বলেছেন যে, কোন বিষয়কে মানসুখ (রহিত) করলে তার স্থলে আরও উত্তম হুকুম প্রদান করেন কিংবা অনুরূপ বিষয় স্থাপন করেন। এরপরই তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকে ধমক দিয়েছেন, যারা রসূল ﷺ এর হুকুমের বিরুদ্ধে হঠকারিতা প্রদর্শন করে এবং তাঁর হুকুমের সামনে মাথা নত করেনা।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের পারস্পারিক মতভেদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাদের একদল অন্যদলকে দোষারোপ করে বলে থাকে যে, তোমরা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত নও। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টানদের অনুরূপ করতে এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হতে সতর্ক করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কুফর ও শির্কের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারা বলে যে, আল্লাহর পুত্র সন্তান রয়েছে। তিনি এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং তাদের ধারণার অনেক উর্ধ্বে।

কিবলা পরিবর্তনের আলোচনার ধারাবাহিকতায় তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম তথা সকল দিক। সুতরাং তাঁর বান্দাগণ যেদিকেই মুখ ফিরাবে আল্লাহ্ সেদিকেই রয়েছেন। তার জ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রশস্ত। তিনি তাঁর বড়ত্ব ও বিশালতার মাধ্যমে সকল কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছেন বলেই বান্দা যেদিকে মুখ ফিরাবে আল্লাহ্ তা'আলা সেদিকেই রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, যারা তাঁর অনুসরণ না করার কারণে এবং তাঁকে সত্যায়ন না করার কারণে জাহান্নামে যাবে তাদের সম্পর্কে তিনি তাঁর রসূলকে কিছুই জিজ্ঞেস করবেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানরা কখনই তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবেনা, যতক্ষণ না তিনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। তিনি এও বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইহুদী-খৃষ্টানদের বিভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে পরিত্রাণ দেয়ার পরও যদি তিনি তাদের অনুসরণ করেন তাহলে আল্লাহর মুকাবেলায় তাঁর জন্য কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু থাকবেনা। এরপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর আযাবের ভয় দেখিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কাবার নির্মাণকারী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর আলোচনা করেছেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন। আরও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁকে মানব জাতির ইমাম বানিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাবা ঘরের নির্মাণ সম্পর্কে এবং বিশেষ করে তাঁর খলীল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর নির্মাণ সম্পর্কেও বলেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যেহেতু মুসলিম মিল্লাতের ইমাম তাই তাঁর হাতে নির্মিত ঘরও মুসলিমদের প্রাণকেন্দ্র এবং ইমাম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- এই সম্মানিত ইমামের মিল্লাত থেকে কেবল মূর্খরাই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর অনুসরণ করার ও তাঁর প্রতি এবং তাঁর পূর্বের সকল নাবীর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার প্রতিও ঈমান আনয়নের হুকুম দিয়েছেন। আর যারা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর আহলে বাইতকে ইহুদী বা নাসারা বলে দাবী করে তাদের প্রতিবাদ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা উপরের সকল বিষয়কে কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। তিনি কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টিকে বার বার জোর দিয়ে বলেছেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানেই থাকেন, যেখান থেকেই বের হন, সকল স্থানেই এবং সকল অবস্থাতেই তাঁকে কাবার দিকে মুখ ফিরানোর আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথের সন্ধান দেন। তিনিই তাদেরকে এই কিবলার দিকে হিদায়াত করেছেন। এটি মুসলিমদেরই কিবলা, তারাই এদিকে মুখ ফিরানোর হকদার। আর এটিই সর্বোত্তম কিবলা। মুসলিমগণ সর্বোত্তম জাতি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য নির্বাচন করেছেন সর্বোত্তম রসূল, তাদেরকে দান করেছেন সর্বোত্তম কিতাব, তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম যুগে, বিশেষ করে তাদেরকে দান করেছেন সর্বোত্তম শরীয়ত, ভূষিত করেছেন তাদেরকে সর্বোত্তম চরিত্রে, পাঠিয়েছেন তাদেরকে সুন্দরতম ভূখন্ডে, অধিষ্ঠিত করেছেন তাদেরকে জান্নাতের সর্বোত্তম স্থানে এবং কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে তাদের অবস্থানের জায়গা হবে সব চেয়ে উত্তম। তারা সে দিন দাঁড়াবে সুউচ্চ একটি টিলার উপর। অন্য লোকেরা দাঁড়াবে তাদের নীচে। সুতরাং আমি ঐ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত প্রদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ অত্যন্ত বিশাল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, কিবলা পরিবর্তনের কারণ হল যাতে লোকেরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করার সুযোগ না পায়।[২২৮] তারপরও জালেমরা উপরে উল্লেখিত দুর্বল যুক্তি ও অভিযোগগুলো পেশ করে থাকে।[২২৯] নাস্তিকরা কেবল এগুলো বা এ জাতিয় অন্যান্য দুর্বল যুক্তির মাধ্যমে নাবী-রসূলদের দাওয়াতের বিরোধীতা করে থাকে। যারাই নাবী-রসূলদের কথার উপর অন্যান্য লোকদের কথাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে তাদের যুক্তিগুলোও অনুরূপ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, মুসলিম মিল্লাতের উপর তাঁর নিয়ামাতকে পরিপূর্ণ করার এবং তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্যই কিবলাকে পরিবর্তন করেছেন এবং কাবাকেই তাদের কিবলা নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই পরিপূর্ণ নিয়ামতের বিবরণ দিয়ে বলেন-

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

"যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও প্রজ্ঞা (সুন্নাত) এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনও তোমরা জানতে না"। (সূরা বাকারা-২:১৫১)

পরিশেষে আল্লাহ্কে স্মরণ করার এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আদেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যমেই নেয়ামত পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর বান্দারা আল্লাহকে স্মরণ করলে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাদেরকে স্মরণ করেন এবং ভালবাসেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন, যা ব্যতীত তাদের নিয়ামাত পরিপূর্ণ হবে না। আর তা হচ্ছে সবুর ও সালাত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন"। (সূরা বাকারা-২:১৫৩) আল্লাহ্ তা'আলা কিবলা পরিবর্তনের সাথে সাথে দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পূর্বে আযান দেয়াও শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সেই সাথে যোহর, আসর ও

---

২২৮. আহলে কিতাবরা আগে থেকেই জানত যে, মুসলিম জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে তারা এবাদতে কাবাঘরের দিকে মুখ ফিরাবে। এখন যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে তারা সম্ভবতঃ অভিযোগ পেশ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। অথবা এও হতে পারে যে, মুসলিমদের কিবলা যদি বাইতুল মাকদিসই থেকে যায় তাহলে ইহুদীরা এ কথা বলার সুযোগ পাবে যে আমরা যদি হকপন্থী না হয়ে থাকি তাহলে তারা আমাদের কিবলার অনুসরণ করল কেন? এ সকল অযুহাত সমূলে কেটে দেয়ার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা কাবাকেই মুসলিমদের কিবলা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। (আল্লাহই ভাল জানেন)

২২৯. মুশরিকরা বলতে লাগলঃ সে যেমন আমাদের কিবলার দিকে ফেরত এসেছে তেমনি অচিরেই আমাদের দ্বীনে ফেরত আসবে। আমাদের কিবলাকে সত্য মনে করেই সেদিকে ফিরে এসেছে। ইহুদীরা বলতে লাগলঃ সে তাঁর পূর্বের সকল নাবীদের কিবলার বিরোধীতা করেছে। মুনাফিকরা বলতে লাগলঃ জানি না, এই লোক কোথায় যাচ্ছে? প্রথম কিবলা সঠিক হয়ে থাকলে সে সত্য পরিত্যাগ করেছে। আর দ্বিতীয়টি সঠিক হয়ে থাকলে প্রথমে সে বাতিলের উপর ছিল। এ ছাড়া মূর্খরা আরও অনেক কথাই বলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ

"নিশ্চিতই এটা (কিবলা পরিবর্তন) কঠিন বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছেন"। (সূরা বাকারা-২: ১৪৩)

ইশার সলাতের রাকআত সংখ্যাও বাড়িয়ে দুইএর স্থলে চার করেছেন। অথচ ইতিপূর্বে উক্ত সলাতগুলোর রাকআত সংখ্যা ছিল দুই দুই করে। উপরের সবগুলো বিষয় নাবী ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পরে সম্পন্ন হয়েছে।

মদীনায় রসূল ﷺ এর হিজরত এবং জিহাদের সূচনা

নাবী ﷺ যখন মদীনায় এসে বসবাস শুরু করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পক্ষ হতে সাহায্যের মাধ্যমে এবং একদল মুমিন দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করেছেন। পারস্পরিক শত্রুতা থাকার পরও তিনি তাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন রচনা করেছেন। আল্লাহর সাহায্যকারীগণ এবং ইসলামের সিপাহীরা তাঁকে হেফাজত করেছেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তারা নিজেদের জান কোরবানী করেছেন এবং রসূল ﷺ এর মুহাব্বতকে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী-পরিবারের মুহাব্বাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা তাঁকে নিজেদের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী মনে করতেন। আরব এবং ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুশমনী শুরু করল। চতুর্দিক থেকে তারা মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং যুদ্ধ ঘোষণা করল। অথচ এতদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সবর করতে এবং কাফেরদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন মুসলমানদের শক্তি অর্জিত হল এবং তাদের ভিত্তি মজবুত হল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তা তাদের উপর ফরয করে দেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম"। (সূরা হাজ্জ-২২:৩৯) কেউ কেউ বলেছেন- মুসলমানগণ মক্কায় থাকাবস্থায় এই হুকুম ছিল। কেননা এই সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। এই মতটি কয়েকটি কারণে ভুল।

১) মক্কায় থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে কিতাল তথা যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নি।

২) আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা প্রমাণ করে যে, অন্যায়ভাবে মুসলমানদেরকে তাদের মক্কার বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়ার পরই যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

৩) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم "এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে"- এটি ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা বদরের যুদ্ধের দিন সর্বপ্রথম সম্মুখ যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিল।

৪) এই সূরাতে আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا "হে ঈমানদারগণ" বলে সম্বোধন করেছেন। এইভাবে যত সম্বোধন করা হয়েছে তার সবই মদীনায় নাযিল হয়েছে।

৫) এই সূরাতে অস্ত্রের মাধ্যমে এবং অন্যান্য মাধ্যমে জিহাদ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, সাধারণ জিহাদের হুকুম হিজরতের পরেই নাযিল হয়েছে।

৬) হাকেম স্বীয় মুস্তাদরাকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ মক্কা হতে বের হলেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন বললেন- তারা তাদের নাবীকে মক্কা

থেকে তাড়িয়ে দিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তারা অবশ্যই ধ্বংস হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের এই আয়াত নাযিল করেন-

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম"। (সূরা হাজ্জঃ ৩৯) সসস্ত্র যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ এটিই সর্বপ্রথম আয়াত। সূরা হজ্জের আয়াতগুলো গভীরভাবে পাঠ করলে বুঝা যায় যে, তাতে রয়েছে মক্কী ও মাদানী আয়াত। শয়তান কর্তৃক নাবীদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দেয়ার ঘটনা মক্কায় নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রসূল ও নাবী প্রেরণ করেছি তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ্ তার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়"। (সূরা হাজ্জঃ ৫২)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"আর লড়াই কর আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না"। (সূরা বাকারা-২:১৯০)

অতঃপর সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয করে দেয়া হয়। আসল কথা হচ্ছে মক্কায় জিহাদ নিষিদ্ধ ছিল। হিজরতের পর জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়। অতঃপর যে সমস্ত মুশরিক মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। পরিশেষে সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করা ফরয করে দেয়া হয়। কেউ বলেছেন- জিহাদ ফরযে আইন করা হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন- ফরযে কিফায়া। এটিই প্রসিদ্ধ মত।

এ ব্যাপারে সঠিক কথা হল জিহাদ মূলত ফরযে আইন। তথা উম্মতের সকলের উপর তা ফরয। তবে তা কখনও হবে অন্তরের দ্বারা, কখনও জবানের দ্বারা, কখনও হাতের দ্বারা আবার কখনও হবে মালের দ্বারা। প্রত্যেক মুসলিমকে উপরোক্ত চারটি জিহাদের কোন একটি অবশ্যই করতে হবে। আর আল্লাহর রাস্তায় জান দিয়ে জিহাদ করা ফরযে কিফায়া। উম্মাতের কোন একটি দল এই প্রকারের জিহাদ করলে অন্যদের পক্ষ হতে ফরযিয়াত উঠে যাবে। কেউ না করলে সকলেই গুনাগার হবে।

মালের দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে আলেমদের পক্ষ হতে দু'টি মত পাওয়া যায়। একটি ওয়াজিবের পক্ষে অন্যটি এর বিপক্ষে। তবে সঠিক কথা হচ্ছে মালদার মুসলিমের উপর আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করে জিহাদ করা আবশ্যক। কেননা কুরআনে জিহাদ বিন্ নাফস এবং জিহাদ বিল মালের হুকুম এক সাথেই করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার"। (সূরা তাওবা-৯:৪১) শুধু তাই নয় আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার শর্তারোপ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার (বাণিজ্যের) সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে অতি উত্তম; যদি তোমরা তা জান। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটা মহাসাফল্য এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ করো। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। হে নাবী! মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করো"। (সূরা সাফ্ফ-৬১:১০-১৩) আল্লাহ্ তা'আলা আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। এর বিনিময়ে তিনি তাদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কেউ আছে কি? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (সূরা তাওবা-৯:১১১) সুতরাং দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা এই চুক্তি ও অঙ্গীকারকে উত্তম কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন। এর পর তিনি তাদেরকে জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কেউ নেই। মুসলিমদেরকে তিনি এই ওয়াদা পেয়ে খুশী হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটিই হচ্ছে মহান সাফল্য।

সুতরাং জ্ঞানীদের চিন্তা করা উচিত। এই চুক্তি ও ক্রয়-বিক্রয় কত বিরাট! এখানে ক্রেতা হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। পণ্য হচ্ছে মুমিনদের জান ও মাল। মূল্য হচ্ছে জান্নাতুন নাঈম, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং

আল্লাহর দিদারের স্বাদ। যার মাধ্যমে এই ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তিনি হচ্ছেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং বনী আদম ও ফিরিস্তাকুলের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান। সুতরাং যেই পণ্যের প্রকৃত অবস্থা হল এই, তাকে অবশ্যই একটি বিরাট কাজের জন্যই তৈরী করা হয়েছে।

সুতরাং হে আদম সন্তান! তোমাকে এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তুমি পশুর মত জীবন যাপন করা হতে বিরত হও।

জান্নাত পাওয়ার মোহরানা (মূল্য) হচ্ছে উহার মালিকের রাস্তায় জান ও মাল খরচ করা, যা তিনি ক্রয় করে নিয়েছেন তাঁর মুমিন বান্দাদের থেকে। মূলতঃ জান্নাত হচ্ছে এমন একটি পণ্য, যা বিক্রি করতে ক্রেতাদের জন্য বিশেষ একটি বাজারে পেশ করা হয়েছে। কাপুরুষদের জন্য এই পণ্যটির কাছে এসে দামাদামি করার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। পণ্যটি এমনও নয় যে, বাজার মন্দা হওয়ার কারণে তাকে তাচ্ছিল্য করা হবে বা কম মূল্যে বিক্রি করা হবে কিংবা ক্রেতা কম হওয়ার কারণে অভাবী ক্রেতাদের কাছে তা বাকীতেই বিক্রি করা হবে। পণ্যটির মালিক শুধু এটিকে জানের বিনিময়েই বিক্রি করতে চান। এ ছাড়া অন্য কোন মূল্য তিনি গ্রহণ করতে রাজী নন। সুতরাং এটি ক্রয় করার অযোগ্য লোকেরা কেটে পড়ল। এরপর জান্নাতের প্রেমিকরা সামনে আসল। তারা অপেক্ষা করতে লাগল, তাদের মধ্যে কে জানের বিনিময়ে এটি অর্জন করতে চায়। পণ্যটি তাদের সামনে ঘুরতে লাগল। পরিশেষে তাদের হাতে এসে ধরা দিল, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবেনা। এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী"। (সূরা মায়েদা-৫:৫৪)

যখন জান্নাত ও মুহাব্বাতের দাবীদারের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন কার দাবীটি সঠিক তা যাচাই করার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ চাওয়া হল। কেননা শুধু দাবী করলেই যদি মানুষকে সবকিছু দেয়া হত তাহলে বিনা প্রমাণে একজন অন্যজনের রক্ত ও সম্পদ দাবী করত। সুতরাং মানুষের মধ্যে দাবীদারের সংখ্যা প্রচুর। তাই বলা হল, সাক্ষী ছাড়া দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"হে রসূল! বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু"। (সূরা আল-ইমরান-৩:৩১) এই আয়াত শুনে সকলেই পিছিয়ে পড়ল। যারা কথায়, কাজে ও আচার-আচরণে রসূল ﷺ এর অনুসরণ করে শুধু তারাই রয়ে গেল। এবার তাদের সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজন হল। যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারে ভীত হবেনা প্রকৃতপক্ষে তারাই আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসে। সুতরাং যারা কথায় ও কাজে রসূল ﷺ এর সুন্নাতের অনুরণের দাবী করে; কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে প্রস্তুত নয় তাদের অধিকাংশই কেটে পড়ল। প্রকৃত মুজাহিদগণ সামনে আসল। তাদেরকে বলা হল, আল্লাহর প্রতি এবং রসূলের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের জান ও মাল তাদের নিজেদের নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা

তাদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের সাথে যেই বিষয়ে চুক্তি হয়েছে, তা সোপর্দ করে দাও। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে উভয় পক্ষের উপরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা জরুরী। ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করবে আর বিক্রেতা পণ্য সোপর্দ করে দিবে।

ব্যবসায়ীগণ (ঈমানদারগণ) যখন ক্রেতার সুমহান মর্যাদা, মূল্যের বিশালতা, চুক্তি সম্পাদনে মধ্যস্থতাকারীর মহাত্ম এবং যেই কিতাবে চুক্তিটি লিখিত আছে তার মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারল তখন পণ্যটির মর্যাদা ও শান-শওকত সম্পর্কে অবগত হল। তারা বুঝতে সক্ষম হল যে এটি (মুমিনের জান) এমন একটি পণ্য, যা পৃথিবীর অন্যান্য পণ্যের মত নয়। সুতরাং তারা দেখল যে, সস্তা মূল্যে এবং সীমিত কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে এটিকে বিক্রি করে দেয়া মারাত্মক ক্ষতিকর ও ভুল হবে। কারণ দুনিয়ার স্বাদ ও সম্পদ ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের ফলাফল সুদূর প্রসারী। যারা সামান্য স্বাদ ও স্বার্থের বিনিময়ে স্থায়ী সুখ-শান্তিকে বিক্রি করে দেয় তাদেরকে মূর্খদের কাতারেই গণ্য করা হয়।

সুতরাং মুজাহিদরা স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে ক্রেতার (আল্লাহর) সাথে বায়আতুর রিযওয়ানের চুক্তি সম্পাদন করল এবং বলল- আল্লাহর শপথ! আমরা কখনই এই বায়আত (চুক্তি) ভঙ্গ করব না।

সুতরাং যখন চুক্তিটি সম্পাদিত ও পূর্ণ হল এবং মুজাহিদগণ পণ্য সোপর্দ করল তখন তাদেরকে বলা হল এখন তোমাদের জান ও মাল আল্লাহর মালিকানায় চলে গেছে ।

তবে এখন তা পূর্বের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ ও সবল অবস্থায় এবং বৃদ্ধিসহকারে তোমাদের নিকটই ফেরত দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

"আর যারা আল্লাহ্র রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করোনা। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত"। (সূরা আল-ইমরান-৩:১৬৯) তাদেরকে আরও বলা হল, লাভ করার জন্য তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের জান ও মাল ক্রয় করা হয় নি; বরং এই ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তোমাদের থেকে সাহসিকতা ও দানশীলতা প্রকাশ পায় এবং মূল্য ও পণ্য উভয়টিই তোমাদের কাছে ফেরত দেয়া যায়।

প্রিয় পাঠক! আপনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘটনাটি নিয়ে চিন্তা করুন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাছ থেকে একটি উট ক্রয় করেছিলেন। তিনি জাবেরকে উটের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করলেন, তার সাথে আরও বাড়িয়ে দিলেন এবং পরিশেষে তাঁর উট তাঁকেই ফেরত দিলেন। প্রিয় পাঠক! আপনি সেই সাথে জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পিতা আব্দুল্লাহএর ঘটনাও স্মরণ করুন। আল্লাহ্ তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন, তাও স্মরণ করুন। জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পিতা আব্দুল্লাহ্ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাবেরকে বললেন- হে জাবের! আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পিতাকে জীবিত করেছেন। তাঁর সাথে সরসূরি এবং খোলাখুলি কথা বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলেছেন- তুমি চাও। যা চাইবে তাই তোমাকে দেয়া হবে। সুতরাং তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় জীবিত করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন। আমি দ্বিতীয়বার আপনার রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হব।

সেই মহান আল্লাহ্ অতীব পবিত্র, যার দয়ার সাগর এত বিশাল যে, সৃষ্টির জ্ঞান দ্বারা তা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তিনি মুমিন মুজাহিদ বান্দার পণ্য তাকেই ফেরত দেন, মূল্যও ফেরত দেন, চুক্তি পরিপূর্ণ করার তাওফীকও দেন, পণ্যের দোষ থাকলে কিনে নেন এবং ভালভাবে মূল্য পরিশোধ করেন। বান্দার

নফসকে নিজের মালের বিনিময়ে ক্রয় করেন। অতঃপর পণ্য ও মূল্য উভয়টিই ফেরত দিয়ে বান্দার এবং চুক্তিপত্রের প্রশংসা করেন। অথচ তাঁর তাওফীক ও ইচ্ছাতেই চুক্তি অনুযায়ী বান্দার আমল সংঘটিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা এবং দারুস্ সালাম তথা জান্নাতের দিকে আহবানকারী মুহাম্মাদ ﷺ গর্বিত আত্মাসমূহ এবং উচ্চ আকাঙ্খা পোষণকারীদেরকে সজাগ করেছেন। ঈমানের আহবানকারী (মুহাম্মাদ) উন্মুক্ত কর্ণের এবং জীবন্ত প্রাণের অধিকারীদেরকে শুনিয়ে দিয়েছেন। এই শ্রবণ থেকেই আবরারদের (সৎকর্মশীলদের) মঞ্জিলের দিকে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। দারুল কারার তথা জান্নাত তাদের একমাত্র ঠিকানা। সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত তাদের সফর চলতেই থাকবে। রসূল ﷺ বলেন-

«انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَلَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ»

"আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির যিম্মাদার হবেন, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উদ্দেশ্যে বের হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- তার বের হওয়া কেবল আমার প্রতি ঈমান ও আমার রসূলদেরকে সত্যায়নের কারণেই। তার সাথে আমার এই অঙ্গীকার রয়েছে যে, হয়ত আমি তাকে বিনিময় প্রদান করব অথবা গনীমতের মালামালসহ ঘরে ফিরিয়ে আনব অথবা শাহাদাতের মাধ্যমে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। রসূল ﷺ বলেন- আমার উম্মাতের উপর যদি কষ্ট না মনে করতাম, তাহলে কোন যুদ্ধ হতেই আমি পিছিয়ে থাকতামনা। আমার ভাল লাগে যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই। অতঃপর জীবিত হয়ে আবার শহীদ হই। অতঃপর জীবিত হয়ে আবার শহীদ হই"।[২৩০] তিনি আরও বলেন-

«مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, আল্লাহই ভাল জানেন কে তাঁর পথে জিহাদ করে, সে এমন এক সিয়ামদারের ন্যায় যে অবিরাম রোজা রাখে ও সলাত আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীর ব্যাপারে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, সে মৃত্যু বরণ করলে তাকে জান্নাত দান করবেন অথবা নিরাপদে পুরস্কার ও গণীমতসহ ঘরে ফিরিয়ে আনবেন"।[২৩১] রসূল ﷺ আরও বলেন-

«لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

"আল্লাহর রাস্তায় একটা সকাল অথবা একটা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত সকল কিছু থেকে উত্তম"।[২৩২] তিনি আরও বলেন- তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। কেননা আল্লাহর রাস্তায়

২৩০. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, তাও. হা/৩৬
২৩১. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ, তাও. হা/২৭৮৭
২৩২. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ।২৭৮৭তাও. হা/২৭৯২, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/১৬৫১, মিশকাত, হাএ. হা/৩৭৯২

জিহাদ করা বেহেশতের অন্যতম একটি দরজা। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী হতে মুক্ত করেন।

রসূল ﷺ আরও বলেন- আমি ঐ ব্যক্তির যিম্মাদার, যে আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে, আনুগত্য করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। তার জন্য রয়েছে জান্নাতের এক পার্শ্বে একটি ঘর, জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর এবং জান্নাতের উপরে একটি ঘর। যে উপরোক্ত আমল করবে তথা রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, আনুগত্য করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, কোন কল্যাণই তার হাত ছাড়া হবেনা এবং কোন অকল্যাণেরই তার ভয় থাকবেনা। সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই মৃত্যু বরণ করুক। রসূল ﷺ আরও বলেন-

«مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»

"একটি উটনী দোহন করতে যতটুকু সময় লাগে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ঠিক ততটুকু সময় জিহাদ করবে, তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে"।[২৩৩] রসূল ﷺ বলেন-

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ»

"জান্নাতের একশটি স্তর রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তা মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রত্যেক দু' স্তরের মধ্যকার ব্যবধান হচ্ছে আসমান ও যমীনের ব্যবধানের সমান। সুতরাং যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তখন তোমরা জান্নাতুল ফিরদাউস চাও। কেননা এটি হচ্ছে জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। বর্ণনাকারীর ধারণাঃ রসূল ﷺ তারপর বলেছেন- উহার উপর আল্লাহর আরশ এবং তা থেকে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়েছে"।[২৩৪]

রসূল ﷺ আরও বলেন- যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে, ঋণদারকে ঋণ পরিশোধ করতে এবং চুক্তিবদ্ধ কোন দাসকে দাসত্বের বন্ধন মুক্ত হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ তাঁকে সেই দিন স্বীয় ছায়া দান করবেন, যেই দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবেনা।[২৩৫] রসূল ﷺ আরও বলেন-

«مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»

"যে ব্যক্তির দু'পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলিমাখা হবে তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন"।[২৩৬] রসূল ﷺ আরও বলেন-

«لاَ يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيمَانٌ فِى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي وَجْهِ عَبْدٍ»

---

২৩৩. মিশকাত, হাএ. হা/৩৮২৫
২৩৪. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ, তাও. হা/২৭৯০
২৩৫. মুসনাদে আহমাদ। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। সিলসিলায়ে যঈফা, হা/৪৫৫৫।
২৩৬. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জুমআ, তাও. হা/৯০৭

"কৃপণতা ও ঈমান একই ব্যক্তির অন্তরে একত্রিত হতে পারেনা এবং আল্লাহর রাস্তার ধুলোবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া একই ব্যক্তির চেহারায় একত্রিত হতে পারেনা"।[২৩৭] রসূল ﷺ আরও বলেন-

«رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِى كان يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُه وَأَمِنَ الفَتَّان»

"আল্লাহর রাস্তায় একদিন এবং এক রাত পাহারা দেয়া একমাস দিনের বেলায় সিয়াম রাখা এবং রাতের বেলায় কিয়াম করা হতেও উত্তম। পাহারা দেয়া অবস্থায় সে যদি মারা যায়, তাহলে সে জীবিত থাকতে যে আমল করত তার জন্য সেই আমলের ছাওয়াব লেখা হতে থাকবে, তাঁকে রিযিক দেয়া হতে থাকবে এবং সে ফিতনা হতে নিরাপদ থাকবে"।[২৩৮]

কোন একজন লোক ভ্রমণকালে সারা রাত ঘোড়ায় আরোহন করে মুসলমানদেরকে সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত পাহারা দিল। শুধু সলাত আদায়ের জন্য কিংবা পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া সারা রাত সে ঘোড়া থেকে অবতরণ করেনি। তাকে লক্ষ্য করে নাবী ﷺ বলেছেন- তোমার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে গেছে। আজকের পরে যদি তুমি আর কোন আমল নাও কর, তাহলে তোমার কোন অসুবিধা হবেনা।[২৩৯] ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নাবী ﷺ থেকে আরও বর্ণনা করেন যে,

«مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا، أَوْ يُخَلِّفْ غَازِيًا فِى أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ»

"যে ব্যক্তি জিহাদ করবেনা অথবা কোন মুজাহিদের হাতিয়ার প্রস্তুত করে দিবেনা কিংবা কোন মুজাহিদের পরিবার-পরিজনকে ভালভাবে দেখা-শুনা করবেনা, কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অবশ্যই কোন না কোন মসিবতে আক্রান্ত করবেন।"[২৪০] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"নিজের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা"। (সূরা বাকারা-২:১৯৫)

আবু আইয়্যুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা।

নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে। (১) রিয়াকারী আলেম। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের সুনাম ও প্রশংসা অর্জনের আশায় ইলম অর্জন করবে। (২) যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য দান করবে এবং (৩) যে ব্যক্তি শুধু মানুষকে বীরত্ব প্রদর্শনের নিয়তে জিহাদ করে শহীদ হবে।[২৪১]

---

২৩৭. নাসাঈ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ, নাসাঈ, মাপ্র. হা/৩১১১

২৩৮. মুসলিম ও আবু দাউদ, মিশকাত, হাএ. হা/৩৭৯৩

২৩৯. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ। ইমাম আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ, হা/২১৮৩

২৪০ . আবু দাউদ, আলএ. হা/২৫০৩, সুনান ইবনে মাজাহ, তাও. হা/২৭৬২, মিশকাত, হাএ. হা/৩৮২০, সহীহ হাসান।

২৪১. সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী।

জিহাদের ময়দানে অবতরণের পূর্বে নাবী ﷺ এর হিদায়াত

নাবী ﷺ দিবসের প্রথমভাগে শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে অবতরণ করা পছন্দ করতেন। সফরে বের হওয়ার সময়ও তিনি দিবসের প্রথম ভাগেই বের হতেন। দিবসের শুরুতে জিহাদ শুরু না করতে পারলে সূর্য ঢলা, বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং মদদে ইলাহী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

জিহাদের শুরুতে তিনি সাহাবীদের থেকে এই মর্মে বায়আত নিতেন যে, তারা পলায়ন করবেনা। কখনও তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর রাহে জিহাদ করার এবং ইসলামের উপর অবিচল থাকার বায়আত নিতেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি হিজরতের বায়আতও নিয়েছেন। ঠিক তেমনি আল্লাহর তাওহীদ এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার বায়আত নিয়েছেন।

তিনি একদল সাহাবীর সাথে এই মর্মে বায়আত নিলেন যে, তারা কারও কাছে কিছুই চাইবেনা। তাই তাদের কারও হাত থেকে ঘোড়ার চাবুক পড়ে গেলে নিজেই বাহন থেকে নেমে চাবুক উঠিয়ে নিতেন। কাউকে এ কথা বলতেন না যে, আমার চাবুকটি উঠিয়ে দাও।

জিহাদের ময়দানে নামার আগে যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণের বিষয়ে তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করতেন। চলার পথে তিনি সবার পিছনে চলতেন এবং দুর্বলদেরকে সাথে নিয়ে চলতেন। কেউ পিছনে পড়ে গেলে তাকে স্বীয় বাহনের পিছনে উঠিয়ে নিতেন। চলার পথে সাহাবীদের সাথে তিনি সর্বাধিক নরম ব্যবহার করতেন।

তিনি কোন জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে তাওরীয়া করতেন (যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, সেদিকের কথা না বলে অস্পষ্ট করে অন্যদিকে যাওয়ার কথা বলতেন)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তিনি হুনাইনের যুদ্ধে বের হওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন নজদের রাস্তা কোন দিকে? সেখানকার অবস্থা কেমন? সেখানে কোন সম্প্রদায়ের দুশমনরা বসবাস করে? ইত্যাদি। এভাবে তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে কার্য সম্পাদন করতেন। আর তিনি বলতেন- যুদ্ধ হচ্ছে এক প্রকার ধোঁকা। তিনি গোয়েন্দা পাঠিয়ে শত্রুদের খবরা-খবর এবং তাদের গতিবিধি জানার চেষ্টা করতেন এবং অগ্রগামী সৈনিকদেরকে তা বলে দিতেন। তিনি জিহাদের সময় পাহারাদারও নিযুক্ত করতেন।

আর যখন শত্রুদের সাথে মুকাবেলা শুরু হত, তখন তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন, তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতেন। সে সময় তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করতেন এবং তাদের আওয়াজ খুব নীচু রাখতেন।

জিহাদের ময়দানে তিনি সৈনিকদেরকে সুন্দরভাবে সাজাতেন এবং সকল দিকেই খেয়াল রাখতেন। তাঁর আদেশ পেয়েই সৈন্যরা সামনের দিকে অগ্রসর হত। তিনি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করতেন। কখনও তিনি দু'টি লৌহ বর্ম পরিধান করে বের হয়েছেন। যুদ্ধের সময় তিনি ছোট ও বড় আকারের পতাকা ধারণ করতেন।

তিনি যখন কোন গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করে জয়লাভ করতেন, তখন তিনি তাদের আঙ্গিনায় তিন দিন অবস্থান করতেন। অতঃপর সেখান থেকে ফেরত আসতেন।

তিনি যখন চূড়ান্ত আক্রমণের ইচ্ছা করতেন তখন আযানের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। সেখান থেকে আযানের শব্দ শুনা গেলে হামলা করা থেকে বিরত থাকতেন। আর আযানের শব্দ না

শুনলে আক্রমণ করতেন। কখনও তিনি রাতে শত্রুদের উপর হামলা করতেন। কখনও তিনি দিনের বেলাতেই হঠাৎ আক্রমণ করতেন।

তিনি বৃহস্পতিবার সকাল বেলা বের হওয়া পছন্দ করতেন। রসূল ﷺ এর সৈনিকরা যখন ময়দানে অবতরণ করতেন, তখন তাদের একজন অন্যজনের সাথে মিলে এবং সারিবদ্ধ হয়ে এমনভাবে দাঁড়াতেন যে, একটি চাদর তাদের উপর ফেলে দিলে তা সকলকেই আবৃত করে ফেলত।

তিনি সৈন্যদেরকে কাতারবন্দী করতেন এবং নিজ হাতে কাতার সোজা করতেন। তখন তিনি বলতেন- হে অমুক! আগে বাড়। হে অমুক পিছনে সরে এসো। তিনি পছন্দ করতেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ গোত্রের পতাকা তলে থেকেই যুদ্ধ করুক। শত্রুদের সাথে মুকাবেলা করার সময় তিনি বলতেন

«اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَاب ومُجْرِى السَّحَاب وهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وانصُرْنَا عَلَيْهِم»

"হে আল্লাহ্! কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রু সৈন্যদেরকে পরাজিতকারী। তাদেরকে পরাজিত কর এবং আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর"। কখনও তিনি বলতেন-

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ والسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾

"এ দল তো অচিরেই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (সূরা কমার-৫৪:৪৫-৪৬) তিনি আরও বলতেন- হে আল্লাহ্! আমাদের উপর তোমার সাহায্য নাযিল কর"।

তিনি আরও বলতেন-

«اللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وأَنتَ نَصِيرِى وَبِكَ أُقَاتِلُ»

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার বাহু (শক্তি)। তুমি আমার মদদগার। তোমার পথেই এবং তোমার জন্যেই আমি যুদ্ধ করি"।[২৪২]

যুদ্ধ যখন প্রকট ও কঠোর আকার ধারণ করত এবং শত্রুরা তাঁর নিকটবর্তী হত, তখন তিনি নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ করে বলতেন- "আমি সত্য নাবী, মিথ্যুক নই", আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র"। যুদ্ধ কঠিন আকার ধারণ করলে লোকেরা রসূল ﷺ এর কাছে এসে আশ্রয় নিত। যুদ্ধের সময় রসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের জন্য এমন কিছু সংকেত নির্ধারণ করতেন, যার মাধ্যমে তাদেরকে চিনা যেত। কোন এক যুদ্ধে তাদের সংকেত ছিল, 'আমিত', 'আমিত', কোন এক যুদ্ধে ছিল 'ইয়া মানসুর আমিত' আবার অন্য এক যুদ্ধে তাদের সংকেত ছিল حَم لا يُنْصَرُونَ ।

যুদ্ধের সময় তিনি লৌহ বর্ম ও হিলমেট পরিধান করতেন, গলায় তরবারী ঝুলাতেন, হাতে বর্শা ও আরবী কামান বহন করতেন এবং আত্মরক্ষার জন্য ঢাল ব্যবহার করতেন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে অহংকার করা পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন- আল্লাহ্ তা'আলা কিছু কিছু অহংকার পছন্দ করেন আর

---

২৪২. সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৫৮৪, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/১২৯৩২

কিছু কিছু অহংকার পছন্দ করেন না। তিনি যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব ও অহংকার প্রদর্শন করা পছন্দ করেন এবং সাদকাহ্‌ করার সময় অহংকার করাকে ভালবাসেন। কিন্তু পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে অহংকার করাকে অপছন্দ করতেন।

তিনি একবার তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় মিনজানিক তথা কয়েকজন মিলে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র সদৃশ এক প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধের সময় তিনি নারী ও শিশু হত্যা করতে নিষেধ করতেন। আর যুদ্ধের মাঠে অল্প বয়স্ক কোন লড়াইকারী দেখলে তিনি তাকে পরীক্ষা করতেন। তার মধ্যে বালেগ হওয়ার আলামত পরিলক্ষিত হলে তাকে হত্যা করতেন। আর তা না হলে ছেড়ে দিতেন।

কোন বাহিনীকে প্রেরণের সময় তিনি তাদেরকে তাকওয়া তথা আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন। তিনি তখন বলতেন- তোমরা আল্লাহর নামে চল, আল্লাহর পথে চল, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, মুছলা তথা কাফেরদেরকে হত্যা করার সময় অঙ্গহানী করোনা, গাদ্দারী করোনা, বাড়াবাড়ি করোনা এবং কোন শিশুকে হত্যা করোনা।

তিনি শত্রুদের দেশে কুরআন নিয়ে ভ্রমণ করতে নিষেধ করতেন। তিনি যুদ্ধের আমীরকে যুদ্ধ শুরু করার আগে শত্রুদের কাছে তিনটি প্রস্তাব করার আদেশ দিতেন। (১) ইসলাম কবুল করার এবং কাফেরদের ভূমি ত্যাগ করে হিজরত করে মুসলমানদের দেশে চলে আসার প্রতি আহবান জানাতে বলতেন। (২) হিজরত ব্যতীত শুধু ইসলাম কবুলের দিকে আহবান জানানোর আদেশ দিতেন। এটি গ্রহণ করলে তাদেরকে অন্যান্য বেদুঈন (গ্রাম্য লোক) মুসলিমদের মতই গণ্য করা হবে। গণীমতের সম্পদে তাদের কোন হিস্‌সা (অংশ) থাকবেনা। (৩) জিযয়া তথা কর প্রদান করে নিজেদের ধর্মের উপরই অবশিষ্ট থাকবে।

তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি মেনে নিলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার আদেশ দিতেন। আর উপরোক্ত প্রস্তাবের কোনটিই না মানলে আল্লাহর উপর ভরসা এবং তাঁর সাহায্য কামনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিতেন।

গণীমতের মাল বণ্টন

তিনি যখন দুশমনদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতেন, তখন একজন ঘোষককে ঘোষণা করার আদেশ দিতেন। তখন গণীমতের সমস্ত মাল একত্রিত করা হত। গণীমত বন্টনের পূর্বে নিহত কাফেরের সালাব তথা তার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ তার হত্যাকারীকেই দিয়ে দিতেন। অতঃপর তিনি গণীমতের মাল থেকে পাঁচ ভাগের একভাগ বের করে নিতেন। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি তা ব্যয় করতেন এবং মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে খরচ করার আদেশ দিতেন। আর যা বাকী থাকত, তা থেকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে দান করতেন, যাদের জন্য গণীমতের মাল থেকে অংশ দেয়ার বিধান রাখা হয়নি। যেমন নারী, শিশু এবং দাস-দাসীগণ। অতঃপর বাকী সম্পদ মুজাহিদদের মাঝে সমান হারে ভাগ করে দিতেন। অশ্বারোহী যোদ্ধাকে তিন অংশ প্রদান করতেন। এক অংশ অশ্বারোহী মুজাহিদের জন্য। দুই অংশ তার ঘোড়ার জন্য। পদাতিক সৈনিককে দিতেন এক অংশ। এটিই সঠিক মত। তিনি গণীমতের মূল সম্পদ থেকে প্রয়োজন অনুপাতে মুসলমানদের কাজেও ব্যয় করতেন।

কোন এক যুদ্ধে তিনি সালামা বিন আকওয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পদাতিক ও অশ্বারোহীর অংশ একত্রিত করে মোট পাঁচ অংশ প্রদান করেছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর বীরত্ব এবং অন্যান্য ক্রিয়া কলাপের কারণেই তিনি এমনটি করেছিলেন। গণীমতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল ও শক্তিশালীর মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। সকলকেই সমান করে প্রদান করতেন। তবে তিনি কাউকে অতিরিক্ত কিছু দিলে সে কথা ভিন্ন। শত্রুদের দেশে হামলা করার সময় তিনি প্রথমে সেনাবাহিনীর ছোট একটি দল প্রেরণ করতেন। তারা যদি গণীমত সংগ্রহ করতে পারত তাহলে তা থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকী চার অংশের এক অংশ নফল হিসাবে হামলাকারী সৈনিকদের মাঝে ভাগ করে দিতেন। যা বাকী থাকত তা প্রেরিত সৈনিক এবং অন্যান্য সৈনিকদের মাঝে ভাগ করে দিতেন। অগ্রে প্রেরিত সৈনিকরা যখন ফেরত এসে পুনরায় আক্রমণ করে গণীমত অর্জন করত তখন তিনি গণীমত অর্জনকারী সৈনিকদেরকে গণীমতের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করতেন। কেননা একবার যুদ্ধ করে ফেরত এসে পুনরায় আক্রমণ করতে যাওয়া খুব কঠিন। কারণ তখন তারা এবং তাদের বাহনগুলো দুর্বল থাকে। তাই তিনি উৎসাহ দেয়ার জন্য এবার প্রথমবারের চেয়ে বেশী প্রদান করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি সৈনিকদের কাউকে অতিরিক্ত দেয়াকে অপছন্দ করতেন এবং বলতেন- শক্তিশালী মুমিনগণ যেন তাদের দুর্বলদেরকে এই অংশ ফেরত দেয়।

গণীমতের মাল থেকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জন্য একটি অংশ বের করে নিতেন। এই অংশকে সাফী (নির্বাচিত অংশ) বলা হত। তিনি ইচ্ছা করলে বন্টনের পূর্বেই কোন দাস বা দাসী বা ঘোড়া নিয়ে নিতেন।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী সাফীয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাফীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি সাফীয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে খায়বারের গণীমত ভাগ হওয়ার পূর্বেই নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর যুল-ফিকার নামক তরবারিটিও সাফীর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

যারা মুসলমানদের সেবামূলক কাজে মশগুল থাকার কারণে জিহাদে যেতে পারতেন না, তাদেরকেও তিনি গণীমতের মালের অংশ দিতেন। উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তিনি গণীমতের মাল থেকে তাঁকে অংশ দিয়েছেন। কারণ তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসুস্থ কন্যার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন- উছমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহর রসূলের কাজে ব্যস্ত আছে। সুতরাং তিনি তাঁর জন্য অংশ নির্ধারণ করেছেন।

সাহাবীগণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে জিহাদ ও গাযওয়ায় থাকা অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ও করতেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দৃশ্য দেখতেন। কিন্তু তিনি এর কোন প্রতিবাদ করতেন না। সাহাবীগণ জিহাদে দুই প্রকারের শ্রমিকও নিয়োগ করতেন। (১) কোন ব্যক্তি জিহাদে বের হওয়ার সময় স্বীয় খেদমতের জন্য কাউকে ভাড়া করে নিয়ে যেত। (২) আবার কোন কোন সাহাবী কাউকে অর্থের বিনিময়ে জিহাদের জন্যও ভাড়া করে নিতেন। এই প্রকার মুজাহিদদেরকে জায়েল বলা হত। এদের ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- মুজাহিদের জন্য বিনিময় রয়েছে। জায়েলের জন্যও বিনিময় রয়েছে। এতে মুজাহিদের বিনিময়ে মোটেই কমতি হবেনা।

তারা গণীমতের মাল হতে অন্য আরও দুইভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। (১) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এই শর্তে একসাথে যুদ্ধ করবে যে, গণীমতের মাল পেলে তারা উভয়ে ভাগ করে নিবে। (২) কেউ তার উট বা ঘোড়া অন্য কাউকে এই শর্তে দিত যে, সে এর উপর আরোহন করে জিহাদ করবে। গণীমতের

মাল হস্তগত হলে উভয়ে সমানভাবে ভাগ করে নিবে। কখনও এমন হত যে, একটি তীর-ধনুক গণীমত হিসাবে পাওয়া গেলে একজনের ভাগে আসত তীর আর অন্যজনের ভাগে পড়ত তীরের ফলা। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন- আমি, আম্মার বিন ইয়াসির এবং সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই শর্তে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম যে, আমরা যা পাবো, তা আমরা তিন জনে ভাগ করে নিব। সা'দ দু'টি কয়েদী নিয়ে আসল। আমি এবং আম্মার কিছুই নিয়ে আসতে পারলামনা।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও অশ্বারোহী বাহিনী আবার কখনও পদাতিক বাহিনী প্রেরণ করতেন। জিহাদে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হওয়ার পর যারা ময়দানে উপস্থিত হত তিনি তাদেরকে গণীমতের কোন অংশ দিতেন না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালেবকেই অংশ দিতেন। বনী আবদে শামস্ ও বনী নাওফালকে কোন অংশ দিতেন না। তিনি বলতেন- বনী হাশেম এবং বনী আব্দুল মুত্তালেব পরস্পর সম্পৃক্ত। এই বলে তিনি এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে জালের মত বানালেন। তিনি আরও বলতেন- তারা জাহেলীয়াতে বা ইসলামী যুগে কখনই আমাদের থেকে আলাদা হয়নি।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যুদ্ধ করে সাহাবীগণ মধু, আঙ্গুর এবং অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য পেতেন। তারা এগুলো খেয়ে ফেলতেন। গণীমতের মাল হিসাবে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পেশ করতেন না।

ইবনে আবী আওফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনারা কি যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত খাদ্য-দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করতেন? তিনি বললেন- আমরা খায়বারের দিন কিছু খাদ্য পেলাম। লোকেরা এসে তাদের প্রয়োজন অনুসারে সেখান থেকে খেয়ে যেত। কোন কোন সাহাবী বলেন- আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আখরোট খেয়ে নিতাম, মুজাহিদদের মাঝে বন্টনের জন্য তা পেশ করতামনা। এগুলো আমরা এত পরিমাণ পেতাম যে, সফর থেকে ফিরে এসেও আমাদের থলিগুলো ভর্তি পেতাম।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণীমতের মাল লুটতরাজ করতে এবং শত্রুদেরকে মুছলা করতে অর্থাৎ নাক-কান কেটে অঙ্গহানি করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন- গণীমতের মাল লুটকারী আমাদের দলের অন্তর্ভূক্ত নয়।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণীমত হিসেবে প্রাপ্ত জন্তুর উপর আরোহন করে তাকে দুর্বল করে ফেরত দিতে এবং গণীমতের কাপড় পরিধান করে পুরাতন করে ফেরত দিতে নিষেধ করেছেন। তবে যুদ্ধাবস্থায় এগুলো দিয়ে উপকার গ্রহণ করতে নিষেধ করেননি।

গণীমতের মাল খেয়ানত করতে তিনি শক্তভাবে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন- কিয়ামতের দিন গণীমতের মাল খেয়ানতকারীর জন্য রয়েছে লজ্জা, আগুন এবং অপমান। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গোলাম (দাস) মিদআম যখন যুদ্ধে আহত হল, তখন কতক সাহাবী বলল- তার জন্য রয়েছে জান্নাতের মুবারকবাদ। এ কথা শুনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- কখনই নয়, ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। খায়বারের দিন সে যেই চাদরটি মালে গণীমত বন্টনের পূর্বেই চুরি করেছিল সেটি আগুনে পরিণত হয়ে তাকে জ্বালাতে থাকবে। এ কথা শুনে লোকদের কেউ জুতার একটি ফিতা বা কেউ দু'টি ফিতা নিয়ে এসে ফেরত দিতে লাগল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বলতে লাগলেন এই একটি বা দু'টি ফিতাও আগুনে পরিণত হবে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আসবাব-পত্র বহন ও দেখাশুনাকারী লোকটি যখন মারা গেল তখন তিনি বললেন- সে জাহান্নামে যাবে। লোকেরা তার অবস্থা তল্লাশি করে দেখতে পেল, সে গণীমতের মাল থেকে একটি চাদর চুরি করে রেখে দিয়েছিল।

লোকেরা কোন এক যুদ্ধে বলতে লাগল- অমুক শহীদ, অমুক শহীদ হয়েছে। তারা এক লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ও অনুরূপ বলল। নাবী ﷺ তখন বললেন- কখনই নয়। আমি তাকে জাহান্নামে সেই চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি, যা সে গণীমতের মাল থেকে চুরি করেছিল। অতঃপর তিনি বললেন- হে খাত্তাবের পুত্র! যাও এবং মানুষের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, ঈমানদার ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে যেতে পারবেনা। কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

তিনি যখন কোন জিহাদে গণীমতের মাল পেতেন তখন বিলালকে এই মর্মে ঘোষণা দেয়ার আদেশ দিতেন যে, লোকেরা যেন গণীমতের মাল নিয়ে আসে। নাবী ﷺ তা থেকে এক পঞ্চমাংশ নিতেন এবং বাকী অংশ ভাগ করতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি ঘোষণা হওয়ার এবং মালে গণীমত ভাগ হয়ে যাওয়ার পর একটি লাগাম নিয়ে আসল। রসূল ﷺ তখন তাকে বললেন- তুমি কি বেলালের ঘোষণা শুন নি? সে বলল- হ্যাঁ, শুনেছি। তিনি বললেন- তাহলে তুমি তা আগে নিয়ে আস নি কেন? লোকটি ক্ষমা চাইল। তখন তিনি বললেন- তুমি এটি কিয়ামতের দিন নিয়ে আসবে। আজ এটি আমি তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করবনা।

নাবী ﷺ গণীমতের চোরাই মাল আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলার আদেশ দিয়েছেন। তাঁর পরে আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাই করতেন এবং চোরকে প্রহারও করা হত। এর জবাবে বলা হয় যে, পূর্বে উল্লেখিত হাদীসগুলো দ্বারা পুড়ে ফেলার আদেশ রহিত হয়ে গেছে। কেননা তাতে পুড়ে ফেলার আদেশ নেই। আবার কোন কোন আলেম বলেছেন- সাবধানতা স্বরূপ এবং ভয় দেখানোর জন্য এরূপ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর এ জাতীয় বিষয়গুলো ইমামদের ইজতেহাদের উপর নির্ভর করে। শরীয়তে এগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন বিধান নেই। যেমন তৃতীয় এবং চতুর্থবার মদ পানকারীকে হত্যা করার বিষয়টি ইমামদের ইজতেহাদের অধীন। এটি শরীতের নির্ধারিত শাস্তি নয়।

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে নাবী ﷺ এর হিদায়াত

যুদ্ধবন্দীদের কারও উপর তিনি অনুগ্রহ করতেন এবং ছেড়ে দিতেন। বনী হানীফার সরদার ছুমামা বিন উছালকে বন্দী করে তিনি মাসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন। পরে তিনি তাকে ছেড়ে দিলে সে মুসলমান হয়ে যায়। আবার কাউকে তা না করে হত্যা করতেন। যেমন তিনি আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূলের সাথে মাত্রাতিরিক্ত শত্রুতা পোষণ করার কারণে উকবা বিন আবী মুঈত ও নযর বিন হারিছকে হত্যা করেছেন। আবার কাউকে অর্থের বিনিময়েও ছেড়ে দিতেন। বদরের যুদ্ধে তিনি সকল বন্দীকে অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আবার কখনও মুসলিম বন্দীদের বিনিময়েও ছাড়তেন। এ সব কিছুই করতেন মুসলমানদের প্রয়োজনার্থেই। বদরের যুদ্ধে যখন তাঁর চাচা আব্বাস বন্দী হলেন, তখন আনসারগণ মুক্তিপন ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেয়ার সুপারিশ করলেন। নাবী ﷺ তখন বললেন- তোমরা তার জন্য একটি দিরহামও ছাড়বেনা। গণীমতের মাল বণ্টন হওয়ার পরও তিনি হাওয়াযেন গোত্রের বন্দীদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। গণীমতের হকদার সাহাবীগণ এটিকে খুশী মনে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর যারা এতে খুশী হতে পারেন নি, তিনি তাদেরকে প্রত্যেক বন্দীর বিনিময়ে গণীমতের অন্যান্য মাল হতে ছয় অংশ প্রদান করেছেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, বন্দীদের কারও মাল থাকতনা। তাই তিনি আনসারদের সন্তানদেরকে লেখা-পড়া শিখানোকেই বিনিময় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং কাজের বিনিময়ে বন্দিকে ছেড়ে দেয়াও জায়েয আছে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আরব বন্দীদেরকেও দাস বানানো জায়েয আছে এবং তাদের দাসীদেরকে ক্রয়সূত্রে বা গণীমত হিসাবে মালিক হয়ে তাদের সাথে সহবাস করাও জায়েয আছে। দাসীদের সাথে সহবাসের ক্ষেত্রে মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। শিশু সন্তানসহ কোন মহিলা বন্দী হলে তিনি মা ও তার সন্তানের পার্থক্য করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন- যে ব্যক্তি কোন শিশু ও তার মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার মাঝে এবং তার প্রিয়জনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন।[২৪৩]

কখনও কখনও কোন পরিবারের সকলেই বন্দী হয়ে আসত। তখন সকলকেই এক সাথে একজনের কাছে দিয়ে দিতেন, যাতে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ না ঘটে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একজন মুশরিক গোয়েন্দাকে হত্যা করেছেন। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করা সত্ত্বেও তিনি হাতেব বিন আবী বালতাআকে হত্যা করেন নি। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এই ঘটনা থেকে কেউ কেউ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, মুসলিম গোয়েন্দাকে হত্যা করা যাবেনা। এটি ইমাম শাফেঈ, আহমাদ এবং আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মত। আবার কেউ এই হাদীস থেকে হত্যা করা জায়েয হওয়ারও দলীল গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ মত পোষণ করেছেন। হাতেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হত্যা না করার কারণ হল তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম হলেই যদি হত্যা করা নাজায়েয হত তাহলে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করাকে হত্যা না করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করার কোন অর্থ হতনা; বরং মুসলিম হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হত। কেননা কোন হুকুমকে সাধারণ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করার পর খাস বিষয় উল্লেখ করা অর্থহীন। এটিই সঠিক এবং অধিক শক্তিশালী মত।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র সুন্নাত এটিও ছিল যে, মুশরিকদের দাসেরা মুসলমানদের দেশে চলে আসলে এবং মুসলমান হয়ে গেলে তাদেরকে আযাদ মনে করা হত। তার পবিত্র অভ্যাস এও ছিল যে, কেউ মুসলমান হলে তার কাছে যা কিছু থাকত, তিনি তার সবই নও মুসলিমকে দিয়ে দিতেন। ইসলাম কবুলের পূর্বে সে কিভাবে সেই সম্পদ উপার্জন করেছে, সেদিকে দৃষ্টি দেন নি। কাফেররা কুফরীর হালতে থাকাবস্থায় এবং যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের জান-মালের যত ক্ষতিই করেছে ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের থেকে সেই ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়নি। মুসলমানগণ তাদের হাতে সেই সমস্ত সম্পদ দেখতেন, কিন্তু তা ছিনিয়ে নেওয়ার কোন চেষ্টা করতেন না।

মক্কা বিজয় হলে কতিপয় মুহাজির নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তাদের ঐ সমস্ত বাড়িঘর ফেরত পাওয়ার দাবী করলেন, যেগুলো মুশরিকরা দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের কারও ঘর ফেরত দেন নি। কেননা তারা এগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় ছেড়ে দিয়েছিল। আর আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতে এর চেয়ে উত্তম ঘর দিয়েছেন। সুতরাং তারা যা আল্লাহর জন্য ছেড়ে

---

২৪৩. তিরমিযী, ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, মিশকাতুল মাসাবীহ, হা/৩৩৬১

দিয়েছেন, তাতে ফেরত আসার অধিকার তাদের নেই। শুধু তাই নয়, হাজ্জ-উমরা সম্পাদনের পর তিনি কোন মুহাজিরকে মক্কায় তিন দিনের বেশী অবস্থান করার অনুমতি দেননি। কেননা তিনি স্বীয় দেশকে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ছেড়ে দিয়েছেন এবং তা থেকে হিজরত করেছেন। সুতরাং তাতে ফেরত এসে পুনরায় বসবাস শুরু করার অধিকার তার নেই। এ জন্যই তিনি সা'দ বিন খাওলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ সে মক্কা হতে হিজরত করার পর পুনরায় ফেরত এসে মক্কাতেই মৃত্যু বরণ করেছিল।

গণীমত হিসাবে প্রাপ্ত যমীনে রসূল ﷺ এর হিদায়াত

রসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, বনী কুরায়যা, বনী নযীর এবং খায়বারের অর্ধেক ভূমি মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। মদীনা বিজয় করেছিলেন কুরআনের মাধ্যমে। মদীনাবাসীগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছে। সুতরাং তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে রেখে দিয়েছেন।

মক্কা বিজয়ের পর মক্কার যমীন মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়নি। কারণ স্বরূপ কেউ কেউ বলেন, এটি হচ্ছে মুসলমানদের পবিত্র ও ইবাদতের স্থান। তাই এটি আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের জন্য ওয়াক্ফ স্বরূপ। কেউ কেউ বলেছেন- যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলের যমীনের ব্যাপারে ইমামের স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে এগুলো ভাগ করে দিবেন অথবা ওয়াক্ফ হিসেবে রেখে দিবেন। কেননা নাবী ﷺ খায়বারের যমীন ভাগ করে দিয়েছেন এবং মক্কার যমীন ওয়াক্ফ হিসেবে রেখে দিয়েছেন। এতে বুঝা গেল উভয়টিই জায়েয আছে। আলেমগণ বলেন- যুদ্ধলব্ধ অন্যান্য সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা যমীনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মাত ব্যতীত অন্য কোন উম্মাতের জন্য গণীমতের মাল হালাল করেন নি। আল্লাহ তাদের জন্য কাফেরদের ভূমি যমীন ও বসতবাড়ি হালাল করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ - يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾

"যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন- হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামাত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নাবীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিষ দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি। হে আমার সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে"। (সূরা মায়েদা-৫:২০-২১) আল্লাহ্ তা'আলা ফেরাউনের দেশ, জাতি ও যমীন সম্পর্কে বলেন-

﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

"এরূপই হয়েছিল এবং বনী-ইসরাঈলকে করে দিলাম এসবের (যমীনের) মালিকানা"। (সূরা শুআরা-২৬:৫৯) এ থেকে বুঝা গেল যমীন ভাগ করা হবেনা। যমীনের বিষয়টি ইমামের অধীন। তিনি তাতে মুসলমানদের উপকার অনুযায়ী কাজ করবেন। রসূল ﷺ ভাগ করেছেন। আবার ভাগ করা ছেড়েও

দিয়েছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ভাগ করে দেন নি; বরং তাতে স্থায়ী টেক্স নির্ধারণ করেছেন। টেক্স আদায় করে তা জিহাদের কাজে ব্যয় করা হবে। যমীন ওয়াক্ফ করার অর্থ এটিই। এটি সেই ওয়াক্ফ নয়, যারা মালিকানা স্থানান্তরের অযোগ্য। বরং এটি বিক্রয়যোগ্য ওয়াক্ফ। এর উপরই উম্মাতের আমল। আলেমদের সর্ব সম্মতিক্রমে এর ওয়ারিছ হওয়া যাবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেছেন- বিবাহের মোহরানা হিসেবে এটি দেয়া জায়েয আছে। ওয়াক্ফকৃত বস্তু বিক্রি করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল এতে যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার হক নষ্ট হয়। মুসলমান সৈনিকদের জন্য খিরাজী যমীনে হক রয়েছে। সুতরাং বিক্রির মাধ্যমে এটি বাতিল হয়না। এই যমীন যে ক্রয় করবে তার কাছেও খিরাজী ভূমি হিসাবেই থাকবে। মালিকের সাথে অর্থের বিনিময়ে গোলামী হতে মুক্তির চুক্তিবদ্ধ গোলাম বিক্রির বিষয়টিও অনুরূপ। লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তার মধ্যে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাকে বিক্রি করা হলে ক্রেতার নিকট সে মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) অবস্থায়ই স্থানান্তরিত হবে। যেমন ছিল বিক্রেতার নিকট। বিক্রয়ের কারণে তার মুক্ত হওয়ার সুযোগ বাতিল হবেনা। (আল্লাহই ভাল জানেন)

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করতে সক্ষম মুসলিমদেরকে মুশরিকদের সাথে বসবাস করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন- আমি সেই মুসলিমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করছি, যে মুশরিকদের সাথে বসবাস করে। তিনি আরও বলেন- যে মুসলিম মুশরিকদের সাথে একত্রে এবং একসাথে বাস করবে, সে তাদের মতই হবে। তিনি আরও বলেন- তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবেনা। আর পশ্চিম আকাশে সূর্য না উঠা পর্যন্ত তাওবার দরজা বন্ধ হবেনা। অচিরেই কিয়ামতের পূর্বে হিজরতের পর (শাম দেশে) আরেকটি হিজরত হবে। তাই যমীনের উপর সর্বোৎকৃষ্ট লোক তারাই হবে, যারা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)এর হিজরতের স্থানে (শাম দেশে) হিজরত করবে।

যমীনের নিকৃষ্ট লোকেরাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে। যমীন তাদেরকে উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্ তাদেরকে বানর ও শুকরের সাথে হাশর করাবেন।[২৪৪]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিরাপত্তা চুক্তি, সন্ধি, অমুসলিমদের দূত, জিযইয়া গ্রহণ, আহলে কিতাব এবং মুনাফিকদের সাথে তাঁর আচরণ ও ওয়াদা-অঙ্গিকার পূরণ সম্পর্কে

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- সকল মুসলিমের অঙ্গিকার ও নিরাপত্তা একই রকম। তাদের সবচেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির অঙ্গিকার এবং নিরাপত্তা প্রদানও পূর্ণ করতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের নিরাপত্তা সম্পর্কিত চুক্তি ভঙ্গ করবে, তার উপর আল্লাহ্, ফিরিস্তা এবং সমস্ত মানুষের লা'নত। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। তিনি আরও বলেন- কোন ব্যক্তি এবং কোন গোত্রের মধ্যে যদি চুক্তি থাকে, তাহলে সেই চুক্তি যেন ভঙ্গ না হয়। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে সেই অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে পারে। আর কোন পক্ষ চুক্তির অবসান চাইলে অপর পক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে। যাতে উভয় পক্ষই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার বিষয়টি সমানভাবে জানতে পারে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন- যে ব্যক্তি কোন মানুষকে জানের নিরাপত্তা দেয়ার পর হত্যা করবে, আমি তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর থেকে

২৪৪.আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সিলসিলায়ে সহীহা, হা/৩২০৩।

আরও বর্ণনা করা হয় যে, যখনই কোন সম্প্রদায় অঙ্গিকার ভঙ্গ করবে, তখন তাদের উপর শত্রুকে সবল করে দেয়া হবে।

নাবী ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন মদীনার কাফেররা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

➢ একটি দল নাবী ﷺ এর সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হল যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনা, তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রকার হামলা করবেনা এবং তাঁর শত্রুকে তার বিরুদ্ধে সাহায্যও করবেনা। তারা কুফরীসহ তাদের জান ও মাল নিয়ে মদীনায় নিরাপদে বসবাস করবে।

➢ একদল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করল।

➢ আরেক প্রকার কাফের তাঁর সাথে কোন প্রকার চুক্তি করলনা এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করলনা। তারা তাঁর এবং তাঁর শত্রুদের শেষ পরিণামের অপেক্ষায় থাকল। তবে এই দলের কেউ কেউ মনে মনে তাঁর বিজয় কামনা করত। আবার এদের কেউ তাঁর শত্রুদের বিজয় কামনা করত। এদের মধ্যে আরেক গ্রুপ ছিল, যারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু গোপনে তারা তাঁর শত্রুদের সাথেই ছিল। যাতে তারা উভয় দলের ক্ষতি হতে নিরাপদ থাকতে পারে। এরাই ছিল মুনাফিক। রসূল ﷺ এ সমস্ত কাফেরদের সাথে হুকমে ইলাহী অনুযায়ী কাজকারবার করেছেন।

সুতরাং তিনি মদীনার ইহুদীদের সাথে সন্ধি চুক্তি করলেন এবং তাদের সাথে নিরাপত্তার সনদ রচনা করলেন। কিন্তু বদরের যুদ্ধের পর বনু কায়নুকা নাবী ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল।

কেননা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়কে তারা ভাল চোখে দেখেনি। তাই তারা হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ করে চুক্তি ভঙ্গ করল।

অতঃপর বনী নযীরের ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করল। তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং তাদেরকে ঘেরাও করলেন ও তাদের খেজুর বৃক্ষগুলো কেটে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। অতঃপর নাবী ﷺ তাদেরকে মদীনা হতে এই শর্তে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন যে, তারা যুদ্ধাস্ত্র ব্যতীত উট বোঝাই করে অন্যান্য আসবাব-পত্র সাথে নিয়ে যেতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই কাহিনী সূরা হাশরে উল্লেখ করেছেন।

এরপর বনী কুরায়যার ইহুদীরা অঙ্গিকার ভঙ্গ করল। এরা রসূল ﷺ এর ঘোর বিরোধী ছিল এবং কুফরীতে ছিল খুবই মজবুত। এ জন্যই অন্যান্য ইহুদীর তুলনায় এদের বিরুদ্ধে কঠিনতম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

এই ছিল মদীনার ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যবস্থা। তিনি প্রত্যেকটি বড় যুদ্ধের পরপরই ইহুদীদের একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। বদরের যুদ্ধের পর বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, উহুদের পর বনু নযীরের বিরুদ্ধে এবং খন্দকের পরে বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আর খায়বারের ইহুদীদের আলোচনা একটু পরেই আসছে।

তাঁর পবিত্র সুন্নাত এই ছিল যে, তিনি যখন কোন গোত্রের সাথে চুক্তি করতেন, তখন তাদের কতক লোক যদি সেই চুক্তি ভঙ্গ করত আর কতক লোক সেই চুক্তি বহাল রাখত এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতেন। যেমন তিনি করেছিলেন বনী কুরায়যা, বনী নযীর এবং মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে। এই ছিল চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের বিরুদ্ধে নাবী ﷺ এর পবিত্র সুন্নাত।

ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য ইমামদের মতে যিম্মীদের ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[২৪৫] ইমাম শাফেঈর ছাত্রগণ এই মতের খেলাফ করেছেন। তারা বলেন, যারা চুক্তি ভঙ্গ করবে, কেবল তাদের সাথে তা ভঙ্গ করা যাবে, অন্যদের সাথে নয়। যারা অঙ্গিকার রক্ষা করবে তাদের সাথে অঙ্গিকার রক্ষা করা জরুরী। শাফেঈগণ উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন যে, অঙ্গিকারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- যখন সিরিয়ার খৃষ্টানরা মুসলমানদের সম্পদ ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল, তখন অন্যান্য খৃষ্টানরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েও মুসলিম শাসককে জানায়নি; বরং তারা খৃষ্টানদের কাজকেই সমর্থন করল। কিন্তু শাসক বিষয়টি জানতে পেরে আলেমদের কাছে যখন ফতোয়া চাইলেন, তখন আমরা ঐ খেয়ানতকারীদের ব্যাপারে শাসককে ফতোয়া দিলাম যে, যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে, যারা এতে সহায়তা করেছে এবং যারা এতে সন্তুষ্ট হয়েছে এদের সকলকেই হত্যা করতে হবে। এদের ব্যাপারটি শাসকের ইচ্ছাধীন নয়, হত্যাই একমাত্র তাদের শাস্তি।

ইসলামের বিধিবিধান মেনে নিয়ে যে সমস্ত যিম্মী নিরাপত্তার অঙ্গিকার নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে, তারা যদি এমন কোন অপরাধ করে, যার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড, তাহলে ইসলাম তাকে মৃত্যুদন্ড হতে রেহাই দিবেনা।

কিন্তু হারবী তথা যুদ্ধরত কোন কাফের যদি ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে তার হুকুম সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ তখন তাকে হত্যা করা যাবেনা। চুক্তি ভঙ্গকারী যিম্মীর হুকুম আলাদা। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের উক্তি হতে এটিই সুস্পষ্ট হয়েছে। আমাদের শাইখ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) অনেক স্থানেই এই ফতোয়া দিয়েছেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন গোত্রের সাথে চুক্তি করতেন, তখন তাদের সাথে তাঁর অন্যান্য শত্রুরাও শরীক হত। তাঁর সাথেও অন্য কাফেররা এসে যোগ দিত। এতে করে যারা তাঁর সাথে যোগদানকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে বলেই ধরে নেওয়া হত। এই কারণেই তিনি মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং কুরাইশদের মধ্যে দশ বছর পর্যন্ত সকল প্রকার যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এই চুক্তিতে বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে যোগ দিল। আর খোযাআ গোত্র যোগ দিল রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে। পরবর্তীতে বনু বকর গোত্র রাতের অন্ধকারে খুযাআ গোত্রের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাদের কতককে হত্যা করল। কুরাইশরাও গোপনে বনু বকরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার কুরাইশদেরকে অঙ্গিকার ও চুক্তি ভঙ্গকারী হিসাবে গণনা করলেন এবং বনু বকর ও কুরাইশদের বিরুদ্ধে হামলা করে মক্কা জয় করলেন।

এ কারণেই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) পূর্বাঞ্চলের খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফতোয়া দিয়েছিলেন। কারণ তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারদেরকে সাহায্য করেছিল এবং অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়ে ছিল। এ জন্যই তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গকারী হিসাবে

---

২৪৫ - ইসলামী রাষ্ট্রের ঐ সমস্ত অমুসলিম নাগরিকদেরকে যিম্মী বলা হয়, যারা ইসলামী হুকুমত মেনে নিয়ে, কর প্রদান করে এবং ইসলামী শরীয়তে বর্ণিত এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিবিধান মেনে নিয়ে মুসলিমদের সাথে বসবাস করে।

সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী যিম্মীরা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহিরসূত মুশরিকদেরকে সাহায্য করে তাহলে তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গকারী এবং বিদ্রোহ ঘোষণাকারী সাব্যস্ত করা হবে না কেন?

নাবী ﷺ এর কাছে তাঁর শত্রুদের দূতগণ আগমণ করত। তাঁর প্রতি তাদের শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও তিনি দূতদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতেন না। যখন মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামা কাজ্জাবের পক্ষ হতে দু'জন প্রতিনিধি রসূল ﷺ এর দরবারে আগমণ করল তখন রসূল ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- মুসায়লামার ব্যাপারে তোমাদের আকীদাহ (বিশ্বাস) কী? তারা বলল- সে যেমন দাবী করে তেমনই। তখন রসূল ﷺ বললেন- দূতগণকে হত্যা করা যদি দোষণীয় না হত তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। এখান থেকেই দূতদেরকে হত্যা না করার সুন্নাত জারী হল।

তাঁর পবিত্র সুন্নাত এই ছিল যে, অমুসলিমদের কোন দূত যদি তাঁর কাছে এসে ইসলাম কবুল করত, তাহলে তিনি তাকে রেখে দিতেন না; বরং প্রেরকের নিকট ফেরত পাঠাতেন। যেমন আবু রাফে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- মক্কার কুরাইশরা আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট পাঠাল। আমি যখন তাঁর নিকট হাজির হলাম তখন আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা জাগ্রত হল। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি ফেরত যেতে চাইনা। রসূল ﷺ তখন বললেন- আমি অঙ্গিকার ভঙ্গ করিনা এবং দূতগণকে আটকিয়ে রাখিনা। তুমি তাদের কাছে ফেরত যাও। সেখানে যাওয়ার পরেও যদি তোমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা অনুভব হয়, তাহলে পুনরায় ফেরত এসো।

ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- এটি ছিল ঐ সময়ের ঘটনা যখন নাবী ﷺ ও কুরাইশদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি চলছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল, মক্কাবাসী কোন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় আসলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এরূপ করা যাবেনা। রসূল ﷺ-এর বাণী, 'আমি দূতকে আটকিয়ে রাখিনা'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি। মুসলমান হয়ে কেউ আসলে তাঁকে ফেরত দেয়ার ব্যাপারটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রীয় দূতদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা।

তাঁর অনুমতি ছাড়াই কোন একজন সাহাবীর সাথে তাঁর শত্রুরা যদি এমন কোন চুক্তি করত, যাতে মুসলমানদের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই, তাহলে তিনি সেই চুক্তি ও অঙ্গিকার বহাল রাখতেন। যেমন হুযায়ফা ও তার পিতার সাথে শত্রুরা এই মর্মে চুক্তি ও অঙ্গিকার করেছিল যে, তোমরা দু'জন রসূল ﷺ-এর সাথে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেনা। নাবী ﷺ এই অঙ্গিকার বহাল রাখলেন এবং হুযায়ফা ও তার পিতাকে বললেন- তোমরা ফেরত যাও। তারা তোমাদের সাথে যে অঙ্গিকার করেছে আমরা তা রক্ষা করব। আমরা তাদের মুকাবেলায় কেবল আল্লাহর সাহায্য চাই।

তিনি কুরাইশদের সাথে দশ বছর মেয়াদী (যুদ্ধ বিরত থাকার) চুক্তি করলেন। তাতে এই শর্ত রাখা হয়েছিল যে, মক্কাবাসীদের কেউ যদি মুসলমান হয়ে তাঁর নিকট আগমণ করে তাহলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। আর মদীনার কেউ যদি মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করে মক্কাবাসীগণ তাকে ফেরত দিবেনা। চুক্তিতে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীই শামিল ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের বিষয়টি রহিত করে দিলেন এবং তাদেরকে পরীক্ষা করার আদেশ দিলেন। তাদেরকে মুমিন মহিলা

হিসাবে জানা গেলে তাকে আর কাফেরদের নিকট ফেরত দেয়া হতনা। শুধু কাফেরের সাথে বিবাহের সময় ঐ নারীকে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয়া হত।

আর কোন মুশরিকের স্ত্রী মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে আসলে তিনি মুসলিমদেরকে আদেশ দিতেন, তারা যেন সেই মহিলার বিবাহের মোহরানা তাঁর মুশরিক স্বামীকে ফেরত দেয়। সুতরাং তারা মুহাজির মুমিন মহিলার মোহরানা তার কাফের স্বামীর নিকট ফেরত পাঠাতেন। তাকে তার মুশরিক স্বামীর নিকট ফেরত পাঠানো হতনা। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, স্বামীর মালিকানা থেকে বের হয়ে আসতে চাইলে মহিলার পক্ষ হতে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর সেটি হচ্ছে সেই মোহরানা, যা বিবাহের সময় নির্ধারিত হয়েছিল। মহরে মিছ্‌ল (মহিলার খালা বা ফুফুর জন্য সেই পরিমাণ মোহরানা নির্ধারিত হয়েছে তা) নয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, কাফেরদের বিবাহ-সাদীও বিশুদ্ধ এবং শর্তের মধ্যে লিখা থাকলেও হিজরতকারী মুসলিম মহিলাকে কাফেরদের নিকট ফেরত দেয়া যাবেনা। আরও জানা গেল যে, কোন মুসলিম নারীর জন্য অমুসলিম কাফেরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয নয় এবং ইদ্দত পার হয়ে যাওয়ার পর মোহরানা পরিশোধ করে হিজরতকারী মহিলাকে বিবাহ করা মুসলিম পুরুষের জন্য বৈধ।

এতে আরও সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, হিজরতের মাধ্যমেই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার বৈবাহিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্ত্রীর উপর থেকে কাফের স্বামীর মালিকানা সম্পূর্ণরূপে উঠে যায়। মুশরিক মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত বিধানগুলো কুরআনের আয়াত থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর উপর কতক আলেমদের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। আর কতক মাসআলায় আলেমদের মতবিরোধও রয়েছে। যারা বলে এগুলো রহিত হয়ে গেছে, তাদের কাছে কোন দলীল নেই।

কেননা নাবী ﷺ এবং মুশরিকদের মধ্যে যেই শর্ত ছিল, তাতে কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় আসলে তাকে ফেরত দেয়ার কথা ছিল। তবে পুরুষদের সাথেই বিষয়টি সম্পৃক্ত ছিল। মহিলারা এই শর্তের আওতায় ছিলনা। তাই মুসলমান হয়ে কোন মহিলা চলে আসলে তাকে ফেরত দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

নাবী ﷺ শুধু মোহরানা ফেরত দেয়ার আদেশ করেছেন। যার স্ত্রী মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে আসবে সে ঐ পরিমাণ মোহরানা ফেরত পাবে, যা সে তাঁকে বিবাহের সময় প্রদান করেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, এটিই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও হিকমতের আলোকেই এই ফয়সালা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে এই হুকুমের বিপরীতে অন্য কোন হুকুম নাযিল হয়নি।

নাবী ﷺ যখন কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করলেন তখন তিনি কুরাইশদের জন্য এই সুযোগ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাদের নিকট থেকে যে তাঁর কাছে চলে আসবে তারা তাকে ফেরত নিতে পারবে, তবে তিনি কাউকে ফেরত যেতে বাধ্য করতেন না বা আদেশও দিতেন না। আর সেই আগত ব্যক্তি যখন কাউকে হত্যা করে ফেলত কিংবা কারও মাল ছিনতাই করে নিয়ে তার আয়ত্তের বাইরে চলে যেত এবং মুসলমানদের সাথেও এসে যোগ দিত না, তখন তিনি এর কোন প্রতিবাদ করতেন না এবং তার দ্বারা কৃত অপরাধের ক্ষতি পূরণ দেয়ার কোন দায়-দায়িত্ব বহন করতেন না। কারণ সে তার

কর্তৃত্বাধীন ছিল না। তিনি তাকে ক্ষতি পূরণ দেয়ার হুকুমও দেন নি। কেননা জান ও মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে নাবী ﷺ যেই চুক্তি তাদের সাথে করেছিলেন, তা কেবল তাঁর অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রনাধীন লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। যেমন তিনি বনী জুযায়মার ঐ সমস্ত জান ও মালের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন, যা খালেদ বিন ওয়ালিদের হাতে নষ্ট হয়েছিল। সেই সাথে তিনি খালেদ বিন ওয়ালিদের কাজকর্মকে অপছন্দ করেছেন এবং তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করেছেন।

নাবী ﷺ এর আদেশে খালেদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আর খালেদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যেহেতু তাবীল করে (ইজতেহাদ) করে এরূপ করেছিলেন, কারণ তারা সরসূরি এটি বলেনি যে, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি; বরং তারা বলেছিল- আমরা সাবে হয়ে গেছি অর্থাৎ পূর্বের দ্বীন পরিত্যাগ করেছি। এ কারণেই খালেদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের ইসলামের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি তাবীল ও সন্দেহের কারণে তাদেরকে অর্ধেক দিয়ত দিয়েছিলেন। তাদের ক্ষেত্রে তিনি আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানদের বিধান জারী করেছেন। কেননা তারা অঙ্গিকার ও চুক্তির ভিত্তিতে জান-মালের নিরাপত্তা পেয়েছিল; ইসলামের মাধ্যমে নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধির দাবী এটিও ছিল না যে, তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরের কোন শক্তি যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে সেই আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। এই ঘটনায় আরও প্রমাণ রয়েছে যে, ইমামের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোন লোক যদি চুক্তিবদ্ধ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে সেই শত্রুকে প্রতিহত করা কিংবা সেই শত্রু যা ধ্বংস করবে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া ইমামের উপর আবশ্যক নয়, যদিও সে মুসলিম হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, যুদ্ধ, চুক্তি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতেহাদের আশ্রয় নেয়ার চেয়ে নাবী ﷺ এর সুন্নাত থেকে সমাধান গ্রহণ করা অনেক উত্তম। এর উপর ভিত্তি করেই বলা যায় যে, মুসলমানদের কোন বাদশাহ ও তাঁর রাজ্যে বসবাসকারী যিম্মীদের মধ্যে যখন চুক্তি হবে তখন অন্য এমন বাদশাহ সেই যিম্মীদের বিরুদ্ধে হামলা করতে পারবে, যাদের সাথে তার কোন চুক্তি নেই।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আবু বসীরের ঘটনাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে মালটা অঞ্চলের নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয হওয়ার ফতোয়া দিয়েছিলেন। খায়বারবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করার পর তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করলেন যে, তারা সেখান থেকে উচ্ছেদ হবে এবং তাদের উটগুলো যা বহন করতে সক্ষম সে পরিমাণ জিনিষ-পত্র বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। এ ছাড়া স্বর্ণ-রৌপ্য এবং যুদ্ধের হাতিয়ার রসূল ﷺ এর মালিকানাতেই থাকবে। চুক্তিতে আরও শর্ত ছিল যে, তারা তাদের কোন বস্তুই গোপন করতে ও লুকাতে পারবেনা। যদি তারা কোন কিছু গোপন করে তাহলে তাদের সাথে কৃত চুক্তি বহাল থাকবেনা। অতঃপর তারা একটি মশক (কলসী) লুকিয়ে ফেলল। তাতে হুআই বিন আখতাবের সম্পদ লুকায়িত ছিল। বনী নযীর কবীলাকে উচ্ছেদ করার সময় সে তা খায়বারে নিয়ে এসেছিল। নাবী ﷺ হুআই বিন আখতাবের চাচাকে মশকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল- যুদ্ধ এবং অন্যান্য খরচে তা শেষ হয়ে গেছে। নাবী ﷺ বললেন- দিন তো বেশী হয়নি। সম্পদ ছিল বিপুল পরিমাণ। এত দ্রুত সম্পদগুলো শেষ হয়ে গেল কিভাবে? অতঃপর নাবী ﷺ হুআইয়ের চাচার খোঁজ-খবর রাখার জন্য যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নিযুক্ত করে দিলেন। যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন তার উপর চাপ প্রয়োগ করলেন তখন সে বলল- আমি হুআইকে এই অঞ্চলের বিরানভূমির আশেপাশে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি। সাহাবীগণ সেখানে গিয়ে তালাশ করে তা

পেয়ে গেলেন। অতঃপর আবুল হুকাইকের দুই পুত্রকে হত্যা করলেন। তাদের একজন ছিল হুআইয়ের কন্যা সাফিয়ার স্বামী। সুতরাং রসূল ﷺ তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করলেন। তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। ইহুদীরা বলল- আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন। আমরা এখানের যমীন চাষাবাদ করব। কারণ আমরা এখানের ভূমি সম্পর্কে অধিক অবগত আছি। ঐ দিকে নাবী ﷺ এর হাতে এমন জনশক্তিও ছিলনা, যারা সেখানকার ভূমি দেখা-শুনা করবে ও চাষাবাদ করবে। তাই তিনি সেখানকার জমি তাদের জন্য এই শর্তে ছেড়ে দিলেন যে, উৎপাদিত সকল ফল ও ফসলের অর্ধেক তারা পাবে আর বাকী অর্ধেক রসূল ﷺ এর কাছে সোপর্দ করবে। তারা যত দিন ইচ্ছা ততদিন সেখানে বসবাস করতে পারবে। নাবী ﷺ তাদের সকলকে হত্যা করেন নি। কিন্তু বনী কুরায়যার সকলেই যেহেতু অঙ্গীকার ভঙ্গে শরীক ছিল, তাই তিনি তাদের সকলকেই হত্যা করেছিলেন।

কিন্তু খায়বারের বনী নযীরের লোকদের মধ্যে হতে যারা মশকটি সম্পর্কে অবগত ছিল এবং তা গোপন করেছিল তিনি কেবল তাদেরকেই হত্যা করেছেন। বনী নযীরের বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা রসূল ﷺ কে শর্ত দিয়েছিল যে, তাদের কেউ কোন কিছু গোপন করলে তার জন্য নিরাপত্তার অঙ্গিকার বহাল থাকবেনা। সুতরাং তিনি তাদেরকে শর্ত ভঙ্গ করার কারণেই হত্যা করেছিলেন। খায়বারবাসীর সকলকে হত্যা করেন নি। কেননা তাদের সকলেই মশকের (কলসীর) বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলনা। এটি ঐ যিম্মী তথা নিরাপত্তার অঙ্গিকার নিয়ে বসবাসকারীর মতই যে নিরাপত্তা সম্পর্কিত চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং অন্য কেউ তার সাথে শরীক ছিলনা।

অর্ধেকের বিনিময়ে যমীন চাষ করতে দেয়ার মধ্য ভাগে চাষাবাদ করা জায়েয আছে। চাই তা খেজুর গাছের ক্ষেত্রে হোক বা অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে হোক। এতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা কোন বিষয়ের হুকুম তার অনুরূপ বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং যে সমস্ত দেশে আঙ্গুর ফল উৎপন্ন হয় সে সমস্ত দেশের হুকুম খেজুর বিশিষ্ট যমীনের মতই।

এই ঘটনায় আরও দলীল রয়েছে যে, যমীনের মালিকের উপর ভাগে চাষাবাদকারীর জন্য বীজ সরবরাহ করা জরুরী নয়। কেননা নাবী ﷺ খায়বারবাসী ইহুদীদের জন্য চাষাবাদের বীজ সরবরাহ করেন নি। কতক আলেম বলেছেন- চাষীর উপর বীজ সরবরাহ করার শর্ত চাপিয়ে দেয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা নাবী ﷺ এর সুন্নাত এটিই প্রমাণ করে। তিনি খায়বারবাসীর জন্য বীজ সরবরাহ করেন নি। যারা বীজ সরবরাহ করার বিষয়টি যমীনের মালিকের উপর চাপিয়ে দেয়ার পক্ষে তাদের কাছে কোন দলীল নেই। তারা শুধু মুসাকাত তথা ভাগে যমীন চাষ করাকে মুদারাবাত তথা একজনের অর্থ দিয়ে অন্যের ব্যবসা করার উপর কিয়াস করেছেন।

তবে এ ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে যমীনের মালিক কিংবা চাষী উভয়েই বীজ সরবরাহ করতে পারে। এটি কারও সাথে খাস নয়।

খায়বারের ঘটনায় আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সুনির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ না করেও শত্রুদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করা জায়েয। বিষয়টি ইমামের ইচ্ছাধীন থাকবে। চুক্তি বাতিল করার মত কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হলে তিনি যতদিন ইচ্ছা চুক্তি বহাল রাখবেন। তবে এমন পরিস্থিতিতে ইমাম শত্রুপক্ষকে চুক্তির পরিসমাপ্তির বিষয়টি না জানিয়ে যুদ্ধের প্রতি অগ্রসর হতে পারবেনা। যাতে করে উভয় পক্ষের লোকেরাই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারে।

এই ঘটনায় আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া জায়েয। আল্লাহ্ তা'আলা হুআই ইবনে আখতাবের গুপ্তধন সম্পর্কে তাঁর রসূলকে বিনা মাধ্যমে জানিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু তা না করে তিনি অনুসন্ধানের মাধ্যমে অভিযুক্তকে সনাক্ত করে তাদের শাস্তির বিধান তৈরীর ইচ্ছা করেছেন এবং উম্মাতের প্রতি অনুগ্রহ ও সহজ করার জন্য বিভিন্ন হুকুম-আহকাম উদারভাবে বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনায় আরও প্রমাণ মিলে যে, দাবী সঠিক হওয়ার পক্ষে আলামত ও লক্ষণাদি দ্বারাও দলীল গ্রহণ করা জায়েয। কেননা রসূল ﷺ বলেছেন- মাল তো ছিল প্রচুর। এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কিভাবে?

আল্লাহর নাবী সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)ও ঐ শিশুর প্রকৃত মাকে সনাক্ত করার জন্য তাই করেছিলেন, যার মালিকানা দাবী করেছিল দুইজন মহিলা। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, একবার দুই মহিলার দু'টি শিশুর একটিকে বাঘে নিয়ে গেল। অবশিষ্ট শিশুটিকে নিয়ে উভয় মহিলা টানা-টানি শুরু করল। পরিশেষে ফয়সালার জন্য দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) এর নিকট যাওয়া হল। তিনি উভয় পক্ষের কথা-বার্তা শুনে জোরালো দাবীর কারণে বড় মহিলাটির পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিলেন। মহিলা দু'টি বের হয়ে আসার সময় সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম) জিজ্ঞেস করলেন- আল্লাহর নাবী দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) তোমাদের মাঝে শিশুটির ব্যাপারে কি ফয়সালা করেছেন? তারা উভয়ে ফয়সালার বিষয়টি জানালো।

সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম) বললেন- তোমরা চাকু নিয়ে আস। আমি শিশুটিকে দুইভাগ করে তোমাদের উভয়ের মাঝে ভাগ করে দিবো। এ কথা শুনে ছোট মহিলাটি বলল- আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন! এরূপ করবেন না। শিশুটি তাকেই দিয়ে দিন। সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম) ছোট মহিলার অন্তরে শিশুটির প্রতি দয়া-মায়া দেখে বুঝতে পারলেন যে, সেই শিশুটির প্রকৃত মা। তাই তিনি এর ভিত্তিতেই ফয়সালা করলেন এবং ছোট মহিলার নিকটই শিশুটিকে সোপর্দ করে দিলেন। শুধু মুখে মুখে আলোচনার জন্য নাবী ﷺ আমাদেরকে এই ঘটনা শুনান নি; বরং বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই তা শুনিয়েছেন।

ইসলামী শরীয়তে হত্যার ঘটনায় বাদী পক্ষের (সাক্ষী না থাকলে) শপথের উপর ভিত্তি করেই ফয়সালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটিই দাবী সঠিক হওয়ার সুস্পষ্ট আলামত। এমনি স্বামী যদি স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাহলে উভয়ের মাঝে লিআনের ব্যবস্থা করা হলে স্বামীর সাক্ষ্য দেয়ার (পাঁচবার আল্লাহর নামে শপথ করার) পর স্ত্রী যদি অনুরূপ করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রীকে রজম করার বিধান রাখা হয়েছে। কারণ এটি তার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আলামত।

সফর অবস্থায় যদি কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং অসীয়ত করার সময় যদি কোন মুসলিম পাওয়া না যায়, তাহলে আহলে কিতাব তথা অমুসলিমদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে মৃতের ওয়ারিছরা পরবর্তীতে সাক্ষীদের পক্ষ হতে যদি কোন বস্তু খিয়ানতের কথা জানতে পারে তাহলে তাদের শপথ করার এবং শপথের মাধ্যমে সেই বস্তুর হকদার হওয়ার অধিকার রয়েছে। ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা ও আলামতের উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা ও খুনের ব্যাপারে এর উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; বরং তাতে প্রবল ধারণা ও বাহ্যিক আলামতের ভিত্তিতে ফয়সালা করার প্রয়োজন আরও বেশী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কারও মাল চুরি হলে সে যদি সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তির হাতে সেই মালের অংশ বিশেষ দেখতে পায় এবং সে কারও কাছ থেকে সেই মাল ক্রয় করেছে বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে সে এই মর্মে শপথ করতে পারবে যে, অবশিষ্ট সম্পদ সেই

সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছেই রয়েছে এবং সে তা চুরি করেছে। কারণ এখানে চুরির আলামত সুস্পষ্ট। কেননা আলামত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রেক্ষাপট উক্ত বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে।

হত্যা সম্পর্কিত বিষয়েও একই কথা। সেখানেও আলামত ও বাহ্যিক কারণাদির উপর নির্ভর করে ফয়সালা করা জায়েয। বিশেষ করে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা যখন বলবে যে, অমুক অমুক লোকেরা তাকে হত্যা করেছে। মাল সম্পর্কিত বিষয়ে তা আরও সহজ। একজন সাক্ষী একটি শপথের মাধ্যমে এবং একজন পুরুষ সাক্ষী ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর মাধ্যমে মাল সম্পর্কিত হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অথচ খুনের ব্যাপারটি ভিন্ন। খুনের ক্ষেত্রে যেহেতু আলামতের উপর নির্ভর করে ফয়সালা দেয়া যায় তাই সম্পদের ক্ষেত্রে এর উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দেয়া অধিক উপযোগী ও উত্তম।

কুরআন ও সুন্নাহ এ বিষয়ের (আলামতের) উপর নির্ভর করার প্রমাণ বহন করে। যারা বিষয়টি রহিত হয়ে যাওয়ার দাবী করে তাদের হাতে কোন দলীল নেই। কেননা বিষয়টি সূরা মায়েদায় বর্ণিত হয়েছে। এটি সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা। এতে বর্ণিত বিষয়াদি দিয়ে সাহাবীগণও বিচার-ফয়সালা করেছেন।

ইউসুফ (আলায়হিস সালাম) এর ঘটনার সাক্ষী ও কারীনা তথা আলামত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এই দলীল গ্রহণের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে বলেছিল- ইউসুফ (আলায়হিস সালাম) এর কাপড় যদি পিছনের দিকে ছেড়া হয়, তাহলে তিনি সত্যবাদী এবং মহিলাটি মিথ্যুক। বাস্তবে দেখা গেল, তাঁর কাপড় পিছনের দিকে ছেড়া ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মহিলাকে পিঠ প্রদর্শন করে দৌড়িয়ে পালাচ্ছিলেন। মহিলাটি পিছনের দিক থেকে কাপড় ধরে টান দেয়াতে কাপড় ছিড়ে গিয়েছিল। এতে মহিলার স্বামী এবং উপস্থিত লোকেরা ইউসুফ (আলায়হিস সালাম) এর নির্দোষিতার প্রমাণ পলেন। তাই মহিলাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করা হল এবং তাকে তাওবা করার আদেশও দেয়া হল। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এই ঘটনা শুধু পাঠ করে আনন্দ পাওয়ার জন্য উল্লেখ করেন নি; বরং এ থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্যই তা উল্লেখ করেছেন।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন খায়বার বাসীকে নির্ধারিত শর্তে সেখানে থাকতে দিলেন তখন প্রত্যেক বছর ফল কাটার সময় হলে একজন অনুমানকারীকে পাঠাতেন। তিনি অনুমান করে দেখতেন যে, কি পরিমাণ ফল হতে পারে। অনুমান করার পর মুসলমানদের অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হত। বাকী অংশ তারা ভোগ করত। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাত্র একজন অনুমানকারী পাঠাতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, খেজুরের মত অন্যান্য ফলও অনুমান করে ভাগ করা জায়েয আছে। অনুমানের ভিত্তিতেই অংশীদারের অংশ নির্ধারিত হয়ে যেত। যদিও ফল বড় হওয়া ও পাকার জন্য গাছেই রেখে দেয়া হত।

এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, শুধু আলাদা করার জন্য অনুমানের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়; বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। খায়বারের ঘটনায় আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অনুমানের পর যখন অংশীদারের অংশ নির্ধারিত হবে তখন যার নিয়ন্ত্রণে ফল থাকবে সে তা দেখা-শুনা করতে পারবে।

অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যামানায় যখন তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খায়বারে তাঁর মালামালের খোঁজ-খবর নিতে গেলেন তখন ইহুদীরা তাঁর উপর আক্রমণ করল এবং তাঁকে ঘরের ছাদ থেকে ফেলে দিল। এতে তাঁর এক হাত ভেঙ্গে গেল। এই ঘটনার পর তিনি সেখানকার ইহুদীদেরকে সিরিয়ায় নির্বাসন দিলেন এবং খায়বারের সম্পদ হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

অমুসলিমদের সাথে চুক্তি করা এবং কর আদায় সম্পর্কে রসূল ﷺ এর হিদায়াত

অমুসলিমদের সাথে চুক্তি করা এবং কর গ্রহণ সম্পর্কে রসূল ﷺ এর হিদায়াত হচ্ছে, অষ্টম হিজরীতে সূরা তাওবা নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি কোন অমুসলিমের নিকট হতে জিযিয়া তথা কর গ্রহণ করেন নি। অতঃপর যখন জিযিয়া (কর-টেক্স) সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হল তখন তিনি অগ্নিপূজক ও আহলে কিতাবদের থেকে তা আদায় করলেন। তবে খায়বারের ইহুদীদের থেকে তা আদায় করেন নি। যারা মনে করে আদায়ের বিষয়টি খায়বারের ইহুদীদের সাথে নির্দিষ্ট তাদের ধারণা ভুল। এই রকম ধারণা সীরাতে নববী সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের কমতির প্রমাণ বহন করে। কেননা তিনি খায়বারের ইহুদীদের সাথে কর আদায় সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই চুক্তি করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশে খায়বারের ইহুদীরা শামিল ছিলনা। কেননা তাদের মধ্যে ও রসূল ﷺ এর মধ্যে এর পূর্বেই চুক্তি হয়েছিল। নির্দিষ্ট একটি অংশ প্রদানের বিনিময়ে তাদের সাথে যেহেতু চুক্তি হয়েছিল, তাই তাদের কাছে তা ছাড়া অন্য কিছু তলব করা হয়নি। এ ছাড়া যে সমস্ত অমুসলিমদের সাথে চুক্তি ছিলনা, তাদের কাছে তিনি জিযিয়া দাবী করেছেন। অতঃপর যখন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদেরকে খায়বার থেকে সিরিয়ায় নির্বাসন দিলেন তখন তাদের সাথে কৃত চুক্তি পরিবর্তন হয়ে গেল। এরপর থেকে তারা অন্যান্য অমুসলিমদের মতই হয়ে গেল।

মুসলিমদের কোন কোন শাসনামলে যখন কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল কমে গিয়েছিল তখন কতক লোক একটি চিঠি বের করল। তাতে লেখা ছিল, রসূল ﷺ খায়বারবাসীর উপর থেকে জিযিয়া গ্রহণ বাতিল করেছেন। তাতে আলী বিন আবু তালেব, সা'দ বিন মুআয এবং একদল সাহাবীর সাক্ষ্যও ছিল। পত্রটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে পুরাতন মনে হলেও তা ছিল কুচক্রীদের পক্ষ হতে বানোয়াট একটি চিঠি। সুন্নাত সম্পর্কে যাদের কোন জ্ঞান ছিলনা, তারা এই পত্রটিকে সহীহ মনে করে তার উপর আমল করতে লাগল। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার কাছে যখন পত্রটি প্রেরণ করা হল এবং এর উপর আমল চালু করার জন্য তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া হল তখন তিনি পত্রটির উপর থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং তা মিথ্যা ও বানোয়াট হওয়ার উপর দশটি দলীল পেশ করলেন।

১) পত্রটিতে সা'দের সাক্ষ্য লিখা ছিল। অথচ সা'দ বিন মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খায়বারের ঘটনার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছেন।

২) খায়বারের ঘটনার সময় পর্যন্ত জিযিয়ার বিধান নাযিল হয়নি।

৩) পত্রটিতে লিখা ছিল যে, শক্ত ও পরিত্যক্ত যমীন তিনি তাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। অথচ রসূল ﷺ-এর যামানায় এ ধরণের যমীনের উপর কোন কিছুই নির্ধারিত ছিলনা। পরবর্তীতে জালেম শাসকরাই এটি তৈরী করেছিল। এর উপরই আমল চলতে থাকে।

৪) সীরাতে নববী, ইলমে হাদীস এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞ কোন আলেমই তাদের লেখনীতে পত্রটি উল্লেখ করেন নি। মিথ্যুক ইহুদীরা সালফে সালেহীনদের যুগে এই পত্রটি বের করেনি। কেননা তারা জানত যে, তখন বের করা হলে সীরাতে নববী সম্পর্কে পারদর্শী আলেমগণ তা মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি ধরে ফেলবেন। যখন সুন্নাতের ইলম বিলুপ্ত হতে লাগল তখন তারা পত্রটি বের করল। আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূলের সাথে খেয়ানতকারী কিছু লোকও ইহুদীদেরকে সহায়তা

করেছিল। তবে বিষয়টি বেশী দিন গোপন থাকেনি। আল্লাহ্ তা'আলা পত্রটির বিষয় পরিষ্কার করে দিলেন এবং খলীফাগণ তা বাতিল বলে ঘোষণা করলেন।

মূর্তিপূজকদের কাছ থেকে তিনি জিযিয়া গ্রহণ করেন নি। ইমাম শাফেঈ এবং এক বর্ণনায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান) এবং অগ্নিপূজক ব্যতীত অন্য কোন অমুসলিম থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবেনা। আর ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- অনারব মূর্তিপূজকদের থেকে গ্রহণ করা হবে; আরব মূর্তিপূজক থেকে নয়। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরবদের থেকে জিযিয়া আদায় করেন নি। কারণ আরবদের ইসলাম গ্রহণের পরই জিযিয়ার আয়াত নাযিল হয়েছে। আরব দেশে তখন কোন মুশরিকই অবশিষ্ট থাকেনি। এই জন্যই তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাবুকের যুদ্ধ করেছেন। তখন যদি আরবের ভূমিতে কোন মুশরিক থাকত, তাহলে তাবুক পর্যন্ত না গিয়ে নিকটের কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই উত্তম হত। আর তাবুকের লোকেরা ছিল খৃষ্টান। যে ব্যক্তি সীরাতে নববী ও ইসলামের দিনগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারবে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া আদায় করেছেন। এ কথা সহীহ নয় যে, তাদের কাছে কোন কিতাব ছিল, যা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং মূর্তিপূজকরা দ্বীনে ইবরাহীমের এমন কিছু বিষয় মেনে চলে, যা অগ্নিপূজকরা মানেনা। অগ্নিপূজকরা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)এর শত্রু। সুতরাং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র সুন্নাত প্রমাণ করে যে, মূর্তিপূজক তথা মুশরিকদের থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন- যখন তুমি মুশরিকদের থেকে তোমার কোন শত্রুর মুকাবেলায় অবতীর্ণ হবে তখন তুমি তাদেরকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি মেনে নেওয়ার প্রতি আহবান করবে। যে কোন একটি বিষয় মেনে নিলেই তুমি তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে নিবে এবং তাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- তাদেরকে ইসলাম কবুল করার প্রতি আহবান জানাবে।

ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করলে তুমি তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করার প্রতি আহবান জানাবে। তাও যদি তারা মেনে না নেয়, তাহলে তুমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।[২৪৬] মুগীরা বিন শু'বা পারস্যের সম্রাট কেসরার গভর্ণরকে বলেছিলেন- তোমরা যতক্ষণ না আল্লাহর ইবাদত করবে অথবা জিযিয়া প্রদান না করবে ততক্ষণ আমাদের নাবী তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন।[২৪৭] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশদেরকে বলেছিলেন- তোমরা কি এমন একটি বাক্য মেনে নিবে? যাতে আরবরা তোমাদের আনুগত্য করবে এবং অনারবরা তোমাদের কাছে জিযিয়া পাঠাবে। তারা বলল- সেটি কী? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- তা হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।[২৪৮]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করলেন যে, তারা প্রত্যেক বছর মুসলমানদেরকে দুই হাজার জোড়া কাপড় দিবে এবং ত্রিশটি বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট ও প্রত্যেক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র থেকে ত্রিশটি করে অস্ত্র মুসলমানদেরকে এই শর্তে দিবে যে, তারা এগুলো দিয়ে জিহাদ

---

২৪৬. সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩১।
২৪৭. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ।
২৪৮. মুসনাদে আহমাদ, (১/২২৭)

করবে। পরে সেগুলো তাদের কাছে ফেরত দেয়া হবে। যত দিন এগুলো মুসলিমদের হাতে থাকবে তত দিন মুসলমানেরাই এগুলোর যিম্মাদার হবে। এর বিনিময়ে তাদের কোন ইবাদতখানা ভাঙ্গা হবেনা, তাদের পাদ্রীদেরকে গীর্জা থেকে বের করা হবেনা এবং তাদেরকে তাদের দ্বীন ছাড়তে বাধ্য করা যাবেনা। তবে শর্ত হচ্ছে তারা কোন অপকর্ম করতে পারবেনা এবং সুদের ব্যবসা করতে পারবেনা। সুতরাং এতে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, তাদের সাথে সুদ না খাওয়ার এবং অপকর্ম না করার শর্ত করা হলে তারা যদি তা করে তাহলে তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে বলে গণ্য হবে।

নাবী ﷺ যখন মুআয বিন জাবালকে ইয়ামানে পাঠালেন তখন তাকে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের নিকট হতে এক দীনার করে অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানে তৈরী মুআফেরী নামক কাপড় জিযিয়া (কর) হিসাবে গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিযিয়াতে পরিমাণ ও শ্রেণী নির্ধারিত নয়। বরং মুসলমানদের প্রয়োজন অনুসারে স্বর্ণ-রৌপ্য, কাপড়-চোপড় এবং অন্য যে কোন বস্তু থেকে নেওয়া যেতে পারে। যাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে, তাদের অবস্থাও বর্ণনা করেন নি। এ ব্যাপারে রসূল ﷺ এবং তাঁর খলীফাগণও আরব এবং অনারবদের মাঝে পার্থক্য করেন নি। তিনি হাজার নামক স্থানের অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেছেন। তারা ছিল আরব। কেননা আরবদের প্রত্যেক গোত্রই তাদের পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহের দ্বীন পালন করে চলত। বাহরাইনের আরবরা ছিল অগ্নিপূজক। কারণ তারা ছিল পারস্যের অগ্নিপূজকদের প্রতিবেশী। তানুখ, বহরা এবং বনী তাগলিবের খৃষ্টানদের থেকেও তিনি জিযিয়া গ্রহণ করেছেন। কারণ তারা ছিল খৃষ্টান। ইয়ামানের কিছু কিছু আরব গোত্র ইহুদীদের পাশে বসবাস করার কারণে আহলে কিতাবদের দ্বীনের অনুসরণ করত। নাবী ﷺ তাদের উপর জিযিয়ার বিধান জারি করেছেন। তাদের বাপ-দাদাদের দ্বীন কি ছিল এবং তারা কখন আহলে কিতাবদের দ্বীনে প্রবেশ করল? এ বিষয়ের কোন মূল্যায়ন করেন নি।

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসা (আলাইহিস সালাম) এর শরীয়ত মানসুখ হয়ে যাওয়ার পর আনসারদের কিছু কিছু সন্তান ইহুদী হয়ে গিয়েছিল।

তাদের পিতাগণ পরে তাদেরকে ইসলামের উপর বাধ্য করতে চাইলে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

“দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে”। (সূরা বাকারা-২:২৫৬) নাবী ﷺ বলেন- প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ থেকে এক দীনার করে আদায় কর। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, শিশু এবং নারীদের থেকে জিযিয়া আদায় করা হবেনা। আর যেই হাদীছে বলা হয়েছে, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ থেকে এক দিরহাম করে আদায় কর, তা মুত্তাসেল সনদে সহীহ নয়। হাদীসটির সনদের ধারাবাহিকতা (চেইন) বিচ্ছিন্ন। এই বাড়তি শব্দটি (নারী শব্দটি) অন্যান্য সীরাত গ্রন্থকারগণ উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত কোন কোন রাবীর পক্ষ হতে এটি ব্যাখ্যা স্বরূপ।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত কাফের এবং মুনাফেকদের সাথে নাবী ﷺ এর মুআমালাত (আচার-ব্যবহার)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীর প্রতি সর্বপ্রথম যেই অহী প্রেরণ করেন তা হচ্ছে,

﴿إِقرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أقرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾

"তোমার রবের নামে পড়, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড় তোমার রব সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। (সূরা আলাক-৯৬:১-৩) এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে নবুওয়াতের সূচনা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ......وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

"হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি!। উঠ, সতর্ক কর। তোমার পালনকর্তার বড়ত্ব ঘোষণা করো এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক"। (সূরা মুদ্দাস্সির-৭৪:১-৫) এর মাধ্যমে তাঁর উপর রেসালাতের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে আদেশ দিলেন তিনি যেন তার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

"এবং তুমি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক কর"। (সূরা শুআরা-২৬২১৪) সুতরাং তিনি তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করলেন। অতঃপর তিনি সমগ্র আরব সম্প্রদায়কে সতর্ক করলেন। অতঃপর সারা বিশ্ববাসীকেও সতর্ক করলেন। মক্কাতে তিনি ১৩ বছর অবস্থান করলেন। এ সময়ে শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছেন। কোন প্রকার যুদ্ধ করেন নি। তখন তাকে সবর করার আদেশ দেয়া হত। তারপর তাঁকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হল। এরপর যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে, কেবল তাদের সাথেই যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হল। পরিশেষে আল্লাহর দ্বীন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন।

জিহাদের আদেশ নাযিল হওয়ার পর কাফেররা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। (১) এক দল কাফের তাঁর সাথে সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হল। (২) এক দল কাফেরের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকল এবং (৩) অন্য এক দল জিযিয়া প্রদান করতে রাজী হয়ে গেল। চুক্তিবদ্ধ কাফেররা যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ তাদের সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করার আদেশ দিলেন। তাদের পক্ষ হতে খেয়ানতের আশঙ্কা হলে অঙ্গীকার রক্ষা করা জরুরী নয়। যারা তাঁর সাথে চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। উপরোক্ত তিন প্রকার মুশরিকদের ব্যাপারে সূরা তাওবা নাযিল হয়। জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তিনি আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মুনাফেক ও কাফেরদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং তিনি অস্ত্র দ্বারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। মুনাফেকদের সাথে যুদ্ধ করেছেন দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে। এই সূরায় তিনি কাফেরদের সাথে সকল প্রকার চুক্তির বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন এবং তাদেরকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। এক প্রকার কাফেরের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। এরা হচ্ছে চুক্তি ভঙ্গকারী। আরেক প্রকার হচ্ছে, যাদের সাথে স্বল্প মেয়াদী চুক্তি হয়েছিল। তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং তাঁর বিরুদ্ধে অন্য

কাউকে সাহায্যও করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে সেই চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন। তৃতীয় আরেক প্রকার কাফের হচ্ছে, যাদের সাথে কোন চুক্তিই ছিল না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে নি। এই প্রকার কাফেরেদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা চার মাস সময় দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। এই মেয়াদ চলে গেলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। সেই মেয়াদ ছিল মাত্র চার মাস। নিম্ন লিখিত আয়াতে এই চুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾

"অতঃপর তোমরা পরিভ্রমন কর এ দেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারবেনা, আর নিশ্চিয়ই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করেন"। (সূরা তাওবা-৯: ২) মেয়াদ শেষ হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়ে বলেন-

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সলাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। (সূরা তাওবা-৯: ৫) এই চার মাস মেয়াদের শুরু হচ্ছে যুল-হাজ্জ মাসের ১০ তারিখ আর শেষ হচ্ছে রবীউল আওয়াল মাসের ১০ তারিখ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করোনা। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ্ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন"। (সূরা তাওবা-৯:৩৬) সুতরাং এখানে যে চার মাসের কথা বলা হয়েছে, পূর্বের আয়াতে সেই চার মাস উদ্দেশ্য নয়। কেননা হারাম মাস সমূহের তিনটি আসে ধারাবাহিকভাবে (পরপর)। যুল-কাদ, যুল-হাজ্জ এবং মুহাররাম। আরেকটি হচ্ছে রজব, তা আসে আলাদাভাবে। সুতরাং এই চারমাসে তাদেরকে ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করতে বলা হয়নি। কারণ হারাম সমূহের সবগুলো একসাথে না আসার কারণে তাতে পরিভ্রমণ করা সম্ভবও নয়। চারমাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং চুক্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন, যাদের সাথে কোন অঙ্গিকার ছিলনা, তাদেরকে চারমাস সময় দিয়েছেন। আর যারা অঙ্গিকার পূর্ণ করবে, তাদের সাথে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন। পরিশেষে সকল কাফের মুসলমান হয়ে গেল। কোন কাফেরই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত কুফরীর উপর অবিচল রইল না। যিম্মীদের উপর তিনি জিযিয়া নির্ধারণ করে

দিলেন। সুতরাং লোকেরা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে গেল। (১) নাবী ﷺ এর সাথে যুদ্ধরত কাফের সম্প্রদায়। (২) নাবী ﷺ এর সাথে চুক্তিবদ্ধ কাফের সম্প্রদায়। (৩) জিযিয়া প্রদানকারী। অতঃপর চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমরা মুসলমান হয়ে গেল। এখন দুই প্রকারের লোক বাকী থাকল। যুদ্ধকারী ও যিম্মী। পরিশেষে তৎকালে ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। মুসলিম, যিম্মী (কর প্রদানকারী) এবং যুদ্ধরত কাফের, যারা নাবী ﷺ এর পক্ষ হতে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল।

মুনাফেকদের সাথে নাবী ﷺ এর আচরণ এ রকম ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রকাশ্য দিকটি দেখেই সিদ্বান্ত নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং অন্তরের গোপন বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিতে বলেছেন। আর দলীল-প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে তাদের সাথে জিহাদ করার হুকম দিয়েছেন। সেই সাথে তাদের অন্তরে যেন পীড়া দায়ক হয় এমন শক্ত ও কঠিন কথা বলার আদেশ দিয়েছেন। তাদের কেউ মৃত্যু বরণ করলে তার জানাযার সলাত পড়তে এবং কবরের কাছে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুনাফেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না আর না করলেও ক্ষমা করবেন না।

সাহাবী এবং বন্ধুদের সাথে নাবী ﷺ এর আচরণ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীকে আদেশ দিয়েছেন, তিনি যেন তাঁর সাথীদের সাথেই থাকেন এবং তাদের পক্ষ হতে কোন দুঃখ-কষ্ট আসলে তিনি যেন তা বরদাশত করেন। বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের সাথে তিনি যেন ধৈর্য ধারণ করেন, যারা সকাল-বিকাল আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আরও আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাদের থেকে দৃষ্টি না উঠান, তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তাদের সাথে পরামর্শ করেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতে থাকেন। আর যারা তাঁর কথা অমান্য করে এবং জিহাদে যাওয়া থেকে পিছিয়ে থাকে তাদের তাওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁকে আরও আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন মুসলমানদের সম্ভ্রান্ত ও নিম্ন শ্রেণীর সকল লোকের উপরই শরীয়তের দন্ডবিধি কায়েম করেন।

মানব শয়তানদের মধ্যে তাঁর যে সমস্ত দুশমন রয়েছে, তাদেরকে উত্তম পন্থায় প্রতিহত করতে বলা হয়েছে। সুতরাং তারা খারাপ আচরণ করলে তার মুকাবেলায় তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে, মূর্খতার মুকাবেলায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে, জুলুমের মুকাবেলায় ক্ষমা করা এবং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে তা বজায় রাখতে হবে। তিনি বলেছেন- যদি এরূপ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে।

জিন শয়তান থেকে বাঁচার জন্য তিনি ইস্তিআযা পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন তথা আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম পাঠ করতে বলেছেন। এই দুইটি বিষয় অর্থাৎ মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের তিন স্থানে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আরাফে বলেন-

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক। আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহ্র শরনাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী"।[২৪৯]

সুতরাং জাহেলদের ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য তাদের থেকে মুখ ফিরানোর আদেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান থেকে বাঁচার জন্য আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করতে বলা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সৎচরিত্রের সকল বৈশিষ্টই একত্রিত করেছেন। কেননা শাসকের সাথে প্রজাদের তিন রকমের অবস্থা হতে পারে। (১) তাদের উপর শাসকের একটি হক রয়েছে, যা পালন করা তাদের জন্য আবশ্যক। শাসক নিজেই তা পালন করার হুকুম দিবেন। আর এ ব্যাপারে যেহেতু প্রজাদের ত্রুটি ও অলসতা করার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আল্লাহ্ তা'আলা শাসককে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন তার হক আদায় করে নেয়ার সময় প্রজাদের সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখেন এবং তাদের উপর সহজ করেন। কঠোরতা আরোপ করা থেকে যেন বিরত থাকেন। ক্ষমা করে দেয়ার এটিই অর্থ। এরূপ করলে তাদের কোন ক্ষতি ও কষ্ট হবেনা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি যেন লোকদেরকে ভাল কাজের আদেশ দেন। সুস্থ বিবেক ও অবিকৃত স্বভাব যাকে সমর্থন করে এবং যাকে সুন্দর ও উপকারী হিসাবে স্বীকৃত দেয়, তাই ভাল। তাঁকে আরও আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন নরম-ভদ্রভাবে ভাল কাজের আদেশ দেন এবং কঠোরতা পরিহার করেন। সাহাবীগণ তাঁর সাথে মূর্খতা সুলভ আচরণ করলে তিনি যেন তা পরিহার করে চলেন এবং মূর্খদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এই ছিল জিন, ইনসান, মুমিন, কাফের তথা পৃথিবীবাসীদের সকল শ্রেণীর সাথে তাঁর চিরসুন্দর আচরণ।

নাবী ﷺ এর যুদ্ধসমূহের বর্ণনা

হিজরতের সপ্তম মাস রমযান মাসে নাবী ﷺ সর্বপ্রথম ইসলামী সেনাদল প্রেরণ করেন। হামজাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবকে এই অভিযানের আমীর নিযুক্ত করেন। এই বাহিনীতে কেবল ত্রিশজন মুহাজির শরীক ছিলেন। কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু ধাওয়া করার জন্য এই বাহিনীকে পাঠানো হয়। কাফেলাটি শাম তথা সিরিয়া থেকে ফেরত আসছিল। এই কাফেলার লোক সংখ্যা ছিল তিনশ জন। আবু জাহেলও তাদের সাথে ছিল।

উভয় বাহিনী সামনা সামনি হওয়ার সময় মাজদি বিন আমর আল জুহানী গোত্র অন্তরায় হয়ে গেল। এই গোত্রটি ছিল কুরাইশ এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বন্ধু।

এর পরের মাসে তথা শাওয়াল মাসে উবাইদাহ্ বিন হারেছের নেতৃত্বে ৬০ জন মুহাজিরের একটি বাহিনী রাবেগ উপত্যকার দিকে প্রেরণ করেন। তারা মক্কার আবু সুফিয়ানের সাথে মুকাবেলায় লিপ্ত হলেন। তার সাথে ছিল দুইশ জনের একটি দল। উভয় দলের মধ্যে তীর বিনিময় হয়। কিন্তু তলোয়ার নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধ হয়নি। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেন। এই অভিযানকে ইবনে ইসহাক হামজাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অভিযানের পূর্বে বর্ণনা করেছেন।

---

২৪৯. সূরা আরাফ-৭: ১৯৯-২০০

এর পরের মাসে ২০ জন মুজাহিদের একটি দলসহ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে খার্‌রার নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেন। কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে ধাওয়া করার জন্য এই বাহিনী প্রেরিত হয়। তারা সেখানে গিয়ে দেখেন কুরাইশরা একদিন আগেই সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের নেতৃত্বে আবওয়ার যুদ্ধ পরিচালনা করেন। স্বশরীরে তিনি সর্বপ্রথম এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধেও কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে ধরার জন্য শুধু মুহাজিরদেরকে নিয়ে এই অভিযানে বের হন। কিন্তু শত্রুদের সাক্ষাত মেলেনি।

অতঃপর তিনি দুইশ সাহাবীসহ রবীউল আওয়াল মাসে কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে ধাওয়া করার জন্য আবওয়াতের উদ্দেশ্যে বের হন। আবওয়াত পর্যন্ত পৌঁছে শত্রুদের সাক্ষাত না পেয়ে মদীনায় ফেরত আসেন।

অতঃপর হিজরতের ১৩তম মাসে কুরয্ বিন জাবের আলফেহরীর অনুসন্ধানে বের হন। কেননা সে মদীনার গবাদি পশুর উপর আক্রমণ করেছিল এবং সেগুলো নিয়ে পলায়ন করছিল। বদরের সাফওয়ান নামক উপত্যকার পাশে পৌঁছলেন। কিন্তু কুরয্-এর সন্ধান না পেয়ে তিনি ফেরত আসলেন।

অতঃপর হিজরতের ১৬তম মাসে ১৫০ জন মুহাজির সাহাবী নিয়ে কুরাইশদের সিরিয়াগামী একটি বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু ধাওয়া করার জন্য বের হলেন। যুল উশায়রা নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, কাফেলাটি মক্কার পথে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। ফেরার পথে এই কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্যই তিনি বের হয়েছিলেন। এই বের হওয়াই ছিল বদরের যুদ্ধের একমাত্র কারণ।

এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের নের্তৃত্বে ১২ জন মুহাজিরের একটি দলকে নাখলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। একেক উটের উপর তাদের দুইজন করে আরোহন করেছিলেন। কুরাইশদের একটি কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য তারা নাখলা উপত্যকায় পৌঁছলেন। এ সময় সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস এবং ইতবা বিন গাযওয়ান তাদের উট হারিয়ে ফেললেন। উটের সন্ধান করতে গিয়ে তারা পিছনে পড়ে গেলেন। তারা যখন নাখলা উপত্যকায় পৌঁছলেন তখন কুরাইশদের একটি কাফেলা তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তাতে ছিল আমর বিন হাযরামী, উছমান, হাকাম বিন কায়সান এবং নাওফাল। তারা বললেন- আজ রজব মাসের শেষ তারিখ। এখন যদি তাদের উপর আক্রমণ করি তাহলে হারাম মাসের সম্মান নষ্ট হবে। আর যদি তাদেরকে ছেড়ে দেই, তাহলে তারা আজ রাতেই হারামের সীমানায় প্রবেশ করবে। পরিশেষে তারা আক্রমণ করার উপর একমত হলেন। মুসলমানদের একজন আমর বিন হাযরামীকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করে ফেললেন। আর উছমান এবং হাকাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পাকড়াও করে নিয়ে আসলেন। নাওফাল পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। মুসলমানগণ গণীমতের মাল বণ্টন করে পাঁচ ভাগের এক ভাগ আলাদা করে নিয়ে আসলেন। এটিই ছিল ইসলামে প্রথম গণীমত, প্রথম হত্যা কান্ড এবং প্রথম কয়েদী।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের এই কাজকে অপছন্দ করলেন। হারাম মাসে এই যুদ্ধ হয়েছে বলে কুরাইশরাও এই ঘটনাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করল। তারা ভাবল, এবার মুসলমানদের দোষ ধরার সুযোগ পাওয়া গেছে। মুসলমানদের নিকটও বিষয়টি খারাপ অনুভব হল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন-

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মাসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহ্‌র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো আগুনের অধিবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে"।[২৫০] আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলছেন, হারাম মাসে যুদ্ধ করা যদিও গুরুতর অপরাধ, কিন্তু তোমরা যেই কুফরীতে লিপ্ত আছ এবং যেইভাবে তোমরা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা ও আল্লাহর ঘর থেকে বিরত রাখছ, মক্কার মুসলমান অধিবাসীদেরকে তাদের বসতবাড়ি থেকে বহিস্কার করছ, যেই শির্কে তোমরা লিপ্ত রয়েছ এবং তোমরা যেই ফিতনায় নিপতিত আছ, তা আল্লাহর কাছে হারাম মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও ভয়াবহ। অধিকাংশ আলেম ফিতনার অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তা হচ্ছে শিরক। এর স্বরূপ হচ্ছে, এটি সেই শিরক যাতে লিপ্ত ব্যক্তি অন্যদেরকেও সেদিকে আহবান জানায়। আর যারা তাতে লিপ্ত হতে অস্বীকার করে তাদেরকে শাস্তি দেয়। এতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, ذوقوا فتنتكم তোমরা তোমাদের ফিতনার (শির্কের) শাস্তি ভোগ কর।[২৫১] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- এখানে ফিতনা দ্বারা কাফেরদের মিথ্যাচারিতা উদ্দেশ্য। এর সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে, তোমরা ফিতনার তথা শির্কের পরিণাম ফল ভোগ কর। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন-

﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾

"অতএব শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে"।[২৫২] আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নের বাণীও উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾

"যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা"।[২৫৩] এখানে ফিতনা অর্থ হচ্ছে মুমিনদেরকে আগুন দিয়ে পুড়ানো। কিন্তু ফিতনা শব্দটি আরও ব্যাপক।

---

২৫০. সূরা বাকারা-২:২১৭
২৫১. সূরা যারিয়াত-৫১:১৪
২৫২. সূরা আরাফ-৭:৩৯
২৫৩. সূরা বুরুজ-৮৫:১০

আসল কথা হচ্ছে, তারা দ্বীন থেকে বিরত রাখার জন্য তথা শিরক করতে বাধ্য করার জন্য মুমিনদেরকে শাস্তি দিত। আর যেই ফিতনার সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾

"আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা ফিতনায় (পরীক্ষায়) ফেলেছি- যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন"?[২৫৪] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾

"এসবই তোমার ফিতনা (পরীক্ষা); তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে। তুমি যে আমাদের রক্ষক সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুণা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী"।[২৫৫] উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে ফিতনা অর্থ হচ্ছে, বিপদাপদে ফেলে এবং নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। সুতরাং এটি এক প্রকার ফিতনা, মুশরিকদের ফিতনা অন্য রকম এবং মুমিনদের সন্তান-সন্ততির ফিতনা, মালের ফিতনা ও প্রতিবেশীর ফিতনা অন্য রকম।

ঐ দিকে আবার মুসলমানদের পারস্পরিক ফিতনা অন্য রকম। যেমন উষ্ট্রের যুদ্ধের ফিতনা, সিফ্ফীনের যুদ্ধের ফিতনা। রসূল ﷺ এ সমস্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী উভয় দল হতে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন।

ফিতনা কখনও সাধারণ পাপ কাজের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾

"তারা তো ফিতনা তথা পাপ কাজেই লিপ্ত রয়েছে"। (সূরা তাওবা-৯:৪৯) অর্থাৎ তারা নিফাকীতে লিপ্ত রয়েছে রোমকদের সুন্দরী মহিলার ফিতনা থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা নিফাকীতে লিপ্ত হয়েছে।

শেষ কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শত্রু ও বন্ধুদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবেন। তার প্রিয় বান্দাদেরকে তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, তারা যদি তাওহীদপন্থী হয়ে থাকে, আনুগত্য করে এবং হিজরত করে তাহলে তিনি তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিবেন।

বদরের যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরী সালে নাবী ﷺ এর কাছে এই মর্মে খবর পৌঁছল যে, কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া হতে মক্কার পথে অগ্রসর হচ্ছে। কাফেলার নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান। নাবী ﷺ কাফেলাটির পিছু ধাওয়া করার আহবান জানালেন। তবে এর জন্য বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নি। দ্রুত বের হওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে এর জন্য বেশী সময় পান নি। তাই তিনি তিনশত

---

২৫৪. সূরা আনআম-৬:৫৩

২৫৫. সূরা আরাফ-৭:১৫৫

তের জন সাহাবী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। তাদের কাছে ছিল দুইটি ঘোড়া এবং সত্তরটি উট। লোকেরা পালাক্রমে আরোহন করতেন।

ঐ দিকে আবু সুফিয়ান নাবী ﷺ এর বের হওয়ার কথা জানতে পেরে মক্কায় লোক পাঠিয়ে কাফেলার হেফাজতের জন্য দ্রুত সাহায্যের আবেদন করল। সংবাদ পেয়ে তারা দ্রুত বের হয়ে পড়ল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বের হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করে বলেন-

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

"আর তাদের মত হয়ে যেয়োনা, যারা বের হয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহ্র পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আয়ত্তে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে"। (সূরা আনফাল-৮:৪৭) সুতরাং পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা উভয় দলকে মুখোমুখী করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- "এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত হতে"। (সূরা আনফাল-৮: ৪২)

যাই হোক নাবী ﷺ যখন কুরাইশদের বের হওয়ার কথা জানতে পারলেন, তখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন।

সেই পরামর্শ সভায় মুহাজিরগণ প্রথমে কথা বললেন এবং অত্যন্ত সুন্দর পরামর্শ দিলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার পরামর্শ চাইলেন। এবারও মুহাজিরগণই কথা বললেন। তৃতীয়বার পরামর্শ চাইলেন। এতে আনসারগণ বুঝতে পারলেন যে, নাবী ﷺ তাদেরকে উদ্দেশ্য করছেন এবার তাদের পরামর্শ শুনতে চাচ্ছেন। তাই সা'দ বিন মুআয উঠে দাঁড়ালেন এবং আনসারদের পক্ষ হতে তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কথাগুলো বললেন। তিনি তাতে রসূল ﷺ কে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, আনসারগণ যুদ্ধ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছেন। সা'দ বিন মুআয বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনি সম্ভবত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আপনি যদি আমাদেরকে ঘোড়া ছুটিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, তাহলে আমরা তাই করব। আপনি আমাদেরকে যেখানে যেতে বলেন, আমরা সেখানেই যাবো। এমন কি বারাকুল গামাদ (লোহিত সাগরের অপর প্রান্তের একটি অঞ্চলের নাম) পর্যন্ত যেতে বলেন, তাহলে আমরা সেখানে যেতেও দ্বিধাবোধ করবনা। মিকদাদ বিন আসওয়াদও অনুরূপ কথা বললেন- মিকদাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- মুসা (আলাইহিস সালাম) এর অনুসারীরা যেরূপ বলেছিল আমরা সেরূপ বলবনা। তারা মুসাকে বলেছিল- আপনি এবং আপনার প্রভু তাদের (শত্রুদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। আর আমরা বলছিঃ আমরা আপনার ডানে, বামে সামনে এবং পিছনে তথা চতুর্দিক থেকেই যুদ্ধ করব। সাহাবীদের কথা শুনে বিশেষ করে এই দুই নেতার কথা শুনে নাবী ﷺ খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন- তাহলে তোমরা আগে বাড়, সামনে চল এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ আমাকে কাফেরদের দুই দলের একটির উপর বিজয় দান করার ওয়াদা করেছেন। আর আমি কাফের নেতাদের নিহত হওয়ার স্থানগুলো দেখতে পাচ্ছি।

এরপর নাবী ﷺ সামনে চলতে লাগলেন এবং বদর প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি যখন মুশরিকদের মুখোমুখী হলেন এবং উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পেল, তখন রসূল ﷺ আল্লাহর দরবারে উভয় হাত তুলে দু'আ করতে লাগলেন এবং তাঁর প্রভুর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মুসলমানেরাও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকলেন এবং আল্লাহর মদদ চাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ সময় কুরআনের এই আয়াত নাযিল করলেন-

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

"তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করছিলে স্বীয় প্রভুর নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত এক হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে"। (সূরা আনফাল-৯)

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তা হচ্ছে, এখানে এক হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। আর সূরা আল ইমরানে তিন হাজার ও পাঁচ হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। এর জবাব কী?

এর উত্তর দুইভাবে দেয়া যেতে পারে। (১) উহুদ যুদ্ধের দিন তিন হাজার ও পাঁচ হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করার কথা বলা হয়েছিল। তবে সেখানে একটি শর্ত জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। শর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে সেই সাহায্য আগমণ করেনি। (২) বদরের যুদ্ধের দিনই তিন হাজার বা পাঁচ হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছিল। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা এ কথারই প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ - بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ - وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

"বস্তুত আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। তুমি যখন মুমিনগণকে বলতে লাগলে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের প্রতিপালক আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফিরিস্তা পাঠাবেন? অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন কর, আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফিরিস্তা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। বস্তুত এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্তনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই"। (সূরা আল-ইমরান-৩:১২৩-১২৬) মুসলমানেরা যখন আল্লাহর কাছে মদদ চাইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার ফিরিস্তার মদদ পাঠালেন। তারপর তিন হাজার ফিরিস্তা পাঠালেন। পুনরায় পাঁচ হাজার পাঠালেন। এভাবে ধাপে ধাপে সাহায্য পাঠানোর মাধ্যমে মুমিনদের মনোবল বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এটি ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ দায়ক।

প্রথম মতের সমর্থকগণ বলেন- ঘটনাটি অর্থাৎ তিন হাজার ও পাঁচ হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে সাহায্য করার ঘটনা উহুদ যুদ্ধের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বদরের আলোচনা চলে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি বদরের যুদ্ধের দিনের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর উহুদ যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর রসূলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾

"তুমি যখন মুমিনগণকে বলতে লাগলে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের প্রতিপালক আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফিরিস্তা পাঠাবেন। অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং তাকওয়ার পথ অবলম্ভন কর, আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফিরিস্তা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন"।[২৫৬] এটি হচ্ছে আল্লাহর রসূলের কথা। আর বদরের যুদ্ধের দিন এক হাজার ফিরিস্তা দিয়ে সাহায্য করার কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন। আর সেটি ছিল শর্তহীন। আর উহুদ যুদ্ধে গায়েবী সাহায্য পাঠানোর বিষয়টি ছিল শর্তযুক্ত তথা সবর করলে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার শর্তে তিন ও পাঁচ হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছিল।

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা সূরা আল-ইমরানে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বদরের আলোচনা চলে এসেছে। আর বদরের যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সূরা আনফালে। সুতরাং উভয় সূরার প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর এই বাণীই প্রমাণ করে যে, উভয় সূরার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-ইমরানে বলেন-

﴿وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا﴾

"আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয়"। (সূরা আল-ইমরান-৩:১২৫) মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- এটি উহুদ যুদ্ধের ঘটনা। এটি প্রমাণ করে যে, উহুদ যুদ্ধের দিনও গায়েবী সাহায্য এসেছিল। সুতরাং এ কথা বলা ঠিক হবেনা যে, বদরের যুদ্ধের দিনই তিন বা পাঁচ হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছিল। মোট কথা দ্রুত ও তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাঠানো হয়েছিল উহুদ যুদ্ধের দিন। আল্লাহই ভাল জানেন।

কাফেররা যখন বের হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করল, তখন তারা তাদের এবং বনী কেনানার মাঝখানের শত্রুতার কথা স্মরণ করল। তখন ইবলীস বনী কেনানার অন্যতম নেতা সুরাকা বিন মালেকের আকৃতিতে প্রকাশিত হয়ে বলতে লাগল-

﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾

"আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবেনা, আমি হলাম তোমাদের সমর্থক"। (সূরা আনফাল-৮: ৪৮) সুতরাং বনী কেনানার লোকেরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। ইবলীসের এই আশ্বাস পেয়ে কুরাইশরা বীরত্বের সাথে বেরিয়ে পড়ল। পরিশেষে যখন চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং ইবলীস দেখল যে, আকাশ থেকে আল্লাহর সৈনিকগণ অবতরণ করেছেন তখন সে পিছন দিকে পলায়ন করতে লাগল। কুরাইশরা বলল- হে সুরাকা তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি এর আগে বলনি যে, আমাদের পাশেই থাকবে? তখন ইবলীস বলতে লাগল-

﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

---

২৫৬. সূরা আল-ইমরান-৩:১২৩-১২৬

"আমি তোমাদের সাথে নাই। আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছনা; আমি ভয় করি আল্লাহ্‌কে। আর আল্লাহ্‌র আযাব অত্যন্ত কঠিন"।[২৫৭] ইবলীসের কথা, আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; এটি ছিল সত্য।

কারণ সে আকাশ থেকে ফিরিস্তাদের অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা দেখছিল। আর তার কথা, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি- এটি ছিল মিথ্যা। কেউ কেউ বলেছেন- ইবলীস কাফেরদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিল। এটিই অধিক সুস্পষ্ট।

বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুনাফেক এবং রোগাক্রান্ত হৃদয়ের অধীকারীরা যখন দেখল যে, আল্লাহর সৈনিকদের সংখ্যা খুবই কম এবং শত্রু সংখ্যা খুব বেশী তখন তারা ভাবতে লাগল যে, সংখ্যাধিক্যই বিজয়ের মানদন্ড। তারা বলতে লাগল- এদের দ্বীন এদেরকে প্রতারিত করছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন- আল্লাহর উপর নির্ভেজাল ঈমান এবং ভরসাই বিজয় অর্জনের মাধ্যম। অস্ত্রের প্রাচুর্যতা ও সংখ্যাধিক্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল শক্তিধর, তাকে পরাজিত করা অসম্ভব। তিনি প্রজ্ঞাময়। যে বিজয়ের হকদার, তাকেই তিনি বিজয় দান করেন। যদিও সে শক্তির দিক দিয়ে দুর্বল হয়।

রসূল ﷺ যখন শাওয়াল মাসে বদর যুদ্ধ এবং বন্দীদের বিষয়ে সিদ্বান্ত গ্রহণ করার সাত দিন পর বনী সুলাইম গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হলেন। সেখানকার কুদ্‌র নামক পানির কাছে পৌঁছে তিন দিন অবস্থান করে যুদ্ধ ছাড়াই মদীনায় ফেরত আসেন।

ঐ দিকে মুশরিকরা যখন পরাজিত ও অপমানিত অবস্থায় মক্কায় পৌঁছল তখন আবু সুফিয়ান মানত করল যে, মদীনাবাসীদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ না করা পর্যন্ত মাথায় পানি ব্যবহার করবেনা। সে দুইশত অশ্বারোহীর একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পৌঁছে সালাম বিন মিশকাম নামক ইহুদীর নিকট রাত্রি যাপন করল। সেই ইহুদী মানুষের কাছে আবু সুফিয়ানের আগমণের কথা গোপন রাখল। সকাল বেলা সে বেশ কিছু খেজুর গাছ কর্তন করল এবং একজন আনসারী ও তার এক বন্ধুকে হত্যা করে ফেলল। খবর পেয়ে নাবী ﷺ তার সন্ধানে বের হলে সে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় বোঝা কমানোর জন্য প্রচুর পরিমাণ ছাতু ফেলে যায়। এ কারণেই একে গাযওয়াতুছ ছাওয়ীক বা ছাতুর যুদ্ধ বলা হয়।

অতঃপর নাবী ﷺ নজদ এলাকার গাতফান গোত্রের উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে গিয়ে তিনি তৃতীয় হিজরীর পূর্ণ সফর মাস অবস্থান করেন। অতঃপর যুদ্ধ না করেই ফেরত আসেন। সেখান থেকে ফেরত এসে রবীউল আওয়াল মাস মদীনাতেই কাটান। অতঃপর কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বের হন। হিজাজের বুহরান এলাকায় পৌঁছে রবীউছ ছানী এবং জুমাদাল আওয়াল মাস অবস্থান করেন। অতঃপর কোন রূপ যুদ্ধ ছাড়াই সেখান থেকে ফেরত আসেন।

অতঃপর মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় বনী কায়নুকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং কাব বিন আশরাফকে হত্যা করেন। এর পর অঙ্গীকার ভঙ্গ ও আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেওয়ার কারণে মদীনার ইহুদীদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়।

---

২৫৭. সূরা আনফাল-৮:৪৮

উহুদের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা যখন আবু জাহেলসহ কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হত্যা করলেন তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করল। দায়িত্ব পেয়ে রসূল ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রসমূহকে একত্রিত করতে লাগল। প্রচুর অস্ত্র ও জনবলসহ সে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে উহুদ পাহাড়ের নিকট তাবু স্থাপন করল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে হিজরী তৃতীয় সালের শাওয়াল মাসে মদীনার মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের যুবকরাও এবার নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য পেশ করে। যারা বয়সে ছোট ছিল তাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন ছাবেত এবং আরাবা বিন আওয়াস। আর যাদেরকে জিহাদ করতে সক্ষম মনে করেছেন, তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সামুরা বিন জুন্দুব এবং রাফে বিন খাদীজ। এদের বয়স ছিল তখন ১৫ বছর। কেউ কেউ বলেছেন- যাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন ১৫ বছর বয়স হওয়ার কারণে তাদেরকে বালেগ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। আর যাদের বয়স এর কম ছিল নাবালেগ হওয়ার কারণে তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।

অন্য একদল আলেম বলেন- ১৫ বছর বয়স বা বালেগ হওয়ার কারণে নয়; বরং যাদের মধ্যে যুদ্ধ করার মত শক্তি দেখেছেন তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। আর যাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন শক্তি না থাকার কারণেই তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীছের কতক শব্দে এসেছে যে, রসূল ﷺ যখন আমাকে শক্তিশালী দেখলেন তখন জিহাদের অনুমতি দিলেন।

যাই হোক নাবী ﷺ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে শত্রুদের মুকাবেলা করবেন? না মদীনায় থেকেই যুদ্ধ করবেন? রসূল ﷺ-এর রায় ছিল যে, মুসলমানেরা মদীনা থেকে বের হবেনা; বরং মদীনার ভিতরেই থাকবে। কাফেররা যদি মদীনায় প্রবেশের সাহসিকতা প্রদর্শন করে তাহলে মুসলমানেরা মদীনার প্রবেশ পথে যুদ্ধ করবে এবং মহিলারাও ঘরের ছাদ থেকে কাফেরদের উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এই মতকেই সমর্থন করল। আর এটিই ছিল সঠিক রায়। কিন্তু যে সমস্ত সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, তারা মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। তারা এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করলেন এবং যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে পড়লেন। যারা বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল এবার তাদের দৃঢ়তায় ভাটা পড়ল। তখন তারা বলল- আমরা আল্লাহর রসূলকে বের হতে বাধ্য করলাম! তারা আরও বলল- হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি মদীনায় অবস্থান করতে চান তাহলে তাই করুন। রসূল ﷺ তখন বললেন- যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর কোন নাবীর জন্য এটা জায়েয নয় যে, তাঁর মাঝে এবং শত্রুর মাঝে আল্লাহর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলবে।

তাই নাবী ﷺ এক হাজার সাহাবী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। বের হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদীনায় অবশিষ্ট মুসলমানদের ইমাম নিযুক্ত করলেন। এর আগে মদীনায় থাকার সময় রসূল ﷺ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর তলোয়ারটি সামান্য ভেঙ্গে গেছে, একটি গাভী যবেহ করা হচ্ছে এবং তিনি একটি সুরক্ষিত দূর্গে স্বীয় হাত ঢুকাচ্ছেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন- তলোয়ার ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার পরিবারের একজন লোক আক্রান্ত হবেন,

গাভী যবেহ করার ব্যাখ্যা করলেন যে, তাঁর সাহাবীদের একটি দল নিহত হবেন আর সুরক্ষিত দূর্গ হচ্ছে মদীনা।

তিনি পবিত্র জুআর দিন উহুদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী স্থানে এসে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এক তৃতীয়াংশ লোকসহ ফিরে গেল।

অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে তিনি উহুদ প্রান্তরে গিয়ে পাহাড়কে পিছনে রেখে অবস্থান করলেন। মুসলমানদেরকে আদেশ করলেন যে, তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন যুদ্ধ শুরু না করেন। শনিবারের দিন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এ সময় তিনি ৫০ জন তীরন্দাজ বাহীনির উপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরকে আমীর নিযুক্ত করে তাদেরকে আমীরের আনুগত্য করার আদেশ দিলেন। এমন কি তারা যদি দেখে পাখীরা অন্যান্য সৈনিকদেরকে ছিড়ে খাচ্ছে তাতেও যেন তারা স্থান ত্যাগ না করেন। এই বাহিনীকে পিছনে নিযুক্ত করেছিলেন। যাতে মুশরিকরা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে প্রতিহত করা যায়।

ঐ দিকে কুরাইশরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। তারা সংখ্যায় ছিল তিন হাজার। তাদের মধ্যে ছিল দুইশত অশ্বারোহী যোদ্ধা।

দিবসের প্রথম ভাগে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন মুসলিমদের বিজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হল। আল্লাহর দুশমনেরা পরাজিত হল। তারা পরাজিত হয়ে তাদের মহিলাদের নিকট আশ্রয় নিতে লাগল।

ঐ দিকে রসূল ﷺ কর্তৃক নিয়োজিত ৫০ জনের তীরন্দাজ বাহিনী যখন কাফেরদের পরাজয় দেখল তখন তারা রসূল ﷺ এর আদেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগ করতে লাগল এবং গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগল।

তাদের আমীর আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রসূল ﷺ এর আদেশের কথা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলনা। তাদের ধারণা ছিল মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। সুতরাং রসূল ﷺ এর আদেশের কার্যকরিতা শেষ হয়ে গেছে। তাই তারা স্থান ত্যাগ করে গণীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঐ দিকে মুশরিকদের অশ্বারোহীরা পিছন দিক খালি পেয়ে পুনরায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। এক পর্যায়ে তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলল। এখানে ৭০জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। বাকীরা পলায়ন করলে মুশরিকরা রসূল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মুশরিকরা তাঁর চেহারা মোবারকে আঘাত করল, সামনের দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলল। পরিশেষে কুরাইশদের আঘাতে তিনি একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন।

এ সময় শয়তান উচ্চস্বরে চিৎকার করল যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। এই কথা শুনে মুসলিমগণ নিরুৎসাহী হয়ে পড়ল এবং তাদের অধিকাংশই পলায়ন করল। আনাস বিন নযর তখন মুসলিমদের একটি দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি দেখলেন তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা জবাব দিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন- তিনি নিহত হয়ে থাকলে তোমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি?। তোমরা উঠ এবং তিনি যেই জন্য শহীদ হয়েছেন তোমরাও সে পথে মৃত্যু বরণ কর। অতঃপর তিনি লোকদের দিকে অগ্রসর হয়ে সা'দ বিন মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর দেখা পেলেন। সা'দকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন- হে সা'দ!

আমি উহুদ পাহাড়ের পিছন দিক থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। অতঃপর তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন।

কিছুক্ষণ পর রসূল ﷺ মুসলমানদের সামনে আগমণ করলেন। কাব বিন মালেকই সর্বপ্রথম তাঁকে হিলমেটের নীচ থেকে চিনে ফেললেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, হে মুসলিমগণ! এই তো আল্লাহর রসূল এসে গেছেন। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। রসূল ﷺ ইংগিতের মাধ্যমে তাঁকে চুপ থাকতে বললেন। মুসলমানেরা তাঁর চতুর্পাশে এসে একত্রিত হল। সেখানে আবু বকর, উমার এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ছিলেন।

উহুদ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন

উহুদ যুদ্ধের দিন যারা শহীদ হন তাদের মধ্যে হামজাহ, মুসআব বিন উমাইর এবং হানযালা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অন্যতম। রসূল ﷺ দেখলেন যে, ফিরিস্তাগণ হানযালাকে গোসল দিচ্ছে। তাই তিনি সাহাবীদেরকে বললেন- তোমরা তার স্ত্রীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস কর। সাহাবীগণ হানযালার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদেরকে জানালেন যে, যখন যুদ্ধের ডাক আসল তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের উপর ছিলেন। ডাক শুনে তিনি দ্রুত জিহাদের ময়দানে বের হয়ে পড়েন। হানযালার ঘটনা থেকে আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অপবিত্র অবস্থায় যদি কেউ শহীদ হয়, তবে তাকে গোসল দিতে হবে।

এই যুদ্ধে আরও যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের মধ্যে আমর বিন ছাবেতও অন্যতম। তিনি উসাইরাম নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করতেন। যখন উহুদ যুদ্ধের দিন আসল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি ইসলামে প্রবেশ করলেন। তলোয়ার হাতে নিয়ে উহুদ প্রান্তরে রসূল ﷺ এর নিকট চলে গেলেন। এ সময় তাঁর হাতে কয়েকটি খেজুর ছিল। তিনি সেখান থেকে খাচ্ছিলেন। খেজুরগুলো তিনি এই বলে ফেলে দিলেন যে, আমি যদি এগুলো শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে তা হবে এক দীর্ঘ জীবন। অতঃপর তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়ে গেলেন।

তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কেউ অবগত ছিলনা। যুদ্ধ শেষে তার গোত্রীয় লোকেরা শহীদদের মধ্যে স্বজনদের খোঁজ করতে গিয়ে উসাইরামকে পেয়ে গেলেন। তখনও তাঁর রূহ বের হয়ে যায়নি। তারা বলে উঠলঃ আল্লাহর শপথ! এ দেখছি উসাইরাম। সে এখানে কি জন্যে আসল? ইতিপূর্বে তাকে তো আমরা ইসলামের প্রতি নাখোশ অবস্থায় দেখেছি। অতঃপর তারা তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল। হে উসাইরাম! তুমি কি কারণে উহুদ প্রান্তরে এসেছিলে? স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে রক্ষা করতে? না ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়ে? সে উত্তর দিল, বরং ইসলামকে ভালবেসে এবং এতে অনুরাগী হয়ে। আমি আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর আমি আল্লাহর রসূলের পক্ষে যুদ্ধ করে এই অবস্থায় পৌঁছেছি। এই বলে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। সাহাবীগণ রসূল ﷺ এর নিকট উসাইরামের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন- উসাইরাম জান্নাতী হয়ে গেছে। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- তিনি আল্লাহর জন্য একটি সিজদাও করেন নি। তার সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে, তিনি সামান্য কাজ করে বিরাট বিনিময় পেয়ে গেলেন।

উহুদ যুদ্ধে আরও যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম। তিনি বলেন- উহুদ যুদ্ধের পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, মুবাশশির বিন মুনযির

আমাকে বলছেনঃ অচিরেই তুমি আমাদের সাথে মিলিত হবে। আমি বললামঃ কোথায়? তিনি বললেন- জান্নাতে। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াব। আমি মুবাশশিরকে বললামঃ তুমি কি বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাওনি? তিনি বললেন- হ্যাঁ। তবে আমি পুনরায় জীবিত হয়েছি। স্বপ্নের বিষয়টি রসূল কে বলা হলে তিনি বললেন- হে জাবেরের পিতা! তুমি অচিরেই আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

আমর ইবনুল জামুহ ছিলেন একজন লেংড়া সাহাবী। তাঁর ছিল চারজন যুবক পুত্র সন্তান। পুত্রদের সকলেই রসূল এর সকল যুদ্ধেই অংশ নিতেন। রসূল যখন উহুদের উদ্দেশ্যে বের হলেন তখন তিনিও তাঁর সাথে বের হতে চাইলেন।

সন্তানেরা তাঁকে বলল- আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আপনি বাড়িতেই থাকুন। আমরাই আপনার পক্ষ হতে যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে জিহাদ থেকে রেহাই দিয়েছেন। আমর বিন জামুহ এ কথা শুনে রসূল এর নিকট এসে বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমার এই ছেলেরা আমাকে আপনার সাথে জিহাদে বের হতে বারণ করছে। আল্লাহর শপথ আমি আমার এই লেংড়া পা নিয়ে জান্নাতে বিচরণ করতে চাই। রসূল তাঁকে বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আর তাঁর ছেলেদেরকে বললেন- তোমরা যদি তাকে জিহাদে যেতে দাও, তাহলেও তোমাদের কোন ক্ষতি হবেনা। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাকে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। অতঃপর তিনি রসূল এর সাথে উহুদের দিন জিহাদে বের হয়ে শহীদ হলেন।

উহুদ যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান তিনবার বলল- মুহাম্মাদ কি লোকদের মধ্যে জীবিত আছে? নাবী লোকদেরকে জবাব দিতে নিষেধ করলেন। অতঃপর আবু সুফিয়ান তিনবার বলল- লোকদের মধ্যে আবু কুহাফার পুত্র আছে কি? পুনরায় তিনবার বলল- লোকদের মধ্যে খাত্তাবের পুত্র কি আছে? অতঃপর আবু সুফিয়ান তার সাথীদের কাছে গিয়ে বলল- এরা তিন জনই নিহত হয়েছে। এ কথা শুনে উমার আত্মসংবরণ করতে না পেরে বলে উঠলেনঃ আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহ্র দুশমন! তোমার ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুমি যাদের নাম ধরে ডাকলে তাদের সবাই জীবিত আছেন। তোমার কষ্টের দিনগুলো বাকী রয়েছে। আবু সুফিয়ান বলল- আজকের দিন বদরের যুদ্ধের দিনের প্রতিশোধ হয়ে গেল। আর যুদ্ধ তো পানির পাত্রের মত। অর্থাৎ পানির পাত্র যেমন একজনের হাতে স্থির থাকে না, তেমনি যুদ্ধে একবার একজন, আরেকবার অন্য জন জয়লাভ করে থাকে। তোমরা তোমাদের কিছু লোককে মুছলা অবস্থায় তথা নাক কান কাটা পাবে। অবশ্য এরূপ করার জন্য আমি নির্দেশ করিনি। এতে আমার কোন দুঃখও নেই। এরপর আবু সুফিয়ান উচ্চস্বরে কবিতার ছন্দ উচ্চারণ করতে লাগল- হোবলের জয়! হোবলের জয়! নাবী তখন বললেন- তোমরা কি তার কথার জবাব দেবে না? তাঁরা বললেন- হে আল্লাহর রসূল! বলুনঃ আমরা কি বলে তার জবাব দেব? তিনি বললেন- তোমরা বলঃ আল্লাহ মহান! তিনি সবচেয়ে বড়। আবু সুফীয়ান বলল- আমাদের আছে উয্যা। তোমাদের কোন উয্যা নেই। নাবী বললেন- তোমরা কি তার কথার জবাব দেবে না? তারা বললেন- হে আল্লাহর রসূল! বলুনঃ আমরা কি জবাব দেব? নাবী বললেন- তোমরা বলঃ আমাদের মাওলা হলেন আল্লাহ। তোমাদের কোন মাওলা নেই।

অতঃপর আবু সুফিয়ান বলতে লাগল- আজ আমরা বদরের যুদ্ধের বদলা নিতে সক্ষম হয়েছি। যুদ্ধের ক্ষেত্রে এ রকম সমান সমান হয়েই থাকে। উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন বললেন- সমান সমান হয় কিভাবে? আমাদের শহীদগণ জান্নাতী। আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামী।

আবু সুফিয়ান যখন শিরক, কুফর ও দেব-দেবী নিয়ে বাহাদুরী করল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাওহীদের বড়ত্ব প্রকাশ ও মুসলমানদের একমাত্র মাবুদ আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করার জন্য জবাব দিতে বললেন। এর আগে যখন সে বলেছিল- তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ বেঁচে আছে কি? আবু বকর বেঁচে আছে কি? উমার বেঁচে আছে কি? তখন তিনি জবাব দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা তখনও তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা শেষ হয়নি। অতঃপর আবু সুফিয়ান যখন বলল- এদের তিনজনই নিহত হয়েছেন। তখন উমার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন- হে আল্লাহর দুশমন তুমি মিথ্যা বলেছ। এদের সকলেই জীবিত আছেন।

উমারের এই ঘোষণায় বিপদজনক অবস্থাতেও সাহসিকতা ও শত্রুদের প্রতি সজাগ থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে আরও পরিচয় পাওয়া যায় মুহাম্মাদের অনুসারীগণ বীরত্বের অধিকারী এবং তারা শত্রুদের থেকে ভীত নন। তার জবাবে শত্রুদের মর্ম জ্বালা সৃষ্টি হয়েছিল। আবু সুফিয়ান যখন প্রত্যেকের খবর আলাদাভাবে জানতে চেয়েছিল তখন তিনি জবাব দেন নি। আর যখন তিনজনের কথা একসাথে বলেছিল তখন জবাব দিয়েছেন। এতে তিনি তাদের শক্তিকে দুর্বল করতে চেয়েছেন। সুতরাং প্রথমবার জবাব না দেয়া উত্তম ছিল। দ্বিতীয়বার জবাব দেয়া উত্তম হয়েছে। প্রথমবার জবাব না দিয়ে তিনি আবু সুফিয়ানকে অপমানিত করতে চেয়েছেন। সে যখন তাদের তিনজনকে মৃত জেনে খুশী হতে চেয়েছিল এবং অহংকার করতে চেয়েছিল তখন জবাব দিয়ে তিনি তাকে নিরাশ করতে চেয়েছেন। সুতরাং উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জবাবে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিষেধাজ্ঞার বিরোধীতা ছিলনা।

উহুদ যুদ্ধে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে

- যুদ্ধ শুরু করার পর তা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করবে এবং মাঠে নেমে যাবে তার জন্য যুদ্ধ থেকে সরে আসা বৈধ নয়।
- মুসলিম দেশে শত্রু আগমণ করে হামলা করলে মুসলমানদের জন্য নগর ফটকের বাইরে গিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করা আবশ্যক নয়।
- যে সমস্ত শিশু যুদ্ধের ক্ষমতা রাখেনা তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হবেনা।
- জিহাদের ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারাও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
- যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদলের মধ্যে ঢুকে পড়া জায়েয আছে। যেমনটি করেছিলেন আনাস বিন নযর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।
- ইমাম যদি আহত হয়ে যান আর তিনি যদি বসে সলাতের ইমামতি করেন, তাহলে পিছনের লোকেরাও বসে সলাত পড়বে।[২৫৮]

---

২৫৮. وأنّ الإمام إذا جرح صلّى بهم قاعداً وصلّوا وراءه قعوداً ইমাম যদি অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ইমামতি করতে অক্ষম হয়, তাহলে অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করা মুস্তাহাব। কারণ বসে আদায় কারীর নামাযের চেয়ে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর সলাত অধিক পরিপূর্ণ।যেসব মুসল্লী দাড়িয়ে সলাত পড়তে সক্ষম, তাদের ইমামের জন্য অসুস্থতা বা অন্য কারণে বসে ইমামতি করা সম্পর্কে

- আল্লাহর কাছে শাহাদাতের তামান্না (আশা) করা এবং দু'আ করা দোষের কিছু নয়। যেমন আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ শাহাদাত কামনা করেছিলেন।
- কোন মুসলিম যদি আত্মহত্যা করে তাহলে সে জাহান্নামী হবে। কাযমান যখন উহুদ যুদ্ধে আহত হলেন তখন সে জখমের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্ম হত্যা করল। নাবী ﷺ তা জানতে পেরে বললেন- সে জাহান্নামী।
- যুদ্ধক্ষেত্রে যারা শহীদ হবে তাদেরকে গোসল দেয়া হবেনা এবং তাদের জানাযা পড়া হবেনা। যে পোষাকে তারা নিহত হবেন সেই পোষাকেই তাদেরকে দাফন করা হবে। তবে শত্রুরা যদি তার পোশাক ছিনিয়ে নেয় তাহলে অন্য পোষাকে কাফন পরাতে হবে। আর কেউ যদি স্ত্রী সহবাস জনিত কারণে নাপাক থাকে তাহলে গোসল দেয়া হবে। যেমন হানযালা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ফিরিস্তারা গোসল দিয়েছিলেন। শহীদদের পরিহিত পোষাকেই দাফন করা মুস্তাহাব না ওয়াজিব? এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তবে সঠিক কথা হচ্ছে তা ওয়াজিব।

আলেমদের থেকে একাধিক মত পাওয়া যায়।

১) ইমাম যদি অসুস্থতা বা অন্য কারণে দাঁড়িয়ে সলাত পড়তে দাঁড়াতে সক্ষমদের জন্য বসে ইমামতি করে তাহলে তার ইমামতি জায়েয হবে এবং মুক্তদীদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে তারাও বসে সলাত পূর্ণ করবে। তাদের দলীল হচ্ছে, নবী ﷺ বলেন-

وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ

ইমাম যদি বসে সলাত পড়ে, তাহলে তোমরা সকলেই বসে সলাত পড়ো। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৬২৮)। শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উছাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন এখানে আদেশটি ইমামের পিছনে বসে সলাত পড়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ করে। এটিই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের মত। তবে তার অন্যমতে বসে পড়া মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।

২) শাফেঈ ও হানাফী মাজহাবের মতে ইমাম যদি বসে সলাত পড়ে, তাহলে মুসাল্লীদের দাড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে সলাত পড়লে তাদের সলাতই হবেনা। তারা নবী ﷺ এর অসুস্থতার সময়ের ইমামতি করার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। তাতে এসেছে যে, অতঃপর নবী ﷺ একদিন কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন। তাই তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে যোহরের সলাত পড়ার জন্য ঘর থেকে বের হলেন। যাদের কাঁধে ভর দিয়েছিলেন তাদের একজন ছিলেন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) লোকদেরকে নিয়ে সলাত পড়ছিলেন। আবু বকর তাঁকে দেখে পিছনে চলে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি নিজ স্থানেই থাক। তিনি বললেনঃ আমাকে আবু বকরের পার্শ্বে বসিয়ে দাও। তাঁরা নবী ﷺ কে আবু বকরের পার্শ্বে বসিয়ে দিলেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী ﷺ এর নামাযের অনুসরণ করছিলেন। আর লোকেরা আবু বকরের নামাযের অনুসরণ করে সলাত আদায় করছিল। আর নবী ﷺ ছিলেন বসা অবস্থায়।

দ্বিতীয় মতের পক্ষের আলেমগণ প্রথম মতের সমর্থকদের দলীলের জবাবে বলেন যে, প্রথমে রাসূল ﷺ উপবিষ্ট ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে সলাত পড়তে আদেশ করেছিলেন। পড়ে তাঁর শেষ জীবনের আমলের দ্বারা প্রথম আদেশ রহিত হয়ে গেছে। তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাসূল ﷺ বসে ইমামতি করছিলেন। ঐ দিকে আবু বকর ও অন্যান্য সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে সলাত পড়েছিলেন।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আলউছাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ উভয় প্রকার হাদীছের উপর যেহেতু আমল করা সম্ভব, তাই বসে উপবিষ্ট ইমামের পিছনে বসে সলাত পড়ার আদেশ রহিত হয়ে গেছে বলা ঠিক নয়। তিনি উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, সাহাবীগণের দাঁড়িয়ে সলাত পূর্ণ করার কারণ হলো, তারা প্রথমে আবু বকরের ইমামতিতে দাঁড়িয়েই শুরু করেছিলেন। সুতরাং ইমাম যদি দাঁড়িয়ে শুরু করে অতঃপর অসুস্থতার কারণে বসে পড়তে বাধ্য হয়, তাহলে মুসালল্লীরা দাঁড়িয়েই তাদের সলাত পূর্ণ করবে।

আর ইমাম যদি প্রথম থেকেই বসে ইমামতি শুরু করে, তাহলে মুক্তাদীগণও বসে পড়বে। এভাবে সমন্বয় করলে উভয় প্রকার হাদীসের উপরই আমল হয়ে যায়। (আল্লাহই অধিক অবগত আছেন)

Contents

- ➢ যুদ্ধের শহীদদেরকে যুদ্ধের ময়দানেই দাফন করতে হবে। কেননা উহুদের যে সমস্ত শহীদকে মদীনায় বহন করে নেওয়া হয়েছিল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢম তাদেরকে উহুদের মাঠে ফেরত নিয়ে তথায় দাফন করতে আদেশ দিয়েছেন।
- ➢ এক কবরে দুইজন বা তিনজন মৃতকে দাফন করা জায়েয আছে।
- ➢ বিকলাঙ্গ বা অন্য কোন উযর (ওযূহাত) থাকার কারণে যাদের জন্য জিহাদে বের না হওয়ার অনুমতি আছে, ইচ্ছা করলে তারাও জিহাদে বের হতে পারে। যেমন নাবী ﷺ একজন লেংড়া সাহাবীকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন।
- ➢ কোন মুসলিম যদি যুদ্ধের ময়দানে ভুলক্রমে অন্য কোন মুসলিমকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে বাইতুল মাল থেকে দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। কেননা রসূল ﷺ হুযায়ফা বিন ইয়ামানের পিতার দিয়ত দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।

উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা

উহুদ যুদ্ধে যে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-ইমরানের ১২১ নং আয়াত থেকে শুরু করে ১৬০ নং আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে মুসলমানদেরকে রসূলের কথা অমান্য করা, মতভেদ করা এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া। যাতে তারা ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ে যায় এবং যে সমস্ত বিষয় তাদের পরাজয়ের কারণ হতে পারে তা থেকে বিরত থাকে।

নাবী-রসূল ও তাদের অনুসারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ একটি হিকমত ও রীতি হচ্ছে তারা কখনও জয়লাভ করবে আবার কখনও পরাজিত হবে। তবে সর্বশেষে তাদেরই বিজয় হবে। সবসময় তাদেরকে বিজয় দান করলে সত্যিকার মুমিন ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব হবেনা। আর সবসময় পরাজিত করলে নাবী-রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সফল হবেনা।

﴿مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

"তোমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছো, আল্লাহ মুমিনদের কখনও সেই অবস্থায় থাকতে দিবেন না। পাক-পবিত্র লোকদেরকে তিনি নাপাক ও অপবিত্রকে লোকদের থেকে আলাদা করেই ছাড়বেন। কিন্তু তোমাদেরকে গায়েবের খবর জানিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রসূলদের মধ্যে হতে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নেন। সুতরাং আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর রসূলগণের উপর তোমরা ঈমান আনয়ন কর। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান।"[২৫৯] অর্থাৎ মুমিন ও মুনাফিকরা যেভাবে একসাথে মিশ্রিত অবস্থায় আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সে অবস্থায় রেখে দিবেন না। বরং তিনি প্রকৃত মুমিনদেরকে মুনাফেকদের থেকে আলাদা করবেন। যেমন তিনি করেছিলেন উহুদ যুদ্ধের দিন। আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে গায়েবের খবর অবগত করেন না। কেননা গায়েবের মাধ্যমেই তিনি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য করেন।

---

২৫৯. সূরা আল-ইমরান-০৩:১৭৯

আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছেন যে, বাহ্যিকভাবেও যেন বিশ্বাসী ও মুনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। আর উহুদ যুদ্ধে তাই হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনি তাঁর রসূলদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকে গায়েবের খবর অবগত করেন।

সুতরাং হে মুমিনগণ! তোমরা সেই গায়েবের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমেই সৌভাগ্যবান হবে, যা তিনি তাঁর রসূলগণকে অবগত করেন। তোমরা যদি গায়েবের প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের মধ্যে আরেকটি হিকমত এই ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা দেখাতে চান যে, তাঁর খাঁটি বন্ধুরা সুখে-দুঃখে এবং পছন্দে-অপছন্দে তথা সকল অবস্থাতেই আল্লাহর ইবাদত করে। সুতরাং আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তারাই, যারা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর ইবাদত করে। তারা ঐ সকল লোকদের মত নয়, যারা শুধু সুখে থাকা অবস্থাতেই আল্লাহর পথে থাকে।

আল্লাহ্ যদি সবসময় তাদেরকে বিজয়ী করতেন, তাহলে তাদের অবস্থা ঐ সব লোকদের মতই হতো, যাদেরকে রিযিকের ব্যাপারে প্রশস্ততা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সকল মাখলুকের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। তিনি মাখলুকের সকল অবস্থা সম্পর্কে জানেন ও তা দেখেন।

বান্দারা যখন আল্লাহর দরবারেই নিজেদের অক্ষমতা ও অপারগতা তুলে ধরে দু'আ করে তখন তারা বিজয়ের হকদার হয়ে যায়। আর দুর্বলতা ও পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পর বিজয়ের পোশাক খুব ভাল লাগে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"বস্তুত আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (সূরা আল-ইমরান-০৩:১২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾

"আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুলণ্ড করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল ও মুমিনদের উপর নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এই হল কাফেরদের কর্মফল"।[২৬০]

---

২৬০. সূরা তাওবা-৯:২৫-২৬

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের জন্য বেহেশতের মধ্যে এমন কিছু মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন, যা শুধু আমলের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। বালা-মসিবতে আক্রান্ত হওয়া ব্যতীত তা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য বালা-মসিবত দ্বারা পরীক্ষা করার পর উক্ত মনজিলে পৌঁছায়ে দেন। সেই সাথে তিনি সৎ আমল করারও তাওফীক দান করেন।

সর্বদা সুস্থ থাকা, সবসময় বিজয় অর্জন হতে থাকা এবং প্রচুর নিয়ামাত ও কল্যাণের মধ্যে থাকা মুমিনদেরকে দুনিয়ার মায়া-মমতায় ফেলে দেয় এবং তাদের হৃদয়ের মধ্যে মরিচা পড়ে যায় এবং আল্লাহর পথে এবং আখিরাতের সুন্দর জীবনের দিকে চলতে হৃদয়কে বাধাগ্রস্ত করে।

আর আল্লাহ্ যখন তাঁর কোন বান্দাকে সম্মানিত করতে চান তখন তাকে বালা-মসিবতে ফেলে আখিরাতের দিকে ফিরিয়ে আনেন। এটিই হচ্ছে তার চিকিৎসা।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহর নিকট শাহাদাত হচ্ছে সর্বোচ্চ মর্যাদা। তাই তিনি স্বীয় বন্ধুদের মধ্য হতে কতিপয়কে শহীদ হিসাবে বেছে নিতে চান।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন তার দুশমনদেরকে হালাক (ধ্বংস) করতে চান তখন তাদেরকে দিয়ে এমন কিছু করিয়ে নেন, যাতে তারা ধ্বংসের হকদার হয়ে যায়। এ সবের মধ্যে রয়েছে, কুফরীতে বাড়াবাড়ি করা, সীমা লংঘন করা, আল্লাহর অলীদেরকে মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট দেয়া, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাগণ গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায় এবং দুশমনরা ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾

"আর তোমরা নিরাশ হয়োনা এবং দুঃখ করোনা। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে। তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্ জানতে চান, কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান।" (সূরা আল-ইমরান-৩:১৩৯-১৪১) এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা একই সাথে মুমিনদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং উহুদের যুদ্ধে তাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার জন্য উত্তমভাবে শান্তনা দিয়েছেন। সেই সাথে যে কারণে উহুদ যুদ্ধে তাদের উপর কাফেরদেরকে বিজয়ী করেছেন তাও বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

"তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি"। (সূরা আল-ইমরান-৩:১৪০) সুতরাং তোমাদের কি হল যে, তোমরা নিরাশ হচ্ছ এবং দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছ। ইতিপূর্বে কাফেররাও আহত হয়েছে। আর তাদের সেই আঘাত ছিল শয়তানের পথে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি দুনিয়ার

দিনসমূহ মানুষের মাঝে ঘুরিয়ে থাকেন। কেননা এটি এমন বিষয়, যা দুনিয়াতে তিনি তাঁর বন্ধু ও শত্রু উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই ভাগ করে থাকেন। তবে আখিরাতের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে কেবল আল্লাহর বন্ধুগণই নেয়ামত ভোগ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ যুদ্ধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হিকমত উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে খাঁটি মুমিনদেরকে মুনাফেকদের থেকে আলাদা করা। ইতিপূর্বে মুনাফেকদেরকে মুমিনগণ চিনতেন না। তারা কেবল আল্লাহর ইলমেই ছিল। এবার মুমিনগণ মুনাফেকদেরকে কপালের চোখ দিয়ে দেখে নিলেন এবং গায়েবী বিষয়টি জেনে ফেললেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের আরেকটি হিকমতের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের থেকে কাউকে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

"আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না"। এখানে সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুনাফেকরা যেহেতু উহুদ যুদ্ধের দিন আল্লাহর নাবীকে ফেলে চলে এসেছিল, তাই তিনি তাদেরকে পছন্দ করেন নি এবং তাদের থেকে কাউকে শহীদ হিসাবেও গ্রহণ করেন নি। উহুদ যুদ্ধে মুমিনদের পরাজয়ের আরেকটি হিকমত হচ্ছে, তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করা এবং মুনাফেকদের থেকে আলাদা করা। উহুদ যুদ্ধের পর থেকে মুমিনগণ মুনাফেকদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।

এতে আরও হিকমত রয়েছে যে, প্রথমে কাফেরদেরকে সীমালংঘনের সুযোগ দেয়া এবং সেই কারণে তাদেরকে ধ্বংস করা। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত মুমিনদের ধারণা খন্ডন করেছেন, যারা মনে করত যে, বিনা জিহাদেই জান্নাতে যাওয়া যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল?" (সূরা আল-ইমরান-৩: ১৪২) অর্থাৎ তোমাদের থেকে এখন পর্যন্ত উহা লক্ষ্য করা যায়নি। যাতে করে তার পুরুস্কার দেয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে এই বলে ধমক দিয়েছেন যে, তোমরা যেহেতু জিহাদের কামনা করেছিলে এবং শত্রুদের সাথে মুকাবেলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে, তাই এখন পলায়ন করলে কেন? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾

"আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ"। (সূরা আল-ইমরান-৩: ১৪৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর নাবীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বদরের যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করলেন তখন ঐ সমস্ত মুসলমান নতুন কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাতের তামান্না (আকাঙ্খা) প্রকাশ করলেন, যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য উহুদ যুদ্ধে বের হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। সেখানে গিয়ে কতিপয় লোক ব্যতীত যখন তারা পলায়ন করল তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের আরেকটি কারণ ছিল এই যে, নাবী ﷺ জীবিত থাকতেই এমন একটি ভূমিকা পেশ করা যাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ অচিরেই মৃত্যু বরণ করবেন। নিয়ামতের প্রকৃত শোকর আদায়কারী তারাই হতে পারবে, যারা তাদের মাঝে রসূল ﷺ জীবিত থাকার নিয়ামতের কদর বুঝতে সক্ষম হবে তাঁর সাথে দৃঢ় থাকবে এবং পশ্চাৎমুখী হবেনা। যারা এ রকম হবার তাওফীক প্রাপ্ত হবে তারাই পুরস্কৃত হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে। মুহাম্মাদ ﷺও মৃত্যু বরণ করবেন। কারণ তাঁর পূর্বেও অনেক নাবী-রসূল মৃত্যু বরণ করেছেন। তাদের সাথেও অনেক অনুসারী নিহত হয়েছেন। আর যারা বেঁচে ছিলেন, তারা দূর্বল হয়ে যান নি কিংবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে যান নি। তারা শক্ত মনোবল ও সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি নিয়ে যুদ্ধ করে শাহাদাত অর্জনের স্পৃহা নিয়ে বেঁচে ছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য প্রেরিত হন নি। সুতরাং তিনি মারা গেলে বা নিহত হলে মুসলমানদের পিছপা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাদেরকে তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীন ও তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে এবং মৃত্যু বা নিহত হওয়া পর্যন্ত এর উপরই অবিচল থাকতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেছেন, যার মাধ্যমে নাবী-রসূল ও তাদের অনুসারীগণ তাদের জাতির উপর জয়লাভ করেছিলেন। আর তা হচ্ছে নিজেদের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করা, তাওবা করা, সত্যের উপর অটুট রাখার জন্য তাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করা এবং শত্রুর উপর জয়লাভ করার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

"তারা আর কিছুই বলেনি, শুধু বলেছে, হে আমাদের প্রতিপালক! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখিরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন"। (সূরা আল-ইমরান-৩: ১৪৭-১৪৮) সুতরাং তারা আল্লাহর কাছে তাদের গুনাহ্ থেকে ক্ষমা চেয়েছেন, যুদ্ধের সময় তাদের পদসমূহকে দৃঢ় রাখার দু'আ করেছেন এবং আল্লাহর সাহায্য চেয়েছেন। কেননা তারা জেনেছিল যে, মুসলমানদের গুনাহের কারণেই তাদের উপর দুশমনরা জয়লাভ করে থাকে এবং শয়তান তাদের গোমরাহ করে ও এর মাধ্যমেই তাদেরকে পরাজিত করে। গুনাহ্সমূহ দুই প্রকার। (১) হকসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি করা এবং (২) কিছু গুনাহ হয়ে থাকে সীমালংঘনের কারণে। আর আনুগত্য করার মাধ্যমেই মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সাহায্য এসে থাকে। তারা বলেছিলেন- হে আমাদের প্রতিপালক! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর। তারা জেনেছিল যে, আল্লাহ্ যদি তাদেরকে দৃঢ়পদ না রাখেন এবং সাহায্য না করেন, তাহলে কখনই তারা জয়লাভ করতে পারবেন না। তারা আল্লাহর কাছে ঐ বিষয় চেয়েছিলেন, যা আল্লাহর হাতে রয়েছে। তারা উভয় দিকের প্রতিই খেয়াল রেখেছিলেন। তাওহীদের বাস্তবায়ন এবং উহার হকসমূহ পরিপূর্ণরূপে আদায় করে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। সেই সাথে বিজয় আসার পথে যে সমস্ত বাধা থাকতে পারে তা দূর করতে সক্ষম

হয়েছিলেন। আর তা হচ্ছে পাপাচারিতা ও জুলুম। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা মুনাফেক ও মুশরিক শত্রুদের তাবেদারী করতে নিষেধ করেছেন। তারা যদি শত্রুদের আনুগত্য করে তাহলে তারা উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে ঐ সমস্ত মুনাফেকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পর কাফেরদের পূর্ণ তাবেদারী করা শুরু করে দিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন- তিনিই মুমিনদের অভিভাবক এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতি মুহাব্বাত রাখবে সেই বিজয়ী হবে। তিনি শত্রুদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিবেন। যেই ভয় তাদেরকে মুসলমানদের উপর হামলা করতে বাধা দিবে। শিরক ও কুফরীর কারণেই এমন ভীতি তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে। যেই মুমিন ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে নি, তার জন্যই রয়েছে হিদায়াত ও নিরাপত্তা।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুমিনদেরকে সাহায্য করার সত্য ওয়াদা করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা যদি বরাবরই আনুগত্য করতে থাকে, তাহলে তারা সদা বিজয় অর্জন করতে থাকবে। তবে সমস্যা হচ্ছে মুসলিমরা আনুগত্যের পথ ছেড়ে দেয়ার কারণে বিজয় ও সাহায্য তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং গুনাহ ও পাপ কাজের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে জানিয়ে দেয়ার জন্য ও ভাল কাজের শুভ পরিণাম সম্পর্কে অবগত করে দেয়ার জন্য এবং পরীক্ষা করার জন্য তাদের থেকে বিজয়কে সরিয়ে নিয়েছেন।

এত কিছুর পরও তিনি মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। হাসান বসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে জিজ্ঞেস করা হল- শত্রুকে মুসলমানদের উপর শক্তিশালী করে দেয়ার পর ক্ষমা করে দেয়া হল কিভাবে? উত্তরে তিনি বললেন- আল্লাহর ক্ষমা না হলে শত্রুরা তাদের মূলোৎপাটন করে ফেলত। তারা মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং তাঁর ক্ষমার কারণেই এইবার তিনি শত্রুদেরকে প্রতিহত করেছেন।

এরপর আল্লাহ্ তা‘আলা উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের ঐ দৃশ্য ও অবস্থার আলোচনা করেছেন, যখন তারা পাহাড়ের উপর আরোহন করে পলায়ন করছিল। তারা আল্লাহর রসূল ও সাহাবীদের প্রতি ফিরেও তাকাচ্ছিলেন না। অথচ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছন দিক থেকে এই বলে ডাকছিলেন যে, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আমার দিকে ফিরে এসো। আমি আল্লাহর রসূল! সুতরাং আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের এই পলায়নের কারণে দুঃশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তায় ফেলার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন। (এক) পলায়নের কারণে নেমে আসা বিষিণ্ণতা। (দুই) শয়তানের এই বলে চিৎকারের বিষণ্নতা যে, সে বলেছিল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিহত হয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন- পলায়নের মাধ্যমে যেহেতু তারা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পেরেশানীর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তাই আল্লাহ্ তা‘আলাও তাদেরকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলে পরীক্ষায় ফেলেছেন। তবে নিম্নলিখিত কারণে প্রথম কথাটিই অধিক সুস্পষ্ট: ১. আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-

﴿لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

“যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সে জন্য বিষণ্ন না হও। আর আল্লাহ্ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন”।[২৬১] এখানে

২৬১. সূরা আল-ইমরান-৩: ১৫৩

মুসলমানদেরকে বিষণ্ণগ্রস্ত করার পর পুনরায় বিষণ্ন করা হিকমত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে তারা বিজয় হাত ছাড়া হওয়ার কারণে এবং পরাজিত হওয়ার কারণে আপতিত দুঃশ্চিন্তা ভুলে যায়। আর এটি ঐ রকম একটি পেরেশানী ঢেলে দেয়ার মাধ্যমেই সম্ভব, যার পরে আরেকটি পেরেশানী আগমন করেছিল।

২. প্রথম ব্যাখ্যাটিই বাস্তব সম্মত। তারা একাধিক পেরেশানীতে পড়েছিল। সেদিন গণীমতের মাল অর্জন না করতে পারার বিষণ্নতা, পরাজিত হওয়ার বিষণ্নতা, আহত ও নিহত হওয়ার বিষণ্নতা, নাবী ﷺ নিহত হওয়ার গুজব এবং শত্রুদের পাহাড়ের উপর উঠে পড়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এখানে শুধু দু'টি পেরেশানী ছিলনা; বরং পেরেশানীর পর পেরেশানী আসতেই ছিল। যাতে করে তাদের ঈমানের পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা হয়ে যায়।

৩. এখানে গাম্ম (পেরেশানী) দ্বারা সাজা ও শাস্তিকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। সাজা অর্জনের কারণ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়নি। সার কথা হচ্ছে নাবী ﷺ কে বর্জন করা, যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, রসূলের ডাকে সাড়া না দেয়া, তাঁর কথা অমান্য করে তীরন্দাজদের স্থান ত্যাগ করা, পরস্পর মতবিরোধ করা এবং মনোবল হারা হয়ে যাওয়া- এগুলো এমন বিষয় যার প্রত্যেকটিই একটি করে পেরেশানী ডেকে আনে। সুতরাং পেরেশানীতে পড়ার একাধিক কারণ পাওয়া গিয়েছিল বলেই একের পর এক পেরেশানী এসেছিল। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহ ও দয়ার কারণেই তাদের থেকে এমন কিছু স্বভাবগত মন্দ আচরণ প্রকাশ হয়েছিল, যা স্থায়ী বিজয়ের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই এগুলো থেকে তাদেরকে পরিষ্কার করার জন্য এমন কিছু কারণ তৈরী করেছেন, যার ফলাফল বাহ্যিক দৃষ্টিতে খারাপ মনে হচ্ছিল। তখন তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, কৃত অপরাধ থেকে তাওবা করা, উপরোক্ত অপরাধগুলো জরুরী ভিত্তিতে পরিহার করা। আর পাপ কাজ ছেড়ে দিয়ে তার স্থলে নেক কাজ করা অত্যন্ত জরুরী। এ ছাড়া স্থায়ী সাহায্য ও বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়। সুতরাং উহুদ যুদ্ধের পর তারা সতর্ক হয়ে গেল এবং যেই দরজা দিয়ে পরাজয়ের কারণগুলো প্রবেশ করেছিল, তা সম্পর্কে অবগত হয়ে গেল। কেননা কখনও অসুস্থতার মাধ্যমেও শরীর সুস্থ হয়ে থাকে। অর্থাৎ পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার পর বান্দা যখন তাওবা করে তখন সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়। তার শরীর ও মন পূর্বের তুলনায় অধিক সুস্থতা অনুভব করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের উপর দয়া ও রহমত বশতঃ তাদের উপর নিদ্রা ঢেলে দিয়ে পেরেশানীকে দূর করে দিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নিদ্রা হচ্ছে বিজয়ের আলামত। বদরের যুদ্ধেও আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে তন্দ্রা ও নিদ্রা দিয়ে আচ্ছাদিত করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- যার উপর নিদ্রা আগমণ করেনি, সে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত যারা নিজেদের নফস্ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তার কাছে দ্বীন, নাবী বা সঙ্গী-সাথীর কোন মূল্য ছিলনা। আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জাহেলী যামানার লোকদের ধারণা পোষণ করেছিল।

আল্লাহর রসূল সম্পর্কে তাদের ধারণা কেমন ছিল- এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তারা ধারণা করত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে সাহায্য করবেন না। অচিরেই মুহাম্মাদের কর্ম-কান্ড ও প্রচেষ্টার অবসান ঘটবে। তারা আরও ধারণা করেছিল যে, তাদের যে বিপর্যয় হয়েছিল, তা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী হয়নি। এতে আল্লাহর বিশেষ কোন হিকমতও ছিলনা। সুতরাং তারা কাদ্‌র (তাকদীর), হিকমতে ইলাহী এবং দ্বীনে ইলাহীর বিজয় হওয়ার কথা অস্বীকার করেছিল। এটিই ছিল

তাদের মন্দ ধারণা। যেই ধারণা করেছিল মক্কার মুশরিক এবং মদীনার মুনাফেকরা। সূরা ফাতাহ্-এর মধ্যে এ সবের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এই ধারণা ছিল একটি মন্দ ধারণা। কারণ এটি এমন একটি ধারণা, যা আল্লাহর যাতে পাক, তাঁর সুমহান নাম, গুণাবলী, তাঁর হিকমতের ক্ষেত্রে মোটেই ঠিক নয়। তেমনি এমন ধারণা আল্লাহর একচ্ছত্র রুবুবীয়াত ও উলুহীয়াতের শানেও প্রযোজ্য নয়। কারণ আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং যে ধারণা করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রিসালাতকে পূর্ণতা দান করবেন না, সত্যের উপর বাতিলকে সবসময় বিজয়ী রাখবেন, সত্য বাতিলের সামনে দুর্বল হয়ে থাকবে এবং এরপর সত্য কখনই মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবেনা, সে অবশ্যই আল্লাহর ব্যাপারে মন্দ ধারণা করল। সে আল্লাহর সাথে এমন বিষয়কে সম্পৃক্ত করল, যা আল্লাহর সিফাতে কামালিয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যে ব্যক্তি ঐ প্রকারের কোন কর্মে তাকদীরে ইলাহীকে অস্বীকার করল সে আল্লাহর ক্ষমতা ও রাজত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর যে সমস্ত লোক আল্লাহর সেই হিকমতকে অস্বীকার করল, যার কারণে তিনি প্রশংসার হকদার এবং এই ধারণা পোষণ করল যে, উহুদের যুদ্ধে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে পরাজিত করতে চেয়েছেন বলেই তা করেছেন, এর পিছনে অন্য কোন হিকমত নিহিত নেই, তারা কাফেরদের ন্যায়ই ধারণা করল। আর কাফেরদের জন্যই রয়েছে ধ্বংস ও জাহান্নাম।

অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ্ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকে। বিশেষ করে ঐ সমস্ত বিষয়ে, যা তাদের তাকদীরের সাথে সম্পৃক্ত। যারা আল্লাহর যাতে পাক, তাঁর পবিত্র নামসমূহ, তাঁর ত্রুটিমুক্ত সিফাতসমূহ এবং হিকমতসমূহ ও তিনিই যে যথাযথ প্রশংসার হকদার এ সম্পর্কে যারা অবগত, তারাই কেবল আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারনা করা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। যে মুমিন আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হল, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল। যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের সাথে একই আচরণ করবেন, সেও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল।

যে ব্যক্তি মনে করল যে, আল্লাহর বান্দারা তাঁর আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, সেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অসৎ ধারণা করল। এমনি কল্পনা করল যে, তিনি ভাল কাজের বিনিময়ে ছাওয়াব ও খারাপ কাজের বিনিময়ে শাস্তি দিবেন না এবং যে বিষয়ে মানুষেরা মতভেদ করছে, তাতে তিনি কিয়ামতের দিন ফয়সালা প্রদান করবেন না সেও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল।

এমনি যারা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিনা কারণেই বান্দার সৎকাজকে নষ্ট করে দিবেন এবং যেই কর্মে বান্দার কোন দোষ নেই, তার জন্যও তিনি বান্দাকে শাস্তি দিবেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা সেই সমস্ত মুজেযা দ্বারা তাঁর শত্রুদেরকে শক্তিশালী করবেন, যেগুলো দ্বারা তিনি তাঁর রসূলদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং যে মনে করবে যে, আল্লাহ্ থেকে যা আসবে তার সবই একই রকম ভাল, এমন কি যে ব্যক্তি সারা জীবন আল্লাহর আনুগত্যে কাটিয়েছে, তাকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে পাঠানো এবং যে ব্যক্তি সারা জীবন আল্লাহর নাফরমানীতে শেষ করেছে, তাকে জান্নাতে পাঠানোও আল্লাহর জন্য একই রকম উত্তম এবং উভয়টি একই রকম সুন্দর, যে ব্যক্তি ধারণা করল, ভাল-মন্দ- এ দু'টির মাঝে অহীর মাধ্যম ছাড়া পার্থক্য করা সম্ভব নয়, কারণ মানুষের বিবেক কোনটিকে মন্দ ও কোনটিকে সুন্দর সাব্যস্ত করতে সক্ষম নয়, সেও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল।

এমনি যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সত্ত্বা, গুণাবলী এবং তাঁর কর্মসমূহ সম্পর্কে যেই সংবাদ দিয়েছেন, তার প্রকাশ্য অর্থ বাতিল এবং তা উপমা স্বরূপ। এখানে মূল সত্যকে সুস্পষ্ট করে উল্লেখ না করে ছেড়ে দিয়ে দূর থেকে তার দিকে ইশারা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মনে করবে যে, কুরআন মজীদে সর্বদা অর্থহীন শব্দ ও উপমা পেশ করা হয়েছে, সেও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল। যারা মনে করল, আল্লাহ্ চেয়েছেন যে, তাঁর বান্দারা স্বীয় কালামের অর্থ পরিবর্তন করুক এবং সেই অর্থ দ্বারা তাদের মস্তিস্ককে পরিপূর্ণ করুক এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর পরিচয় জানার জন্য তিনি তাদেরকে বিবেকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন; তাঁর কিতাবের উপর নির্ভর করতে বলেন নি, তারাও আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করল। যারা মনে করে, আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় কালামের সেই বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে বলেন নি, যার প্রতি আরবী ভাষা সুস্পষ্ট নিদের্শনা প্রদান করে (অথচ আল্লাহ্ তা'আলা খোলাখুলিভাবে হক প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং ঐ সমস্ত শব্দ দূর করতে সক্ষম, যেগুলো মানুষকে বাতিল আকীদার দিকে নিয়ে যায়) তারাও আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করল।

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল ব্যতীত সে এবং তার উস্তাদরাই সত্য বলেছেন এবং তাদের কথাতেই রয়েছে সুস্পষ্ট হিদায়াত ও আল্লাহর কালামের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের মধ্যে গোমরাহী ছাড়া অন্য কিছু নেই, তাদের ধারণা আল্লাহর প্রতি খুবই মন্দ। এদের সকলেই আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণকারী এবং আল্লাহর ব্যাপারে অন্যায় ও জাহেলিয়াতের ন্যায় ধারণা পোষণকারী।

এমনি যে ধারণা করল যে, আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরেও অন্য কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে এবং এমন কিছু হয়ে থাকে, যা তিনি সৃষ্টি করতে ও গঠন করতে সক্ষম নন সেও আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করল। যারা বিশ্বাস করল আল্লাহ্ তা'আলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কর্মহীন ছিলেন, কোন কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষমও ছিলেন না, অতঃপর তিনি কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছেন, সেও আল্লাহর প্রতি খুব খারাপ বিশ্বাস পোষণ করল। যারা বিশ্বাস করল, আল্লাহ্ শুনেন না, দেখেনও না এবং সৃষ্টি সম্পর্কে অবগতও নন সেও আল্লাহর প্রতি খুব খারাপ ধারণা পোষণ করল। আর যারা মনে করে আল্লাহর কোন ইচ্ছা নেই, কথা বলাও তাঁর গুণের অন্তর্ভূক্ত নয়, তিনি কারও সাথে কথা বলেন নি, বলবেনও না, কোন আদেশ বা নিষেধও করেন নি, তারাও আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করল।

এমনি যারা ধারণা করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহের উপর আরশে সমুন্নত নন, সকল স্থানই তাঁর জন্য সমান এবং যারা সুবহানা রাব্বীয়াল আ-লা আর সুবহানা রাব্বীয়াল আসফাল বলাকে একই রকম মনে করে তাদের আকীদাহ্ খুবই খারাপ। যারা মনে করে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরী পাপাচারিতা এবং অবাধ্যতাকে আনুগত্যের ন্যায়ই ভালবাসেন ও পছন্দ করেন তারাও আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করল।

এমনি যারা বিশ্বাস করল যে, আল্লাহ্ কাউকে ভালবাসেন না, কারও প্রতি সন্তুষ্টও হন না, ক্রোধান্বিতও হন না, কাউকে বন্ধু হিসাবেও গ্রহণ করেন না, কাউকে দুশমন হিসাবেও গ্রহণ করেন না, তিনি কারও নিকটবর্তী হন না এবং অন্য কেউ তাঁর নিকটবর্তী হয়না, তারাও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণকারী।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মনে করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয়কে একইভাবে মূল্যায়ন করেন এবং সকল দিক থেকে সমান দু'টি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করেন (অর্থাৎ ন্যায় বিচার বর্জন করেন) কিংবা একটি মাত্র কবীরা গুনাহ্এর কারণে সারা জীবনের সৎ আমল বরবাদ করে দেন এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী করেন, সেও আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করল।

সার কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যেই গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন অথবা আল্লাহর রসূল ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য যে সমস্ত গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, কেউ যদি তার খেলাফ ধারণা পোষণ করে অথবা আল্লাহর গুণাবলীকে বাতিল বলে বিশ্বাস করে সেও আল্লাহর প্রতি খুব মন্দ ধারণা পোষণ করল।

এমনিভাবে যারা বিশ্বাস করল যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে অথবা তাঁর কোন শরীক আছে অথবা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীতই তাঁর কাছে কেউ সুপারিশ করতে পারবে অথবা আল্লাহর মাঝে এবং তাঁর মাঝে কোন মাধ্যম (মধ্যস্থতাকারী রয়েছে), যারা আল্লাহর কাছে মাখলুকের প্রয়োজন পেশ করে থাকে অথবা যে ধারণা করল যে, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা আনুগত্যের মাধ্যমেও পাওয়া যাবে এবং নাফরমানীর মাধ্যমেও পাওয়া যাবে অথবা ধারণা করল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কাজ ছেড়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার বদলে অন্য কিছু দিবেন না অথবা ধারণা করল যে, পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই বিনা কারণে বান্দাকে শাস্তি দিবেন অথবা যে ব্যক্তি ধারণা করল যে, অন্তরে ভয় ও আশা নিয়ে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করলেও আল্লাহ্ তাকে নিরাশ করবেন অথবা ধারণা করল যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর শত্রুরা তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর পর সর্বদা বিজয়ী থাকবে, তারাও আল্লাহর প্রতি খুব মন্দ ধারণা পোষণ করল।

যারা ধারণা করল যে, রসূল ﷺ মৃত্যু বরণ করার পর লোকেরা আহলে বাইতের উপর জুলুম করেছে এবং তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, আল্লাহর দুশমন এবং আহলে বাইতের দুশমনদের বিজয় হয়েছে, অথচ আল্লাহ্ আহলে বাইতকে সাহায্য করার ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন নি এবং যারা ধারণা করে যে, যারা রসূল ﷺ এর অসীয়তকে পরিবর্তন করেছে, তাদেরকেই (আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) তাঁর পাশে কবর দেয়া হয়েছে আর উম্মাতে মুহাম্মাদী তাঁর উপর এবং তাদের উপর সালাম পেশ করছে, তারা কাফের ও বাতিলপন্থী এবং আল্লাহর প্রতি খুবই খারাপ ধারণা পোষণকারী। কারণ আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা কুফরীরই নামান্তর।

সুতরাং অধিকাংশ লোকই আল্লাহর প্রতি অন্যায় ও খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকে। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন সেই কেবল বাঁচতে পেরেছে। মানুষ মনে করে তাকে স্বীয় হক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, অথবা কমিয়ে দেয়া হয়েছে, সে মনে করে, আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন, সে তার চেয়ে আরও বেশী পাওয়ার হকদার ছিল, মুখে উচ্চারণ না করলেও তার অবস্থার ভাষা বলছে, আমার রব আমার উপর জুলুম করেছেন, আমার অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখেছেন। তার নফস্ এই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে। যদিও তার জবান তা অস্বীকার করছে। কেননা সে তা খোলাখুলি উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছেনা। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের নফসের মধ্যে অনুসন্ধান চালাবে, সে তাতে এই কথার সত্যতা খুঁজে পাবে। এই ধারণাটি তার মধ্যে সেভাবেই লুকিয়ে থাকে যেমন আগুন দিয়াশলাইয়ের মধ্যে লুকায়িত থাকে। সুতরাং তুমি যদি এ কথার সত্যতা যাচাই করতে চাও, তাহলে কারও দিয়াশলাইয়ে আঘাত করে দেখ (কোন মানুষকে পরীক্ষা করে দেখ)। অচিরেই সে তার ভিতরের

অবস্থা কিছু হলেও প্রকাশ করে দিবে। তুমি দেখবে, সে তার তাকদীরের উপর আপত্তি উত্থাপন করছে, স্বীয় তাকদীরকে দোষারোপ করছে এবং তাকদীরে যা লিখিত হয়েছে, তার বিপরীত প্রস্তাব করছে। কেউ কম করছে আবার কেউ বেশী করছে। প্রত্যেকের উচিৎ নিজ নিজ নফ্‌সের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং আত্মসমালোচনা করা। সে এই রেস্‌ থেকে মুক্ত কি না? কবির ভাষায় বলতে গেলেঃ

فإن تنجُ منها تنجُ من ذي عظيمة + وإلا فإني لا إخالك ناجيا

"হে বন্ধু! তুমি যদি এ থেকে (তাকদীরের উপর আপত্তি করা থেকে) মুক্ত হয়ে থাক তাহলে জেনে রাখ তুমি বিরাট একটি মসীবত থেকে মুক্তি পেলে। এ থেকে মুক্তি না পেলে তুমি নাজাত পাবে বলে আমার মনে হয়না।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই উচিত নিজ নিজ আত্মার খবর নেওয়া, আত্মাকে উপদেশ দেয়া এবং প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিনি যেন তাকে তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা থেকে মাহফুজ রাখেন এবং সেই অনুযায়ী আমলে সালেহ করার তাওফীক দেন। আমীন।

অতঃপর আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণার বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। উহুদ যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেক ও দুর্বল ঈমানের অধিকারীদের প্রকৃত অবস্থা ফাঁস করে দিয়ে বলেন-

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

"অতঃপর তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মত। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে (নিজের জীবনকে নিয়ে) ব্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মত। তারা বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহ্‌র হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে-তোমার নিকট প্রকাশ করে না সে সবও। তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতামনা। তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তথাপি যাদের ভাগ্যে মৃত্যু লিখা ছিল, তারা তাদের মৃত্যুশয্যা পানে বের হয়ে পড়ত। তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে, তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তার কাম্য। আল্লাহ্ মনের গোপন বিষয় জানেন"।[২৬২] আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণার কারণেই তারা বলেছিল- এ ব্যাপারে অর্থাৎ পরামর্শ দেয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের হাতে কি কিছু করার ছিল? তারা আরও

২৬২. সূরা আল-ইমরান-৩:১৫৪

বলেছিল, উহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের হাতে যদি কিছু থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতামনা। এই কথার মাধ্যমে তারা তাকদীরকে অস্বীকার করছে। তারা যদি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করত, তাহলে তাদেরকে দোষারোপ করা হতনা এবং এই ভাবে জবাব দেয়া হতনাঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহ্র হাতে। এ জন্যই অনেকেই বলেছেন- তারা যেহেতু বলেছিল, এ ব্যাপারে তাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে তারা নিহত হতনা, তাই তাদের এ কথা তাকদীরকে মিথ্যা বলারই শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- সব কিছুই আল্লাহর হাতে। সুতরাং যা কিছু পূর্ব থেকেই তাকদীরে লিখিত আছে তাই হবে। যার ভাগ্যে নিহত হওয়া লিখিত আছে, সে ঘরে বসে থাকার ইচ্ছা করলেও যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে অবশ্যই নিহত হবে। এতে কাদরীয়া সম্প্রদায় তথা তাকদীরকে অস্বীকারকারীদের কড়া প্রতিবাদ করা হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের আরেকটি হিকমত হচ্ছে, তাদের অন্তরে যে ঈমান বা নিফাক লুকায়িত আছে, তা যাচাই ও পরীক্ষা করা। এতে মুমিনদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পাবে। আর মুনাফেক এবং যাদের অন্তর রেসূাক্রান্ত তাদের নিফাকী প্রকাশিত হয়ে যাবে। মুমিনদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করাও উদ্দেশ্য ছিল। কেননা মানুষের অন্তরে কখনও কখনও নাফসানী খাহেশাত, কুস্বভাব ও প্রবৃত্তির চাহিদা, সামাজিক রসম-রেওয়াজ প্রীতি, শয়তানের প্ররোচনা এবং গাফেলতি প্রবেশ করে থাকে। এতে অন্তরসমূহ প্রভাবিত হয় এবং এগুলো পরিপূর্ণ ঈমানের পরিপন্থীও বটে। মুমিনগণ যদি সবসময় বিপদমুক্ত থাকে এবং সুখ-সাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করে তাহলে, তাদের অন্তর নিফাকী ও গাফেলতী থেকে পবিত্র হবেনা। সুতরাং এই পরাজয়ের মাধ্যমে তাদের উপর রহম করা হয়েছে। এটি বিজয়ের নিয়ামাত দান করার সমতুল্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- যে সমস্ত খাঁটি মুমিন উহুদ যুদ্ধের দিন পলায়ন করেছিল, তারা তাদের পাপের কারণেই এমনটি করেছিল। শয়তান তাদেরকে এমন কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছিল, যার মাধ্যমে শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা বান্দার আমলসমূহ কখনও তার পক্ষের সৈনিক হয় আবার কখনও তার বিপক্ষের সৈনিকে পরিণত হয়। সুতরাং যে মুহূর্তে মুমিন বান্দা শত্রুর মুকাবেলা করতে সক্ষম, তখন যদি সে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে তখন সেই পলায়ন তার এমন আমলের কারণেই, যার প্রতি শয়তান প্ররোচিত করেছিল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেননা তাদের এই পলায়ন নিফাকী বা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য নাবী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে ছিলনা। এটি হয়েছিল আকস্মিকভাবে। এটি হয়েছিল তাদের কৃত কর্মের কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"যখন তোমাদের উপর একটি মসীবত এসে পৌছাল, অথচ তোমরা তার পুর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল"। (সূরা আল-ইমরান-৩: ১৬৫)

মুসলমানদের বিপদাপদ ও কষ্টে নিপতিত হওয়ার বিষয়টি মক্কী সূরসমূহে আরও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾

"তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন"। (সূরা শুরা-৪২:৩০) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই- যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুত তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এ সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। তবে তাদের কী হল যে, তারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করেনা"। (সূরা নিসা-৪:৭৮) সুতরাং নিয়ামত অর্জিত হলে তা আল্লাহর ফজল ও করমের ফলেই হয়ে থাকে।

আর মসীবত নাজিল হলে তাঁর পক্ষ হতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কারণেই হয়ে থাকে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল"। (সূরা আল-ইমরান-৩:১৬৫) তার আগে তিনি বলেন- যে মসীবতে তোমরা পড়েছ, তা তোমাদের হাতের কামাই। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইনসাফের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে তাকদীর তথা ভাগ্যের লিখন এবং বান্দার প্রচেষ্টা- উভয়টি সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমল ও চেষ্টার নিসবত (সম্বন্ধ) করা হয়েছে বান্দাদের দিকে এবং কুদরত তথা ক্ষমতার নিসবত (সম্বন্ধ) করা হয়েছে আল্লাহর দিকে। এখানে জাবরীয়া সম্প্রদায় অর্থাৎ যারা বলে, বান্দা যা কিছু করে তার সবই আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে। তাতে বান্দার কোন হাত নেই। বান্দা কাঠের পুতুলের ন্যায় এবং শিশুর হাতে লাটিমের ন্যায়। শিশু লাটিম যেভাবে ঘুরায়, লাটিম সেভাবেই ঘুরে। বান্দার বিষয়টিও একই রকম। আল্লাহ্ তাকে যেভাবে চালান, সেভাবেই চলে। বান্দার কোন স্বাধীনতা নেই। সুতরাং ভাল-মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ হতে।

সেই সাথে এখানে কাদরীয়া সম্প্রদায় অর্থাৎ যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে তাদেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে। কাদরীয়াদের পরিচয় হল, তারা বলে বান্দার ভাল-মন্দ সকল কাজে বান্দা স্বাধীন। তাতে আল্লাহর কোন হাত নেই। এমন কি বান্দা কাজটি করার আগে আল্লাহ্ তা'আলা জানতেও পারেন না।

কুরআন ও হাদীছের দলীল উপরোক্ত দলটির কঠোর প্রতিবাদ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

" তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা পথে চলতে চায়। তোমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারনা"। (সূরা তাকভীর-৮১:২৮-২৯) উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের

যেই কষ্ট হয়েছিল তার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে নাযিলকৃত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত (ক্ষমতার) উল্লেখ করার মধ্যে একটি সুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। তা হচ্ছে উহুদ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। সুতরাং এ বিষয়ে আল্লাহ্ যা বলেছেন, তা ব্যতীত অন্য কারও কাছে ব্যাখ্যা তলব করা ঠিক নয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾

"আর যেদিন দু'দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহ্র হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, যাতে ঈমানদারদেরকে জানা যায়"। (সূরা আল-ইমরান- ৩:১৬৬-১৬৭) এখানে আল্লাহুর হুকুমেই উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয় হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর হুক্মে তাকভীনি বা তাকদীরী। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত হুকুম উদ্দেশ্য। যেই হুকুমের মাধ্যমে তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। শরীয়তের হুকুম উদ্দেশ্য নয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদেরকে পরাজিত করার মাধ্যমে খাঁটি মুমিনদেরকে জানতে চেয়েছেন এবং মুনাফেকদেরকে মুসলমানদের থেকে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করতে চেয়েছেন। এর মাধ্যমে মুনাফেকরা তাদের অন্তরের গোপন বিষয় বের করে দিয়েছিল। মুমিনগণ তা শুনেও ফেলল এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে তাদের জবাব দিয়েছেন তাও শুনতে পেল। সেই সাথে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ও তার পরিণাম সম্পর্কেও জানা হয়ে গেল।

সুতরাং উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের ঘটনার মধ্যে যে কত হিকমত, নিয়ামাত ও উপদেশ নিহিত আছে, তার প্রকৃত হিসাব আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না।

পরিশেষে উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করার কারণে মুসলমানদের অন্তরে যেই আঘাত লেগেছিল তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অত্যন্ত উত্তম ভাষায় শান্তনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

"আর যারা আল্লাহ্র রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করোনা। বরং তাঁরা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। আল্লাহ্র নিয়ামাত ও অনুগ্রহের জন্য তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ্ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। যারা আহত হওয়ার পরেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের

নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও মুত্তাকী, তাদের জন্য রয়েছে মহান ছাওয়াব।[২৬৩] আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত সমূহে শহীদদের জন্য চিরস্থায়ী জিন্দিগী, আল্লাহর নৈকট্য প্রদান, অবিরাম রিযিক চালু রাখার ঘোষণা করেছেন। তাই শহীদগণ আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে অত্যন্ত খুশী ও সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের যে সমস্ত মুসলমান ভাই শহীদ হয়ে এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি, পরবর্তীতে তারা শহীদ হয়ে এসে তাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুসংবাদ শুনেও তারা আনন্দিত হয়। তাদের আনন্দ, নিয়ামাত, এবং সুসংবাদ প্রতি মুহূর্তে তাদের জন্য বর্ধিত সম্মান প্রাপ্তির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করবে।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের বিনিময়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অফুরন্ত নিয়ামাত প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেই নিয়ামাতগুলোর তুলনায় উহুদ যুদ্ধের মসীবত খুবই সামান্য। নিয়ামাতগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করলে উহুদ যুদ্ধে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের কষ্টের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সেই নেয়ামতগুলোর অন্যতম হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য হতেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত শিক্ষা দেন এবং গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হিদায়াতের (আলোর) দিকে বের করেন। এই বিরাট কল্যাণের পর সকল বালা-মসীবত খুবই নগণ্য। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন যে, এই মসীবতের কারণ স্বয়ং মুসলিমরাই। যাতে তারা আগামীতে সংশোধন হয়ে যায় এবং সাবধানতা অবলম্বন করে। আর তাদের এই পরাজয় পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ীই হয়েছিল। সুতরাং তাদের উচিত সবসময় এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করা। আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের হিকমতগুলো এই জন্যই বলে দিয়েছেন, যাতে তারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হিকমতের উপর ইয়াকীন রাখে এবং আল্লাহর উপর কোন প্রকার খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকে। সেই সাথে যাতে করে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনা ও সিফাতে কামালিয়াতের মারেফতও হাসিল হয়ে যায়।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে শান্তনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাদেরকে এমন জিনিষ দিয়ে সম্মানিত করেছেন, যা বিজয় ও গণীমতের চেয়ে অনেক বড়। আর তা হচ্ছে শাহাদাতের মর্যাদা। এভাবে শান্তনা দেয়ার কারণ হচ্ছে, যাতে তারা তা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয় এবং যারা নিহত হয়েছে তাদের জন্য চিন্তিত না হয়। সুতরাং এর জন্য আমরা আল্লাহর সেরকমই প্রশংসা করছি, যেমন প্রশংসা তিনি পাওয়ার হকদার।

গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ

উহুদ যুদ্ধ শেষে যখন মক্কার মুশরিকরা ফেরত গেল, তখন মুসলমানদের মুখে মুখে এ কথা বলাবলি হতে লাগল যে, মুশরেকরা পুনরায় মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই খবরটি তাদের কাছে খুব বিরাট কষ্টকর মনে হল। কেননা নাবী ﷺ আলী বিন আবু তালেবকে বলে রেখেছিলেন যে, তুমি খেয়াল রাখ, তাদের গতিবিধি লক্ষ্য কর এবং দেখ তারা কি করতে চায়। তারা ঘোড়া থেকে নেমে উটের উপর আরোহন করে তাহলে বুঝতে হবে যে, তারা মক্কায় চলে যাচ্ছে। আর যদি ঘোড়ায়

২৬৩.সূরা আল-ইমরান-৩:১৬৯-১৭২

আরোহন করে উটকে চালিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তারা পুনরায় মদীনা আক্রমন করবে। ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! তারা যদি মদীনা আক্রমণ করার ইচ্ছা করে, তাহলে অবশ্যই আমি মদীনা থেকে বের হয়ে তাদের কাছে যাবো এবং তাদের মুকাবেলা করবো। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আমি তাদের সন্ধানে বের হলাম এবং তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। তারা কি করতে যাচ্ছে তাও দেখতে লাগলাম। দেখলাম, তারা ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে উটের উপর আরোহন করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে।

মক্কার মুশরিকরা যখন ফেরত যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল, তখন আবু সফিয়ান মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল- আগামী বছর আমাদের ও তোমাদের মাঝে বদর প্রান্তরে মুলাকাত হবে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে বললেন- তোমরা বল হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। অতঃপর তারা চলতে লাগল।

কিছু দূর গিয়ে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল এবং তাদের একজন অন্যজনকে এই বলে দোষারোপ করতে লাগল- আমরা মুসলমানদেরকে দুর্বল করে দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু তাদেরকে এমন অবস্থায় রেখে আসলাম যে, তারা দ্বিতীয়বার শক্তি জোগাড় করতে সক্ষম হবে। চল আবার ফেরত গিয়ে তাদের মূলোৎপাটন করে আসি। এই খবর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে পৌঁছলে তিনি মানুষের মাঝে ঘোষণা করে দিলেন যে, তোমরা পুনরায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হও। তিনি আরও বললেন- তবে আমাদের সাথে শুধু তারাই বের হবে, যারা উহুদ যুদ্ধে শরীক ছিল। মুসলমানেরা যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থাতেই তারা রসূলের ডাকে সাড়া দিল। এবার মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই বলল- আমিও কি বের হব? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- তোমার বের হওয়ার প্রয়োজন নেই। উহুদ যুদ্ধে জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পিতা যেহেতু মারাত্মক আহত হয়েছিল তাই তিনি পিতার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার পাশে থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাঁকে না যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল।

যাই হোক মুসলমানগণ বের হয়ে হামরাউল আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আবু সুফিয়ান তখন মদীনাগামী এক মুশরিককে বলল- তুমি যদি আমাদের পক্ষ হতে মুহাম্মাদকে একটি পয়গাম পৌঁছিয়ে দিতে পার, তাহলে মক্কায় ফেরত আসার পর আমি তোমাকে তোমার বাহন বোঝাই কিসমিস প্রদান করব। লোকটি বলল- অবশ্যই পারব। এইবার আবু সুফিয়ান বলল- তাঁকে জানিয়ে দাও যে, আমরা মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মুসলমানদের কাছে খবরটি পৌঁছার পর তারা বলল-ঃ

﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾

“আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; তিনি কতই না চমৎকার কর্মসম্পাদনকারী। অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হল না। তারপর তারা আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহ্র অনুগ্রহ অতি বিরাট”।[২৬৪]

উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের সাত তারিখ শনিবার। যুদ্ধ শেষে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় ফেরত আসলেন। বছরের বাকী দিনগুলো তিনি মদীনাতেই কাটালেন। নতুন

২৬৪. সূরা আল-ইমরান-৩: ১৭৩-১৭৪

বছরের মুহার্‌রাম মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর রসূল ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, খুওয়াইলিদের দুই ছেলে তুলাইহা এবং সালামা নিজেদের গোত্র এবং বনী আসাদ গোত্রকে নাবী ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত করছে। এই সংবাদ পেয়ে নাবী ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের থেকে ১৫০ জন সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। সাহাবীগণ শত্রুদের এলাকায় গিয়ে কিছু ছাগল ও উট গণীমত হিসাবে অর্জন করলেন। কিন্তু কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই গণীমতের মালসহ মদীনায় ফেরত আসলেন।

মুহার্‌রাম মাসের ৫ তারিখে নাবী ﷺ জানতে পারলেন যে, খালিদ বিন সুফিয়ান আল-হুযালী রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছে। তাই তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন আনীসকে তাদের দিকে পাঠালেন। আব্দুল্লাহ্ তাকে হত্যা করে ফেললেন।

সফর মাসে 'আযাল' এবং 'কারা' গোত্রের একদল লোক নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করল। তারা রসূল ﷺ এর কাছে আবেদন করল যে, আমাদের কাছে এমন কিছু সাহাবীকে পাঠান, যারা আমাদেরকে দ্বীন ও কুরআন শিক্ষা দিবে। নাবী ﷺ তাদের সাথে মারছাদ বিন আবী মারছাদ আলগানামীর নেতৃত্বে ছয়জন সাহাবীকে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে খুবাইব (রাঃ) ছিলেন। তারা যেহেতু ছদ্মবেশী ছিল তাই তারা সাহাবীদের অধিকাংশকেই হত্যা করে ফেলল। খুবাইব বিন আদী এবং যায়েদ বিন দাছিনা (রাঃ) কে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং মক্কাবাসীদের কাছে বিক্রি করে দিল। মক্কার লোকেরা তাদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করে।

বিরে মাউনা

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসেই বি'রে মাউনার ঘটনা সংঘটিত হয়। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নজদ অঞ্চল থেকে আবু বারা নামক একজন মুশরিক নাবী ﷺ এর নিকট আগমণ করলে তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সে ইসলাম গ্রহণও করে নি, প্রত্যাখ্যানও করে নি। বরং সে বলল- আপনি যদি নজদ এলাকার লোকদের কাছে আপনার কয়েকজন সাহাবী পাঠাতেন এবং তারা লোকদেরকে আপনার দ্বীনের প্রতি আহবান করত, তাহলে আমার ধারণা তারা তাদের আহবানে সাড়া দিবে।

রসূল ﷺ বললেন- আমার আশঙ্কা, নজদবাসীরা তাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। আবু বারা তখন বলল- আমি তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি। ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন- রসূল ﷺ তার সাথে ৪০ জন লোক পাঠিয়ে দিলেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় ৭০ জনের কথা এসেছে। এক্ষেত্রে সহীহ বুখারীর বর্ণনাই সঠিক। এই ৭০ জনের আমীর ছিলেন, মুনযির বিন আমর। এই ৭০ জন ছিল মুসলমানদের খুব সম্মানী, নেতৃস্থানীয় এবং কুরআন পাঠ ও পাঠদানে পারদর্শী। 'বিরে মাউনা' নামক স্থানে পৌঁছে উম্মে সুলাইমের ভাই হারাম বিন মিলহানকে তারা নজদ অঞ্চলের আমের বিন তুফাইলের কাছে রসূল ﷺ-এর চিঠিসহ প্রেরণ করলেন। আল্লাহর এই দুশমন চিঠির প্রতি তাকিয়েই দেখেনি। বরং সে হারাম বিন মিলহানের উপর আক্রমণের আদেশ দিলে এক ব্যক্তি পিছন দিক থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত করল। হারাম স্বীয় শরীর থেকে রক্ত বের হতে দেখে বললেন- কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফল হয়েছি (শাহাদাত বরণ করেছি)। অতঃপর আল্লাহর শত্রু তৎক্ষণাৎ অন্যান্য সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বনী আমেরের লোকদেরকে আহবান জানাল। কিন্তু আবু বারা নিরাপত্তা দেয়ার কারণে বনী আমেরের লোকেরা তার ডাকে সাড়া দেয়নি। তারপর সে বনী সুলাইমের লোকদেরকে ডাকল। এরা

তার আহবানে সাড়া দিল এবং সাহবীদেরকে ঘেরাও করে সকলকেই হত্যা করে ফেলল। এই ছিল বিরে মাউনার সংক্ষিপ্ত ঘটনা।

এরপর চতুর্থ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে বনী নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইমাম যুহরীর ধারণা হচ্ছে, বদরের যুদ্ধের ছয়মাস পর বনী নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই ধারণা সঠিক নয়। সঠিক কথা হচ্ছে উহুদ যুদ্ধের পর এটি সংঘটিত হয়। বনু কায়নুকার যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদরের পরে। আর বনী কুরায়যার যুদ্ধ সংঘটিত হয় খন্দকের যুদ্ধের পরে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সংঘটিত হয় খায়বারের যুদ্ধ। তিনি ইহুদীদের সাথে মোট চারটি যুদ্ধ করেন।

অতঃপর জুমাদাল আওয়াল মাসে যাতুর রিকা-এর যুদ্ধ করেন। এতে রসূল ﷺ স্বশরীরে অংশ গ্রহণ করেন। এটি ছিল নজদ অঞ্চলের যুদ্ধ। গাতাফান গোত্রকে আক্রমণ করার জন্য তিনি বের হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেন। ইবনে ইসহাক এবং একদল ঐতিহাসিক যাতুর রিকা-এর যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এ রকমই বলেছেন। এই তথ্যটি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সুস্পষ্ট কথা হচ্ছে, নাবী ﷺ উসফান নামক স্থানে সর্বপ্রথম ভয়ের সলাত পড়েছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। আর এতে কোন মতভেদ নেই যে, গাযওয়ায়ে উসফান খন্দকের যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছে। আবু হুরায়রা এবং আবু মুসা (রাঃ) উসফানের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) খয়বারের যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন নি। সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, রসূল ﷺ উসফানের যুদ্ধেই সর্বপ্রথম সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। অতঃপর যখন চতুর্থ হিজরী সালের শাবান মাস অথবা যুল-কাদ মাস উপস্থিত হল তখন আবু সুফিয়ানের সাথে কৃত ওয়াদা অনুযায়ী রসূল ﷺ বদর প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে তিনি মুশরিকদের অপেক্ষা করতে থাকলেন। আবু সুফিয়ানও মক্কা হতে বের হল। মক্কা হতে বের হয়ে যখন এক মঞ্জিল পর্যন্ত আসল তখন লোকেরা বলতে লাগল- এটি হচ্ছে অনাবৃষ্টি এবং দূর্ভিক্ষের বছর। সুতরাং এ বছর ফেরত যাওয়া উচিত।

এরই মধ্যে হিজরী পঞ্চম সাল এসে গেল। এই বছরের রবীউল আওয়াল মাসে তিনি দুওমাতুল জান্দালের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি সেখানকার লোকদের পশুপালের উপর আক্রমণ করলেন দুওমাতুল জান্দালের লোকেরা রসূল ﷺ এর আক্রমণের খবর শুনে পলায়ন করল।

অতঃপর এই বছরের শাবান মাসে বুরায়দা আল-আসলামীকে বনী মুসতালেকের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। এখানে যেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তাকে গাযওয়াতুল মুরাইছী বলা হয়। যুদ্ধের কারণ এই ছিল যে, রসূল ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, বনী মুসতালেকের নেতা হারেছ বিন আবী যিরার নিজ গোত্র এবং পার্শ্বস্ত আরব গোত্রসমূহকে রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করছে। মদীনায় এই খবর পৌঁছলে রসূল ﷺ বুরায়দাহ আল-আসলামী (রাঃ) কে পাঠালেন। অতঃপর একদল সাহাবীকে নিয়ে রসূল ﷺ মুরাইসী নামক একটি জলাশয়ের নিকট পৌঁছালেন। মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সেখানে কিছুক্ষণ তীর বিনিময় হল। অতঃপর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে সম্মিলিত হামলা করার আদেশ দিলে তারা সকলেই কাফেরদের উপর আক্রমণ করলে শত্রুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে গেল। রসূল ﷺ এখানে তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসলেন এবং কিছু গণীমতের মাল অর্জন করলেন।

গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালেক এবং ইফ্কের (অপবাদের) ঘটনা

বনী মুসতালেকের যুদ্ধেই আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর গলার হার হারিয়ে যায়। কারণ এই সফরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) শরীক ছিলেন। ফেরার পথে এক স্থানে যখন কাফেলা যাত্রা বিরতি করল তখন তিনি ইস্তেনজা করার জন্য মাঠের দিকে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন গলার হার হারিয়ে গেছে। তা অনুসন্ধান করার জন্য তিনি পুনরায় মাঠের দিকে ফেরত গেলেন। এই সময় কাফেলার লোকেরা যাত্রা করল। লোকেরা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাওদাজ (পালকী) দ্রুত উটের উপর উঠিয়ে বেঁধে দিল। তারা মনে করল আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ভিতরেই আছেন। কারণ উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন তখন খুব হালকা-পাতলা। তাই লোকেরা অনুভব করতে পারেনি।

এই সময় সাফওয়ান বিন মুআত্তাল কাফেলার পিছনে চলতেন। কোন জিনিষ পড়ে থাকলে তা উঠিয়ে নিতেন। সেখানে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে দেখে তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন পাঠ করলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। সাফওয়ান পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে একবার দেখেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে সহজেই চিনতে পেলেন। ইন্না লিল্লাহ ব্যতীত সাফওয়ান একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নি। অতঃপর তিনি আদবের সাথে উট নিকটবর্তী করলেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উটের উপর আরোহন করলেন। সাফওয়ান উটের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। পরিশেষে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। লোকেরা এই দৃশ্য দেখে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী ব্যাখ্যা ও মন্তব্য করতে লাগল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন বিষয়টি জানতে পারল তখন কোন প্রকার বিলম্ব না করেই সাফওয়ানের সাথে ব্যভিচারের তুহমত (অপবাদ) লাগিয়ে দিল। কথাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে প্রথমে সম্পূর্ণ নিরবতা পালন করলেন। অতঃপর তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তালাক দেয়ার পরামর্শ দিলেন। কেননা বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। আর সন্দেহযুক্ত কোন বিষয়ে সন্দেহ পরিহার করে নিশ্চিত বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়াই অধিক উপযুক্ত। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উদ্দেশ্য ছিল, এতে করে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের বলাবলি শুনে যে পেরেশানীতে পড়েছিলেন, তা থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন।

কিন্তু উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তালাক দেয়ার বিরোধীতা করলেন। কেননা তিনি জানতেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশা এবং তাঁর পিতা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে অপরিসীম ভালবাসা রাখেন ও আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর পূর্ণ পবিত্রতা এবং দ্বীনদারী সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর রসূলের প্রিয় জীবন সঙ্গিনীকে এ ধরণের অপরাধে জড়ানো হবে- এটা কখনই হতে পারেনা। এই বুনিয়াদ তথা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই উসামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কথা বলেছিলেন এবং আল্লাহর রসূল থেকে টেনশন দূর করার জন্যই আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উপরোক্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পবিত্রতার ব্যাপারে তাঁর কোন প্রকার সন্দেহ থেকে তিনি কথাটি বলেন নি। মুনাফেকরা যেই রকম ধারণা করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের জন্য সেই রকম মানের একজন সঙ্গিনী নির্ধারণ করবেন- তা হতেই পারেনা।

মূলতঃ সকল সাহাবীর পূর্ণ ইয়াকীন এটিই ছিল যে, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর চরিত্র সম্পূর্ণ পবিত্র এবং সকল প্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত। নাবীয়ে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন সঙ্গিনীর ক্ষেত্রে এ ধরণের কল্পনা

তাদের মনে আসতেই পারেনা। এ জন্যই আবু আইয়্যুব আনসারী এবং অন্যান্য সাহাবীগণ কথাটি শুনার সাথে সাথেই বলেছিলেন-

﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾

"এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ"।[২৬৫]

এই ঘটনার পর পূর্ণ একমাস অহী আসা বন্ধ ছিল। পরিশেষে যখন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর পবিত্রতায় কুরআন নাযিল হল এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পাঠ করলেন তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুশীতে আত্মহারা হলেন। তিনি তাঁর কন্যা আয়িশাকে বলতে লাগলেনঃ উঠ! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুকরিয়া আদায় কর। এই কথা শুনে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যেই সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং যেই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেনঃ মুসলিম জাতি তা চিরদিন স্মরণ রাখবে। তিনি বলেছিলেন- আল্লাহর শপথ! আমি এ ব্যাপারে কখনই তাঁর শুকরিয়া আদায় করবনা। আমি শুধু সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব, যিনি আমার পবিত্রতায় কুরআন নাযিল করেছেন। এই কথায় তাঁর নির্মল চরিত্র, সৎসাহস এবং ঈমানী দৃঢ়তার বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

অহীর মাধ্যমে যখন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর পবিত্রতা ছাবেত (প্রমাণিত) হয়ে গেল তখন তিনি অপবাদ প্রদানকারীদের প্রত্যেককেই আশিটি করে বেত্রাঘাত করলেন। কেননা তাদের মিথ্যাচারিতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কেন?

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাধিক অবগত হওয়া সত্ত্বেও অপবাদের ঘটনায় তিনি এত তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কেন? এর উত্তর হল আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনার মাধ্যমে সেই হিকমতগুলো প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যা এতে লুকায়িত ছিল। সেই সাথে এটি ছিল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সকল উম্মাতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত একটি পরীক্ষা স্বরূপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা একদল লোকের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং অন্য একদল লোকের পতন ঘটান।

যাতে করে আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরীক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। তাই পূর্ণ একমাস অহী বন্ধ রাখা হয়েছিল। সেই সাথে সত্যবাদীদের ঈমান যাতে বৃদ্ধি পায় এবং তারা যেন ন্যায়পরায়ণতা ও মুমিনদের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করেন। মুনাফিকদের নিফাকী ও মিথ্যাচারিতা যেন আরও বৃদ্ধি পায় এবং তাদের অন্তরের গোপন অবস্থা যেন সকলের সামনে প্রকাশিত হয়ে যায়। সেই সাথে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর পিতা-মাতার দ্বীনদারী যেন পূর্ণতা লাভ করে এবং আবু বকরের পরিবারের উপর যেন আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করে, তারা যেন নিজেদের

২৬৫.সূরা নূর-২৪:১৬

প্রয়োজন পূর্ণ করতে বিনীত হয়ে কেবল আল্লাহর দিকেই ধাবিত হয়, তাঁর কাছেই আশা করে এবং সৃষ্টির উপর ভরসা না করে কেবল আল্লাহর আশা-ভরসা করে।

সুতরাং আয়িশা এর পিতা-মাতা যখন বললেন- উঠ! আল্লাহর রসূল এর কাছে যাও এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় কর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পবিত্রতায় অহী নাযিল করেছেন তখন তিনি বললেন- এটা হতেই পারেনা। তিনি বলেছিলেন- আল্লাহর শপথ! আমি এ ব্যাপারে কখনই তাঁর শুকরিয়া আদায় করবনা। আমি শুধু সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব, যিনি আমার পবিত্রতায় কুরআন নাযিল করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা যদি তৎক্ষণাৎ তাঁর রসূলকে ইফকের ঘটনার প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে দিতেন, তাহলে এই হিকমত ও আহকামগুলো জানা যেতনা এবং এ ব্যাপারে কারও পক্ষে কিছুই জানা সম্ভব হতনা।

সেই সাথে আল্লাহ্ তা'আলা আরও চেয়েছিলেন যে, স্বীয় রসূল এবং তাঁর পরিবারের মর্যাদা প্রকাশ করবেন, নিজেই তাদের উপর আরোপিত অভিযোগের প্রতিবাদ করবেন এবং শত্রুদের দোষারোপের জবাব দিবেন। কেননা তারা নাবী পরিবারের প্রতি একটি অশুভনীয় ও ভিত্তিহীন কথা চালিয়ে দিচ্ছিল।

মুনাফেকরা যেহেতু নাবী কে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যেই অপবাদ রটিয়েছিল, সেই হিসাবে তাঁর পক্ষে আয়িশা এর আরোপিত অপবাদের জবাব দেয়া সমীচিন ছিল না। অথচ তাঁর কাছে আয়িশা এর পবিত্রতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিলনা এবং অন্যান্য মুমিনদের তুলনায় তাঁর কাছে আয়িশা এর দোষমুক্ত থাকার প্রমাণাদি অধিক পরিমাণে ছিল। তবে সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে এবং সত্যের উপর অবিচল থাকতে গিয়ে আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত চুপ থেকেছেন।

কিন্তু যখন অহী আগমণ করল, তখন অপবাদ আরোপকারীদেরকে দুর্‌রা মারার হুকুম করলেন। তবে মুনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে তা থেকে রেহাই দেয়া হল।

মুনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে দুর্‌রা না মারার কারণ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে দুর্‌রা না লাগানোর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আলেমদের থেকে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছে।

১) মুমিনরা দুনিয়াতে অপরাধ করলে দুনিয়াতে যদি তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয় তাহলে সেই শাস্তি গুনাহর কাফ্‌ফারা স্বরূপ। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই যেহেতু মুনাফেক ছিল এবং তার জন্য যেহেতু পরকালে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে, তাই তাকে দুর্‌রা লাগানো হয়নি। যাতে পরকালের শাস্তি সে পূর্ণরূপে ভোগ করতে পারে।

২) সাক্ষী ব্যতীত কারও উপর শরিয়তের নির্ধারিত শাস্তি কায়েম করা যায়না। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার সাথীদের সামনেই বলাবলি করে বেড়াত। অন্যান্য মুসলমানদের সামনে সে মুখ খুলেনি। তাই তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোন সাক্ষী না থাকায় কিংবা সে নিজে স্বীকারোক্তি না দেয়ায় তাকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হয়নি।

৩) ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি যেহেতু বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত, আর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যেহেতু তার শাস্তি দাবী করেন নি, তাই সে শাস্তি হতে রেহাই পেয়েছিল। তা ছাড়া এটি আল্লাহর হক হলেও তা বাস্তবায়নের দাবীর প্রয়োজন রয়েছে।

৪) বলা হয়ে থাকে যে, হদ কায়েম করার চেয়ে অধিক বৃহৎ স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য তার উপর শাস্তি কায়েম করা হয়নি। যেমন তার থেকে নিফাকী প্রকাশ পাওয়ার পরও বৃহৎ স্বার্থে তাকে হত্যা করা হয়নি। আর তা হচ্ছে, তার জাতির প্রচুর লোক মুসলিম ছিল। সে ছিল স্বীয় গোত্রের নেতা। তাই তাকে হত্যা করা হলে মুসলিমদের ঐক্য নষ্ট হতে পারে ভেবে তাকে হত্যা করা হয়নি।

এই যুদ্ধ হতে ফেরার পথেই আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার সাথীদের সাথে বলেছিল-

﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾

“আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কার করবে”।[২৬৬] যায়েদ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই খবর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলে দিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডাকা হলে সে ওযূহাত পেশ করতে লাগল এবং শপথ করে এ কথা বলতে লাগল যে, আমি এ কথা কখনই বলিনি। তার কথা শুনে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা যায়েদ বিন আরকামের সত্যতায় এবং মুনাফেক সরদারকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে সুরা মুনাফিকুন নাযিল করেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন যায়েদকে বললেন- সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রশংসায় কুরআন মজীদে সূরা মুনাফিকুন নাযিল করেছেন। তিনি আরও বললেন- তুমি তোমার কানের হক আদায় করেছ। উমার বিন খাত্তাব সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনি হুকুম করুন। আব্বাদ বিন বিশ্‌র তার গর্দান উড়িয়ে ফেলুক। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন- আমি যদি তা করি তাহলে লোকেরা বলাবলি করবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করছে।

খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কারণ হল, ইহুদীরা যখন দেখল যে, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা জয়লাভ করেছে ও মুসলিমগণ পরাজিত হয়েছে এবং তারা শুনতে পেল যে, আগামী বছর আবু সুফিয়ান বদর প্রান্তরে মুসলিমদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ করবে, তখন তাদের সাহস বেড়ে গেল। সুতরাং ইহুদী নেতারা মক্কার কুরাইশদের কাছে গমণ করল। তারা মক্কায় গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে তারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করল। ইহুদীদের আগ্রহ দেখে কুরাইশদের হিম্মত ও সাহস বেড়ে গেল। ইহুদীদের পরামর্শ মুতাবেক তারা রণপ্রস্তুতি নিতে শুরু করল। এ লক্ষ্যে তারা গাতফান এবং অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট গমণ করল। তারা তাদেরকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহবান জানাল। তারা সেই ডাকে সাড়া প্রদান করল।

---

২৬৬. সূরা মুনাফিকুন-৬৩: ৮

অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন আরব গোত্রের ১০ হাজার স্বশস্ত্র যোদ্ধা প্রস্তুত হয়ে গেল। এদের মধ্যে কিছু ইহুদীও ছিল। আবু সুফিয়ান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করল। পূর্ণ প্রস্তুতি সহ তারা মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল।

সংবাদ পেয়ে নাবী ﷺ সালমান ফারসীর পরামর্শে মদীনার চার পার্শে খন্দক তথা পরীখা খননের পর তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার মূল শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় ইহুদী গোত্রগুলোও চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে মিলিত হল এবং মুনাফেকদের নিফাকীও প্রকাশিত হয়ে গেল। এতে মুসলিমদের উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ল এবং অনেক লোকই ভীত হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যেই কুরাইশ বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং চতুর্দিক থেকে মদীনাকে ঘেরাও করে ফেলল। পূর্ণ একমাস তারা কঠোরভাবে মদীনাকে অবরোধ করে রাখল। মুশরিক ও মুসলিম শিবিরের মাঝখানে খন্দক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর কারণে কোন প্রকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের উপর বিরাট এক বাতাস প্রেরণ করলেন। প্রচন্ড বাতাসে তাদের তাবুগুলো উল্টে গেল। এতে করে তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি প্রবেশ করল। তারা আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি নিয়ে ফেরত গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৈনিকদেরকে বিজয় দান করলেন এবং দুশমনদেরকে একাই পরাজিত করলেন।

মুশরিকরা চলে যাওয়ার পর রসূল ﷺ ও মদীনায় প্রবেশ করে যুদ্ধের হাতিয়ার খোলা শুরু করলেন। তখন জিব্রীল ফিরিস্তা এসে বললেন- আপনারা অস্ত্র ছেড়ে দিচ্ছেন? অথচ আল্লাহর ফিরিস্তাগণ এখনও যুদ্ধের পোশাক খুলেন নি। মোটকথা তিনি জানতে পারলেন যে, বনী কুরায়যার ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তিনি সাথে সাথে ঘোষণা করে দিলেন যে, বনী কুরায়যার যমীনে পৌঁছার আগে কেউ যেন আসরের সলাত না পড়ে। এই ঘোষণা শুনে মুসলিমগণ দ্রুত বের হয়ে পড়লেন। নাবী ﷺ ও বের হয়ে পড়লেন। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছার পর ইহুদীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হল। যার ভাগ্যে হত্যা নির্ধারিত ছিল সে নিহত হল। বাকীরা অপমানিত হয়ে মুসলিমদের হাতে বন্দী হল। খন্দক ও বনী কুরায়যার যুদ্ধে মুসলিমদের মোট দশজন লোক শহীদ হল।

উরায়নার ঘটনা

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- একদা উরায়না কিংবা উক্‌ল গোত্রের কিছু লোক নাবী ﷺ এর কাছে আগমণ করল। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থের অনুকুল না হওয়ার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে গেল। নাবী ﷺ তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের কাছে যেতে আদেশ করলেন এবং বললেন- তোমরা উটের দুধ এবং পেশাব পান কর। তারা তথায় চলে গেল। কিছু দিন পর সুস্থ হয়ে তারা নাবী ﷺ এর রাখালকে হত্যা করল এবং পশুগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। দিবসের প্রথম ভাগে যখন নাবী ﷺ এর নিকট এ সংবাদ আসল, তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য একদল সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। দ্বিপ্রহরের সময় তাদেরকে পাকড়াও করে রসূল ﷺ এর দরবারে নিয়ে আসা হল। নাবী ﷺ এর আদেশে তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল এবং লোহার কাঠি গরম করে তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দেয়া

হল। তারপর তাদেরকে উত্তপ্ত বালুর উপর ফেলে রাখা হল। তারা পানির পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইলেও তাদেরকে পানি দেয়া হল না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- এই ঘটনা থেকে জানা গেল, (১) উটের পেশাব পান করা জায়েয।

(২) যে সমস্ত পশুর গোশত খাওয়া হালাল সে সমস্ত পশুর পেশাব পবিত্র।

(৩) আরও জানা গেল, যারা সন্ত্রাসী তাদেরকে হাত-পা কর্তন করসূহ হত্যা করা জায়েয।

(৪) সন্ত্রাসী কোন মানুষকে যেভাবে হত্যা করবে, তাকে সেভাবেই হত্যা করতে হবে। তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রাখালের চোখে গরম কাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাই কিসাস স্বরূপ তাদেরকে সেভাবেই শাস্তি দেয়া হয়েছে। এই ঘটনা থেকে একটি স্বতন্ত্র বিধান সাব্যস্ত হয়েছে। আর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হুদুদ তথা দন্ডবিধির হুকুম-আহকাম নাযিল হওয়ার পূর্বে। তবে হুদুদের আহকাম নাযিল হওয়ার পর এই বিধান রহিত হয়ে যায়নি; বরং তাকে বহাল রেখেছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির বর্ণনা

হিজরী ৬ষ্ঠ সালে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রথমে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য একজন গোয়েন্দা মক্কায় পাঠালেন। উসফান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা তাকে কাবার কাছেই পৌঁছতে দিবেনা এবং তাঁর সাথে তারা প্রচন্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসলেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পরামর্শ ছিল, কুরাইশদেরকে কোন প্রকার ছাড় দেয়া যাবেনা। তারা যদি রাস্তায় আটকিয়ে দেয়, তাহলে প্রয়োজনে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকরের এই মতকেই পছন্দ করলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উছমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এই খবর দেয়ার জন্য মক্কায় পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় আসছিনা। উমরাহ পালন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদের পথ ছেড়ে দাও। কিন্তু কুরাইশরা এই কথার মোটেই মূল্যায়ন করলনা। তারা বলল- আমরা তোমার কথা শুনলাম। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হল। আলোচনা সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। এক পর্যায়ে সন্ধির পরিবর্তে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। উভয় পক্ষের লোকেরা পরস্পর তীর ও পাথর নিক্ষেপে লিপ্ত হল। এই পর্যায়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে খবর পৌঁছল যে, কুরাইশরা উছমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হত্যা করে ফেলেছে। মুসলমানেরা এই খবর শুনে রসূান্বিত হলেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তারা একটি গাছের নীচে একত্রিত হয়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে এই মর্মে বায়আত নিলেন যে, তারা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং কোনক্রমেই এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ না নিয়ে মদীনায় ফেরত যাবেন না। কিন্তু একটু পরেই সহীহ-সালামতে উছমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মক্কা হতে ফেরত আসলেন। উছমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আগমণে পরিস্থিতি শান্ত হল। পুনরায় নতুন করে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হল। আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে নিম্নে বর্ণিত শর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি চুক্তি রচিত হল। ইসলামের ইতিহাসে এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ

সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তগুলো ছিল এই-

- মদীনার মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
- এই বছর মুসলমানেরা উমরাহ না করেই মদীনায় ফেরত যাবেন।
- আগামী বছর তারা মক্কায় আগমণ করতে পারবেন। এ সময় তারা সাথে তীর ও বর্শা আনতে পারবেন না। আত্মরক্ষার জন্য শুধু কোষবদ্ধ তলোয়ার সাথে রাখতে পারবে।
- মক্কায় তারা কেবল তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন। তিন দিন পার হওয়ার সাথে সাথে মক্কা থেকে বের হয়ে চলে যেতে হবে।
- এই দশ বছরের মধ্যে মক্কার কোন লোক যদি মুসলমান হয়ে মদীনায় আশ্রয় নেয় তাহলে মদীনাবাসীগণ তাকে আশ্রয় দিবে না। পক্ষান্তরে মদীনার কোন লোক যদি মক্কায় চলে আসে তাহলে মক্কাবাসীগণ তাকে মদীনায় ফেরত দিবে না।

চুক্তির এই শেষ শর্তটি মেনে নেওয়া মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন ছিল। তারা নাবী ﷺ এর কাছে বলতে লাগলেনঃ হে আল্লাহর নাবী! আমরা কি এই শর্তটিও মেনে নিব? নাবী ﷺ বললেন- তাদের যে লোক মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে, আমরা তাকে তাদের নিকট ফেরত দিব। আল্লাহ তা'আলা তার কোন না কোন ব্যবস্থা করবেন।

চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর নাবী ﷺ মুসলমানদেরকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, কুরবানী করে ফেল এবং মাথা কামিয়ে ফেল।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সংশিলিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

- এই সন্ধির পর মক্কার খোযাআ গোত্র নাবী ﷺ এর সাথে যোগ দিল আর বনী বকর কুরাইশদের পক্ষ নিল।
- হুদায়বিয়ার বছর এই হুকুম নাযিল হল যে, ইহরাম অবস্থায় কেউ যদি অসুবিধার কারণে মাথা কামাতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে ফিদইয়া স্বরূপ তিন দিন সিয়াম রাখতে হবে, অথবা সাদকাহ করতে হবে অথবা একটি কোরবানী করতে হবে। বিধানটি নাযিল হয়েছিল কা'ব বিন উজরাকে কেন্দ্র করে।
- এই সন্ধির ঘটনায় নাবী ﷺ মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল খাটোকারীদের জন্য একবার দু'আ করেছেন।
- এই ঘটনার সময় দশ জনের পক্ষ হতে একটি উট এবং সাতজনের পক্ষ হতে একটি গরু কোরবানী বৈধ হওয়ার বিধান জানা যায়।
- এই ঘটনায় সূরা ফাতাহ নাযিল হয়।
- রসূল ﷺ যখন মদীনায় ফেরত আসলেন, তখন একদল মু'মিন মহিলা আগমণ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে নিষেধ করলেন। এর মাধ্যমে মহিলাদেরকে ফেরত পাঠানোর বিধান মানসুখ (রহিত) হয়ে যায়। আবার কেউ বলেছেন- এ বিষয়ে কুরআনের মাধ্যমে

সুন্নাতকে খাস করা হয়েছে। এ মতটি খুব শক্তিশালী। আবার কেউ কেউ বলেছেন- শুধু পুরুষদেরকেই ফেরত দেয়ার ব্যাপারে চুক্তি হয়েছিল। তবে মুশরিকরা উভয় শ্রেণীর ক্ষেত্রেই শর্তটি কার্যকর রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হুদায়বিয়ার ঘটনায় যে সমস্ত ফিকহী মাসায়েল জানা যায়

- হুদায়বিয়ার ঘটনায় দলীল পাওয়া যায় যে, হজ্জের মাস সমূহেও উমরাহ করা জায়েয। হজ্জের ন্যায় উমরাহ্এর ক্ষেত্রেও মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা উত্তম। আর যেই হাদীছে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস হতে উমরার ইহরাম বাঁধবে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, তা সঠিক নয়।
- এতে আরও দলীল পাওয়া যায় যে, উমরাতে কোরবানীর জানোয়ার সাথে নেয়া সুন্নাত। কোরবানীর জন্তুতে দাগ লাগানোও সুন্নাত; এটি মুছলা বা অঙ্গহানীর শামিল হবেনা।
- আল্লাহর দুশমনদের মধ্যে ক্রোধের জ্বালা প্রবেশ করানো জায়েয।
- সেনাপতির উচিত শত্রুদের দেশে গোয়েন্দা প্রেরণ করা।
- প্রয়োজন বশত যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রাপ্ত ও চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের সহায়তা নেওয়া জায়েয। কেননা উয়াইনা আল-খুজায়ী কাফের হওয়া সত্ত্বেও নাবী ﷺ তার সাহায্য নিয়েছিলেন।
- সেনাপতির উচিত সঠিক মতামত খুঁজে বের করার জন্য সাধারণ সৈনিক ও জনগণের সাথে পরামর্শ করা। এতে আল্লাহর আদেশ পালিত হবে এবং তাদের মনও খুশী হবে।
- যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই মুশরিকদের শিশু সন্তানদেরকে বন্দী করা জায়েয আছে।
- অন্যায় কথার প্রতিবাদ করা জরুরী। যদিও সেই কথাটি অবুঝ মানুষ কিংবা কোন পশুকে লক্ষ্য করে বলা হয়। কেননা হুদায়বিয়ার দিন রসূল ﷺ এর উটনী কাসওয়া যখন বসে পড়ল, তখন লোকেরা বলল যে, রসূল ﷺ এর উটনী কাসওয়ার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। রসূল ﷺ তাদের কথার প্রতিবাদ করে বললেন- কাসওয়ার অভ্যাস খারাপ হয়নি। পূর্বেও তার অভ্যাস খারাপ ছিলনা। বরং একে সেই আল্লাহ্ তা'আলাই রুখে দিয়েছেন, যিনি আবরাহার হস্তিবাহিনীকে রুখে দিয়েছিলেন।[২৬৭]
- দ্বীনি বিষয়কে জোরালোভাবে উপস্থাপন করার জন্য শপথ করা জায়েয আছে। নাবী ﷺ থেকে আশিটিরও অধিক স্থানে শপথ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের তিনটি

---

২৬৭. পবিত্র কাবা ঘর ও মক্কা নগরীর রয়েছে সুমহান মর্যাদা। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সকল স্থানের উপর মক্কা নগরীকে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং সৃষ্টির লগ্ন থেকেই মানব জাতি কাবা ঘর ও মক্কা নগরীকে সম্মান দিয়ে আসছে। কাবা ঘর ও মক্কা নগরীর প্রতি এই সম্মান শুধু জিন-ইনসানের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং পশুপাখির হৃদয়েও আল্লাহ্ তা'আলা কাবা ঘরের প্রতি সম্মান ঢেলে দিয়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উটনী বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, সামনে অগ্রসর হলে এবং মক্কায় প্রবেশ করলে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে এবং কাবার সম্মান নষ্ট হতে পারে। তাই উটনী বসে গিয়েছিল। এর আগে আবরাহার হস্তিবাহিনীও একই কারণে কাবায় প্রবেশ করা হতে বিরত ছিল।

স্থানে তথা সূরা সাবা, সূরা ইউনুস এবং সূরা তাগাবুনে সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য শপথ করার আদেশ দিয়েছেন।

- মুশরিক এবং পাপী লোকেরাও যদি আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতি আহবান জানায়, তাহলে আল্লাহর নিদর্শনের সম্মান রক্ষার্থে তাদের সাথে সহযোগিতা করা জায়েয আছে। তবে তাদের ফাসেকী ও কুফরীর সাথে কোন প্রকার সহযোগিতা করা যাবেনা। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ের উপর সাহায্য চায়, তার ডাকে সাড়া দিতে হবে। সাহায্যপ্রার্থী যে কেউ হোক না কেন। তবে শর্ত হল সেই প্রিয় বস্তুর কারণে সাহায্য করতে গেলে যাতে সেই প্রিয় বিষয়টির চেয়ে অধিক ভয়াবহ কোন ক্ষতি সাধিত না হয়। মানুষের নিকট এটি একটি কঠিন ও সুক্ষ্ম বিষয়। এ কারণেই হুদায়বিয়ার দিন কতিপয় সাহাবীর হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তো সেই দিন উমরাহ না করেই হুদায়বিয়া থেকে ফেরত আসাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেই দিন রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ন্যায় জবাব প্রদান করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম, সর্বাধিক জ্ঞানী এবং আল্লাহ্ রসূল ও আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। তিনি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণেও ছিলেন সর্বাধিক মজবুত। এই জন্যই উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীকে কোন বিষয়েই জিজ্ঞেস করতেন না।
- এতে আরও জানা গেল যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুদায়বিয়ার ডান দিক থেকে বের হয়েছিলেন। তাই ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- হুদায়বিয়ার এক অংশ হারামের সীমানার মধ্যে এবং অন্য অংশ এর বাইরে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারামের সীমানায় সলাত আদায় করতেন এবং হারামের সীমার বাইরে অবস্থান করতেন। এতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হারামের সীমানার মধ্যে এবং এর যেকোন স্থানে সলাত পড়লেই বাড়তি ছাওাব (এক ওয়াক্তের বিনিময়ে এক লক্ষ ওয়াকক্তের ছাওয়াব) পাওয়া যাবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী-

«صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ»

"মাসজিদুল হারামের এক সলাত অন্যান্য মাসজিদের এক লাখ সলাত থেকেও উত্তম"।[২৬৮] এখানে শুধু মাসজিদকে খাস করা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর তাৎপর্যও অনুরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

"সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে"। (সূরা তাওবা-৯: ২৮) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾

---

২৬৮. ইবনে মাজাহ, তাও. হা/১৪০৬

- "পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি"। (সূরা ইসরা-১৭:১)
- যে ব্যক্তি মক্কার নিকটবর্তী কোন স্থানে অবতরণ করবে, তার উচিৎ হবে হারামের সীমানার বাইরে অবস্থান করা এবং সলাতের সময় হলে হারামের সীমানার মধ্যে সলাত আদায় করা। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এরূপই করতেন।
- মুসলমানদের স্বার্থে ইমাম নিজেই শত্রুদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব করতে পারেন।
- হুদায়বিয়ার সন্ধি চলাকালে মুগীরা বিন শুবা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাথার কাছে তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অথচ তিনি অন্য সময় এমন করতেন না। এতে জানা গেল যে, মুসলিম শাসকের কাছে অমুসলিমদের দূত আসলে মুসলমানদের শান-শাওকাত ও শাসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয আছে। এটি কোন দোষের বিষয় নয়। এমনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে গর্ব ও বীরত্ব প্রকাশ করা কোন দোষের বিষয় নয়।
- শত্রুর সামনে উটসমূহ হাজির করার মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় অমুসলিম শাসকদের দূতের সামনে ইসলামের নিদর্শনসমূহ পেশ করা মুস্তাহাব। সেই দিন মুগীরাকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন- তোমার ইসলাম কবুল করাকে মেনে নিলাম। আর তুমি যে মাল নিয়ে এসেছ, এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সম্পদের উপরও হস্তক্ষেপ করা যাবেনা এবং তার মালিকও হওয়া যাবেনা; বরং তা মালিকের নিকট ফেরত দেয়া হবে। মুগিরা বিন শুবা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের সাথে বসবাস করত। অতঃপর সে তাদের সাথে গাদ্দারী করে তাদের সম্পদ হস্তগত করে নিয়েছিল। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই মালের প্রতি কোন প্রকার দৃষ্টিপাত করেন নি, সম্পদগুলো স্বীয় মালিকের জন্য রক্ষা করা কিংবা এর কোন দায়-দায়িত্বও নেন নি। কেননা এটি ছিল মুগিরা বিন শুবা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনা।
- সেই দিন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উরওয়া বিন মাসউদকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- তুমি যাও এবং লাত-এর লজ্জাস্থান চাটতে থাকো! এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রয়োজনে লজ্জাস্থানের নাম উল্লেখ করা জায়েয আছে। এমনি যে ব্যক্তি জাহেলীয়াতের দিকে মানুষকে আহবান করে, তার জন্য এ কথা বলতে বলা হয়েছে যে, তোমার বাপের লজ্জাস্থান চুশতে থাকো। এ সমস্ত কথা ইংগিতের মাধ্যমে বলা হবেনা; বরং খোলাখুলি বলা হবে। কেননা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বক্তব্যও ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় এ ধরণের কথা বলা দোষণীয়।
- বহিরসূত লোক কিংবা কাফেরদের দূতরা বেআদবী করলে বিশেষ স্বার্থে তাতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কেননা হুদায়বিয়ার দিন উরওয়া যখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাড়িতে বারবার হাত লাগাচ্ছিল, তখন তাকে বাঁধা দেয়া হয়নি।
- লোকেরা হুদায়বিয়ার দিন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কফ, থুথু এবং ব্যবহৃত পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল এবং বুক ও চেহারায় মাখাচ্ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে উপরের বস্তুগুলো অপবিত্র নয়।
- হুদায়বিয়ার ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নেকফাল (শুভ লক্ষণ) লওয়া অর্থাৎ ভাল কিছু দেখে বা শুনে ভাল কিছু কামনা করা মুস্তাহাব। হুদায়বিয়ার দিন যখন কুরাইশদের দূত সুহাইল আগমণ

করল তখন নাবী ﷺ বললেন- তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেছে। সুহাইল অর্থ নরম ও সহজ।

- হুদায়বিয়ার সন্ধিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মুশরিকদের সাথে চুক্তি করা জায়েয আছে।
- সময় নির্ধারণ না করে কেউ যদি কোন কাজ করার শপথ করে, কিংবা নযর মানে বা কোন ওয়াদা করে তবে তা তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করা জরুরী নয়। বিলম্বে পূর্ণ করলেও চলবে।
- মাথা কামানো হাজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত এবং চুল ছোট করার চেয়ে কামানো উত্তম। হাজ্জ বা উমরার সফরে বাধাপ্রাপ্ত হলেও মাথা কামানো বা মাথার চুল ছোট করা একটি ইবাদত। অন্যের পক্ষ হতে উমরাহ করলেও বদলী উমরাহকারীর মাথা মুন্ডন করা বা মাথার চুল খাটো করা আবশ্যক।
- হাজ্জ বা উমরাহ সম্পাদনের ইচ্ছায় সফররত ব্যক্তি যেই স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানেই কোরবানীর জন্তু যবেহ করবে। চাই সে জায়গা হারামের বাইরে হোক বা ভিতরে- এতে কোন পার্থক্য নেই। এটা আবশ্যক নয় যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হারামে পৌঁছতে সক্ষম না হলে অন্য কারও মাধ্যমে হারামে কোরবানীর জানোয়ার পাঠিয়ে দিবে। যাতে হারামের সীমানায় যবেহ করা যায়। এটিও জরুরী নয় যে, কোরবানীর জন্তু হারামে পৌঁছার পূর্বে ঐ ব্যক্তি হালাল হতে পারবেনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾

"তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মাসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে"। (সূরা ফাতাহ-৪৮:২৫)

- হুদায়বিয়ার যে স্থানে তারা কোরবানী করেছিলেন, সে স্থান হারামের বাইরে অবস্থিত ছিল। কেননা হারামের সমস্ত এলাকাই কোরবানীর পশু যবেহ করার জায়গা। সুতরাং জন্তুগুলো যদি হারামের এরিয়ার মধ্যে পৌঁছে যেত, তাহলে আটকিয়ে দেয়া হয়েছে- এ কথা বলা হতনা।
- হুদায়বিয়ার ঘটনা থেকে জানা গেল যে, ইহরাম বাঁধার সময় এই বলে শর্ত জড়িয়ে থাকলে فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي অর্থাৎ আমাকে কোন বাধা দানকারী বাধাগ্রস্ত করলে সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব, এমতাবস্থায় উমরার সফরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফেরত আসলে সেই উমরাহ কাযা করা জরুরী নয়। পরের বছর তিনি যেই উমরা করেছিলেন, তাকে উমরাতুল কাযা বলার কারণ হল তিনি দ্বিতীয়বার উমরাহ কাযা করার চুক্তি করেছিলেন।
- আম্‌রে মুতলাক তথা শর্তহীন বা সাধারণ আদেশ তাৎক্ষণিক তামীল করা জরুরী। তাই যদি না হত, তাহলে হুদায়বিয়ার দিন রসূল ﷺ এর আদেশ দ্রুত পালন না করার কারণে অর্থাৎ রসূল ﷺ এর আদেশ মোতাবেক কুরবানীর পশু যবেহ করা ও মাথা না কামানোর কারণে তিনি সাহাবীদের উপর নারাজ হতেন না। সাহাবীদের পক্ষ হতে এই আদেশ পালন করতে বিলম্ব হওয়া এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হওয়াকে কোনরূপ সাধুবাদ ব্যতিরেকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাত আবশ্যক করেছেন।

- হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় এটি জানা গেল যে, কাফেরদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করা জায়েয আছে যে, কাফেরদের দেশ থেকে যদি কোন মুসলমান পুরুষ পালিয়ে এসে মুসলমানদের ইমামের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তাকে কাফেরদের নিকট ফেরত দিতে হবে।
  তবে কোন মহিলা মুসলমান হয়ে পালিয়ে আসলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না। কারণ মুমিন মহিলাকে কাফেরদের নিকট ফেরত দেয়া জায়েয নয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির এই অংশ অর্থাৎ নারীদেরকে ফেরত দেয়ার বিষয়টি কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। অন্য কোন অংশ মানসুখ হওয়ার দাবী করা সঠিক নয়।
- এ থেকে আরও জানা গেল, কোন মহিলা মুসলমান হয়ে যদি তার কাফের স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে চলে আসে, তাহলে ঐ কাফেরকে বিবাহের সময় নির্ধারিত মোহরানা ফেরত দিতে হবে। তার বংশের এবং সমমানের মহিলাদেরকে বিবাহের সময় যেই মোহরানা প্রদান করা হয়েছে, তা আবশ্যক নয়।
- মুসলিমদের ইমামের কাছে কাফেরদের কেউ ফেরত আসলে, তাকে কাফেরদের কাছে ফেরত দিতে হবে- এই শর্ত ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা, যে তাদের থেকে পালিয়ে এসে ইমামের কাছে না এসে অন্য কোন দেশে আশ্রয় নিল। তা ছাড়া ইমামের কাছে ফেরত আসলেও কাফেরদের থেকে ফেরত চাওয়ার তলব না আসলে ফেরত দেয়া জরুরী নয়।
- চুক্তি মোতাবেক কোন মুসলমানকে কাফেরদের দূতের হাতে ফেরত দিলে সেই মুসলিম যদি রাস্তায় সেই দূতদেরকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে কিসাস স্বরূপ ঐ মুসলমানকে হত্যা করা আবশ্যক নয়। মুসলিমদের ইমামের উপর এর কোন দায় বর্তায়না।
- কোন মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের সাথে মুশরিকদের নিরাপত্তার চুক্তি থাকা অবস্থায় অন্য কোন এলাকার মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান এই চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের উপর হামলা করতে পারবে। মুসলিমদের উক্ত রাষ্ট্র প্রধানের উপর এই হামলা ঠেকানো জরুরী নয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এরকমই ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি আবু বসীরের ঘটনাকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আবু বসীর মক্কা থেকে পালিয়ে এসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আয়ত্তের বাইরে অন্য এলাকায় চলে যায়। সেখান থেকে তিনি মক্কার কাফেরদের উপর হামলা করতেন এবং তাদের মালামাল লুট করতেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এ কাজ থেকে বারণ করতেন না।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কি কি হিকমত রয়েছে?

হুদায়বিয়ার ঘটনায় এমনি অনেক হিকমত রয়েছে, যার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নিম্নে কয়েকটি হিকমত উল্লেখ করেছেন-

১) মূলতঃ এটি ছিল মহান বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের ভূমিকা স্বরূপ। পৃথিবীর বড় বড় ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে, যে কোন বড় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগে তিনি একটি ভূমিকা পেশ করে থাকেন, যা সেই ঘটনার কারণ হয় এবং ঐ দিকেই ইঙ্গিত করে।

২) হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য একটি বিরাট বিজয় ছিল। কেননা এর মাধ্যমে উভয় পক্ষ পরস্পরকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। ফলে লোকেরা পরস্পর মিলে-মিশে বসবাস করার সুযোগ পায়। সেই সুযোগে মুসলিমগণ কাফেরদেরকে কুরআন ও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পরিবেশ পেলেন। ফলে প্রচুর লোক ইসলামে প্রবেশ করে। যারা ইসলাম গোপন রেখেছিল, তারাও ইসলাম প্রকাশ করে দিল। এই চুক্তির মেয়াদের মধ্যে লোকেরা স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করল। যেই শর্তগুলো মুশরিকরা নিজেদের অনুকূলে মনে করে আরোপ করেছিল, সেগুলোও মুসলমানদের কল্যাণে এসে গেল। সুতরাং যেখান থেকে তারা সম্মানের আশা করেছিল, সেখান থেকেই তারা অপমানিত হল। মুসলমানেরা যেহেতু আল্লাহর সামনে নত হয়েছিল, তাই আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে সম্মানিত করলেন। বাতিলের মাধ্যমে অর্জিত ইজ্জত হকের মুকাবেলায় অপমানে পরিণত হল।

৩) এই সন্ধিকে আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলিমদের ঈমান ও ইয়াকীন বৃদ্ধির কারণে পরিণত করেছেন। এর মাধ্যমে পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে রসূল ﷺ এর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া, তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাকার গুণাবলী অর্জিত হল এবং আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের অন্তরে প্রশান্তি ও স্বস্তি নাযিলের মাধ্যমে যেই অনুগ্রহ ও দয়া করেছিলেন, তারা তাও দেখতে পেয়েছে। এ সময় তাদের জন্য এটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ তারা এমন অবস্থায় ছিল, যাতে মজবুত পাহাড়ের পক্ষেও স্থির থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং এই মুহূর্তে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের প্রতি এমন প্রশান্তি নাযিল করলেন, যাতে তাদের হৃদয়সমূহ একদম শান্ত হয়ে গেল এবং অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল। সেই সাথে তাদের ঈমানও বৃদ্ধি পেল।

৪) হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রসূলের পিছনের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করা, তাঁর প্রতি আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণ করা, সীরাতুল মুস্তাকীমের দিকে তাঁকে হিদায়াত করা ও তাঁর প্রতি সাহায্য প্রেরণ করে তাঁকে বিজয়ী করার মাধ্যম বানিয়েছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রসূলের অন্তরকে খুলে দিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির স্থানে যখন মুমিনদের অন্তর কাঁপছিল, তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করলেন। এই প্রশান্তি নাযিলের মাধ্যমে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেল। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা রসূল ﷺ এর হাতে বায়আতের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বায়আতকে এমন জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই বায়আত যেন আল্লাহর হাতেই হচ্ছে। রসূল ﷺ এর পবিত্র হাত যখন তাদের হাতের উপর ছিল, তখন আল্লাহ্ তা‘আলার পবিত্র হাত তাদের হাতের উপর ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর নাবী ও রসূল। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের হাতে বায়আত করল, সে যেন আল্লাহর হাতেই বায়আত করল এবং যে ব্যক্তি রসূল ﷺ এর সাথে মুসাফাহা করল, সে যেন আল্লাহর সাথেই মুসাফাহা করল। অতঃপর সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যারা এই বায়আত ও অঙ্গিকার ভঙ্গ করবে, তারাই কেবল এর প্রতিফল ভোগ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোকদের আলোচনা করেছেন, যারা অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছিল এবং আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করেছিল।

অতঃপর রসূল ﷺ এর হাতে বায়আত করার কারণে মুমিনদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের সময় মুমিনদের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা‘আলা অবগত ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে প্রচুর

বিজয় ও গণীমত দান করলেন। খায়বার বিজয়ের মাধ্যমেই এই বিজয়ের সূচনা হয়েছিল। এরপর থেকেই বিজয় অব্যাহত থাকে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর কাফেরদের হাত উঠানোকে (আক্রমণকে) প্রতিহত করার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে কোন শ্রেণীর কাফের উদ্দেশ্য- তার ব্যাখ্যা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন- মক্কার কাফেরদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন এবং তাদের ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন- এরা হচ্ছে ইহুদী। সাহাবীগণ যখন মদীনা হতে বের হলেন, তখন তারা মদীনায় অবস্থানকারী মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে মদীনার মুসলিমদেরকে হেফাজত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন- এরা হচ্ছে খায়বারে বসবাসকারী ইহুদী এবং তাদের দুই বন্ধু গোত্র আসাদ ও গাতফান। তবে এই ক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলমানদের সকল শত্রুই এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন- যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন"। (সূরা ফাতাহ-৪৮:২০) মুসলমানদের উপর থেকে শত্রুদের হাত প্রতিহত করাকে একটি আয়াত (নিদর্শন) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মুসলমানদের সংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বরাবরই বিজয় দান করেছেন এবং শত্রুদের অনিষ্ট হতে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। এটি অবশ্যই একটি নিদর্শন ও বিরাট নিয়ামাত। কেউ কেউ বলেছেন- এখানে আয়াত (নিদর্শন) বলতে খায়বার বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। উপরের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে হিদায়াতের নিয়ামাত দেয়ার কথাও বলেছেন। এটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামাত।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে এমন অনেক গণীমত ও বিজয় দান করার ওয়াদা করেছেন, যা তারা সেই মুহূর্তে কল্পনাও করতে পারেনি। এই বিজয়গুলো সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন- এখানে মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেছেন- পারস্য ও রোম উদ্দেশ্য। আবার কেউ বলেছেন- খায়বার বিজয়ের পর পূর্ব ও পশ্চিমের দেশসমূহের বিজয় উদ্দেশ্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- কাফেররা যদি আল্লাহর অলীদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এই সুন্নাতই (রীতিই) চলে আসছে। আর আল্লাহর এই সুন্নাতের মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, উপরোক্ত সুন্নাত অনুযায়ী উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসল না কেন? এই প্রশ্নের জবাব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য আসার জন্য তাকওয়া ও সবরের শর্ত ছিল। উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিমগণ সবুর করতে পারে নি বলে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন না করে রসূলের হুকুম অমান্য করেছিল বলে ওয়াদা পূর্ণ হয়নি। অতঃপর

আল্লাহ্ তা'আলা অসহায় নারী-পুরুষদেরকে রক্ষা করার জন্য কাফেরদের উপর থেকে তাদের হাতকে (হামলাকে) প্রতিহত করেছেন। সুতরাং এই দুর্বল ও অসহায় লোকদের কারণেই কাফেরদের উপর হতে শাস্তিকে প্রতিহত করেছেন। কেননা তখনও বেশ কিছু দুর্বল মুসলিম কাফেরদের কাতারে ছিল এবং তাদের ঈমান কাফেরদের নিকট গোপন ছিল। তারা বাধ্য হয়ে কাফেরদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। সুতরাং এই অবস্থায় যদি আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে কাফেরদের উপর সক্ষম করে দিতেন, তাহলে এই দুর্বল মুসলিমরাও মারা যেত। যেমন রসূল ﷺ মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের অন্তরের মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করার কথা আলোচনা করেছেন। মূর্খতা ও জুলুমের কারণেই তাদের অন্তরে এই জেদ তৈরী হয়েছিল। এই জেদ ও হিংসার মুকাবেলায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধুদের অন্তরে প্রশান্তি ও স্বস্তি অবতরণ করেছেন এবং তাদের জন্যে তাকওয়ার (সংযমের) বাক্য অপরিহার্য করে দিলেন। তাকওয়ার বাক্য দ্বারা সেই সমস্ত বাক্য উদ্দেশ্য, যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে কালিমাতুল ইখলাস তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

"তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। যদিও এতে মুশরিকরা অসন্তুষ্ট হয়"।[২৬৯] সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করার অঙ্গিকার করেছেন এবং ইহাকে পৃথিবীর সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে মুমিনদের অন্তরকে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এই সুসংবাদের মাধ্যমে তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন। হুদায়বিয়ার দিন বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের যে পরাজয় হয়েছে, তা দেখে এমনটি বুঝার সুযোগ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলের দুশমনদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এটি কিভাবে সম্ভব? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে দ্বীনে হকসহ প্রেরণ করেছেন এবং ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাঁর দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল এবং রসূলের পবিত্র জামআতের খুব প্রশংসা করেছেন। অথচ রাফেযীরা (শিয়ারা) এর বিপরীত করে অর্থাৎ রসূলের সাহাবীদের কুৎসা বর্ণনা করে থাকে।

খায়বারের যুদ্ধের ঘটনা

মুসা বিন উকবা বলেন- হুদায়বিয়া থেকে ফেরত এসে নাবী ﷺ ২০ দিন বা এর চেয়ে কম সময় মদীনায় অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। বের হওয়ার সময় তিনি সিবা বিন উরফুযাকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। এ সময় আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মদীনায় আগমণ

২৬৯. সূরা ফাতাহ-৪৮:২৮

করে ফজরের সলাতে সিবা বিন উরফুযার সাথে সাক্ষাত করলেন। সিবা বিন উরফুযাকে তিনি প্রথম রাকআতে كهيعص তথা সূরা মারইয়াম এবং দ্বিতীয় রাকআতে ويل للمطففين তথা সূরা মুতাফফিফীন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তিনি সলাতেই বলতে শুরু করলেন। উমুক ব্যক্তির জন্য সর্বনাশ হোক! তার নিকট রয়েছে দু'টি দাঁড়িপাল্লা। সে যখন মানুষকে কোন কিছু মেপে দেয়, তখন ছোট পাল্লা দিয়ে মেপে দেয়। আর যখন মেপে নেয় তখন বড়টি দিয়ে নেয়। সলাত শেষে তিনি সিবা-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খায়বারে গিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে মিলিত হলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলায় তারা আবু হুরায়রা ও তাঁর সাথীদেরকে মালে গণীমতের অংশ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। সুতরাং তিনিও গণীমতের অংশ পেলেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বারে গিয়ে ফজরের সলাত পড়লেন। সলাতের পর মুসলমানগণ আরোহন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আক্রমণের খবর যেহেতু তাদের জানা ছিল না, তাই তারা সকাল বেলা তাদের চাষাবাদের জমির দিকে বের হচ্ছিল। তারা মুসলিম বাহিনীকে দেখে বলল- আল্লাহর শপথ! এই তো মুহাম্মাদ এবং তাঁর বাহিনী এসে গেছে। এই বলে তারা নিজেদের দূর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন- আল্লাহু আকবার! খায়বার বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন সকাল বেলা কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।

অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীকে যুদ্ধের পতাকা দিলেন। হাদীছের কিতাবসমূহে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর লেখক মারহাব নামক ইহুদীর সাথে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর লড়াইয়ের বর্ণনা এবং আমের বিন আকওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মারহাবকে হত্যা করেছেন।

অতঃপর মুসলিম বাহিনী খায়বারবাসীদেরকে ঘেরাও করলেন। অবরোধ দীর্ঘ হওয়ায় মুসলিমগণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় যখন তারা খাওয়ার জন্য গৃহপালিত গাধা যবেহ করল তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করলেন।

পরিশেষে তাদের সাথে এই শর্তে মীমাংসার চুক্তি করলেন যে, তারা খায়বার ছেড়ে চলে যাবে এবং যুদ্ধের হাতিয়ার ব্যতীত যত ইচ্ছা সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য রেখে যেতে হবে। আর শর্ত করা হল যে, কেউ যদি কোন কিছু গোপন করে কিংবা লুকিয়ে ফেলে, তবে তার জন্য নিরাপত্তার চুক্তি কার্যকর হবেনা। অতঃপর তারা একটি মশক (কলসী) লুকিয়ে ফেলল। তাতে হুআই বিন আখতাবের সম্পদ লুকায়িত ছিল। বনী নযীর কবীলাকে উচ্ছেদ করার সময় সে তা খায়বারে নিয়ে এসেছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুআই বিন আখতাবের চাচাকে মশকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল- যুদ্ধ এবং অন্যান্য খরচে তা শেষ হয়ে গেছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- দিন তো বেশী হয়নি। সম্পদ ছিল বিপুল পরিমাণ। এত দ্রুত সম্পদগুলো শেষ হয়ে গেল কিভাবে? অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুআইয়ের চাচার খোঁজ-খবর রাখার জন্য যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নিযুক্ত করে দিলেন। যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন তার উপর চাপ প্রয়োগ করলেন, তখন সে বলল- আমি হুআইকে এই অঞ্চলের বিরানভূমির আশেপাশে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি। সাহাবীগণ সেখানে গিয়ে তালাশ করে তা পেয়ে গেলেন।

অতঃপর রসূল ﷺ যখন উপরোক্ত শর্তে তাদেরকে বহিষ্কারের ইচ্ছা করলেন, তখন তারা বলল- এই শর্তে আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন যে, আমরা এখানের যমীন চাষাবাদ করব এবং উৎপাদিত ফল ও ফসল থেকে আমরা অর্ধেক নিব আর আপনি বাকী অর্ধেক নিবেন।

ঐ দিকে রসূল ﷺ এর কাছে কাজ করার মত কোন লোক ছিলনা। তাই তিনি তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন।

ইহুদীরা খায়বারে কত দিন থাকতে পারবে? চুক্তিতে এটি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ ছিলনা; বরং বিষয়টি রসূল ﷺ এর ইচ্ছার উপর দেয়া হয়েছিল। যত দিন ইচ্ছা তিনি তাদেরকে সেখানে থাকতে দিবেন।

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তিনি তাদের কাউকেই হত্যা করেন নি। তবে চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে তিনি আবুল হুকাইকের দুই পুত্রকে হত্যা করলেন। তাদের একজন ছিল হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়ার স্বামী।

রসূল ﷺ সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে বন্দী করলেন। তিনি আবুল হুকাইকের এক পুত্রের বিবাহধীন ছিলেন। নাবী ﷺ তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করলেন। মুক্ত করে দেয়াটাই বিয়ের মোহরানা নির্ধারণ করলেন।

খায়বারের ভূমিকে নাবী ﷺ ৩৬ ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক ভাগকে আবার ১০০ ভাগে ভাগ করে মোট ৩৬০০ অংশে ভাগ করলেন। এখান থেকে রসূল ﷺ এবং মুসলমানগণ অর্ধেক অর্থাৎ ১৮০০ অংশ নিলেন। আর বাকী অংশগুলো তথা ১৮০০ অংশ সেখানকার যমীন দেখা-শুনাকারী এবং বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য রেখে দিলেন।

ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- খায়বারের যমীন মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার কারণ হল সেখানকার এক অংশ জয় করা হয়েছিল যুদ্ধ করে আরেক অংশ জয় করা হয়েছিল সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে। যেই অংশ লড়াইয়ের মাধ্যমে জয় করা হয়েছিল, তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল। আর যেই অংশ চুক্তির মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল, তা খায়বারের যমীন দেখা-শুনাকারীদের জন্য এবং মুসলমানদের স্বার্থে রেখে দেয়া হয়েছিল।

তবে সঠিক কথা হচ্ছে খায়বারের সকল অংশই যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয়েছিল। এটিই সঠিক ও সন্দেহাতীত কথা।

যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত ভূমির ব্যাপারে মুসলমানদের ইমাম সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ যমীন মুসলমানদের মাঝে ভাগ করে দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ হিসাবে রেখেও দিতে পারেন। অথবা তিনি ইচ্ছা করলে সৈনিকদের মাঝে ভাগ করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তা থেকে কিছু অংশ মুসলমানদের প্রয়োজনে রেখে দিতে পারেন। নাবী ﷺ এই তিনটিই করেছেন। বনী কুরয়যা ও বনী নযীরের যমীন তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। মক্কার যমীনকে তিনি ভাগ করেন নি। খায়বারের অর্ধেক ভাগ করেছেন। আর বাকী অর্ধেক রেখে দিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যারাই অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সকলেই খায়বারে শরীক ছিলেন। শুধু জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর রসূল ﷺ তাঁকে অংশ দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধের সময় নাবী ﷺ এর চাচাতো ভাই জা'ফর বিন আবী তালেব এবং তাঁর সাথীগণ ও আবু মুসা আশআরী (রাঃ) স্বগোত্রীয় লোকদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

এ যুদ্ধেই একজন ইহুদী মহিলা নাবী ﷺ এর জন্য বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত হাদীয়া (উপহার) দিল। তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবী সেটি খেলেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি সেই মহিলাকে কোন শাস্তি দেন নি। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি মহিলাটিকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনা আছে, যারা সেই খাদ্য খেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে হতে যখন বিশর বিন বারা মৃত্যু বরণ করলেন, তখন নাবী ﷺ সেই মহিলাকে হত্যা করেছেন।

মক্কায় যখন খায়বারের যুদ্ধের খবর পৌঁছল, তখন কুরাইশরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং তারা পরস্পর বাজি ধরল। একদল বলল- মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ জয়লাভ করবে। আরেক দল বলল- দু'টি বন্ধুগোত্র এবং খায়বারের ইহুদীরা জয়লাভ করবে।

অতঃপর আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) হাজ্জাজ বিন ইলাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি খায়বার বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। হাজ্জাজের প্রচুর সম্পদ ছিল। খায়বার বিজয়ের পর তিনি রসূল ﷺ কে বললেন- মক্কায় আমার স্ত্রীর নিকট স্বর্ণ ও অন্যান্য সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে। সে এবং তার পরিবারের লোকেরা যদি আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে আমার সমস্ত সম্পদ হাত ছাড়া হবে। আমাকে অনুমতি দিন। খায়বার বিজয়ের খবর তাদের কাছে যাওয়ার পূর্বেই আমি দ্রুত মক্কায় পৌঁছে যাই এবং আমার সম্পদগুলো হস্তগত করে নেই। তবে আমি মক্কায় গিয়ে এমন কিছু বলতে চাই, যার মাধ্যমে আমি আমার জান ও মালকে হেফাজত করতে পারব। রসূল ﷺ তাঁকে কিছু (মিথ্যা) বলার অনুমতি দিলেন।

মক্কায় গিয়ে হাজ্জাজ বিন ইলাত (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বললেন- আমার ব্যাপারটি গোপন রাখ এবং তোমার নিকট আমার যে সমস্ত মাল রয়েছে, তা একত্রিত কর। কেননা আমি মুহাম্মাদ এবং তার সাথীদের গণীমত ক্রয় করব। কারণ তারা মদীনায় পরাজিত হয়েছে। মুহাম্মাদ বন্দী হয়েছে এবং তার সাথীরা তার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ইহুদীরা শপথ করে বলছে যে, তারা মুহাম্মাদকে মক্কায় পাঠাবে, যাতে তারা তাকে হত্যা করতে পারে।

খবরটি মক্কায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। মক্কার মুসলিমগণ খবরটি শুনে ব্যথিত হলেন। অপর পক্ষে মক্কার মুশরিকরা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করল। রসূল ﷺ এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের কাছে খবরটি পৌঁছলে তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। খবর শুনে তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট রইলনা। তার গৃহের দরজায় মুসলিম ও মুশরিকদের অগণিত লোকের সমাবেশ ঘটল। তাদের কেউ আনন্দ প্রকাশ করছিল আবার কেউ দুঃখ প্রকাশ করছিল। পরক্ষণেই আব্বাস দৃঢ়তার সাথে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। এতে তিনি এমন ভাব প্রকাশ করলেন যে, তাতে মনে হয় মুহাম্মাদ ﷺ এর পরাজয় বরণ করার খবর সঠিক হতে পারেনা। কারণ আব্বাসের জানা ছিল যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনও মিথ্যা হতে পারেনা। কবিতার ভাষায় আব্বাসের দৃঢ়তা দেখে মুহাম্মাদ ﷺ এর অনুসারী এবং তার শুভাকাঙ্খীদের মনে সাহসের সঞ্চার হল। মুশরিকরা মনে করল, আব্বাসের কাছে হয়ত অন্য কোন খবর থাকতে পারে। অতঃপর আব্বাস খবরটির সত্যতা যাচাই করার জন্য হাজ্জাজ বিন ইলাতের কাছে স্বীয় খাদেমকে পাঠালেন। পাঠানোর সময় খাদেমকে বলে দিলেনঃ তুমি গোপনে হাজ্জাজের সাথে

মিলিত হও এবং বলঃ মরণ হোক তোমার! এ কি সংবাদ শুনালে? মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা যে ওয়াদা করেছেন, তা তোমার এই খবরের চেয়ে অনেক ভাল। খাদেম যখন হাজ্জাজের সাথে কথা শেষ করল তখন হাজ্জাজ বলল- তুমি গিয়ে আবুল ফজল তথা আব্বাসকে আমার সালাম দাও এবং এ কথা জানিয়ে দাও সে যেন, তাঁর কোন একটি ঘরে একাকী অবস্থান করে। আমি অচিরেই তার সাথে দেখা করে এমন খবর দিব, যা তাকে খুশী করবে। খাদেম ঘরের দরজায় এসে বলল- হে আবুল ফজল (আব্বাস)! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এই কথা শুনে আব্বাস (রাঃ) খুশীতে লাফিয়ে উঠলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি বিপদজনক কোন খবরই শুনেন নি। তিনি এগিয়ে এসে খাদেমের দু'চোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন। অতঃপর খাদেম হাজ্জাজের কথা জনিয়ে দিল। এতে খুশী হয়ে তিনি সেই দাসকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি সেই খাদেমকে বললেন- হাজ্জাজ তোমাকে যা বলেছে, এবার আমাকে তা শুনাও। খাদেম বলল- তার সাথে একান্তে সাক্ষাত করার জন্য একটি ঘরে একাকী প্রবেশ করুন। তিনি আজ দুপুরে আপনার কাছে আসবেন এবং কথা বলবেন।

সুতরাং হাজ্জাজ আসলেন এবং আব্বাসের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করলেন। হাজ্জাজ তাঁর কাছে এসে প্রথমে অঙ্গিকার নিলেন যে, অবশ্যই এই খবর মক্কাবাসী থেকে গোপন রাখতে হবে। আব্বাস নির্দ্বিধায় রাজী হয়ে গেলেন।

এবার হাজ্জাজ আসল ঘটনা খুলে বলতে লাগলেন। তিনি বলেন- আমি দেখে আসলামঃ আপনার ভাতিজা খায়বারবাসীর উপর জয়লাভ করেছে, তাদের সমস্ত সম্পদ গণীমত হিসাবে তাঁর হস্তগত হয়েছে এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে মুসলিমগণ তা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। আর সেখানকার রাজার কন্যা সাফিয়া বিনতে হুআইকে নিজের স্ত্রী বানিয়ে ফেলেছেন এবং তার সাথে বাসরও করে ফেলেছেন। আর আমি এখানে এসেছি, যাতে আমার সম্পদগুলো একত্রিত করে নিয়ে যেতে পারি। আমি রসূল ﷺ থেকে অনুমতি নিয়েই সেচ্ছায় এ ব্যাপারে মূল সত্যটি গোপন করছি। সুতরাং আপনি তিন দিন পর্যন্ত আমার এই খবর গোপন রাখুন। তিন দিন পর আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন।

যাই হোক হাজ্জাজের স্ত্রী তার সমস্ত সম্পদ একত্রিত করল। সম্পদগুলো নিয়ে হাজ্জাজ দ্রুত গতিতে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। তিন দিন পার হওয়ার পর আব্বাস (রাঃ) হাজ্জাজের স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন- তোমার স্বামীর খবর কি? সে বলল- তিনি তো মদীনায় গমণ করেছেন। হে আবুল ফজল! আল্লাহ্ আপনাকে চিন্তামুক্ত রাখুন। আপনার ভাতিজার খবর শুনে আমরাও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি বললেন- হ্যাঁ, ঠিক আছে। আল্লাহ্ আমাকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করবেন না। আমি যা পছন্দ করি, আল্লাহর মেহেরবানীতে তাই হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে খায়বারের বিজয় দান করেছেন। তাতে আল্লাহর ফয়সালা কার্যকর হয়েছে। সেই সাথে আমার ভাতিজা খায়বারের রাজার মেয়েকে বিয়েও করে ফেলেছেন। এখন যদি তোমার স্বামীর প্রতি তোমার দরদ থাকে, তাহলে মদীনায় গিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর সাথে মিলিত হও। হাজ্জাজের স্ত্রী বলল- আমার ধারণা আপনি ঠিকই বলেছেন। আব্বাস বললেন- আল্লাহর শপথ! আমি সত্য বলছি। আমি যা বলছি, বাস্তবেও তাই।

এবার হাজ্জাজের স্ত্রী বলল- আপনাকে এ বিষয়ে কে খবর দিয়েছে? আব্বাস (রাঃ) বললেন- তোমাকে যে ব্যক্তি এ বিষয়ে খবর দিয়েছেন, আমাকেও তিনি খবর দিয়েছেন। অর্থাৎ তোমার স্বামীই আমাকে তা জানিয়েছেন। এরপর আব্বাস কুরাইশদের মজলিসের দিকে গেলেন। কুরাইশরা

আব্বাসকে দেখেই বলতে লাগল- আল্লাহর শপথ! হে আবুল ফজল! আপনাকে খুশী খুশী মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে আপনার কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু হয়নি। তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমার কোন অকল্যাণ হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ। হাজ্জাজ আমাকে এই এই খবর দিয়েছেন। অর্থাৎ খায়বারবাসীর উপর আমার ভাতিজা মুহাম্মাদের জয়লাভের খবর দিয়েছেন। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি আমাকে এই খবরটি তিন দিন গোপন রাখতে বলেছেন। তাই তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আজ আমি তোমাদেরকে সেই সুখবরটি দিচ্ছি। মক্কাতে খবরটি ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমগণ দ্রুত বের হয়ে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে গেলেন। তিনি তাদেরকে সংবাদটি শুনালেন। এই খবরের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দিলেন এবং তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল

খায়বারের যুদ্ধ থেকে যে সমস্ত মাসআলা জানা যায়

- প্রয়োজন বশতঃ হারাম মাসেও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয আছে। কেননা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহার্‌রাম মাসে খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন।
- গণীমতের মাল বন্টনের সময় অশ্বারোহী যোদ্ধাকে দিতে হবে তিন অংশ এবং পদাতিক সৈন্যকে দিতে হবে এক অংশ।
- যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন সৈনিক যদি খাদ্যদ্রব্য পায়, তাহলে সে ঐ খাদ্যদ্রব্য থেকে খেতে পারবে। তা মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করার প্রয়োজন নেই। কেননা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপস্থিতিতে এক থলে চর্বি একাই নিয়েছিলেন।
- যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে কেউ যদি উপস্থিত হয়, তাহলে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের অনুমতি ব্যতীত তাকে গণীমতের অংশ দেয়া যাবেনা। কেননা খায়বার বিজয়ের পর হাবশা থেকে জা'ফর বিন আবু তালিব এবং তার সাথীগণ যখন নৌকায় আরোহন করে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আগমণ করেছিলেন তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে গণীমতের অংশ দেয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন।
- খায়বারের যুদ্ধে গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করা হয়। এর কারণ হচ্ছে গৃহ পালিত গাধা অপবিত্র। যারা বলে এটি হচ্ছে বাহনের জন্য এবং বোঝা বহন করার জন্য, তাদের কথা ঠিক নয়। আর যারা বলে গাধা যেহেতু নাপাক বস্তু ভক্ষণ করে, তাই এর গোশত খাওয়া হারাম, তাদের কথাও ঠিক নয়।
- ইমামের জন্য যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করা জায়েয আছে। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময় সেই চুক্তির পরিসমাপ্তির ঘোষণা দিতে পারেন।
- চুক্তি করার সময় শর্ত করা জায়েয আছে। যেমন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খায়বারবাসীদের মাঝে এই মর্মে চুক্তি হয়েছিল যে, তারা কোন কিছু লুকাতে পারবেনা এবং গোপনও করতে পারবেনা। অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার পরও আটকিয়ে রাখা জায়েয আছে। এটি ন্যায়পরায়ন শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত, কোন ক্রমেই তা জুলুমের অন্তর্ভূক্ত নয়।
- সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও আলামত দ্বারা বিচার করা জায়েয আছে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বারের যুদ্ধের দিন যখন হুআই বিন আখতাবের সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন বলা হয়েছিল যুদ্ধে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে তা ব্যয় হয়ে গেছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন- মাল তো

ছিল অনেক, দিনও তেমন বেশী অতিক্রম করেনি। সুতরাং এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কিভাবে? এতে বুঝা যাচ্ছে সম্পদ লুকিয়ে রেখে মিথ্যা বলা হচ্ছে।

- যিম্মীরা যদি চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করে, তাহলে তাদের নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি থাকেনা। তখন তাদের জান-মাল হালাল হয়ে যাবে।
- গণীমতের মাল ভাগ হওয়ার পূর্বে কেউ যদি তা থেকে কিছু নিয়ে নেয়, তাহলে সে ঐ বস্তুর মালিক হয়ে যায়না। যদিও তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে কম হয়। যে ব্যক্তি গণীমতের মাল বন্টনের পূর্বে তা থেকে জুতার একটি ফিতা চুরি করেছিল, তাকে নাবী ﷺ বলেছিলেন- সে আগুনের একটি ফিতা নিয়ে নিল।
- নেকফাল (শুভ লক্ষণ) গ্রহণ করা অর্থাৎ কোন কিছু দেখে ভাল কিছু কামনা করা মুস্তাহাব। খায়বারবাসীদেরকে কোদাল নিয়ে বের হতে দেখে নাবী ﷺ বলেছিলেন- খায়বার ধ্বংস হবে।
- মুসলিমদের সাথে চুক্তি করার পর অমুসলিমরা যদি সেই চুক্তি ভঙ্গ করে এবং ভঙ্গকারী সম্প্রদায় যদি প্রভাবশালী হয়, তাহলে তাদের মহিলাদের ক্ষেত্রেও চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। আর চুক্তিবদ্ধ কোন গোষ্ঠির একজন যদি চুক্তিবদ্ধ দলের অন্যদের সমর্থন ছাড়াই চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে চুক্তি ভঙ্গকারীর নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ করার বিধান প্রযোজ্য হবেনা। এমনি নাবী ﷺ কে গালি দেয়ার কারণে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্ধী করা হয়নি।
- নিজের দাসীকে মুক্ত করে বিবাহ করা এবং মুক্ত করাকেই বিবাহের মোহরানা নির্ধারণ করা জায়েয আছে। এ ক্ষেত্রে দাসীর অনুমতি, সাক্ষী, অভিভাবক এবং বিবাহের শব্দ উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। নাবী ﷺ সাফীয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এভাবেই গ্রহণ করেছিলেন।
- নিজের হক আদায় করতে গিয়ে নিজের ব্যাপারে বা অন্যের ব্যাপারে মিথ্যা বলা জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, যাতে এ রূপ মিথ্যা বলায় অন্যের কোন ক্ষতি না হয় এবং সেই সাথে তার উদ্দেশ্যও হাসিল হয়। যেমন করেছিলেন হাজ্জাজ বিন ইলাত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।
- অমুসলিমদের হাদীয়া (উপঢৌকন) গ্রহণ করা জায়েয আছে।
- সফর অবস্থায় বিয়ে করা ও নব বধুর সাথে বাসর করাও জায়েয। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে একই বাহনে আরোহন করা এবং সফরসঙ্গীদের সাথে পথ অতিক্রম করাও জায়েয।
- কেউ যদি কোন মুসলিমকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীকেও কিসাস স্বরূপ হত্যা করতে হবে। কেননা খায়বারের সময় বিশর বিন বারা বিষমিশ্রিত খাবার খেয়ে মৃত্যু বরণ করার পর নাবী ﷺ খাদ্যে বিষ মিশ্রনকারী ইহুদী মহিলাকে হত্যা করেছিলেন।
- আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের যবেহ কৃত পশুর গোশত এবং তাদের খাদ্য মুসলিমদের জন্য হালাল।

খায়বার বিজয় করে নাবী ﷺ ওয়াদীয়ে কুরায় অবতরণ করলেন। সেখানে একদল ইহুদী বসবাস করত। মুসলিমগণ যখন সেখানে অবতরণ করলেন, তখন ইহুদীরা তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। এ সময় রসূল ﷺ-এর কৃতদাস মিদআম নিহত হল। সাহাবীগণ বললেন- তার জন্য সুখবর! তার জান্নাত আবশ্যক হয়ে গেছে। নাবী ﷺ তখন বললেন- কখনই নয়, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে,

তাঁর (আল্লাহর) শপথ! কখনই নয়। খায়বারের দিন গণীমতের মাল বন্টনের পূর্বেই সে যেই চাদরটি চুরি করেছিল, তা আগুনে পরিণত হয়ে তাকে জ্বালাচ্ছে।

অতঃপর রসূল ﷺ সাহাবীদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিলেন এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য কাতারবন্দী করলেন। ইহুদীদেরকে প্রথমে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এ সময় ইহুদীদের একজন মুসলিমদের মুকাবেলা করার জন্য বেরিয়ে আসল। সাহাবীদের মধ্যে হতে যুবাইর ইবনুল আওয়াম তার মুকাবেলা করার জন্য অগ্রসর হলেন। যুবাইর তাকে হত্যা করে ফেললেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি বের হলে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বের হয়ে তাকেও হত্যা করলেন। এভাবে এক এক করে তাদের ১১ জন যোদ্ধা নিহত হল। যখনই তাদের কেউ নিহত হত, নাবী ﷺ তখন অবশিষ্টদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। সলাতের সময় হলে তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করতেন। সলাত শেষে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। অতঃপর যুদ্ধের মাঠে তাদের মুকাবেলা করতেন। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। পরের দিন সকালে সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উঁচু হওয়ার পূর্বেই নাবী ﷺ ওয়াদীউল কুরাকে কবজা করে ফেললেন। আল্লাহ্ তা'আলা রসূল ﷺ কে প্রচুর গণীমত প্রদান করলেন। তিনি এখানে চার দিন অবস্থান করলেন এবং গণীমতের মাল বণ্টন করলেন। তবে খায়বারবাসীর মতই এখানকার যমীন চাষাবাদ করার জন্য ইহুদীদেরকে নিযুক্ত করলেন। তায়মা নামক স্থানে বসবাসকারী ইহুদীদের কাছে যখন খায়বার এবং ওয়াদীউল কুরার খবর পৌঁছল, তখন তারা ভীত হয়ে গেল। খায়বারবাসীর ন্যায় তারাও সন্ধি চুক্তি করতে চাইল। নাবী ﷺ তাদের আবেদন কবুল করলেন এবং যেই শর্তে খায়বারবাসীদেরকে তাদের যমীনে নিয়োগ করেছিলেন, তাদেরকেও সেই শর্তে থাকতে দিলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খেলাফতকালেও তারা সেখানে অবস্থান করেছিল। কেননা তায়মা এবং ওয়াদীউল কুরা সেই সময় শামের (সিরিয়ার) অঞ্চল হিসেবেই গণ্য হত।

অতঃপর নাবী ﷺ মদীনায় ফেরত আসলেন। রাস্তায় রাত্রি যাপন কালে বিলালকে বললেন- আমাদের জন্য রাতের (ফজরের সলাতের) প্রতি খেয়াল রাখ। বিলাল আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু সময় সলাত পড়লেন। রসূল ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সাহাবীগণও ঘুমিয়ে পড়লেন। ফজরের সামান্য পূর্বে বেলাল স্বীয় বাহনে হেলান দিলেন। ইতিমধ্যেই তার চোখে ঘুম চলে আসল। তিনি বাহনে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে নাবী ﷺ কিংবা বিলাল কিংবা সাহাবীদের কেউ জাগ্রত হতে পারেন নি। অতঃপর রসূল ﷺ ই সর্বপ্রথম জাগ্রত হলেন। তিনি পেরেশান হয়ে বিলালকে বললেন- হে বিলাল? তোমার কি হল? বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য আমার বাপ-মা কোরবান হোক! আপনাকে যিনি ঘুম পাড়িয়েছেন, তিনিই আমাকে ঘুমে বিভোর করেছেন।

অতঃপর তারা বাহনগুলো চালিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হলেন এবং সেই উপত্যকা পার হলেন। এইবার নাবী ﷺ বললেন- এই উপত্যকায় শয়তান রয়েছে। সুতরাং উক্ত স্থান অতিক্রম করার পর তিনি সাহাবীদেরকে বাহন থেকে নেমে ওযূ করে প্রথমে ফজরের সুন্নাত সলাত পড়তে বললেন। সুন্নাত পড়া শেষ হলে বিলালকে সলাতের ইকামত দিতে বললেন। নাবী ﷺ সকলকে নিয়ে সলাত পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে মানুষদের দিকে তাকিয়ে তিনি তাদেরকে পেরেশান অবস্থায় দেখে বললেন- হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের রূহসমূহ কবজ করে নিয়েছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই সময়ের

আগেও আমাদের কাছে তা ফেরত দিতে পারতেন। সুতরাং ঘুমের কারণে তোমাদের কারও যদি সলাত ছুটে যায় অথবা কেউ সলাত পড়তে ভুলে যায় অতঃপর এর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে যেন যথা সময়ে সলাত আদায়ের ন্যায়ই তা আদায় করে নেয়।

বলা হয় যে, হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে উপরোক্ত ঘটনা ঘটেছিল। কেউ বলেছেন- তাবুক থেকে ফেরার পথে এমন হয়েছিল।

এই ঘটনা থেকে নিম্নের মাসআলাগুলোও জানা যায়-

- সলাত না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লে অথবা সলাত পড়তে ভুলে গেলে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে কিংবা যখন স্মরণ হবে, তখনই সলাত পড়ে নিবে।
- সুন্নাতে রাতেবারও কাযা আছে।
- কাযা সলাতেরও আযান-ইকামত আছে।
- জামআতের সাথে কাযা সলাত পড়তে হবে।
- কারণ বশতঃ ছুটে যাওয়া সলাত বিলম্বে আদায় করা চলে। রসূল ﷺ ঐ স্থান থেকে একটু দূরে গিয়ে কাযা করার কারণ হল, তা ছিল শয়তানের স্থান।
- শয়তান বসবাসের জায়গায় সলাত আদায় করা যাবেনা। যেমন টয়লেট ও অন্যান্য স্থান।

মুসলিমগণ যখন মদীনায় ফেরত আসলেন তখন মুহাজিরগণ আনসারদের ঐ সমস্ত মাল ফেরত দিলেন, যেগুলো তারা তাদের মুহাজির ভাইদেরকে দিয়ে রেখেছিলেন। খায়বার থেকে ফেরত এসে নাবী ﷺ শাওয়াল মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন স্থানের দিকে ছোট ছোট অভিযান প্রেরণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফার অভিযান অন্যতম। সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা তার সৈনিকদেরকে আগুনে ঝাপিয়ে পড়ার আদেশ দিয়েছিলেন। লোকেরা তার কথা অমান্য করেছিল এবং আগুনে ঝাপ দেয়া থেকে বিরত রইল। মদীনায় ফেরত এসে যখন তারা রসূল ﷺ কে জানাল, তখন তিনি বললেন- তারা যদি আগুনে ঝাপ দিত, তাহলে তা থেকে কখনই বের হতে পারতনা। অতঃপর তিনি বললেন- শুধু ভাল কাজেই আমীরের আনুগত্য করতে হবে। সহীহ বুখারীতে এই ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوف

"আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসূল ﷺ একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন। জনৈক আনসারকে তার আমীর নিযুক্ত করলেন এবং সেনা দলের সবাইকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। কোন কারণে আমীর ক্রুদ্ধ হলেন। নাবী ﷺ কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার হুকুম

দেন নি? তারা বলল- হ্যাঁ। আমীর বললেন- তাহলে তোমরা আমার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ কর। তারা কাঠ সংগ্রহ করল। তিনি বললেন- এবার কাঠে আগুন লাগাও। তারা কাঠে আগুন লাগালো। তখন তিনি বললেন- তোমরা আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়। লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প করল। কিন্তু তারা পরস্পরকে বাধা দিতে লাগল এবং বলতে লাগলোঃ আমরা তো জাহান্নামের আগুন থেকে নাবী ﷺ এর নিকট আশ্রয় নিয়েছিলাম। এভাবে তারা ইতস্তত করতে করতে একসময় আগুন নিভে গেল। সেই সাথে আমীরের রসূও থেমে গেল। নাবী ﷺ এর কাছে যখন এ খবর পৌঁছল,
তখন তিনি বললেন- তারা যদি ঐ আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা থেকে বের হতে পারতনা। আনুগত্য কেবলমাত্র সৎকাজের ক্ষেত্রেই হতে হবে"।[২৭০]

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, তারা যদি আগুনে ঝাপ দিত, তাহলে নেতার আদেশকে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসূলের আদেশ মনে করেই তো প্রবেশ করত। যদিও তাদের ইজতেহাদ ভুল ছিল। তাহলে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হত কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, তাদের যেহেতু জানা ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তাই তারা যদি বিনা ইজতেহাদে আমীরের হুকুমের সাথে সাথেই আগুনে ঝাঁপ দিতেন, তাহলে আত্মহত্যার অপরাধে তারা জাহান্নামী হতেন। সুতরাং সৃষ্টির আনুগত্য করতে গিয়ে স্রষ্টার নাফরমানি করা জায়েয নেই এবং আমীরের আনুগত্য করে আগুনে ঝাঁপ দেয়া আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূলের নাফরমানির শামিল।

অতএব, আনুগত্যই কখনও নাফরমানিতে পরিণত হয় এবং শাস্তি আবশ্যক করে দেয়। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য মনে করে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে কেউ যদি নিজেকে কষ্ট দিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়, তাহলে যে ব্যক্তি শাসকের হুকুমে কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয় তার অবস্থা কেমন হবে? উপরোক্ত সাহাবীগণ আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূলের আদেশ মনে করে আগুনে ঝাঁপ দিলে যদি তা থেকে বের হতে না পারেন, তাহলে যারা দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের আশায় কিংবা শাসকের বা উপরস্ত কর্মকর্তার ভয়ে কেউ আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয় তার অবস্থা কেমন হবে? আর যে সমস্ত সুফী শয়তানের আনুগত্য করে আগুনে ঝাঁপ দেয় এবং মূর্খরা মনে করে এটি হচ্ছে ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এর আগুনে ঝাঁপ দেয়ার মতই, তাদের জন্য আগুন শান্তিময় এবং ঠান্ডা হয়ে যাবে, যেমন হয়েছিল ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এর জন্য, তাদের অবস্থা কেমন হবে? সুফীদের এই কাজ মূর্খতা ও শয়তানের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৭১]

---

২৭০. বুখারী, তাও. হা/৪৩৪০

২৭১. বন্ধুদের সাথে কথা বলে এবং কতিপয় বই পড়ে জানা গেছে যে, কিছু ভন্ড ও ধোঁকাবাজ আছে, যারা শরীরে বিশেষ এক প্রকার পদার্থ ব্যবহার করে এবং বিশেষ এক প্রকার পোশাক পরিধান করে আগুনে ঝাপ দেয়। এই পোশাক ও পদার্থের কারণে

মহান বিজয়ের (মক্কা বিজয়ের) ঘটনা

ইসলামের ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের ঘটনা এমন একটি আযীমুশ শান ঘটনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বীন এবং তাঁর রসূলকে শক্তিশালী করেছেন। রসূল ﷺ এর সৈনিক এবং হারামে মাক্কীর সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। এই বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ঘর ও শহরকে এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর হিদায়াতের কেন্দ্রস্থলকে কাফের-মুশরিকদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। এই বিজয়ে আসমানের অধিবাসীগণ খুশী হয়েছিল এবং এই বিজয়ের ফলেই দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করল।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নাবী ﷺ ১০ হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। বের হওয়ার সময় আবু রুহম কুলছুম বিন হুসাইনকে মদীনার খলীফা নির্বাচন করলেন। মক্কা আক্রমণ ও জয় করার কারণ হচ্ছে, কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং খোযাআ গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে তাদেরকে অকাতরে হত্যা করেছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মোতাবেক খোযাআ গোত্র রসূল ﷺ এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এটি ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির সুস্পষ্ট লংঘন।

ইসলামী বাহিনী যখন 'মার্‌রুয যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছল তখন রাতের বেলা নাবী ﷺ সাহাবীদেরকে আগুন জ্বালানোর আদেশ দিলেন। সাহাবী প্রজ্জ্বলিত আগুনের আলোতে আশে-পাশের সমস্ত অঞ্চল আলোকিত হয়ে গেল। তখনো মক্কাবাসীদের কাছে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের কোন খবর ছিলনা। তবে তাদের অন্তরে আশঙ্কা ছিল যে, যে কোন সময় মুসলিম বাহিনী মক্কায় আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তারা চলে আসবে- এটি তাদের ধারণায় ছিলনা। অতঃপর নাবী ﷺ মুজাহিদ বাহিনীকে সাথে নিয়ে বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে তিনি কাবা ঘরের দিকে গেলেন। তাঁর চার পাশে আনসার ও মুহাজিরগণ ঘিরে ছিল। কাবায় গিয়ে তিনি আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করলেন। রসূল ﷺ-এর হাতে একটি ধনুক ছিল। সে সময় কাবার অভ্যন্তরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। ধনুকের মাধ্যমে এক এক করে তিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেললেন। এ সময় তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করছিলেন-

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

"বলঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল"। [২৭২] অতঃপর নাবী ﷺ কাবার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সলাত পড়লেন। সলাত পড়ে বাইরে আসলেন। কুরাইশরা তখন সারিবদ্ধভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে অবস্থান করছিল। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন- হে কুরাইশ সম্প্রদায়? তোমাদের সাথে আজ আমি কেমন আচরণ করব বলে মনে কর? সকলেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল- আমরা আপনার কাছ থেকে খুব ভাল আচরণ কামনা করছি।

তাদের শরীরে আগুন জ্বলে না। তাদের এ কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে অজ্ঞ লোকদের কাছে নিজেদেরকে আল্লাহর অলী হিসাবে প্রকাশ করা এবং এর বিনিময়ে মানুষের টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেওয়া। মূলতঃ এরা আল্লাহর অলী নয়; শয়তানের অলী।

২৭২. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৮

ইউসুফ (আলায়হিস সালাম) তাঁর ভাইদেরকে যা বলেছিলেন আজ আমিও তোমাদের সাথে তাই বলছি। আজ তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত-স্বাধীন।

মক্কা বিজয়ের ঘটনা থেকে যে সমস্ত মাসআলা জানা যায়

- চুক্তিবদ্ধ কাফেররা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে তাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করা জায়েয আছে। হামলার খবর তাদেরকে জানানো জরুরী নয়। তবে তারা যদি অঙ্গিকার না করে তাহলে তাদের উপর আক্রমণ করার পূর্বে জানিয়ে দিতে হবে যে, তারা অঙ্গিকার ও চুক্তি বলবৎ রাখবে? না এ থেকে অব্যাহতি দিবে?
- চুক্তিবদ্ধদের কোন লোক চুক্তি ভঙ্গ করলে এবং বাকীরা চুক্তি ভঙ্গ না করলেও যদি তারা এতে সম্মতি দেয় তাহলে সকলেই চুক্তি ভঙ্গ করেছে বলে গণ্য হবে। যেভাবে সকলেই একসাথে সন্তুষ্ট হয়ে চুক্তি করেছিল।
- প্রয়োজনে শত্রুদের সাথে দশ বছর মেয়াদী শান্তিচুক্তি করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল এর চেয়ে অধিক মেয়াদের চুক্তি করা যাবে কি না? সঠিক কথা হল যদি মুসলমানদের কল্যাণে হয় এবং তাতে বৃহৎ স্বার্থ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে দশ বছরের চেয়েও অধিক মেয়াদী চুক্তি করা যেতে পারে।
- শত্রুদের সামনে মুসলমানদের সংখ্যা, শক্তি ও শান-শওকত প্রকাশ করা মুস্তাহাব। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় প্রবেশের পূর্বে রাতের বেলায় এক সাথে দশ হাজার আগুন জ্বালানোর মধ্যে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- মুসলমানদের ইমামের কাছে যদি চুক্তি নবায়ন বা না জায়েয কোন জিনিষের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়, এমতাবস্থায় ইমাম যদি চুপ থাকেন, তাহলে তার চুপ থাকা রেজামন্দির প্রমাণ বহন করেনা। কেননা মক্কা বিজয়ের সময় আবু সুফিয়ান যখন চুক্তি নবায়ন করার আবেদন করল, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ ছিলেন। তাঁর এই চুপ থাকা চুক্তি নবায়নের জন্য যথেষ্ট ছিলনা বা চুপ থাকা চুক্তির নবায়ন বলে ধরে নেওয়া হয়নি।
- কাফেরদের দূতকে হত্যা করা যাবেনা। কেননা আবু সুফিয়ান চুক্তি ভঙ্গকারী হওয়া সত্ত্বেও সে যখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসল, তখন তাকে হত্যা করা হয়নি। কেননা সে তার গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল।
- গোয়েন্দা মুসলিম হলেও তাঁকে হত্যা করা জায়েয আছে। হাতেব বিন আবু বালতাআকে হত্যা না করার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন।
- বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাকে উলঙ্গ করার ধমক দেয়া জায়েয আছে। যেমন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাতেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর গোয়েন্দা মহিলাকে বের না করার কারণে তাকে উলঙ্গ করে তল্লাশি করার হুমকি দিয়েছিলেন।
- কেউ যদি কোন মুসলমানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং দ্বীনের জন্য রসূান্বিত হয়ে কাফের বা মুনাফেক বলে দেয়, তাহলে সে গুনাহগার হবেনা। তবে শর্ত হল তা যেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কিংবা নফসের খাহেশাত পূর্ণ করার জন্য না হয়।

➢ হাতেব বিন আবু বালতাআর ঘটনা থেকে আরও জানা গেল যে, কখনও বড় নেকীর দ্বারা বড় গুনাহ্ মোচন হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾

"আর দিনের দুই প্রান্তেই সলাত ঠিক রাখবে এবং রাতেরও প্রান্তভাগে; পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক"।[২৭৩] কখনও এর বিপরীতও হয়। অর্থাৎ পাপ কাজের কারণে অনেক সময় নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায়না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না"।[২৭৪]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাতেব বিন আবু বালতাআ এবং যুল খুওয়াইসারার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হাতেব ইবনে আবু বালতাআর ঘটনা বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন বিশেষ উদ্দেশ্যে আক্রমণের বিষয়টি সাহাবীদেরকে গোপন রাখতে বলেন। কিন্তু তাঁর সাহাবী হাতিব বিন আবু বালতাআ শুধু তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গোপন সামরিক তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মক্কাবাসীদেরকে রসূলের উদ্দেশ্য জানিয়ে তিনি একটি চিঠি লিখে একজন মহিলার মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অহীর মাধ্যমে হাতেবের এই কর্মের কথা জানতে পেরে সাথে সাথে কয়েকজন সাহাবীকে চিঠি উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। তারা রাওযায়ে খাক নামক বাগানে মহিলাকে পাকড়াও করে চিঠি উদ্ধার করেন। এরপর হাতেবকে ডেকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিঠির বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন। হাতেব বলেন- হে আল্লাহর রসূল! আমি কেবল আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার জন্যই এমনটি করেছি। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন- জ্ঞানীদের কাছে এই ঘটনার গুরুত্ব এবং হাতেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর প্রয়োজনের বিষয়টি মোটেই অস্পষ্ট নয়। জ্ঞানীগণ এই ঘটনা দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন এবং এর মাধ্যমে সৃষ্টি জগতে আল্লাহর হিকমতের বিরাট এক অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

---

২৭৩. সূরা হুদ-১১:১১৪
২৭৪. সূরা বাকারা-২: ২৬৪

- মক্কা বিজয়ের ঘটনা থেকে আরও জানা গেল যে, ইহরাম ছাড়াই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করলে অবশ্যই ইহরাম পরিধান করে প্রবেশ করতে হবে। এ ছাড়া আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূল ﷺ যা ওয়াজিব করেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছুই আবশ্যক নয়।
- মক্কা বিজয়ের ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করে যে, মক্কা মুকার্‌রামা যুদ্ধের মাধ্যমে এবং বল প্রয়োগ করে জয় করা হয়েছে। যারা রসূল ﷺ কে গালি দিয়েছিল, তিনি তাদেরকে সে দিন হত্যা করেছেন।
- মক্কা বিজয়ের দিন রসূল ﷺ বলেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে সম্মান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষেরা এটিকে সম্মান প্রদান করেনি। রসূল ﷺ আরও বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর জবানে মক্কার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে সম্মান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। শরীয়তেও এর সম্মান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবী ও বন্ধু ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর পবিত্র জবানের মাধ্যমে এর সম্মান প্রকাশ করেছেন। নাবী ﷺ বলেন- উহাতে রক্তপাত করা যাবেনা। এখানে সেই রক্তপাত উদ্দেশ্য, যা হারামের সাথে সম্পৃক্ত এবং হারামের বাইরে তা করা বৈধ। যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে তা হালাল হয়ে থাকে। যেমন হারামের সীমানার মধ্যে এমন গাছ কাটা হারাম, যা হারামের বাইরে কর্তন করা বৈধ। নাবী ﷺ বলেন- হারামের কাঁটাযুক্ত গাছও কর্তন করা যাবেনা। সুতরাং হারামের গাছ কর্তন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কথাটি খুবই সুস্পষ্ট। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তা ভাঙ্গাও যাবেনা। এ সব বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, কাঁটাযুক্ত এবং আওসাজ গাছ কর্তন করা হারাম। তবে আলেমগণ হারামের শুকনো গাছ-পালা কাটার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা তা মৃতের মতই। অন্য বর্ণনায় আছে, হারাম এলাকার গাছের পাতাও ছিড়া যাবেনা।

নাবী ﷺ এর বাণী, হারাম এলাকার ঘাস কাটা যাবেনা। এই কথার মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে, এখানে ঐ সকল গাছ ও ঘাস উদ্দেশ্য যা নিজেই উৎপন্ন হয়। মানুষেরা যা রোপন করে, তা কাটতে কোন বাধা নেই। আর ঘাস বলতে তাজা ঘাস উদ্দেশ্য। তবে 'ইযখির' ঘাস কাটার অনুমতি আছে। এ ছাড়া অন্য কোন ঘাস কাটা জায়েয নেই। ছত্রাক কিংবা যে সমস্ত উদ্ভিদ মাটির নীচে থাকে, তা কর্তন করা নিষিদ্ধ নয়। কারণ তা ফলের মতই।

নাবী ﷺ বলেন, হারাম অঞ্চলের শিকারকে তাড়ানো যাবেনা। এ কথার মধ্যে সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, শিকার হত্যা করা বা পাকড়াও করার কোন মাধ্যমই অবলম্বন করা যাবেনা। এমন কি শিকারকে তার স্থান থেকে বিতাড়িতও করা যাবেনা। কেননা এটি একটি সম্মানিত প্রাণী। সে একটি সম্মানিত স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং সেই উক্ত স্থানটির অধিক হকদার। মোটকথা, হারাম অঞ্চলের কোন প্রাণী যদি কোন স্থানে আশ্রয় নেয়, তাহলে তাকে উত্যক্ত করে ঐ স্থান থেকে বিতাড়িত করা জায়েয নয়।

হারাম অঞ্চলে পড়ে থাকা জিনিষ কুড়ানো জায়েয নয়

নাবী ﷺ আরও বলেন- হারাম অঞ্চলে পড়ে থাকা জিনিষও কুড়ানো যাবেনা। তবে ঘোষণা করে তার প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করার জন্য কুড়ানো জায়েয আছে। এই হাদীছের মাধ্যমে জানা গেল

যে, কোন অবস্থাতেই হারাম অঞ্চলের জিনিষের মালিক হওয়া যাবে না এবং শুধু মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যই তা উঠানো জায়েয আছে। এটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি মালিক হওয়ার নিয়তে হারামে পড়ে থাকা জিনিষ উঠানো জায়েয নেই। মালিকের জন্য হেফাজত করে রাখার জন্য তা উঠানো জায়েয আছে।

সুতরাং কেউ যদি উঠায়, তাহলে প্রকৃত মালিক আসার আগ পর্যন্ত প্রচার করতে হবে। এটিই সঠিক মত। হাদীসটি এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

মক্কা বিজয়ের ঘটনায় এও উল্লেখ আছে যে, কাবা ঘর থেকে মূর্তি ও দেব-দেবীর ছবিগুলো বের করার পূর্বে নাবী ﷺ তাতে প্রবেশ করেন নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মন্দির এবং যেখানে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে সেখানে সলাত আদায় করা জায়েয নেই। মূর্তির স্থানে সলাত আদায় করা পেশাব-পায়খানার স্থানে সলাত পড়ার চেয়েও অধিক দোষণীয়। কেননা পেশাব-পায়খানার স্থান হচ্ছে শয়তানের জায়গা। আর যেখানে মূর্তি রয়েছে, সেটি হচ্ছে শির্কের স্থান। মানব জাতির অধিকাংশ শিরক ছবি ও কবরকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের ঘটনাতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন একজন মহিলা যদি একজন বা দুইজন পুরুষকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতি সম্মান করতে হবে। নাবী ﷺ সে দিন উম্মে হানির নিরাপত্তা দানকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন তার দুই দেবরকে নিরাপত্তা দিলে রসূল ﷺ তা রক্ষা করেছেন। মুরতাদের কাছে তাওবা পেশ না করেই তাকে হত্যা করা জায়েয আছে। বিশেষ করে যেই মুরতাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য হয়। নাবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মুরতাদ আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সার্হকে হত্যা করেছিলেন। তাকে তাওবা করার আহবান জানাননি।

হুনাইনের যুদ্ধ

ইবনে ইসহাক বলেন- হাওয়াযেন গোত্র যখন মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের সংবাদ পেল তখন মালেক বিন আওয়ফ হাওয়াযেন গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রিত করল। তার সাথে ছাকীফ, জুশাম এবং অন্যান্য গোত্রও এসে যোগ দিল। তাদের মধ্যে দুরাইদ বিন সিমতা নামক একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। এই বৃদ্ধের মতই কার্যকর হত।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এখানে হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি এই যুদ্ধের কতিপয় হিকমতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, যখন মক্কা বিজয় হবে তখন লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে এবং সমস্ত আরব গোত্র রসূল ﷺ এর আনুগত্য করবে।

যখন মক্কা বিজয় পূর্ণ হল তখন হিকমতে ইলাহীর দাবী এই ছিল যে হাওয়াযেন এবং তাদের সহযোগী গোত্রের লোকেরা ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকবে। তাই তারা বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুত করে রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছেন যে, তাঁর হুকুমই বিজয়ী হবে ও তাঁর রসূল ﷺ এর সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের থেকে অর্জিত মালে গণীমত মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বারগাহে ইলাহীতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম পরিণত হবে।

এই বার আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নাবী এবং তাঁর বান্দাদেরকে এমন এক বিরাট শক্তির মাধ্যমে বিজয় দান করলেন, যা মুসলিমদের নিকট ইতিপূর্বে ছিলনা। উদ্দেশ্য হল, যাতে পরবর্তীতে অন্যান্য আরব শক্তি মুসলিমদের মুকাবেলা করতে ভয় পায়।

আল্লাহ্‌ তা'আলার হিকমতের দাবী এই ছিল যে, মুসলমানদের সংখ্যা প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধের প্রথম দিকে তাদেরকে পরাজয়ের স্বাদ ভোগ করালেন।

এর মাধ্যমে তিনি ঐ সমস্ত মুসলিমদের মাথাকে নত করতে চেয়েছেন, যারা মক্কা বিজয়ের দিন অহংকারের সাথে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ এর ন্যায় মস্তক অবনত করে হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাথে প্রবেশ করেনি এবং যারা বলেছিল- সংখ্যা কম হওয়ার কারণে আজ আমরা পরাজিত হবনা। এটি বুঝানোও উদ্দেশ্য ছিল যে, সাহায্য কেবল আল্লাহর পক্ষ হতেই আগমণ করে থাকে। রসূল ﷺ সেদিন স্বীয় মাথাকে এত নীচু করেছিলেন যে, তাঁর থুতনী বাহনের সাথে প্রায় মিশে যাচ্ছিল।

সুতরাং যখন মুসলমানদের মন ভেঙ্গে গেল, তখন তাদের মনে শান্তনা দেয়ার জন্য ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় রসূল ﷺ এবং মুমিনদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার হিকমতের আরও দাবী এই যে, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের পোশাক কেবল বিনয়ীদের উপরই অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন-

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾

"পৃথিবীতে যাদেরকে দুর্বল বিবেচনা করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে যমীনের উত্তরাধিকারী করার এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশঙ্কা করত"।[২৭৫]

বদরের যুদ্ধের মাধ্যমে আরবদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং হুনাইনের যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এই উভয় যুদ্ধেই ফিরিস্তাগণ মুসলমানদের পক্ষে স্বশরীরে যুদ্ধ করেছেন। উভয়টিতেই নাবী ﷺ শত্রুদেরকে লক্ষ্য করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। এই উভয় যুদ্ধেই আরবদের হিংসার আগুন নির্বাপিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাদের অন্তরে ভয় ঢুকে পড়েছিল এবং তাদের তেজ কমে গিয়েছিল। আর হুনাইন যুদ্ধ তাদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছে।

২৭৫.সূরা কাসাস-২৮:৫-৬

হুনাইন যুদ্ধ থেকে নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো গ্রহণ করা যায়

- হুনাইন যুদ্ধের মাধ্যমে জানা যায় যে, শত্রুদের নিকট থেকে যোদ্ধাস্ত্র ধার নেওয়া যায়। কেননা নাবী ﷺ হুনাইনের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার নিকট হতে অস্ত্র ধার নিয়েছিলেন। সাফওয়ান তখন মুশরিক ছিল।
- অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থী নয়। বরং তা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করার অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা রসূল ﷺ কে হেফাজত করার দায়িত্ব নেওয়া সত্ত্বেও আসবাব তথা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।
- আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। এই ওয়াদা বিভিন্ন প্রকার জিহাদের প্রতিবন্ধক নয়। অর্থাৎ এই ওয়াদার অর্থ এই নয় যে, আমরা আল্লাহর ওয়াদার উপর ভরসা করে বসে থাকবো এবং যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকব। বরং সঠিক কথা হচ্ছে আমরা যুদ্ধের ময়দানে নামব এবং আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়নের অপেক্ষা করব।
- নাবী ﷺ সাফওয়ানের নিকট থেকে যুদ্ধের হাতিয়ার ধার নেওয়ার শর্ত করেছিলেন যে, তিনি এর দায়-দায়িত্ব বহন করবেন। এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন- নাবী ﷺ এর মাধ্যমে ধার নেওয়া জিনিষের ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী হওয়ার বিধান করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন- তিনি নিজেই ধার নেওয়া জিনিষটি হুবহু ফেরত দেয়ার যিম্মাদার হওয়ার খবর দিয়েছেন। এ কথাটি এরূপ ছিল যে, তোমার হাতিয়ার নষ্ট হবেনা। যেভাবে নিচ্ছি সেভাবেই ফেরত দিব।
- শত্রুদের ঘোড়া এবং অন্যান্য বাহনকেও আহত করা জায়েয। বিশেষ করে যখন বাহন হত্যা করা শত্রুকে হত্যা করার জন্য সহায়ক হবে। এটি জীব হত্যা বা প্রাণীকে হত্যা করার নিষিদ্ধতার আওতায় পড়বেনা।
- এখান থেকে আরও জানা যায় যে, নাবী ﷺ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে রসূল ﷺ কে হত্যা করতে চেয়েছিল। শুধু ক্ষমাতেই শেষ নয়; তিনি তার বক্ষে হাত রেখে দু'আ করেছেন। এতে সে ইসলাম কবুল করে নিল এবং রসূল ﷺ এর আন্তরিক বন্ধু হয়ে গেল।
- যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত মালে গণীমত বণ্টন করায় তাড়াহুড়া করা যাবেনা। বরং অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তারা এর মধ্যেই ইসলাম কবুল করে কি না? যাতে করে ইসলাম কবুল করার পর তাদের মাল তাদেরকেই ফেরত দেয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, গণীমতের মাল ভাগ হওয়ার পূর্বে তাতে কারও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়না। এ জন্যই কোন মুজাহিদ যদি গণীমতের মাল ভাগ হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, তাহলে তার ওয়ারিসগণ সেখান থেকে কোন অংশ পাবেনা। বরং উক্ত মুজাহিদদের অংশ অন্যান্য মুজাহিদ ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মত। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- নাবী ﷺ কুরাইশদের মন জয় করার জন্য সে দিন তাদেরকে যা দিয়েছিলেন, তা ছিল গণীমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ (১/৫) বের করার পর বাকী চার অংশ থেকে। এটি ছিল নাবী ﷺ এর পক্ষ থেকে তাদের জন্য অনুদান স্বরূপ। খুমুস ১/৫ বের করার পর তিনভাগের এক ভাগ (১/৩) দেয়া কিংবা চারভাগের এক ভাগ (১/৪) দেয়ার চেয়ে এটিই তথা মোট চার ভাগ থেকে অনুদান বের করাই উত্তম।

- গণীমতের মাল আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রসূলের জন্য। রসূল ﷺ তা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ভাগ করবেন। তিনি যদি সম্পূর্ণ গণীমতকেই ইসলামের স্বার্থে বিশেষ এক গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করে দেন, তাতেও হিকমত ও ইনসাফের খেলাফ হবেনা। যুল খুওয়াইসারা তামীমীর এ বিষয়টি বুঝে আসেনি বলেই সে বলেছিল- হে মুহাম্মাদ ইনসাফ কর, কারণ তুমি এই বন্টনের মধ্যে ইনসাফের খেলাফ করেছ।
- ইমাম বা শাসক হচ্ছেন মুসলিমদের নায়েব। মুসলিম নাগরিকদের স্বার্থে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। ইসলামকে রক্ষার জন্য যদি তিনি জনগণের কাছে মাল দাবী করেন, তাহলে তা জায়েয আছে। এমনকি মুসলমানদেরকে কাফেরদের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য শাসক যদি ইসলামের প্রধান প্রধান শত্রুকে নিজের কাছে ডেকে আনেন, তাহলে তাও জায়েয আছে। কেননা ইসলামী শরীয়তের অন্যতম মুলনীতি হচ্ছে বড় ধরণের বিপর্যয় ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ছোট ক্ষতি বরদাশত করা জায়েয আছে এবং বৃহৎ স্বার্থ হাসিল করার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করা জরুরী। সঠিক কথা হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ অর্জনের মূল বুনিয়াদই হচ্ছে উক্ত দু'টি বিষয়।
- হুনাইন যুদ্ধের মাধ্যমে এও জানা গেল যে, দাস বিক্রি করা, এমন কি পশুর বিনিময়ে পশু বাকীতে এবং কম-বেশী দেয়ার শর্তে বিক্রি করা জায়েয আছে। ক্রেতা-বিক্রেতা মিলে যদি অনির্ধারিত মেয়াদে (বাকীতে) ক্রয়-বিক্রয় করে এবং উভয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তাও জায়েয আছে। এটিই সঠিক মত, কারণ এখানে কোন নিষিদ্ধতা ও অনিশ্চয়তা বা ঝুকি নেই।
- হুনাইন যুদ্ধে নাবী ﷺ বলেছেন- কেউ যদি কোন কাফেরকে হত্যা করতে পারে, তাহলে সেই কাফেরের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাল তারই হবে। তবে শর্ত হল এ ব্যাপারে প্রমাণ থাকতে হবে। ফিকাহবিদগণ এই মাসআলায় এখতেলাফ করেছেন। এটি শরীয়তের সাধারণ একটি মাসআলা? অর্থাৎ যে কোন মুজাহিদ যে কোন জিহাদে কোন কাফেরকে হত্যা করতে পারলে সাল্ব তথা নিহত কাফেরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মাল কি হত্যাকারী মুজাহিদেরই প্রাপ্য? নাকি ইমামের পক্ষ হতে এরূপ শর্ত করার পর হকদার হবে? উপরের দু'টি কথাই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে, হত্যাকারীই নিহত কাফেরের (সাল্ব) আসবাব পত্রের হকদার হবে। ইমাম শর্ত করুক বা না করুক। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে শর্ত না করলে সে (হত্যাকারী) নিহত কাফেরের সামানের (মালপত্রের) হকদার হবেনা।
- এখানে মতভেদের কারণ হল, নাবী ﷺ কি রসূল হিসাবে এমনটি বলেছেন যে, এটি একটি সাধারণ শরঈ হুকুমে পরিণত হয়েছে এবং সকল যুগেই এটি কার্যকর হবে? যেমন তিনি বলেছেন-

«مَنْ زَرَعَ فِيْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ»

- "যে ব্যক্তি অন্য লোকদের জমিতে তাদের অনুমতি ছাড়াই বীজ বপন করবে, সে উৎপন্ন ফল-ফসলের কোন অংশ পাবেনা"। তবে সে যা খরচ করেছে, তার প্রাপ্য। না কি তিনি এ ব্যাপারে কারও জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছেন? যেমন তিনি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন- তুমি এবং তোমার স্বামীর সম্পদ হতে ঠিক সেই পরিমাণ নিতে পারবে যা তোমার সন্তানদের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট হবে। নাবী ﷺ কেবল তখনই তাকে এ কথা বলেছিলেন, যখন সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে কৃপণতার অভিযোগ করেছিল। না কি তিনি মুসলিমদের

ইমাম হিসাবে এটি বলেছেন যে, সেই সময় মুসলমানদের বৃহৎ স্বার্থে এমনটি বলে জিহাদের জন্য উৎসাহ যোগানোর প্রয়োজন ছিল? যাতে করে মুসলিমগণ পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুপাতে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এর প্রতি খেয়াল রাখেন।

- এখান থেকেই আলেমদের মাঝে অনেক বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। যেমন তিনি বলেছিলেন- যে ব্যক্তি কোন পরিত্যক্ত ও মৃত যমীনকে আবাদ ও চাষোপযোগী করবে সেই ঐ যমীনের মালিক হবে।
- হুনাইন যুদ্ধ হতে এও জানা গেল যে, মামলা-মুকাদ্দমা ও বিচার-ফয়সালায় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। বিচার ফয়সালার সময় সাক্ষীর এ কথা বলা জরুরী নয় যে, أشهد 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি'। (অন্য শব্দ দিয়েও উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে)।
- এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিহত কাফেরের কাছ থেকে গৃহিত সম্পদে খুমুস লাগানো হবেনা। অর্থাৎ তাও পাঁচ ভাগে বিভক্ত করার সাধারণ বিধানের আওতায় আসবেনা। কারণ এটি মূল গণীমতের অন্তর্ভূক্ত। গণীমতের মালে যাদের কোন অংশ নেই, যেমন নারী ও শিশু, তারাও এই সম্পদের হকদার হতে পারে। হাদীস থেকে এও জানা গেল যে, একজন মুজাহিদ যত কাফেরকে হত্যা করবে, তাদের সকলের সম্পদেরই মালিক হবে। যদি নিহতের সংখ্যা অনেক হয় এবং সম্পদও হয় প্রচুর। মু'জেযা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন লোকেরা পলায়ন করার পরও ময়দানে তাঁর একাই টিকে থাকা,
- এই যুদ্ধে নাবী ﷺ এর অনেকগুলো শত্রুরা দূরে থাকা সত্ত্বেও তাঁর পবিত্র হাতের নিক্ষিপ্ত মাটি শত্রুদের চোখে গিয়ে পড়া, ফিরিস্তাদের অবতরণ করা ও মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইত্যাদি। শত্রুরা এবং কতিপয় সাহাবী এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিল।

তায়েফের যুদ্ধ

হুনাইনের যুদ্ধে তায়েফের ছাকীফ গোত্র পরাজিত হয়ে তাদের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিল। সেখানে থেকে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। রসূল ﷺ ও তাদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাদের দুর্গের নিকটবর্তী হয়ে তিনি একটি স্থানে অবস্থান করতে লাগলেন। এ সময় ছাকীফ গোত্রের তীরন্দাজ বাহিনী মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে প্রচন্ডভাবে তীর নিক্ষেপ শুরু করল। পঙ্গপালের পাখার মত তীরগুলো উড়ে এসে মুসলমানদেরকে আঘাত করতে লাগল। এতে বহু মুসলিম আহত হন। তাদের মধ্যে হতে ১২ জন মৃত্যু বরণ করেন।

অতঃপর নাবী ﷺ সেখান থেকে সরে এসে তায়েফের ঐ স্থানে চলে আসলেন, যেখানে বর্তমানে 'মাসজিদুত্ তায়েফ' তথা তায়েফের মাসজিদ অবস্থিত। নাবী ﷺ তাদেরকে ১৮ দিন মতান্তরে ২৩ দিন অবরোধ করে রাখলেন। এ সময় মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে মিনজানিক (প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ) দিয়ে আক্রমণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরণের অস্ত্রের এটিই ছিল প্রথম ব্যবহার। ঐ দিকে নাবী ﷺ মুসলমানদেরকে সেখানকার আঙ্গুরের বাগানগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানগণ রসূল ﷺ এর আদেশ তামিল করতে গিয়ে দ্রুত কাফেরদের বাগানগুলো কাটতে লাগলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বলেন- তায়েফবাসীরা রসূল ﷺ এর কাছে আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে সেগুলোকে রেখে দিতে বললেন।

নাবী ﷺ তখন বললেন- তাহলে আমি তা আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার দোহাই দেয়ার কারণে ছেড়ে দিলাম। অতঃপর রসূল ﷺ এর পক্ষ হতে একজন ঘোষণাকারী এই বলে ঘোষণা করল যে, ছাকীফ গোত্রের কোন দাস যদি দুর্গ থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে চলে আসে, তাহলে সে স্বাধীন। এই ঘোষণা শুনে দশাধিক ক্রীতদাস তাদের থেকে চলে আসল। তাদের মধ্যে ছিলেন আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। রসূল ﷺ তাদের প্রত্যেককে এক একজন মুসলিমের হাওলা করে দিলেন। তারা যেন তাদের প্রতি খেয়াল রাখেন। তায়েফবাসীর জন্য এটি খুব পীড়াদায়ক ছিল। এরপরও রসূল ﷺ কে তায়েফ বিজয়ের অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই তিনি মুসলিম বাহিনীকে ফেরত চলার আদেশ দিলেন। কিন্তু মুসলিমদের জন্য এটি মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে গেল। আমরা ফেরত যাব? অথচ এখনও তায়েফ বিজয় হয়নি। নাবী ﷺ তখন বললেন- তাহলে যাও। আগামিকাল লড়াই শুরু কর। সকাল বেলা লড়াই শুরু হল। এতে কতিপয় মুসলিম আহত হলেন। এবার তিনি বললেন- ইনশা-আল্লাহ্! আমরা আগামীকাল যাত্রা করব। এতে সাহাবীগণ খুব আনন্দিত হলেন এবং যাত্রা শুরু করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। রসূল ﷺ তখন হাসতে লাগলেন। সফর শুরু হলে তিনি বললেন- তোমরা এই দু'আ পাঠ কর-

«آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

'আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী এবং তাঁর প্রশংসাকারী'।[২৭৬] সাহাবীগণ তখন বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনি ছাকীফ গোত্রের উপর বদ দু'আ করুন। নাবী ﷺ বললেন- হে আল্লাহ্! তুমি ছাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান কর এবং তাদেরকে অনুগত করে আমার কাছে নিয়ে এসো।

অতঃপর তিনি জিইর্‌রা নামক স্থানের দিকে বের হলেন। এখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলেন। উমরাহ থেকে ফারেগ হয়ে তিনি মদীনায় ফেরত গেলেন।

রমযান মাসে যখন তিনি তাবুক থেকে ফেরত আসলেন, তখন রমযান মাসেই ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি নাবী ﷺ এর কাছে আসল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, তিনি যখন তায়েফ থেকে ফেরত আসলেন, তখন উরওয়া বিন মাসউদ তাঁর পিছনে রওয়ানা দিলেন। নাবী ﷺ মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই উরওয়া এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম কুবল করল। ইসলাম কবুল করার পর সে স্বীয় গোত্রের নিকট ফেরত যাওয়ার অনুমতি চাইল। নাবী ﷺ বললেন- তোমার জাতির লোকেরা সম্ভবতঃ তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। কারণ তিনি তাদের অবস্থা দেখে অনুভব করেছিলেন যে, তাদের মধ্যে অহংকার এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। তাই তারা ইসলাম গ্রহণ করবে বলে মনে হয়না। উরওয়া বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমি তাদের নিকট তাদের নেতাদের চেয়েও অধিক প্রিয়। আসলেও উরওয়া তাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সুতরাং তিনি এই আশায় তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন যে, তাদের মাঝে তার মর্যাদার কারণে তারা তার বিরোধীতা করবেনা। এত প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন তাদের কাছে গেলেন

---

২৭৬. বুখারী তাও. হা/৫৯৬৮, মিশকাত হাএ. হা/২৪২০

এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন চতুর্দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। একটি তীর এমনভাবে লাগল যে, এতে তিনি নিহত হলেন।

মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে জিজ্ঞেস করা হল- তোমার রক্তপাত সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আমার মাঝে এবং যারা রসূল ﷺ এর সাথে শহীদ হয়েছে- তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং তোমরা আমাকে তাদের সাথে দাফন কর।

লোকদের ধারণা রসূল ﷺ তার ব্যাপারে বলেছিলেন- স্বীয় গোত্রের সাথে তাঁর অবস্থা সেই রকমই হয়েছিল, যেমন হয়েছিল সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত মুমিন ব্যক্তির অবস্থা তার গোত্রের সাথে। উরওয়া ইবনে মাসউদ শাহাদাত বরণ করার পর ছাকীফ গোত্র কয়েক মাস ইসলাম থেকে বিমুখ রইল। অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বুঝতে পারল যে, চার পাশের ইসলাম গ্রহণকারী আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি তাদের হাতে নেই। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, উরওয়া বিন মাসউদের ন্যায়ই তারা আরেকজন দূতকে রসূল ﷺ এর নিকট পাঠাবে। এ জন্য তারা আব্দে ইয়ালীলের সাথে কথা বলল। আব্দে ইয়ালীল এই প্রস্তাব অস্বীকার করল এবং আশঙ্কা করল যে, তাকে পাঠানো হলে তার সাথেও উরওয়া বিন মাসউদের ন্যায়ই আচরণ করা হতে পারে। কাজেই সে এই শর্তে যেতে রাজী হল যে, তার সাথে অতিরিক্ত লোক পাঠানো হোক। সুতরাং তারা বনী আহলাফ থেকে দুইজন এবং বনী মালেক থেকে তিনজন লোক আব্দে ইয়ালীলের সাথে প্রেরণ করল। তাদের মধ্যে উছমান আবীল আসও ছিল। মদীনার নিকটবর্তী হয়ে তারা যখন একটি নদীর কিনারায় অবতরণ করল তখন মুগিরা ইবনে শুবার সাথে তাদের দেখা হল। মুগিরা ইবনে শুবা রসূল ﷺ এর কাছে বনী ছাকীফের আগমণের সংবাদ পৌঁছানোর জন্য দৌড়াতে লাগল। রাস্তায় আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে দেখা হলে তিনি মুগীরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে আল্লাহর শপথ দিয়ে বললেন, তুমি কখনই আমার আগে রসূল ﷺ এর কাছে প্রবেশ করবেনা। সুখবরটি আমিই রসূল ﷺ কে শুনাব। এতে মুগীরা থেমে গেলেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূল ﷺ এর দরবারে প্রবেশ করে ছাকীফ গোত্রের আগমণের কথা জানালেন। অতঃপর মুগীরা ইবনে শুবা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের কাছে ফেরত গিয়ে যোহরের সময় তাদের সাথে রওয়ানা দিলেন। তাদের আগমণের সংবাদ শুনে নাবী ﷺ মাসজিদের একপাশে একটি তাঁবু স্থাপন করলেন। এ সময় খালেদ বিন সাঈদ নাবী ﷺ এবং বনী ছাকীফ গোত্রের মাঝে পয়গাম বিনিময়ের কাজ করতেন। পরিশেষে তারা মুসলমান হয়ে গেল। ছাকীফ গোত্রের লোকেরা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করল, তার মধ্যে ছিল-

১. তাদের লাত নামক মূর্তিটি তিন বছর পর্যন্ত রেখে দিতে হবে। এই সময়ের মধ্যে এটিকে ভাঙ্গা যাবেনা। যাতে করে এই গোত্রের মূর্খ লোকদের ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়। নাবী ﷺ তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপরও তারা জোর দাবী করতে থাকল। নাবী ﷺ বরাবরই অস্বীকার করলেন। পরিশেষে তারা মাত্র একমাস রেখে দেয়ার অনুরোধ করলে নাবী ﷺ কোন মেয়াদেই তা রেখে দিতে অস্বীকার করলেন।

২. তাদের দাবী ছিল যে, তাদেরকে সলাত আদায় করা থেকে রেহাই দেয়া হোক এবং তাদের মূর্তিগুলো যেন তাদের হাতেই ভাঙ্গার আদেশ না করা হয়। নাবী ﷺ তখন বললেন- তোমাদের

মূর্তিগুলো তোমাদের হাতে ভাঙ্গা হতে রেহাই দিলাম। তবে জেনে রাখো যেই দ্বীনের মধ্যে সলাত নেই, তাতে কোন কল্যাণ থাকতে পারেনা।

সুতরাং ছাকীফ গোত্রের লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন নাবী ﷺ উছমান বিন আবীল আসকে তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলেও তার মধ্যে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ ছিল প্রবল।

সবশেষে তারা যখন নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল, নাবী ﷺ তখন তাদের সাথে আবু সুফিয়ান ও মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) কে লাত নামক মূর্তিটি ভাঙ্গার জন্য পাঠালেন।

মুগীরা ইবনে শুবা যখন হাতিয়ার (কুঠার জাতিয় হাতিয়ার) হাতে নিয়ে মূর্তিটির ঘরে প্রবেশ করলেন। বনী মুগীছের লোকেরা তখন মুগীরাকে হেফাজতের জন্য তার চারপাশে ঘুরাফেরা করছিল। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল উরওয়ার মতই তাকেও তীর নিক্ষেপে হত্যা করা হয় কি না। আর বনী ছাকীফের মহিলারা মূর্তিটির জন্য বিলাপ শুরু করে দিল। তিনি মূর্তিটি ভেঙ্গে সেখানকার সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে আসলেন।

উরওয়া ইবনে মাসউদ শাহাদাত বরণ করার সময় ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি আসার পূর্বে আবু মুলাইহ বিন উরওয়া এবং কারেব বিন আসওয়াদ নাবী ﷺ এর কাছে আগমণ করেছিলেন। তারা উভয়েই ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং ছাকীফ গোত্রের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করেছিলেন। সেই সময় রসূল ﷺ তাদের উভয়কে বলেছিলেন- তোমরা যাকে ইচ্ছা বন্ধু বানাতে পার। জবাবে তারা বলেছিলেন- আমরা আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূল ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবোনা। রসূল ﷺ তখন বললেন- তোমাদের মামা আবু সুফিয়ান বিন হারবকেও বন্ধু বানিয়ে নাও। এতে তারা রাজী হয়ে বললেন- আমাদের মামা আবু সুফিয়ানের সাথেও আমরা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রচনা করলাম।

তায়েফ বাসীরা যখন ইসলাম গ্রহণ করল, তখন আবু মুলাইহ ইবনে উরওয়া ইবনে মাসউদ রসূল ﷺ এর কাছে দাবী করল যে, লাত নামক মূর্তির ঘরে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে তার পিতার ঋণ পরিশোধ করা হোক। রসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ, তাই করা হবে। তখন কারেব বিন আসওয়াদ বলল- হে আল্লাহর রসূল! আসওয়াদের ঋণও পরিশোধ করুন। আসওয়াদ ছিল উরওয়ার ভাই। নাবী ﷺ তখন বললেন- আসওয়াদ তো মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। কারেব বলল- হে আল্লাহর রসূল! এই ঋণ পরিশোধ করা হলে একজন মুসলিমের আত্মীয়ের সাথে অনুগ্রহ করা হবে। এই কথার মাধ্যমে কারেব (রাঃ) নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। নাবী ﷺ বললেন- আমি এই ঋণ পরিশোধ করব। সুতরাং তিনি লাতের মন্দির থেকে প্রাপ্ত মাল থেকেই উরওয়া ও আসওয়াদের ঋণ পরিশোধ করলেন।

তায়েফের যুদ্ধ হতে যে সমস্ত মাসআলা জানা যায়

- হারাম মাসেও যুদ্ধ করা জায়েয। প্রথমে হারাম মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। কেননা রসূল ﷺ মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রমযান মাসের শেষের দিকে বের হয়েছেন। মক্কায় পৌঁছে ১৯ দিন অবস্থান করেছেন। অতঃপর হাওয়াযেন গোত্রের দিকে বের হয়েছেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। অতঃপর তায়েফে গিয়ে তা ১৮ দিন বা ২৩ দিন অবরোধ করে রেখেছেন। আপনি যদি এই দিন ও মাসগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন, তাহলে জানতে পারবেন যে, অবরোধের কিছু দিন যুল-কাদ মাস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এই কথার

জবাবে বলা যায় যে, হারাম মাসে শুধু অবরোধ করা হয়েছিল। যুদ্ধ হয়েছিল শাওয়াল মাসে। সুতরাং যুদ্ধ যেহেতু শুরু হয়েছিল, তাই হারাম মাস চলে আসার কারণে তা বন্ধ করা হয়নি। তা ছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, আপনাদের কাছে এমন কোন দলীল আছে কি, যা প্রমাণ করে নাবী ﷺ কোন হারাম মাসে যুদ্ধ শুরু করেছেন? সুতরাং শুরু করা এবং চালিয়ে যাওয়ার মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

- তায়েফের যুদ্ধ থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী-পরিবার সাথে নিয়ে যুদ্ধে বের হওয়া জায়েয আছে। কেননা নাবী ﷺ এই যুদ্ধে উম্মে সালামাহ এবং যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) কে সাথে নিয়েছিলেন।
- ভারী অস্ত্র (ক্ষেপণাস্ত্র) নিক্ষেপ করে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয আছে। যদিও তাতে নারী ও শিশু নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা নাবী ﷺ তায়েফের যুদ্ধে মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র জাতিয় অস্ত্র) ব্যবহার করেছিলেন।
- শত্রুপক্ষকে দুর্বল করার জন্য এবং তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলার জন্য তাদের গাছপালা ও সম্পদ নষ্ট করা জায়েয আছে।
- কাফেরদের ক্রীতদাসেরা পালিয়ে এসে মুসলিমদের সাথে যোগ দিলে তারা স্বাধীন বলে গণ্য হবে। ইবনুল মুনযির এ বিষয়ে আলেমদের ইজমা বর্ণনা করেছেন।
- এই যুদ্ধ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমদের ইমাম যদি শত্রুদের কোন ঘাটিকে অবরোধ করে, এরপর যদি দেখা যায় যে, অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, তাহলে তার জন্য তা করা জায়েয আছে।
- এ থেকে জানা গেল যে, নাবী ﷺ 'জিআর্‌রানা' নামক জায়গা থেকে উমরার ইহরাম বেঁধেছেন। তায়েফের পথে যারা উমরার নিয়তে মক্কায় প্রবেশ করবে, তাদের জন্য এখান থেকে ইহরাম বাঁধা সুন্নাত। আর উমরার নিয়তে মক্কা হতে বের হয়ে জিআর্‌রানায় এসে ইহরাম বাঁধাকে কোন আলেমই মুস্তাহাব বলেন নি। নাবী ﷺ কিংবা তাঁর কোন সাহাবীই এমনটি করেন নি। মূর্খ লোকেরা মক্কা থেকে বের হয়ে জিআর্‌রানা নামক স্থানে (আয়িশা মাসজিদে) এসে উমরার জন্য ইহরাম বাধাকে সুন্নাত মনে করে থাকে।
- ছাকীফ গোত্রের লোকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ করা নাবী ﷺ এর দয়া ও কোমলতার প্রমাণ বহন করে। অথচ এর আগে তারা রসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধ করেছে, তাঁর একদল সাহাবীকে হত্যা করেছে এবং তাদের নিকট তাঁর প্রেরিত দূতকেও হত্যা করেছে।
- এই ঘটনায় নাবী ﷺ এর সাথে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর গভীর ভালবাসা এবং যে কোন পন্থায় তাঁর নৈকট্য অর্জনের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারনেই তিনি মুগীরাকে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি যেন ছাকীফ গোত্রের আগমণের সুখবরটি নাবী ﷺ কে না দেন। যাতে করে তিনিই (আবু বকরই) নাবী ﷺ কে এই খবরটি দিয়ে খুশী করতে পারেন। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুসলিমের জন্য তার অপর মুসলিম ভাইয়ের কাছে এই আবেদন করা জায়েয আছে যে, সে যেন তাকে কোন নেকীর কাজ করার সুযোগ করে দেয়। এ রকম দাবী করা এবং দাবী মুতাবেক ভাল কাজের সুযোগ দেয়া উভয়টিই জায়েয। সুতরাং যারা বলেন যে, নেকীর কাজে অন্যকে প্রাধান্য দেয়া জায়েয নেই, তাদের কথা ঠিক নয়। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজ ঘরে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে রহমতের নাবী ﷺ এর পাশে কবর দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মনোবাসনা ছিল যে, নাবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের পাশেই তাঁর কবর হবে। কিন্তু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি এই ফযীলত অর্জনের ক্ষেত্রে খলীফাতুল মুসলিমীন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নিজের উপর প্রাধান্য দিলেন। তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আবেদনে কোন প্রকার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি; বরং তাতে সম্মতি দিলেন।

- তায়েফের ঘটনা থেকে প্রমাণ মিলে যে, ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতা থাকলে শিরক ও তাগুতের আড্ডাকে একদিনের জন্যও অবশিষ্ট রাখা জায়েয নেই। কেননা এগুলো হচ্ছে শিরক ও কুফরের নিদর্শন এবং সর্বাধিক গর্হিত কাজ। সুতরাং ক্ষমতা থাকলে এগুলোকে বহাল রাখা কখনই বৈধ নয়। মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া মাজারগুলোর ক্ষেত্রে একই হুকুম। এগুলোকে কবরের উপর নির্মাণ করা হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই তাগুত ও মূর্তিগুলোর ইবাদত করা হচ্ছে। মাজারগুলোর প্রাচীর ও পাথরগুলোকে তা'যীম করা হচ্ছে, এগুলো থেকে তাবার্রুক হাসিল করা হচ্ছে, এগুলোর জন্য নযর-মানত পেশ করা হচ্ছে, লোকেরা এগুলোকে চুম্বন করছে। ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলার ক্ষমতা থাকলে পৃথিবীতে এগুলোর অস্তিত্ব টিকে থাকতে দেয়া বৈধ নয়। এই মাজার ও গম্বুজগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে লাত, মানাত ও উজ্জার স্থান দখল করে আছে। শুধু তাই নয়; কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলোকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত শিরক লাত ও মানাত কেন্দ্রিক শিরককে অতিক্রম করেছে। আমরা এগুলোর ফিতনা থেকে উদ্ধারের জন্য দয়াময় আল্লাহর সাহায্য চাই। আমীন।
- বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে অলী-আওলীয়ার কবরের উপর নির্মিত মাজার ও গম্বুজ কেন্দ্রিক শিরক লাত ও মানাত কেন্দ্রিক শির্কের মতই কিংবা তার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বরূপ এই যে, লাত, মানাত ও উজ্জার অনুসরীরা এই বিশ্বাস করতনা যে, এরা সৃষ্টি করতে পারে, রিযিক দিতে পারে, মৃত্যু দিতে পারে কিংবা জীবন দান করতে পারে। ঐ সময়ের তথা আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মুশরিকরা লাত, মানাত ও উজ্জার কাছে তাই করত, যা করছে বর্তমানে তাদের মুশরিক ভাইয়েরা (মাজার পূজারী মুসলিমরা) তাদের তাগুতসমূহের কাছে (মাজারসমূহে)। সুতরাং বর্তমানের এই লোকেরা (নামধারী মুসলিমরা) তাদের পূর্বসূরী মুশরিকদের অনুসরণ করছে এবং পদে পদে তাদের পথেই চলছে।
- দ্বীনের সঠিক শিক্ষা বিলুপ্ত হওয়ার এবং জাহেলিয়াতের প্রসার ঘটার কারণে মানুষের উপর শিরক চেপে বসেছে। সুতরাং তাদের কাছে ভাল বিষয় মন্দে পরিণত হয়েছে এবং মন্দই ভালতে পরিণত হয়েছে। সুন্নাতকে তারা বিদআত এবং বিদআতকেই সুন্নাত মনে করছে। এর উপরই তাদের ছোটরা প্রতিপালিত হয়েছে এবং যুবকেরা বৃদ্ধ হয়েছে। ইসলামের প্রকৃত নিদর্শন গায়েব হয়েছে, হিদায়াতের আলো নিভে গেছে, ইসলামের গুরবত (অপরিচিতি) ভয়াবহ ধারণ করেছে, আলেমদের সংখ্যা কমে গেছে, মূর্খদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, হতাশা ও নিরাশার ছাপ ফুটে উঠেছে এবং মানুষের পাপের কারণেই জলে ও স্থলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এত কিছুর পরও উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এমন একটি দল রয়েছে, যারা সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা আহলে শিরক ও বিদআতীদের মুকাবেলায় জিহাদ করতে থাকবে। আর আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।

- গাযওয়ায়ে তায়েফ তথা তায়েফের যুদ্ধ হতে আরও জানা যায় যে, রাষ্ট্র প্রধানের জন্য জায়েয আছে যে, তিনি মাজার ও দরগাহ-এর সম্পদগুলো বাজেয়াপ্ত করে তা জিহাদ এবং মুসলিমদের অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করতে পারবেন। সেই সাথে সৈনিকদের মাঝে এগুলো ভাগ করে দেওয়া এবং ইসলামের অন্যান্য কাজেও ব্যয় করা জায়েয আছে। এগুলো বিক্রি করে মুসলমানদের কাজে তার মূল্য ব্যবহার করাও জায়েয। মাজারগুলোতে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের হুকুম একই। অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রধানের জন্য তা বাজেয়াপ্ত করা ও তা মুসলমানদের কাজে খরচ করা জায়েয। কারণ এগুলোতে ওয়াক্‌ফ করার কোন ভিত্তি নেই। এখানে মাল খরচ করা অপচয় ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং তা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে মুসলমানদের উপকারী কাজে খরচ করতে হবে। আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূলের আনুগত্যের কাজেই ওয়াক্‌ফ করা জায়েয। কবর ও মাজারে ওয়াক্‌ফ করা সহীহ নয়। কবরে বাতি জ্বালানো, কবরকে সম্মান করা, তাতে মানত করা, কবর যিয়ারতের জন্য ভ্রমণ করা, আল্লাহর পরিবর্তে কবরের উপাসনা করা এবং আল্লাহর বদলে এগুলোকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করার কোন ভিত্তি নেই। এতে ইসলামের ইমামদের কোন ইমামই মতভেদ করেন নি।

তাবুকের যুদ্ধ

নাবী ﷺ যখন তায়েফের যুদ্ধ হতে মদীনায় ফেরত আসলেন এবং নবম হিজরী সাল শুরু হল তখন তিনি যাকাতের মাল সংগ্রহ করার জন্য কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন আরব গোত্রের নিকট প্রেরণ করলেন। উয়াইনা বিন হিসন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পাঠালেন বনী তামীম গোত্রের নিকট, আদী বিন হাতিমকে পাঠালেন তাঈ ও বনী আসাদ গোত্রের নিকট এবং মালিক বিন নুওয়াইরাকে পাঠালেন বনী হানযালার নিকট। বনী সা'দ গোত্রের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দুইজন লোকের উপর ভাগ করে দিলেন। বনী সা'দ গোত্রের এক অংশের যাকাত উসুল করার জন্য পাঠালেন যাবারকান বিন বদরকে আর অন্য দিকে পাঠালেন কায়েস বিন আসেম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে। বাহরাইনের যাকাত উসুল করার জন্য পাঠালেন আলা ইবনুল হাযরামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে। আর নাজরানের যাকাত আদায়ের জন্য পাঠালেন আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে।

এই বছর তথা হিজরী নবম সালের রজব মাসে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনায় এ সময় মানুষের মধ্যে খুব অভাব বিরাজ করছিল। দেশে তখন অনাবৃষ্টিও দেখা দিয়েছিল। ঐ দিকে আবার মৌসুমের ফল পাকারও সময় হয়ে গিয়েছিল। নাবী ﷺ যখন কোন অভিযানে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন কোন দিকে যাচ্ছেন, তা সুস্পষ্ট করে বলতেন না। কিন্তু তাবুক যুদ্ধে বের হওয়ার পূর্বে সুস্পষ্ট করেই বলে দিলেন। কারণ তাবুক মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং তখন সময়টিও ছিল অভাবের।

একদিন তিনি জুদ্ বিন কায়েসকে লক্ষ্য করে বললেন- এ বছর বনুল আসফার (রোমানদের) মুকাবেলা করার জন্য বের হবে কি? সে বলল- হে আল্লাহর রসূল! আমাকে মদীনায় থাকার অনুমতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় নিপতিত করবেন না। সকলেই জানে যে, আমি নারীদের প্রতি সর্বাধিক আশক্ত। আমার আশঙ্কা আমি যদি রোমানদের মেয়েদেরকে দেখি, তাহলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে

পারবনা। তার এই কথা শুনে রসূল ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রসূল ﷺ তাকে না যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়-

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾

"আর তাদের কেউ বলে, আমাকে (যুদ্ধে যাওয়া হতে) অব্যাহতি দিন এবং ফিতনায় নিপতিত করবেন না। শুনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই ফিতনায় নিপতিত এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে"।[২৭৭] মুনাফেকদের একদল পরস্পর বলাবলি করতে লাগল- তোমরা এই প্রচন্ড গরমের মধ্যে যুদ্ধের জন্য বের হয়োনা। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾

"পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্র রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়োনা। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত"।[২৭৮]

নাবী ﷺ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আদেশ দিলেন। ধনী সাহাবীদেরকে এই পথে খরচ করার উৎসাহ দিলেন। উছমান (রাঃ) সাজ ও সামানসহ তিনশত উট এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর রাস্তায় দান করলেন। এই সময় কিছু লোক কাঁদতে কাঁদতে রসূল ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলেন। তারা ছিলেন সংখ্যায় সাতজন। তারা রসূল ﷺ-এর কাছে বাহনের আবেদন করছিলেন। তিনি বলেছিলেন-

﴿لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾

"আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব। তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইছিল, এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে"।[২৭৯]

এই সময় আবু মুসা আশআরীর সাথীগণ আবু মুসা (রাঃ) কে রসূল ﷺ-এর নিকট পাঠালেন, যাতে তিনি তাদের বাহনের ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় তিনি রসূান্বিত ছিলেন। তাই তিনি রসূান্বিত অবস্থায় শপথ করে বললেন যে, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সওয়ারীর ব্যবস্থা করবনা। তা ছাড়া আমার কাছে সওয়ারীর কোন ব্যবস্থাও নেই। এরপরই কিছু উট নাবী ﷺ-এর কাছে এসে গেল। এবার তার রসূ থেমে গেল। তাই তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের বাহনের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন- আমি তোমাদেরকে বাহন দেইনি; বরং আল্লাহই তোমাদের বাহনের ব্যবস্থা

---

২৭৭. সূরা তাওবা-৯:৫০
২৭৮. সূরা তাওবা-৯:৮১
২৭৯. সূরা তাওবা-৯:৯২

করেছেন। আর আমি যখন কোন বিষয়ে কসম করি, তখন যদি এর বিপরীত করার মধ্যেই কল্যাণ দেখতে পাই, তাহলে আমি শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করি এবং ভাল কাজটিই করি।

রসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধে বের হওয়ার পূর্বে উলবাহ বিন যায়েদ রাতে দাঁড়িয়ে সলাত পড়লেন এবং কেঁদে কেঁদে বললেন- হে আল্লাহ্! তুমি জিহাদের আদেশ দিয়েছ। আর তোমার রসূলকে এমন সামর্থ দাওনি যে, তিনি আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন। এরপর তিনি বললেন- হে আল্লাহ্! আমি যেহেতু জিহাদে বের হওয়ার অযোগ্য, তাই আমি তোমার রাস্তায় প্রত্যেক ঐ মুসলিমের জুলুমের বদলা নেওয়া সাদকা করে দিচ্ছি, (প্রতিশোধ নেওয়া ছেড়ে দিচ্ছি) যা তার হাত দ্বারা আমার উপর করা হয়েছে। চাই সেই জুলুম আমার মালের মধ্যে হোক কিংবা জানের মধ্যে কিংবা ইজ্জত-আবরুর মধ্যে হোক। সকাল হলে রসূল ﷺ বললেন- আজ রাতে সাদকাকারী কোথায়? কেউ উঠে দাঁড়ালো না। তিনি পুনরায় একই কথা বললেন। এবার উলবাহ বিন যায়েদ দাঁড়ালেন এবং রসূল ﷺ কে স্বীয় ঘটনা খুলে বললেন। তিনি তখন উলবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন- সুসংবাদ গ্রহণ কর। ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে, আজ রাতে তোমার দু'আকে সাদকায়ে মাকবুলা হিসাবে লিখা হয়েছে।

তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে গ্রাম্য মুনাফেকরা রসূল ﷺ এর কাছে আগমণ করে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইল। কিন্তু তিনি তাদেরকে অনুমতি দেন নি। সে সময় মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই একদল মুনাফিক ও ইহুদীসহ ছানিয়াতুল ওয়াদায় অবস্থান করছিল। বলা হয় যে, তার বাহিনী দুই বাহিনীর চেয়ে কম ছিলনা। বের হওয়ার পূর্বে রসূল ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে মদীনার খলীফা নিযুক্ত করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন রওয়ানা হল, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই পিঠ টান দিল। আলী ইবনে আবু তালেবকে রেখে গেলেন আহলে বাইতের নারী ও শিশুদের দেখা-শুনার দায়িত্বে। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের সাথে রেখে যাচ্ছেন? তিনি তখন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন- তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আমার নিকট তোমার মর্যাদা ঠিক সে রকমই, যেমন ছিল হারুন (আলাইহিস সালাম) এর মর্যাদা মুসার নিকট। তবে আমার পর আর কোন নাবী নেই।[২৮০]

এই যুদ্ধে কতিপয় মুসলমানও পিছনে রয়ে গিয়েছিল। তবে তাদের পিছিয়ে থাকা ঈমানের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের কারণে ছিলনা। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন কা'ব বিন মালেক, হিলাল বিন উমাইয়াহ, মুরারা বিন রবীআ, আবু খাইছামাহ এবং আবু যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তবে আবু খাইছামা এবং আবু যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পরে রসূল ﷺ-এর সাথে মিলিত হয়েছিল।

এই যুদ্ধে নাবী ﷺ-এর সাথে ত্রিশ হাজার মুজাহিদের এক বিশাল বাহিনী ছিল। তার মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল দশ হাজার। তাবুকে পৌঁছে তিনি বিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সলাত কসর করতেন। রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াস তখন হিমস নগরীতে অবস্থানরত ছিল।

তাবুক যুদ্ধে আবু খায়ছামার অংশগ্রহণের ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাবী ﷺ মদীনা হতে বের হওয়ার কয়েক দিন পর আবু খায়ছামা স্বীয় ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন ছিল প্রচন্ড গরম। তিনি দেখলেন, তার স্ত্রীদ্বয় তার বাগানে তাঁবু স্থাপন করে তাতে অবস্থান করছে। তাদের প্রত্যেকেই

---

২৮০. সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ গাযওয়ায়ে তাবুক।

তাঁবুতে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে তাঁবুকে ঠান্ডা করে রেখেছে এবং তাঁর জন্য ঠান্ডা পানি প্রস্তুত করে রেখেছে। তারা তাঁর জন্য সুন্দর খানাও তৈরী করে রেখেছে। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করে সুন্দরী স্ত্রীদের প্রতি এবং তার জন্য প্রস্তুত কৃত খাদ্যসামগ্রীর দিকে তাকালেন, তখন মনে মনে বলতে লাগলেনঃ রসূল ﷺ দ্বিপ্রহরে পথ চলছেন ও গরম সহ্য করছেন। আর আবু খায়ছামা ঠান্ডা ছায়া, সুস্বাদু খাদ্য এবং সুন্দরী নারী উপভোগ করছে। এটি ইনসাফের বিষয় হতে পারেনা। অতঃপর তিনি বললেন- আল্লাহর শপথ! রসূল ﷺ এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের কারও তাঁবুতে প্রবেশ করবনা।

সুতরাং তোমরা আমার জন্য সফর সামগ্রী তৈরী কর। তারা তাই করল। তিনি বাহনে আরোহন করে বেরিয়ে পড়লেন। তাবুকে পৌঁছে তিনি রসূল ﷺ এর সাথে মিলিত হলেন।

রাস্তায় তার সাথে উমায়ের বিন ওয়াহাবের সাক্ষাৎ হল। তিনিও রসূল ﷺ এর সন্ধানে ছিলেন। তারা পরস্পর সফরসঙ্গী হয়ে গেল। তারা যখন তাবুকের নিকটে পৌঁছলেন তখন আবু খায়ছামা উমায়ের বিন ওয়াহাবকে বললেন- আমি রসূল ﷺ থেকে পিছিয়ে থেকে বিরাট একটি ভুল (পাপ) করেছি। সুতরাং এখন থেকে রসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত আমার থেকে তুমি আলাদা হওয়াতে দোষের কিছু নেই। তাই উমায়ের সরে পড়ল। তাবুকের নিকটবর্তী হলে লোকেরা বলতে লাগল- এই তো রাস্তায় একজন আরোহীকে আগমণ করতে দেখা যাচ্ছে। রসূল ﷺ তখন বললেন- সম্ভবতঃ এই লোক আবু খায়ছামাই হবে। লোকেরা তখন বলল- আল্লাহর শপথ! এ তো দেখছি আবু খায়ছামা। বাহন থেকে নেমে তিনি রসূল ﷺ-এর দিকে এগিয়ে সালাম দিলেন এবং তাঁর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনালেন। অতঃপর নাবী ﷺ তাঁর ব্যাপারে ভাল কথা বললেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন।

তাবুকের পথে তিনি যখন ছামুদ জাতির ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন- তোমরা এখানকার পানি পান করোনা এবং এর দ্বারা সলাতের ওযূ করোনা। এখানকার পানি দিয়ে তোমরা যেই আটা গুলেছ, তা তোমরা উটকে খাইয়ে দাও। এ থেকে তোমরা নিজেরা কিছুই খেয়োনা। আর তোমাদের কেউ যেন সাথে কাউকে না নিয়ে বাইরে না যায়। বনী সায়েদা গোত্রের দুই লোক ব্যতীত বাকী সকলেই তাঁর কথা তামিল করল। ঐ দুই জনের একজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাইরে গেল, অন্যজন তার উটের সন্ধানে বের হল। যে ব্যক্তি পায়খানা করার জন্য একা বের হয়েছিল, সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পায়খানার স্থানে পড়ে রইল আর যে ব্যক্তি উটের সন্ধানে বের হয়েছিল, বাতাস তাকে উঠিয়ে নিয়ে তাইয়ের পাহাড়ে নিক্ষেপ করল। রসূল ﷺ যখন এই খবর শুনলেন তখন বললেন- আমি কি তোমাদেরকে একাকী বের হতে নিষেধ করিনি? অতঃপর যে ব্যক্তি পায়খানা করতে গিয়ে শ্বাসরূদ্ধ হয়ে আটকা পড়ে ছিল, তিনি তার জন্য দু'আ করলে সে ভাল হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বনী তাইয়ের লোকেরা নাবী ﷺ-এর কাছে মদীনায় ফেরত পাঠাল।

ইমাম জুহরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- নাবী ﷺ যখন ছামুদ গোত্রের হিজর অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি স্বীয় কাপড় দিয়ে চেহারা মুবারক ঢেকে নিলেন এবং বাহনকে দ্রুত চালালেন। অতঃপর তিনি বললেন- জালেমদের অঞ্চলের উপর দিয়ে চলার সময় তোমরা ক্রন্দন অবস্থায় চল। কেননা তারা যেই আযাবে আক্রান্ত হয়েছিল, তোমাদেরও সেই আযাবে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই স্থানের পানি দিয়ে যারা আটা গুলেছিল, তাদেরকে তিনি সেই আটা

উটকে খাওয়াতে বলেছিলেন এবং পানি ঢেলে দিতে বলেছিলেন। তিনি সাহাবীদেরকে সেই কুঁপ থেকে পানি সংগ্রহ করার আদেশ দিলেন, যাতে সালেহ (আঃ) এর উটনী অবতরণ করত।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন- সে দিন সকাল বেলা মানুষের কাছে কোন পানি ছিলনা। রসূল ﷺ এর কাছে পানি না থাকার অভিযোগ করা হলে তিনি বারগাহে ইলাহীতে পানির জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এক খন্ড মেঘ পাঠিয়ে দিলেন। মেঘ খন্ডটি হতে এত বৃষ্টি বর্ষিত হল যে, লোকেরা পরিতৃপ্ত হল। প্রয়োজন অনুসারে তারা পানি সঞ্চয়ও করে রাখল।

অতঃপর নাবী ﷺ চলতে লাগলেন। কোন কোন সাহাবী তাঁর পিছনে রয়ে গেল। লোকেরা তখন বলতঃ উমুক পিছনে রয়ে গেছে। বলা হল- আবু যারও পিছনে রয়ে গেছে। তিনি যুদ্ধে বের হন নি। তিনি তখন বলতেন- তাকে ছাড়, তার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকলে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিবেন। আর অন্য কিছু থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিবেন।

আসল কথা হল আবু যার্ গিফারী (রাঃ) এর উট খুব ধীর গতিতে চলছিল। যার কারণে তিনি সাথীদের সাথে চলতে পারেন নি। তাই তিনি উটের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিজের পিঠে বহন করতে লাগলেন এবং একাই তাবুকের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এটিই ছিল তার পিছনে পড়ার একমাত্র কারণ। রাস্তার কোন এক স্থানে যখন রসূল ﷺ অবতরণ করলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল- হে আল্লাহর রসূল! ঐ দেখুন! একজন লোক রাস্তায় একা চলছে এবং আমাদের দিকেই আগমণ করছে। রসূল ﷺ বললেন- ঐ লোকটি আবু যার্ ছাড়া আর কে হবে? তারা গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়ে তাকে চিনে ফেলল এবং বলল- হে আল্লাহর রসূল! এ তো দেখছি আসলেই আবু যার্। রসূল ﷺ তখন বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা আবু যারের উপর রহম করুন! সে একাকীই চলবে, একাকীই মৃত্যু বরণ করবে এবং কিয়ামতের দিন একাই কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে।[২৮১]

সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে, আবু যার্ (রাঃ) এর যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন তাঁর স্ত্রী খুব কাঁদছিলেন। তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন- তুমি কাঁদছ কেন? স্ত্রী বললেন- আমি কাঁদব না? আপনি একটি নির্জন ভূমিতে মৃত্যু বরণ করছেন! আর আমার কাছে এমন কোন কাপড় নেই, যা আপনার কাফনের জন্য যথেষ্ট হবে। আপনাকে দাফন করার মত শক্তিও আমার নেই এবং সহযোগীতা করার মত কোন লোকও এখানে নেই। আবু যার্ তখন বললেন- তুমি কেঁদ না। কেননা আমি রসূল ﷺ কে এমন একদল লোককে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তিনি বলেছেন- তোমাদের মধ্যে হতে একজন লোক নির্জন ভূমিতে মৃত্যু বরণ করবে। তথাপি তার জানাযার সলাতে মুসলিমদের একটি জামআত শরীক হবে। আবু যার্ বলেন- ঐ দলের সকলেই মৃত্যু বরণ করেছে। তাদের কেউ এখন জীবিত নেই। একমাত্র আমিই জীবিত আছি। সুতরাং নির্জন ভূমিতে একাকী মৃত্যু বরণকারী আমি ছাড়া আর কেউ বাকী নেই। আল্লাহর শপথ! আমি ভুল বলছিনা, আমার কথা মিথ্যাও নয়। তুমি রাস্তার দিকে খেয়াল রাখ। দেখ! কোন মানুষ দেখা যায় কি না। তাঁর স্ত্রী উম্মে যার্ বললেন- হজ্জের মৌসুম শেষ হয়ে গেছে। হাজীগণ চলে গেছেন, রাস্তা খালী হয়ে গেছে। সুতরাং লোকের সন্ধান

---

২৮১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, (৪/১৪)

পাব কোথায়? আবু যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পুনরায় বললেন- যাও এবং খুঁজে দেখ। তাঁর স্ত্রী বলেন- আমি টিলার উপর দাঁড়িয়ে ধু-ধু মরুভূমির উপর গভীর দৃষ্টি দিতাম, কোন লোকের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। কোন মানুষের আভাস না পেয়ে আমি আবু যারের কাছে ফেরত আসতাম এবং তার সেবায় মশগুল হতাম। আমার এবং আবু যারের সময় এভাবেই পার হতে থাকল। হঠাৎ দেখলামঃ কিছু লোক তাদের বাহনসমূহে আরোহন করে পথ চলছে। তাদের বাহনগুলো তাদেরকে নিয়ে কদমতালে চলছে।

উম্মে যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন- তাদের দিকে ইঙ্গিত করতেই তারা আমার দিকে দ্রুত চলে আসল এবং আমার কাছে দাঁড়িয়ে গেল। তারা বলল- হে আল্লাহর বান্দী! তোমার এই দশা কেন? আমি বললাম একজন মুসলিম মৃত্যুর পথে যাত্রা করছে। দয়া করে তার কাফন ও দাফনের কাজে সহায়তা করবেন কি? তারা জিজ্ঞেস করলেন কে সেই ব্যক্তি? উম্মে যার্ বলেন- আমি বললামঃ তিনি হচ্ছেন আবু যার্। অশ্বারোহীগণ বললেন- আল্লাহর রসূলের সাথী আবু যার্? উম্মে যার্ বলেন আমি বললামঃ হ্যাঁ, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথী আবু যার্। তারা বললেন- আবু যারের জন্য আমাদের মা-বাপ কোরবান হোক! অতঃপর তারা দ্রুত তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। আবু যার্ তখন বললেন- তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর! আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এমন একদল লোককে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তিনি বলেছেন- তোমাদের মধ্য হতে একজন লোক নির্জন ভূমিতে মৃত্যু বরণ করবে। তথাপি তার জানাযার সলাতে মুসলিমদের একটি জামআত শরীক হবে। ঐ দলের সকলেই মৃত্যু বরণ করেছে। তাদের কেউ এখন জীবিত নেই। একমাত্র আমিই জীবিত আছি। সুতরাং নির্জন ভূমিতে একাকী মৃত্যু বরণকারী আমি ছাড়া আর কেউ বাকী নেই। আল্লাহর শপথ! আমি ভুল বলছিনা, আমার কথা মিথ্যাও নয়। আমার কাছে যদি এমন একটি কাপড় থাকত, যা আমার কাফনের জন্য যথেষ্ট কিংবা আমার স্ত্রীর কাছেও যদি আমাকে কাফন দেয়ার মত কোন কাপড় থাকত, তাহলে আমার অথবা আমার স্ত্রীর কাপড় ব্যতীত অন্য কোন কাপড়ে কাফন দেয়া হতনা। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর উসীলা (দোহাই) দিয়ে আবেদন করছি যে, তোমাদের মধ্য হতে ঐ ব্যক্তি যেন আমার কাফন না দেয়, যে কোন অঞ্চলের আমীর ছিল অথবা গভর্ণর ছিল অথবা বিচারক ছিল অথবা অন্য কোন সরকারি দায়িত্ব পালন করেছিল। তারা সকলেই চিন্তা করে দেখল, এই অশ্বারোহী দলের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যে উপরোক্ত কোন না কোন পদে অধিষ্ঠিত হয়নি। আনসারদের একজন কম বয়সী যুবকই আবু যারের মূল্যায়নে টিকে ছিল। কারণ সে কোন সরকারী দায়িত্ব পালন করেনি। সে বলল- হে চাচা! আমি আপনাকে আমার এই চাদরে এবং সেই দু'টি কাপড়ে কাফন পড়াব, যা আমার মা বুনিয়েছেন। কাপড় দু'টি আমার এই থলেতে রয়েছে। আবু যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- তাহলে তুমিই আমাকে কাফন পড়াবে। কিছুক্ষণ পর আবু যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেখানে মৃত্যু বরণ করলেন। সেই আনসারী যুবকই কাফন পরিধান করাল। তখন সকলে মিলে তাঁর জানাযার সলাত আদায় করলেন এবং তাকে দাফন করলেন। এই যুবকের সাথের লোকদের সকলেই ছিল ইয়ামানের অধিবাসী।[২৮২]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুকে পৌঁছার পূর্বে বলেছিলেন- ইনশা-আল্লাহ্ আগামীকাল তোমরা তাবুকের জলাশয়ে গিয়ে পৌঁছবে। তবে তোমরা সেখানে চাশতের সময় না

---

২৮২. সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/ ২২৬০, ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাদীসের সনদ হাসান।

হওয়ার আগে কোনক্রমেই পৌঁছতে পারবেনা। আমি সেখানে উপস্থিত না হওয়ার আগেই কেউ যদি সেখানে পৌঁছে যায়, তাহলে সে যেন সেখানকার পানিতে হাত না ডুবায়। অর্থাৎ তার কাছেও যেন না যায়। বর্ণনাকারী বলেন- আমরা তাবুকে পৌঁছে দেখি, আমাদের আগেই সেখানে গিয়ে দু'জন উপস্থিত হয়েছে। আর দেখলামঃ সেখানকার ঝর্না থেকে অল্প অল্প পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

রসূল ﷺ ঐ দু'জন লোককে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি এই পানি স্পর্শ করেছ? তারা বলল- হ্যাঁ, স্পর্শ করেছি। তিনি তখন তাদেরকে গালি দিলেন (দোষারোপ করলেন) এবং আরও অনেক কথা বললেন। অতঃপর লোকেরা সেই ঝর্ণা থেকে অঞ্জলি ভর্তি করে অল্প অল্প পানি উঠিয়ে একত্রিত করল। এতে সামান্য পানি এক সাথে জমা হয়ে গেল। নাবী ﷺ সেই পানি দিয়ে স্বীয় মুখ ও উভয় হাত ধৌত করলেন। তারপর সেই পানি ঝর্ণায় ঢেলে দিলেন। এবার ঝর্ণা থেকে প্রচুর পানি প্রবাহিত হতে লাগল। লোকেরা পানি পান করল।

অতঃপর নাবী ﷺ মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললেন- হে মুআয! তোমার হায়াত যদি দীর্ঘ হয়, তাহলে তুমি দেখবে যে, এখানকার পানির আশ-পাশ গাছপালা ও বাগবাগিচায় ভর্তি হয়ে যাবে।[২৮৩]

নাবী ﷺ যখন তাবুকে গিয়ে পৌঁছলেন তখন আয়লার সম্রাট আগমণ করে তাঁর সাথে সন্ধি করতে এবং জিযিয়া-কর প্রদান করতে রাজী হল। এ সময় জারবা এবং আযরুহ-এর অধিবাসীরা এসেও জিযিয়া দিতে সম্মত হল। আয়লার শাসকের সাথে নাবী ﷺ লিখিত চুক্তি করলেন। তার বিষয়বস্তু ছিল এইঃ

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا أَمَنَةٌ مِن الله ومحمد النبى رسول الله لِيُحَنَّةَ بن رُؤْبَةَ وأهلِ أَيْلَة، سُفنهم وسيارتهم فى البرِّ والبحرِ لهم ذِمةُ اللهِ ومحمد النبى ومَنْ كان معهم مِن أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمَن أحدث منهم حَدَثاً فإنه لا يَحولُ مالُه دونَ نفسه وإنَّه لمن أخذه مِن الناس وإنه لا يَحِلُّ أن يُمنعوا ماءً يردونه ولا طريقاً يردونه من بَحْرٍ أو بَرٍّ)

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর পক্ষ হতে ইউহান্না বিন রুবা এবং আয়লার অধিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য এই চুক্তিপত্র লিখা হচ্ছে। জলে ও স্থলে চলাচলকারী তাদের যানবাহন ও নৌকাগুলো আল্লাহ এবং নাবী মুহাম্মাদের হেফাজতে ও যিম্মায় থাকবে। সিরিয়া, ইয়ামান ও বাহরাইনের যে সমস্ত লোক তাদের সাথে থাকবে, তাদের কাফেলাতেও এই নিরাপত্তার চুক্তি কার্যকর হবে। তাদের কেউ যদি চুক্তিবিরোধী কোন কাজ করে বা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে, তাহলে তার মাল তার জান বাঁচাতে পারবো; বরং যে কোন মুসলিমের জন্যই তাদের জান-মাল হালাল হয়ে যাবে। মুসলমানদের জন্য বৈধ নয় যে, কোন পানির ঘাটে অবতরণ করতে তাদেরকে বাধা দিবে, জল বা স্থল পথে চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

---

২৮৩. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুজেযা।

খালেদ বিন ওয়ালীদকে দাওমাতুল জান্দালে প্রেরণ

অতঃপর তাবুকে অবস্থানকালে নাবী ﷺ দাওমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদার বিন আব্দুল মালেক আলকেন্দির কাছে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পাঠালেন। প্রেরণের সময় তিনি খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন- তুমি গিয়ে দেখবে যে, সে নীল গাভী (বন্য গাভী) শিকারে ব্যস্ত আছে। খালেদ চলতে লাগলেন। তিনি যখন উকাইদারের দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন পূর্ণিমার রাত্রিতে দুর্গটি দৃষ্টিগোচর হল। সে তখন স্বীয় স্ত্রীসহ দুর্গের ছাদের উপর ছিল। তখন একটি নীল গাভী এসে শিং দিয়ে প্রাসাদের দরজায় আঘাত করছিল। তখন তার স্ত্রী বলল- আপনি কি কখনও এ রূপ নীল গাভী দেখেছেন? সে বলল- আল্লাহর শপথ! কখনও এরূপ দেখি নি। অতঃপর সে নিজ পরিবারের আরও কয়েকজন লোকসহ ঘোড়ায় আরোহন করে বের হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে উকাইদারের এক ভাইও ছিল। তার নাম ছিল হাস্সান। তারা যখন বের হল তখনই রসূল ﷺ এর অশ্বারোহী বাহিনী উকাইদারকে পাকড়াও করল এবং তার ভাই হাস্সানকে হত্যা করে ফেলল। তার গায়ে ছিল স্বর্ণের পাতা অঙ্কিত একটি লম্বা জামা। খালেদ তা ছিনিয়ে রসূল ﷺ এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি উকাইদারকে পাকড়াও করে রসূল ﷺ এর দরবারে নিয়ে আসলেন।

নাবী ﷺ উকাইদারকে হত্যা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন এবং জিযিয়া কর প্রদানের বিনিময়ে তার সাথে চুক্তি করলেন। সে ছিল খৃষ্টান। সে ছাড়া পেয়ে স্বীয় দেশে চলে গেল।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বলেন- দাওমাতুল জান্দাল জয় করার জন্য নাবী ﷺ চারশত বিশজন অশ্বারোহীসহ খালেদকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা জয় করে উকাইদারের সাথে এই শর্তে চুক্তি করলেন যে, তারা দুই হাজার উট, সাতশত ছাগল, চারশত লৌহ বর্ম এবং চারশত বর্শা (বলণ্চম) প্রদান করবে। এই মালে গনীমত হতে নাবী ﷺ তাঁর অংশ আলাদা করে নিলেন। অতঃপর বাকী সম্পদ ভাগ করতে গিয়ে প্রথমে খুমুস তথা এক পঞ্চমাংশ (১/৫) আলাদা করলেন। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। প্রত্যেক সাহাবী গণীমতের মাল থেকে পাঁচটি করে অংশ পেয়েছিলেন। রসূল ﷺ তাবুকে দশ দিনেরও বেশী সময় অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর মদীনার দিকে রওয়ানা করলেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- তাবুক যুদ্ধে থাকা কালে মধ্যরাতে আমি একবার উঠে একটি অগ্নিশিখা দেখতে পেলাম। আমি সেখানে গিয়ে রসূল ﷺ, আবু বকর এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দেখতে পেলাম। সেখানে আরও দেখলাম যে, রসূল ﷺ-এর সাহাবী যুল বিজাদাইন মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর জন্য কবরও খনন করা হয়েছে। নাবী ﷺ তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে আছেন। আবু বকর এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে কবরে নামাচ্ছেন। নাবী ﷺ বললেন- তোমাদের ভাইকে আমার নিকটবর্তী কর। তারা তাকে রসূলের নিকটস্ত করলেন। তাঁকে যখন কবরে রাখার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করলেন, তখন তিনি তাঁর জন্য দু'আ করলেন। দু'আয় তিনি বললেন- হে আল্লাহ্! আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তুমিও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী ﷺ এর পবিত্র জবানে এই দু'আ শুনে বললেন- আফসোস! আমি যদি এই কবরের বাসিন্দা হতাম! (তাহলে আমার খুশ নসীব হত)।

আবু উমামা বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যখন তাবুকে অবস্থান করছিলেন তখন জিবরীল ফিরিস্তা আগমণ করলেন। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন- হে মুহাম্মাদ! আপনি মুআবিয়া বিন মুআবীয়া আল-

মুযানীর জানাযায় শরীক হোন। এ কথা শুনে নাবী ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে উক্ত সাহাবীর জানাযায় বের হলেন। ঐদিকে জিবরীল ফিরিশ্তা এই সলাতে জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য সত্তর হাজার ফিরিস্তাসহ উপস্থিত হলেন। জিবরীল ফিরিস্তা তাঁর ডান পাখা পাহাড়ের উপর রাখলেন। জিবরীলের পাখার ভারে পাহাড়সমূহ নত হয়ে গেল। তাঁর বাম পাখা রাখলেন যমীনের উপর। এতে যমীনও নত হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন- আমরা সেখান থেকে মক্কা ও মদীনা পর্যন্ত দেখতে পেলাম। অতঃপর নাবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণ, জিবরীল এবং ফিরিস্তাগণ সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষে নাবী ﷺ জিবরীল (আলায়হিস সালাম) কে জিজ্ঞেস করলেন- মুআবীয়া এত উচ্চ মর্যাদায় কিভাবে পৌঁছল? তিনি বললেন- দাঁড়ানো, বসা, আরোহী এবং পায়ে হাটা তথা সকল অবস্থায় সূরা ইখলাস পাঠ করার কারণে তিনি এই মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন।[২৮৪]

তাবুক থেকে ফেরার পথে নাবী ﷺ বলেছিলেন, মদীনায় এমন কিছু লোক রয়ে গেছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের কোন পথ অতিক্রম করার সময় এবং কোন উপত্যকা পার হওয়ার সময় তোমাদের সাথেই ছিল। সাহাবীগণ আরজ করলেন- হে আল্লাহর রসূল! তারা কি মদীনাতেই অবস্থান করছে? তিনি বললেন- হ্যাঁ, গ্রহণযোগ্য উযর (অজুহাত) থাকার কারণেই তথা জিহাদে আসতে অক্ষম বলেই তারা আসতে পারেনি।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র

নাবী ﷺ তাবুক থেকে মদীনায় ফেরত আসছিলেন। পথিমধ্যে কতিপয় মুনাফেক তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এক নীলনকশা তৈরী করল। পথ চলার সময় তাঁকে কোন এক গিরিপথ হতে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা করার ফন্দি করল। তিনি যখন গিরিপথের নিকটবর্তী হলেন, তখন মুনাফেকরা তাঁর সাথে সাথে চলতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীকে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন- তোমাদের মধ্যে যে উপত্যকা দিয়ে তথা নিম্নভূমিতে চলতে চায়, তার কোন সমস্যা নেই। কারণ এ রাস্তাটিই তোমাদের জন্য অধিক প্রশস্ত। এ কথা বলে তিনি নিজে পাহাড়ী পথে চলতে লাগলেন। আর লোকেরা উপত্যকা দিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা মুখোশ পরিধান করে রসূল ﷺ এর সাথে চলার ইচ্ছা পোষণ করল। নাবী ﷺ হুযায়ফা বিন ইয়ামান এবং আম্মার বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে তাঁর সাথে চলার আদেশ দিলেন। আম্মারকে তিনি উটের লাগাম ধরার আদেশ দিলেন এবং হুযায়ফাকে পিছন থেকে উট চালিয়ে নেওয়ার হুকুম করলেন। তারা চলছিলেন। এমন সময় হঠাৎ পিছন দিক থেকে একদল লোকের আক্রমণের আওয়াজ শুনা গেল। ইতিমধ্যেই তারা নাবী ﷺ কে ঘিরে ফেলল। নাবী ﷺ তখন রসূান্বিত হয়ে হুযায়ফাকে আদেশ করলেন যে, তাদেরকে প্রতিহত কর। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূল ﷺ কে রসূান্বিত দেখে ডান্ডা (লাঠি) হাতে নিয়ে পিছনে ফিরে মুনাফেকদের বাহনগুলোর মুখে আঘাত করলেন। তিনি দেখলেন তারা সকলেই মুসাফিরদের ন্যায় মুখোশ পরিহিত। হুযায়ফাকে দেখে তারা ভীত হয়ে গেল এবং তারা বুঝতে পারল যে, তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে। তারা দ্রুতগতিতে সরে পড়ল এবং জনগণের সাথে মিশে

২৮৪. ইমাম বায়হাকী এবং ইবনুস সুন্নী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এই হাদীসটি মুনকার।

গেল। রসূল ﷺ তখন হুযায়ফাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাদের কাউকে চিনতে পেরেছ? হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- আমি উমুক এবং উমুকের সওয়ারী চিনতে পেরেছি। রাত ছিল অন্ধকার। তাই তাদেরকে চেনা সম্ভব হয়নি। রসূল ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছ। তিনি বললেন- না, বুঝতে পারিনি। রসূল ﷺ তখন বললেন- তাদের ষড়যন্ত্র ছিল, তারা আমার সাথে চলবে। যখন আমি গিরিপথে উঠব, তখন তারা গিরি থেকে আমাকে নীচে ফেলে দিবে। হুযায়ফা বললেন- তাহলে আপনি তাদের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন- আমি চাইনা, লোকেরা বলাবলি করুক যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করা শুরু করছে।

অতঃপর তিনি হুযায়ফাকে ঐ দুইজন মুনাফেক এবং অন্যান্য সকল মুনাফেকের নাম বলে দিলেন এবং ঘটনা গোপন রাখতে বললেন।

মাসজিদে যিরারের ঘটনা

নাবী ﷺ যখন তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হলেন এবং মাত্র এক ঘন্টার দূরত্ব অতিক্রম করে যু-আওয়ান নামক স্থানে অবতরণ করলেন। তখন মাসজিদে যিরারের নির্মাণকারীগণ নাবী ﷺ-এর কাছে এসে উপস্থিত হল। তিনি তখন পুনরায় যাত্রা শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তারা বলল- হে আল্লাহর রসূল! দুর্বলদের জন্য এবং বৃষ্টিময় রাতে সলাত পড়ার জন্য আমরা একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছি। আমরা চাই যে, আপনি তাতে আসবেন এবং সলাত পড়ে মাসজিদটি উদ্বোধন করে দিবেন। রসূল ﷺ বললেন- আমি সফরে বের হচ্ছি। ফেরত এসে ইনশা-আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যাবো। তাবুক থেকে ফেরার পথে পুনরায় যখন যু-আওয়ান নামক স্থানে অবতরণ করলেন তখন আকাশ থেকে মাসজিদটির প্রকৃত খবর চলে আসল। তখন তিনি মালেক বিন দুখশুম এবং মাআন বিন আদীকে ডেকে বললেন- তোমরা উভয়ে দ্রুত জালেমদের এই মাসজিদে যাও এবং এটিকে ধ্বংস করে আগুন দিয়ে জালিয়ে দাও। তারা উভয়ে দ্রুত বের হয়ে বনী সালেম গোত্রের নিকট গেলেন। বনী সালেম ছিল মালেক বিন দুখশুমের গোত্র। তিনি তখন মাআনকে বললেন- তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি বাড়িতে গিয়ে আগুন নিয়ে আসি। তিনি খেজুর গাছের একটি ডাল নিয়ে তাতে আগুন ধরালেন। তারা উভয়ে দৌড়িয়ে গিয়ে মাসজিদটিতে প্রবেশ করলেন। তখনও ঐ দুষ্টরা মাসজিদেই ছিল। এরপর তারা উভয়েই মাসজিদটি ধ্বংস করে ফেললেন এবং তাতে আগুন জালিয়ে দিলেন। মুনাফেকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তখন এই আয়াত নাযিল করলেন-

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

"আর যারা নির্মাণ করেছে মাসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ, যে পূর্ব থেকে আল্লাহ্ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করে

আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক"।[২৮৫]

তাবুক যুদ্ধ হতে বিজয়ী বেশে নাবী ﷺ মদীনায় আসছেন। সফর ছিল অনেক লম্বা। বিপদাপদে ছিল পরিপূর্ণ। সকল বাধা উপেক্ষা করে বিজয়ী বেশে যখন মদীনার একদম কাছে চলে আসলেন তখন মদীনায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ এবং শিশু-কিশোর এক কথায় সকল শ্রেণীর মানুষ রসূলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মদীনার বাইরে চলে আসল। মদীনার কিশোরী মেয়েরা নিম্নের এই কবিতাগুলো আবৃতি করে তাদের প্রিয় নাবীকে স্বাগত জানিয়েছিলঃ

طَلَعَ البَــدْرُ عَلَيْنَا + مِـنْ ثَنِيَّاتِ الوَدَاعِ

وَجَـبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا + مَا دَعَـا لِلّٰهِ دَاعِى

"ছানিয়াতুল ওয়াদার দিক থেকে আমাদের উপর পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হয়েছে যতদিন আল্লাহর পথে আহবানকারী আহবান করবে, ততদিন আমাদের উপর শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা, রসূল ﷺ যখন হিজরত করে মক্কা হতে মদীনায় আগমণ করলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এগুলো আবৃত্তি করেছিল। এটি ভুল ধারণা। কেননা ছানিয়াতুল ওয়াদা সিরিয়ার (তাবুকের) পথে অবস্থিত। মক্কা থেকে মদীনায় প্রবেশের সময় ছানিয়াতুল ওয়াদা চোখে পড়ে না। মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় সিরিয়া বা তাবুকগামী লোক ছাড়া অন্য কেউ এই পথে অতিক্রম করেনা।

মদীনায় প্রবেশের নিকটবর্তী হয়ে তিনি বললেন- এটি হচ্ছে 'তাবা' (পবিত্র শহর)। তিনি উহুদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন- এটি হচ্ছে উহুদ। এটি এমন পাহাড়, যা আমাদেরকে ভালবাসে। আমরাও এটিকে ভালবাসি।[২৮৬] মদীনায় প্রবেশ করে তিনি প্রথমে সরসূরি মাসজিদে গেলেন এবং দুই রাকআত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি মানুষের সামনে বসলেন। যারা রসূল ﷺ-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে যায়নি, তারা এসে ওযূহাত পেশ করতে লাগল এবং কসম খেতে লাগল। তাদের সংখ্যা ছিল আশির উপরে। বাহ্যিক দিকে লক্ষ্য করে তিনি তাদের ওজর (ওযূহাত) কবুল করলেন এবং অন্তরের বিষয়টি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিলেন। তাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুরআনের এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়ঃ

﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

---

২৮৫. সূরা তাওবা-৯: ১০৭

২৮৬. বুখারী ও মুসলিম।

"তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট নানা ধরণের ওযর (ওযূহাত) নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলঃ তোমরা ওযর পেশ করোনা, আমরা কখনও তোমাদের কথাই বিশ্বাস করবোনা। আমাদেরকে আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহ্ই দেখবেন এবং তার রসূলও। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁরই দিকে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জানেন। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। তোমরা তাদের কাছে ফিরে এলে তারা তোমার সামনে আল্লাহ্র কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। সুতরাং তুমি তাদের পরিহার করো। নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। অতএব, তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ তা'আলা কখনও এহেন ফাসেকের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না"।[২৮৭]

তাবুক যুদ্ধের ঘটনা থেকে যে সমস্ত বিধি-বিধান জানা যায়

- হারাম মাসে যুদ্ধ করা জায়েয আছে। বিশেষ করে যদি রজব মাসে তাবুকের দিকে বের হওয়ার ঘটনা সহীহ হয়ে থাকে। এখানে আরেকটি কথা হচ্ছে তাবুকের অভিযান ছিল খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে। তারা অন্যান্য আরব গোত্রের ন্যায় হারাম মাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতনা।
- মুসলমানদের ইমামের কর্তব্য হল তিনি সকল মুসলিমকে ঐ বিষয়গুলো জানিয়ে দিবেন, যা গোপন রাখলে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে এবং ঐ সমস্ত বিষয়গুলো তাদের থেকে গোপন রাখবেন, যেগুলো গোপন রাখার মধ্যে তাদের কল্যাণ রয়েছে।
- মুসলিমদের রাষ্ট্রপ্রধান যদি জিহাদে যাওয়ার ডাক দেন, তাহলে সকলের জন্যই জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক। ইমামের অনুমতি ব্যতীত কারও জন্য পিছনে থাকা বৈধ নয়। সৈনিকদের বের হওয়ার ব্যাপারে এটি জরুরী নয় যে, রাষ্ট্র নায়ক প্রত্যেকের নাম আলাদাভাবে ঘোষণা করবেন। যেই স্থানে জিহাদ করা ফরযে আইন, তার মধ্যে এটিও একটি। অর্থাৎ (১) নেতা যখন জিহাদের ডাক দিবে, (২) শত্রুরা যখন মুসলিমদের দেশে আক্রমণ করবে, (৩) যখন মুজাহিদগণ জিহাদের জন্য শত্রু পক্ষের মুখোমুখি কাতারবন্দী হয়ে যাবে, তখন সেখান থেকে সরে যাওয়া নিষিদ্ধ।
- জান দ্বারা যেমন আল্লাহর পথে জিহাদ করা আবশ্যক তেমনি মাল দ্বারাও জিহাদ করা আবশ্যক। এটিই সঠিক কথা। এতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু একটি স্থান ব্যতীত সকল স্থানে নফসের দ্বারা জিহাদ করার পূর্বে মাল দ্বারা জিহাদ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।
- এই যুদ্ধে উছমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রচুর পরিমাণ সম্পদ খরচ করেছিলেন এবং সকল লোকের চেয়ে তাঁর অবদানই অধিক ছিল।
- যারা সম্পদ না থাকার কারণে জিহাদে যেতে অক্ষম, তাদের ওযর ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হবেনা, যতক্ষণ না তারা সম্পদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। তাবুক যুদ্ধের সময় অপারগরা যখন রসূল

২৮৭. সূরা তাওবা-৯: ৯৪-৯৬

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে সওয়ারী চাইলেন এবং তা না পেয়ে যুদ্ধে শরীক হতে না পারার দুঃখে ক্রন্দরত অবস্থায় ফেরত গেলেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিহাদে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

- শাসক যখন জিহাদের সফরে বের হবেন, তখন অনুসারীদের কাউকে নায়েব নির্ধারণ করলে সেই নায়েবকে মুজাহিদদের মধ্যে গণ্য করা হবে। কেননা সেও তার কাজের মাধ্যমে মুজাহিদদেরকে সহযোগিতা করে থাকে।

- ছামুদ জাতির অঞ্চলের কূপের পানি পান করা জায়েয নেই। তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা বা রান্না কিংবা আটা গুলাও জায়েয নেই। তবে উটনী যেই কূপ থেকে পানি পান করত, তা ব্যতীত অন্যান্য কূপের পানি চতুষ্পদ জন্তুকে পান করানো যাবেনা। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগ পর্যন্ত এই কূপটি পরিচিত ছিল। শত শত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও বর্তমান কাল পর্যন্ত কূপটি রয়ে গেছে। তাবুকের পথে কাফেলার সওয়ারীগুলো এই কূপ ব্যতীত অন্য কোন কূপের কাছে অবতরণ করেনা। কূপটি গোলাকার, এর প্রাচীর খুব মজবুত, খুব প্রশস্ত, এটি যে অত্যন্ত পুরাতন, তার আলামত সুস্পষ্ট এবং এটি অন্যান্য কূপের মত নয়।
- গাছের কাঁচা ফল অনুমান করে পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে। অনুমানকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য।
- যেই স্থানে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছে বলে পরিচিত এবং যারা আল্লাহর আযাবে নিপতিত হয়েছে, তাদের বাড়িঘরে প্রবেশ করা অনুচিত। সেই অঞ্চলে অবস্থান করাও ঠিক নয়। সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত গতিতে এবং কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে যেতে হবে। তাদের জনপদে প্রবেশ করতে চাইলে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করতে হবে।
- সফর অবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই সলাত একত্রিত করে আদায় করতেন। তাবুক যুদ্ধের ঘটনায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জমা তাকদীম করেছেন। অর্থাৎ পরের সলাতকে আগের সলাতের সাথে মিলিয়ে পড়েছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- হাদীসটির ইল্লত তথা দুর্বল কারণগুলো আমরা উল্লেখ করেছি। জমা তাকদীম তথা পরের সলাতকে আগের সলাতের ওয়াক্তে এবং এক সাথে দুই সলাত পড়ার বিষয়টি শুধু তাবুকের সফরেই বর্ণিত হয়েছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরাফায় প্রবেশের পূর্বে আরাফার দিন যোহরের সাথে আসর সলাত পড়ার কথাটিও সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।
- বালি দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েয। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীগণ মদীনা ও তাবুকের মরুপথ অতিক্রম করেছেন। তারা সাথে মাটি নিয়ে যান নি। দীর্ঘ পথের কোথাও পানি ছিলনা। সাহাবীগণ পিপাসার অভিযোগও করেছিলেন।

- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুকে বিশ দিনেরও বেশী সময় অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তিনি সলাত কসর করতেন। তিনি এটি বলেন নি যে, কোন লোক বিশ দিনের অধিক অবস্থান করলে সলাত কসর করতে পারবেনা। ইমাম ইবনুল মুনযির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- মুসাফিরের জন্য সলাত কসর করা জায়েয হওয়ার বিষয়ে আলেমগণের ইজমা বর্ণিত হয়েছে। স্থায়ীভাবে বসবাস করার নিয়ত না করলে যত দিন ইচ্ছা কসর করতে পারবে। এভাবে বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও।

- কোন বিষয়ে শপথকারী যদি দেখে যে, শপথ পূর্ণ করার চেয়ে ভঙ্গ করার মধ্যেই অধিক কল্যাণ ও উপকার রয়েছে, তাহলে শপথ ভঙ্গ করা মুস্তাহাব এবং কাফ্ফারা আদায় করা মুস্তাহাব। ইচ্ছা করলে শপথ ভঙ্গ করার পূর্বেই কাফ্ফারা দিতে পারে, ইচ্ছা করলে পরেও দিতে পারবে।
- রসূান্বিত অবস্থায়ও শপথ সংঘটিত হয়। তবে শর্ত হল, রসূ যেন এমন না হয় যে, শপথকারী তখন কি বলছে, তা নিজেই বুঝতে অক্ষম। তাই রসূান্বিত অবস্থায় শপথ করলে, তার হুকুম কার্যকর হবে এবং তার ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য লেনদেনও কার্যকর হবে। তবে রসূান্বিত ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয় যে, তার মস্তিস্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, যার কারণে নিজের কথা নিজেই বুঝতে পারছে না, তাহলে তার কোন লেনদেনই গ্রহণযোগ্য হবেনা, তার শপথ, তালাক এবং দাসমুক্তিসহ কোন কিছুই কার্যকর হবেনা।
- নাবী ﷺ বলেন- لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ আমি তোমাদের বাহনের ব্যবস্থা করি নি; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের বাহনের ব্যবস্থা করেছেন। এই কথা দ্বারা জাবরিয়া[২৮৮] সম্প্রদায়

---

২৮৮. জাবরিয়া একটি বিদআতী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম খারাপ আকীদাহ হচ্ছে, তারা মনে করে বান্দার কোন কাজ নেই। বান্দার পক্ষ হতে যা কিছু হতে দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই করান। তাদের ধারণায়, আল্লাহ্ বান্দাকে পাপ করতে বাধ্য করেন। অনুরূপ আনুগত্যের কাজেও। তাদের মতে বান্দার কোন স্বাধীনতা বা ইচ্ছা নেই। উপরে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় আরও কিছু হাদীছ ও কুরআনের আয়াত দিয়ে তারা তাদের বাতিল মতের পক্ষে দলীল পেশ করার চেষ্টা করেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের অন্যতম আকীদা হচ্ছে, বান্দা যে সকল কাজ করে থাকে তাতে তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে থেকেও সে তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার বলে স্বীয় কাজগুলো করে থাকে। সুতরাং সে কাজের ইচ্ছা করে এবং কাজ সম্পাদন করে। তবে সে কেবল তাই করে, যা করার জন্য আল্লাহ্ তাকে অনুমতি দেন কিংবা তা বাস্তবায়ন করার শক্তি দেন। কাজেই বান্দার ইচ্ছা রয়েছে, যার মাধ্যমে সে ভাল বা মন্দের কোন একটি নির্বাচন করে। এই ইচ্ছার কারণেই ভাল কাজের জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং অন্যায় কাজের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া ইনসাফ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾

"তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন"। (সূরা দাহর-৭৬:৩০) আল্লাহ্ তাআ'লা আরও বলেনঃ

﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾

"কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না, আমি ওটা আগামীকাল করব। এটা না বলে যে, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে'। (সূরা কাহ্ফ-১৮:২৩,২৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

﴿مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াতের সরল-সহজ পথের সন্ধান দেন"। (সূরা আনআম-৬: ৩৯)

আর এ ব্যাপারে কাদরীয়া সম্প্রদায়ের আকীদাহ হচ্ছে জাবরীয়াদের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা কাদরীয়ারা তাকদীরকে অস্বীকার করে। তারা বলে পূর্বনির্ধারিত কোন কিছু নেই। বান্দা যা করে, তা পূর্বে লিখা হয় নি। সে যা করে তাতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বান্দা কাজ করার পরই আল্লাহ্ তা জানতে পারেন। সুতরাং এই বিশ্বাস করা যে, বান্দার কর্মে বান্দা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং পৃথিবীতে যত ঘটনা ঘটে, পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা তা অবগত নন- এটি একটি সুস্পষ্ট গোমরাহী ও কুফরী বিশ্বাস। ইসলামী শরীয়তের একটি প্রকাশ্য ও জরুরী বিষয়কে মিথ্যা বলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ ব্যাপারে সঠিক আকীদা হচ্ছে, সকল বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব হতেই অবগত আছেন। তিনি সমস্ত সৃষ্টির তাকদীর লিখে দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছা ও অবগতি ব্যতীত দুনিয়াতে কিছুই সংঘটিত হয় না এবং গাছের একটি পাতাও ঝরেনা। এর উপর কুরআন ও সুন্নাতের অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

"আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে"। (সূরা কামার-৫৪:৪৯) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেনঃ

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের শরীরে এমন কোন বিপদ আপতিত হয় না, যা সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি নি"। (সূরা হাদীদঃ ২২) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেনঃ

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾

"অতএব আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তকরণ খুলে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তকরণ খুব সংকুচিত করে দেন"। (সূরা আন-আম-৬:১২৫) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ)

"আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাকদীর লিখে দিয়েছেন। তাঁর আরশ পানির উপরে"। তিনি আরো বলেনঃ

(إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: لَهُ اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)

"আল্লাহ্ তা'আলা কলম সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম তাকে বললেনঃ লিখ। কলম বললঃ হে আমার প্রতিপালক! কী লিখব? আল্লাহ্ বললেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত আগমণকারী প্রতিটি বস্তুর তাকদীর লিখ"। নাবী ﷺ আবু হুরায়রাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

(يا أبا هريرة جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ)

"হে আবু হুরায়রা! পৃথিবীতে যা সৃষ্টি হবে তা লিখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। অর্থাৎ সবকিছু লিখা হয়ে গেছে।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এমন অনেক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যাতে কাদরীয়াদের (তাকদীর অস্বীকারকারীদের) নিন্দা করা হয়েছে। কোন কোন হাদীছে তাদেরকে এই উম্মাতের অগ্নিপূজক বলা হয়েছে। ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কাদরীয়ারা এই উম্মাতের অগ্নিপূজক। তারা অসুস্থ হলে তাদের দেখতে যাবে না এবং তাদের কারও মৃত্যু হলে তোমরা তার জানাযায় শরীক হবে না। ইমাম আবু দাউদ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সাহাবীদের যুগের শেষের দিকে সর্বপ্রথম বসরাতে মাবাদ আলজুহানী তাকদীর অস্বীকারের ঘোষণা দেয়। তার থেকে তারই ছাত্র গায়লান আদ্ দিমাসকী এটি গ্রহণ করে। যে সমস্ত সাহাবী তখন জীবিত ছিলেন এবং এই কথা শুনেছেন, তাদের সকলেই এ মতবাদ থেকে সাবধান করেছেন এবং এই মতবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আনাস বিন মালেক, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা এবং উকবা বিন আমের রাঃ অন্যতম।

সহীহ মুসলিমে ইয়াহইয়া বিন ইয়ামুর হতে বর্ণিত হয়েছে যে, বসরাতে সর্বপ্রথম মাবাদ আলজুহানী যখন তাকদীর সম্পর্কে কথা বলল, তখন আমি এবং আব্দুর রাহমান হিময়ারী হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা বললামঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেলে এ সকল লোক যা বলছে, সে ব্যাপারে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব। আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার রাঃ কে পেয়ে গেলাম। আমি বললামঃ হে আবু আব্দুর রাহমান! আমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আত্ম প্রকাশ করছে, যারা কুরআন পাঠ করে এবং ইলম চর্চাও করে। তাদের ব্যাপারে আরও বলা হয়েছে যে, তারা ধারণা করে, তাকদীর নেই। সব কিছুই নতুনভাবে শুরু হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কিছু হয়, তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত নয়; বরং নতুন করেই শুরু হয় এবং বান্দাই তার কর্মের স্রষ্টা। এমন কি বান্দা কাজ করার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা সেই কাজ সম্পর্কে জানেনও না। বান্দা যখন কোন কাজ করে তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তা জানতে পারেন। (নাউযুবিল্লাহ্) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার তখন বললেনঃ তুমি যদি তাদের সাক্ষাৎ পাও, তাহলে বলবে যে, আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সাথে তাদেরও কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহর শপথ! তাদের কারও যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণও থাকে এবং তা যদি আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দেয়, তার থেকে আল্লাহ্ তা কবুল করবেন না। যতক্ষণ না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান না আনবে। দেখুনঃ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, ইসলাম ও ইহসান।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের লোকগণ তাকদীরকে বিশ্বাস করেন। তথা সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার অবগতি ব্যতীত পৃথিবীতে কিছুই হয় না, মানুষ ও তার কর্মসমূহ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যা কিছু করে, তা করার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা অবগত থাকেন। এই বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের আকীদার অন্যতম অংশ। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে সাথে তারা এই বিশ্বাস করেন যে, মানুষেরও ইচ্ছা ও কর্ম নির্বাচনের স্বাধীনতা রয়েছে।

দলীল গ্রহণ করতে পারে। মূলতঃ এ দিয়ে তাদের দলীল দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এই কথা রসূল ﷺ-এর নিম্নোক্ত কথার অনুরূপ। তিনি বলেন-

«والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع و إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»

➢ "আমি কাউকে কিছুই দেইনা, কাউকে কোন কিছু থেকে বারণও করিনা। আমি কেবল বণ্টনকারী। আমাকে যেখানে দেয়ার হুকুম করা হয় আমি সেখানেই দান করি"।[২৮৯] সুতরাং আমি আল্লাহর একজন বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী কাজ করি। আমার প্রভু যখন আমাকে কোন বিষয়ে আদেশ করেন, আমি সেটি তামিল করি। সুতরাং আল্লাহই দানকারী, তিনি বঞ্চিতকারী এবং তাবুক যুদ্ধে বাহনহীন যোদ্ধাদের বাহনের ব্যবস্থাও করেছেন আল্লাহ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

---

এই ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা আছে বলেই তাকে শরীয়ত পালনের আদেশ দেয়া হয়েছে। বান্দা ও বান্দার ইচ্ছা উভয়েরই স্রষ্টা আল্লাহ। কুরআন মযীদ এই সত্যটিকেই সাব্যস্ত করেছে। সুন্নাতে নববীতেও সুস্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্যে উপদেশ, তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। তোমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না"। (সূরা তকাভীর- ৮১:২৭-২৯) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেনঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, যারা বলে মানুষ ইচ্ছা, শক্তি ও দৃঢ়তা দিয়েই কাজ করে, বান্দার কাজে বান্দা সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাতে আল্লাহর কোন দখল নেই, এমন কি কাজ করার আগে আল্লাহ্ তা'আলা জানতেও পারেন না, তাদের কথা বাতিল। আসল কথা হচ্ছে আল্লাহর পৃথিবীতে ও রাজ্যে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত বান্দা কোন কিছুই করতে পারে না। যেমন আমরা উপরে বর্ণিত দলীলসমূহের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বান্দার ইচ্ছা আছে বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার পূর্বে বান্দার ইচ্ছা কখনও কার্যকর হয় না। বান্দার কাজ প্রকৃতপক্ষে বান্দাই করে। এ জন্যই তার হিসাব নেওয়া হবে এবং বিনিময় দেয়া হবে।

মক্কার মুশরিকরাও তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করত। তবে তাদের সমস্যা ছিল যে, তারা শিরক ও গোমরাহীর উপর তাকদীর দ্বারা দলীল পেশ করত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ

"অচিরেই মুশরেকরা বলবেঃ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমন কি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুনঃ তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে পার? তোমরা শুধু আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল"। (সূরা আনআম-৬:১৪৮) সুতরাং পাপ কাজ করে তাকদীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা অন্যায় ও বাতিল। কেননা মুশরিক ও পাপীরা স্বীয় ইচ্ছা ও স্বাধীনতার বলে পাপের কাজ করে। সে এটা কখনই অনুভব করে না যে, তাকে কেউ চাপ দিয়ে করাচ্ছে। সুতরাং তার উপর আবশ্যক ছিল যে, সে সেচ্ছায় তার প্রভুর তাওহীদ বাস্তবায়ন করবে এবং শিরক ও পাপ কাজ বর্জন করবে। এ সবই তার ক্ষমতাধীন ও আয়ত্তে ছিল। (আল্লাহই ভাল জানেন)

২৮৯. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাগাযি।

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى

- "আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্"। (সূরা আনফাল-৮:১৭) বদরের যুদ্ধের দিন মাটির যেই মুষ্ঠি তিনি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন, তা কাফেরদের চেহারায় লেগে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য নিক্ষেপ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ তিনিই মুষ্ঠিভর্তি মাটি নিয়েছেন এবং নিক্ষেপ করেছেন। এই দিক থেকে তিনিই কাজটি করেছেন। অপর দিকে সকল কাফেরের চেহারায় মাটি পৌঁছে দেয়ার কাজটি নাবী ﷺ করেন নি; বরং তা করেছেন আল্লাহ্ তাআলা। এই দৃষ্টিকোন থেকে বলা হয়েছে যে, তিনি নিক্ষেপ করেন নি; বরং করেছেন আল্লাহ্ তাআলা। এটি একমাত্র আল্লাহরই কাজ, বান্দা এটি করতে সক্ষম নয়। নিক্ষেপ হচ্ছে প্রথম কাজ, যা করেছেন রসূল ﷺ। আর সকল কাফেরদের চেহারায় গিয়ে পৌঁছা হচ্ছে শেষ কাজ, যা করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা।
- আহলে যিম্মা তথা কর প্রদান চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোন অমুসলিম যদি এমন কোন কাজ করে, যা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতিকর, তাহলে তার জান ও মালের নিরাপত্তা জনিত চুক্তির মেয়াদ তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে। মুসলিমদের শাসক যদি অঙ্গিকার ভঙ্গকারীকে ধরতে অক্ষম হয়, তাহলে তার জান-মাল যে কোন মুসলিমের জন্য হালাল। নাবী ﷺ আয়লাবাসীদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, তাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।
- প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তিকে রাতেই দাফন করা জায়েয। কেননা নাবী ﷺ যুল-বিজাদাইনকে রাতেই দাফন করেছিলেন।
- ইমামুল মুসলিমীনের পক্ষ হতে প্রেরিত সারিয়া (যুদ্ধের ছোট বাহিনী) যদি মালে গণীমত অর্জন করতে পারে কিংবা শত্রুদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসতে পারে অথবা কোন দুর্গ জয় করতে পারে, তাহলে তা থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করার পর বাকী সবই মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করতে হবে। নাবী ﷺ দাওমাতুল জানদালের মালে গণীমত সৈনিকদের মাঝেই ভাগ করেছিলেন। খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নের্তৃত্বে এই অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। উকাইদারের সাথে সন্ধির মাধ্যমে তিনি দাওমাতুল জান্দাল জয় করেন। তবে বড় ধরণের অভিযান চলাকালে সৈনিকদের থেকে যদি সারিয়া (ছোট বাহিনী) অন্য কোন দিকে পাঠানো হয়, তাহলে তারা যদি মূল অভিযানের সৈনিকদের ক্ষমতাবলে কিছু অর্জন করে, তাহলে তাদের অর্জিত গণীমত খুমুস এবং নফল বের করার পর অবশিষ্ট সম্পদ সকলেরই প্রাপ্য হবে। এটিই ছিল নাবী ﷺ-এর পবিত্র সুন্নাত।
- তাবুক যুদ্ধের সময় নাবী ﷺ বলেন- মদীনায় এক দল লোক রয়ে গেছে। যখনই তোমরা কোন পথ বা উপত্যকা অতিক্রম করেছ, তখনই তারা তোমাদের সাথে ছিল। এর দ্বারা কলবী (অন্তরের) জিহাদ উদ্দেশ্য। এটি চার প্রকার জিহাদের অন্যতম একটি প্রকার। জিহাদের বাকী প্রকারগুলো হচ্ছে, জিহাদে মালী (মালের জিহাদ), জিহাদে লিসানী (জবান ও কলমের মাধ্যমে জিহাদ) এবং জিহাদে বদনী (জানের মাধ্যমে জিহাদ)।
- পাপ কাজের আড্ডা ও স্থানসমূহ জ্বালিয়ে দেয়া উচিত। কেননা নাবী ﷺ মাসজিদে যিরারকে জ্বালিয়ে ও ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। সেটি ছিল মাসজিদ। সেখানে সলাত পড়া হত

এবং তাতে আল্লাহর যিকির করা হত। যেহেতু এটি নির্মাণ করা হয়েছিল মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য, মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং মুনাফেকদের ষড়যন্তের জন্য, তাই এটি ধ্বংস করে দেয়া হল। যে কোন জায়গার অবস্থা এ রকম হবে, শাসকের উপর আবশ্যক হচ্ছে, তা আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলা বা ধ্বংস করে দেয়া। তা যদি করা সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে সেই জায়গার শেকেল ও সুরত (আসল অবস্থা) পরিবর্তন করে দেয়া উচিত। যাতে করে সেখানে পাপ কাজের সুযোগ না থাকে।

➢ এই যদি হয় মাসজিদে যিরারের অবস্থা, তাহলে শির্কের আড্ডা তথা মাজার ও কবরের উপর নির্মিত গম্বুজগুলো ধ্বংস করে দেয়ার গুরুত্ব আরও বেশী। কারণ এগুলোর খাদেমরা যিয়ারতকারীদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করার আহবান জানায়। এমনি যে সমস্ত স্থানে মদপান, অশ্লীল কাজ ও নানা ধরণের অপকর্ম হয়, সেগুলোও গুড়িয়ে দেয়া উচিত। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন জানতে পারলেন যে, একটি গ্রামে মদ ক্রয়-বিক্রয় হয়, তখন তিনি সেই গ্রামকে সম্পূর্নরূপে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তিনি রুওয়াইশীদ আল-ছাকাফীর মদের দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে ফাসেক ও বদমাইশ নামে প্রসিদ্ধ করে দিয়েছেন। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন জনগণ থেকে দূরে সরে এসে নিজ প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন তিনি তার ঘরকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমআ ও জামআত পরিত্যাগকারীদের ঘরও জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নারী ও শিশু থাকার কারণে তিনি ঘর জ্বালিয়ে দেন নি।

➢ ইবাদত ও নৈকট্যের কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে ওয়াক্‌ফ করা সহীহ নয়। তাই মাসজিদে যিরারের ওয়াক্‌ফ সঠিক ছিলনা। সুতরাং কবরের উপর মাসজিদ নির্মিত হলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। এমনি মাসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করা হলে, তাকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং অন্যান্য ইমামগণ সুস্পষ্ট করে এ কথাই বলেছেন। ইসলামে কবর ও মাসজিদ একত্রিত হতে পারেনা। কবর এবং মাসজিদের যেটি আগে হবে, সেটিই টিকবে। এ দু'টির একটি আগে হলে এবং তার উপর অন্যটি স্থাপন করা হলে পরেরটি উঠিয়ে ফেলতে হবে। আগেরটিই টিকে থাকার হকদার। আর দু'টিই যদি এক সাথে করা হয় তাও জায়েয নেই। এ ধরণের কাজে ওয়াক্‌ফ করা হলে, তা সহীহ হবেনা। যেই মাসজিদে কবর আছে বা কবরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত সহীহ নয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই মাসজিদে সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন এবং যারা কবরকে মাসজিদে পরিণত করে কিংবা তাতে বাতি জ্বালায়, তাদের উপর অভিশাপ করেছেন। এই হচ্ছে ইসলামের সঠিক শিক্ষা, যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবী ও রসূলকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ইসলামের এই আসল শিক্ষা মানুষের মাঝে প্রায় অপরিচিত হয়ে গেছে।

➢ আনন্দ প্রকাশের জন্য সম্মানী ব্যক্তিদের আগমণে কবিতা আবৃত্তি করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, তার সাথে যেন হারাম বিষয়ের সংযোগ না হয়। যেমন বাদ্য যন্ত্র, অশণ্টীল গান ইত্যাদি।

➢ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাবুক থেকে বিজয়ী বেশে ফেরত আসলেন তখন প্রশংসাকারীগণ তাঁর প্রশংসা করছিল। তিনি তা শুনছিলেন। কোন প্রকার প্রতিবাদ করেন নি। অন্যদেরকে এর উপর কিয়াস

করা যাবেনা। কেননা সকল প্রশংসাকারী এবং প্রশংসিত ব্যক্তিগণ একই রকম নন। তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর নাবী ﷺ বলেছেন-

«احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ»

"তোমরা প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর"।[২৯০]

কাব বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং তাঁর সাথীদের ঘটনা

কা'ব বিন মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- নাবী ﷺ যত যুদ্ধ করেছেন, তাবুক যুদ্ধ ব্যতীত তার সবগুলোতেই আমি শরীক ছিলাম। তবে এর আগে আমি বদরের যুদ্ধেও অনুপস্থিত ছিলাম। বদরের যুদ্ধে যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের কাউকেই তিনি দোষারোপ করেন নি। কারণ তিনি বের হয়েছিলেন কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে ধরার জন্য। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এবং তাদের শত্রুবাহিনীকে অনির্দিষ্ট একটি স্থানে এবং সময়ে একত্রিত করেছেন। আর আমি রসূল ﷺ এর সাথে আকাবার রাত্রিতে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমরা সকলেই ইসলামের বায়আত করেছিলাম। আকাবার বায়আতের চেয়ে আমার কাছে বদরের যুদ্ধে শরীক হওয়া অধিক পছন্দনীয় ছিল না। যদিও বদরের যুদ্ধের ঘটনাটি আকাবার ঘটনার চেয়ে অধিক আলোচিত বিষয় ছিল।

কা'ব বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- তাবুক যুদ্ধ হতে পিছিয়ে থাকার সময় আমি অন্য সময়ের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহর শপথ! ইতিপূর্বে আমার নিকট কখনো একসাথে দু'টি সওয়ারী ছিলনা। অথচ এ যুদ্ধের সময় আমি দু'টি সওয়ারীর মালিক হয়ে গিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ্ ﷺএর নিয়ম ছিল তিনি যখনই কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করতেন, তখন সুস্পষ্ট করে যুদ্ধের স্থানের নাম জানাতেন না; বরং তিনি প্রথমে অস্পষ্ট কতিপয় শব্দ ব্যবহার করতেন। রসূল ﷺ যখন তাবুক যুদ্ধ করলেন তখন ছিল প্রচন্ড গরম। পথ ছিল দীর্ঘ ও বিপদাপদপূর্ণ। শত্রুর সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ জন্যই তিনি মুসলমানদের কাছে বিষয়টি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলেন। যাতে তারা ভালভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তিনি সেই যুদ্ধের কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন। বিপুল সংখ্যক মুসলমান তাঁর সাথে যাত্রা করলেন। তবে এমন কোন খাতা (রেজিষ্ট্রি খাতা) ছিলনা, যাতে তাদের সকলের নাম লিপিবদ্ধ থাকতো। কা'ব বলেন- যে ব্যক্তি সেদিন অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করতো, তার ধারণা ছিল যে অহী না আসা পর্যন্ত তার ব্যাপারটি রসূল ﷺ জানতে পারবেন না। রসূলুল্লাহ ﷺ সেই যুদ্ধটি এমন এক সময় করলেন, যখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়ায় বসা আরামদায়ক মনে হত। রসূল ﷺ এবং তাঁর সাথীগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। আমি সকাল বেলা প্রস্তুতি গ্রহণ করার কথা চিন্তা করতাম। কিন্তু সারা দিন চলে যেতো অথচ আমি কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারতাম না। আমি মনকে এ বলে শান্তনা দিতাম যে, আমি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। এরই মধ্যে লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। একদিন সকাল বেলা নাবী ﷺ মুসলমানদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। অথচ তখনো আমি কোন প্রস্তুতিই

---

২৯০. মুসনাদে আহমাদ, হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে, হা/১৮৬।

গ্রহণ করি নি। আমি বললামঃ এই তো এক দিন বা দু'দিনের মধ্যেই প্রস্তুতি নিয়ে নেবো এবং পথে তাদের সাথে মিলিত হয়ে যাবো। তাদের চলে যাবার পরের দিন সকালে আমি প্রস্তুতি নিতে চাইলাম। দিন চলে গেল। অথচ আমি কোন প্রস্তুতিই নিতে পারলামনা। তারপরের দিন আবার প্রস্তুতি নিতে চাইলাম, কিন্তু এবারও কিছুই করতে পারলাম না। দিনের পর দিন আমার এ অবস্থা চলতে থাকলো। এখন তো সকলেই দ্রুত গতিতে চলে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। আমি পুনরায় বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম এবং তাদের সাথে মিলিত হতে চাইলাম। আহা! যদি আমি এমনটি করে ফেলতাম! কিন্তু তা আমার পক্ষে সম্ভব হলনা। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন শহরে লোকদের মাঝে বের হতাম এবং পথে-ঘাটে ঘুরাফেরা করতাম তখন এ বিষয়টি আমাকে খুবই ব্যথিত করতো যে, তখন শহরে মুনাফিক অথবা দুর্বল হওয়ার কারণে যাদেরকে আল্লাহ্ পিছনে থাকার অনুমতি দিয়েছেন তাদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। তাবুক না পৌঁছে রসূল ﷺ রাস্তায় কোথাও আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন না। তবে তাবুকে পৌঁছে যখন তিনি সবাইকে নিয়ে বসলেন, তখন আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- কাবের কি হয়েছে। বনী সালামার এক লোক বলল- হে আল্লাহর রসূল! তার সুস্বাস্থ্য ও সম্পদের দু'টি চাদর তাকে আটকে দিয়েছে এবং সেই চাদর দু'টির কিনারায় তাকিয়ে দেখাতে ব্যস্ত রয়েছে। এ কথা শুনে মুআয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- তুমি কতই না নিকৃষ্ট কথা বললে। আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আমি তার ব্যাপারে ভাল ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। রসূল ﷺ এ কথা শুনে চুপ করে থাকলেন।

কা'ব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- যখন আমি জানতে পারলাম রসূল ﷺ ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তা করতে লাগলাম এমন কোন মিথ্যা বাহানাবাজি করা যায় কি না, যার মাধ্যমে আমি তাঁর ক্রোধ হতে বেঁচে যেতে পারি। এ লক্ষ্যে আমি ঘরের প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের কাছে পরামর্শ চাইলাম। পরবর্তীতে যখন বলা হলো যে, রসূল ﷺ মদীনার নিকটবর্তী হয়ে গেছেন, তখন আমার অন্তর থেকে সমস্ত বাতিল চিন্তা বের হয়ে গেল। আর আমি বুঝতে সক্ষম হলাম যে, মিথ্যা কথা আমাকে তাঁর ক্রোধ হতে বাঁচাতে পারবেনা। কাজেই আমি সত্য কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। সকালে রসূল ﷺ মদীনায় পৌঁছে গেলেন। আর তাঁর নিয়ম ছিল যখনই তিনি সফর হতে ফিরে আসতেন প্রথমে মদীনায় মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত সলাত পড়তেন। তারপর লোকদের সাথে কথা বলার জন্য বসে যেতেন। যখন তিনি সলাত শেষ করে বসে গেলেন, তখন তাবুক যুদ্ধ হতে পিছিয়ে থাকা লোকেরা আসতে লাগল। তারা নিজেদের ওযুহাত পেশ করতে লাগল এবং শপথ করতে লাগল। তাদের সংখ্যা ছিল আশির উপরে। রসূল ﷺ তাদের ওযর কবুল করে নিলেন। তাদের কাছ থেকে পুনরায় বায়আত নিলেন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করলেন। আর তাদের মনের গোপন বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলেন। কা'ব বলেন- আমিও তাঁর কাছে আসলাম। আমি সালাম দিলে তিনি ক্রোধ মিশ্রিত মুচকি হেসে সালামের জবাব দিলেন। তারপর বললেন- এসো এসো। আমি গিয়ে তার সামনে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে বললেন- তোমাকে কিসে আটকে রেখেছিল? তুমি কি সওয়ারী কিনে রাখোনি? আমি বললামঃ হ্যাঁ আমি তা করেছিলাম। তবে আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার আর কোন মানুষের সামনে বসতাম, তাহলে তার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য কোন মিথ্যা ওযূহাত পেশ করে চলে যেতাম। কারণ আমাকে কথা বলার যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে। কা'ব ইবনে মালেক বলেন- আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই অবগত আছি যে, আমি যদি আজ আপনার কাছে মিথ্যা বলে

আপনাকে খুশী করে যাই, তাহলে কাল আল্লাহ্ আপনাকে আমার উপর নাখোশ করে দিবেন। আর আজ যদি আমি আপনার সামনে সত্য কথা বলে যাই, তাতে নাখোশ হলেও এতে আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশা আছে। আল্লাহর কসম! আমার কোন ওযূহাত ছিলনা। আল্লাহর কসম! আমি যখন আপনার থেকে পিছনে রয়ে যাই তখন আমি যে রকম শক্তিশালী ছিলাম তেমন শক্তি ও সামর্থের অধিকারী অন্য কোন সময় ছিলামনা।

এ কথা শুনে রসূল ﷺ বললেন- কা'ব সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে চলে যাও। দেখো আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে কি ফয়সালা দেন। কা'ব বলেন- আমি উঠে পড়লাম। বনী সালামার কিছু লোকও আমার সাথে চলতে লাগল। তারা আমাকে বলল- আল্লাহর কসম! আমরা তো এ পর্যন্ত তোমার কোন গুনার কথা জানিনা। পিছনে থেকে যাওয়া অন্যান্য লোকদের মত তুমিও রসূল ﷺএর নিকট একটি বাহানা পেশ করতে অক্ষম হয়ে গেলে? রসূল ﷺএর ইসতেগফার তোমার গুনার জন্য যথেষ্ট হতো। আল্লাহর কসম! তারা বার বার আমাকে দোষারোপ করতে থাকলো। এমন কি এক পর্যায়ে আমি রসূল ﷺএর নিকট ফিরে এসে প্রথম কথাটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে মনস্থ করলাম। তারপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ আমার মত আর কেউ আছে কি, যে রসূল ﷺএর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করেছে? তারা বলল- আরো দুইজন লোক আছে। তারাও আপনার মতই সত্য কথা স্বীকার করেছে। তাদেরকেও সেই কথা বলা হয়েছে, যা আপনাকে বলা হয়েছে। আমি তাদেরকে বললামঃ তারা কারা? লোকেরা জবাব দিল যে, তারা দু'জন হচ্ছেনঃ মুরারাহ ইবনে রাবীআ আল-আমরী ও হিলাল ইবনে উমাইয়া আল-ওয়াকিফী। মোট কথা, তারা আমার কাছে এমন দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করলেন, যারা ছিলেন ভাল লোক। তারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা ছিলেন খুবই আদর্শবান। তারা যখন তাদের নাম বলল, তখন আমি চলতে শুরু করলাম।

এদিকে রসূল ﷺ পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্য থেকে এই তিনজনের সাথে কথা বলা সকল মুসলমানের জন্য নিষেধ করে দিলেন। কাজেই লোকেরা আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তাদের অবস্থা এত পরিবর্তন হয়ে গেল যে, তারা যেন আমাদেরকে চিনেইনা। পরিশেষে আমার অবস্থা এমন হলো যে, চিরচেনা পৃথিবীর সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশটি রাত কাটালাম। আমার অন্য ভাই দু'জন ঘরের মধ্যে বসে গেলেন এবং ক্রন্দন শুরু করলেন। আমি যেহেতু গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম, তাই আমি ঘর থেকে বের হতাম এবং মুসলমানদের সাথে সলাতে যোগ দিতাম এবং বাজারে ঘুরাফেরা করতাম। রসূল ﷺ যখন সলাতের পর লোকদেরকে নিয়ে বসতেন, তখনও আমি তার কাছে গিয়ে সালাম দিতাম। আমি মনে মনে ভাবতাম, আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁট নড়লো কি না? অতঃপর আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে সলাত পড়তাম এবং বাঁকা দৃষ্টিতে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখতাম। আমি লক্ষ্য করতাম যে, আমি যখন সলাতে মশগুল থাকি, তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আবার আমি যখন তার দিকে চাইতাম, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত লোকদের বিমুখতা যখন আমাকে দিশেহারা করে দিল, তখন একদিন আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল টপকে তার কাছে আসলাম। সে ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জবাব দিলনা। আমি বললামঃ হে আবু কাতাদাহ! আল্লাহর কসম দিয়ে আমি তোমাকে

জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জাননা আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি? সে চুপ করে থাকলো। আমি আবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম। সে এবারও চুপ থাকলো। আমি তাকে তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করলাম। এবার সে জবাব দিলঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। এ কথা শুনে আমার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগল। আমি দেয়াল টপকে চলে আসলাম। এ সময় আমি একদিন মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। এসময় সিরিয়ার একজন খৃষ্টান কৃষক মদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে এসেছিল। সে বলতে লাগল- কে আমাকে কা'ব বিন মালেকের ঠিকানা বলে দিতে পারে? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করে তাকে বলে দিতে লাগল। সে আমার কাছে এসে গাস্সানের বাদশার একটি চিঠি আমার হাতে দিল। চিঠিতে বাদশা লিখছেনঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার নেতা আপনার উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ আল্লাহ্ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখেন নি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। আমরা আপনাকে মর্যাদা ও আরামের সাথে রাখবো। পত্রটি পড়ে আমি বললামঃ এটাও আর একটা পরীক্ষা। পত্রটি নিয়ে আমি চুলার নিকট গেলাম এবং তা পুড়ে ফেললাম। এভাবে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এমন সময় রসূল ﷺ-এর একজন দূত আমার কাছে এসে বললেন- আল্লাহর রসূল তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বললামঃ তালাক দিব? না অন্য কিছু করব? তিনি বললেন- না; বরং তার থেকে আলাদা থাক এবং তার কাছে যেয়োনা। আর আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও অনুরূপ বার্তা পাঠালেন। আমি আমার স্ত্রীকে বললামঃ তুমি নিজের আত্মীয়দের কাছে চলে যাও। আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে কোন ফয়সালা না দেয়া পর্যন্ত তাদের কাছে অবস্থান করতে থাকো।

কা'ব বিন মালেক বলেন- হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন- হে আল্লাহর রসূল! হেলাল ইবনে উমাইয়া অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার কোন খাদেম নেই। আমি যদি তার খেদমত করে দেই, তাতে কোন অসুবিধা আছে কি? জবাবে তিনি বললেন- কোন ক্ষতি নেই। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী বললেন- আল্লাহর কসম! তার মধ্যে এধরণের কোন আকাঙ্খা নেই। আল্লাহর কসম! যেদিন থেকে এঘটনা ঘটেছে সেদিন থেকে সে কেঁদে চলছে এবং আজো সে কাঁদছে। কাব বললেন- আমার পরিবারের কেউ কেউ আমাকে বলল- রসূল ﷺ হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তার স্বামীর খেদমত করার জন্য যেমন অনুমতি দিয়েছেন তেমন তুমিও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে একটা অনুমতি নিয়ে আসতে পার। আমি বললামঃ আল্লাহর কসম! আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে অনুমতি আনতে যাবোনা। আমি জানি না রসূল ﷺ এর কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইতে গেলে কি বলবেন। আর আমি তো একজন যুবক লোক। এরপর আমি দশ রাত কাটালাম। রসূল ﷺ আমাদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ করার পর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হয়ে গেল। পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হওয়ার পর ফজরের সলাত পড়লাম। সলাত শেষে আমি আমাদের ঘরের সামনে বসেছিলাম। এ সময় আমার অবস্থা সে রকমই ছিল যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন। আমার জীবন আমার নিকট যন্ত্রনাদায়ক হয়ে গেল। পৃথিবী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তা আমার নিকট অত্যন্ত সংকীর্ণ মনে হচ্ছিল। তখন আমি একটা আওয়াজ শুনলাম। সালা পাহাড়ের উপর থেকে কে একজন চিৎকার করে বলল- হে কা'ব বিন মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেন- এ কথা শুনে আমি সেজদায় পড়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার কষ্ট

কেটে গেছে। ফজরের সলাতের পর রসূল ﷺ আমাদের তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। লোকেরা আমাদের কাছে এসে সুসংবাদ দিতে লাগলো। আমার অপর দু'জন সাথীর কাছে গিয়েও সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দিতে লাগলো। একজন তো ঘোড়ায় চড়ে এক দৌড়ে আমার কাছে আসলেন। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে পাহাড়ে উঠলেন। তার কথা অশ্বারোহীর চেয়েও দ্রুততর হলো। আমি যেই সুসংবাদ গ্রহণকারীর আওয়াজ শুনেছিলাম, তিনি যখন আমার কাছে আসলেন তখন আমি এতো খুশী হলাম যে, আমার পোশাক জোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! তখন আমার কাছে ঐ কাপড় জোড়া ছাড়া আমার কোন কাপড় ছিলনা। তারপর আমি এক জোড়া কাপড় ধার করে নিলাম এবং পরিধান করে রসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করতে বের হলাম। চলার পথে লোকেরা দলে দলে আমার সাথে সাক্ষাত করতে লাগল। তাওবা কবুল হওয়ার কারণে আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগল। তারা বলতে লাগলোঃ আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এজন্য তোমাকে মুবারকবাদ। কা'ব বলেন- আমি যখন মাসজিদে গেলাম, তখন দেখলামঃ রসূল ﷺ বসে আছেন। লোকেরা চার পাশ থেকে তাঁকে ঘিরে বসে আছে। এ সময় তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ আমার দিকে দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্য হতে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ আমার নিকট এসে মুবারকবাদ দেন নি। তালহার এই আচরণ আমি কখনই ভুলতে পারবো না। কা'ব বলেন- তারপর আমি রসূল ﷺকে সালাম দিলাম। তখন তাঁর চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন- হে কা'ব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। আজকের দিনটি তোমার জন্য মুবারক হোক, যা তোমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল। কা'ব বলেন- আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ হতে? না আল্লাহর পক্ষ হতে? তিনি বললেন- না; বরং তা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর রসূল ﷺ যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারক চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আর আমরা চেহারা দেখে তাঁর খুশী বুঝতে পারতাম। আমি তাঁর সামনে বসে বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার তাওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পথে সাদকা করতে চাই। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন- সম্পদের কিছু নিজের জন্য রেখে দাও। তাতে তোমার ভাল হবে। আমি বললামঃ তাহলে আমি শুধু খায়বারের অংশটুকু আমার জন্য রাখলাম। তারপর আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি সত্য বলার কারণে আল্লাহ্ আমাকে নাজাত দিয়েছেন। কাজেই আমার তাওবা কবুল হওয়ার কারণে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমি সত্য কথাই বলতে থাকবো। আল্লাহর কসম! রসূল ﷺ এর কাছে সত্য কথা বলার কারণে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাকে যেমন সুন্দরভাবে পরীক্ষা করেছেন তার চেয়ে অধিক সুন্দর পরীক্ষা অন্য কোন মুসলমানকে করেছেন কি না- তা আমার জানা নেই। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোন মিথ্যা কথা বলিনি। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোয় আল্লাহ্ আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচাবেন বলে আশা করি। আর আল্লাহ্ তাঁর রসূলের উপর নিম্নের এই আয়াতটি নাযিল করেছেনঃ

﴿لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ------إلى قوله وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾

"আল্লাহ নাবী, মুহাজির ও আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখান থেকে "তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো" পর্যন্ত। (সূরা তাওবা-৯:১১৭-১১৯) কা'ব বলেন- আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণ করার পর এর চেয়ে বড় আর কোন অনুগ্রহ আমার উপর হতে দেখিনি যে, রসূল ﷺ এর সামনে সত্য কথা বলার

তাওফীক দান করে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অন্যথায় অন্য মিথ্যাচারীদের ন্যায় আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। কেননা অহী নাযিল হওয়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে যে মারাত্মক কথা বলেছেন তা আর কারোর সম্পর্কে বলেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

"তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। কাজেই তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, তারা অপবিত্র, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা যা করেছে, তার বিনিময়ে এটাই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের উপর খুশী হয়ে যাও। কিন্তু তোমরা তাদের উপর খুশী হলেও আল্লাহ্ অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর খুশী হবেন না। (সূরা তাওবা-৯:৯৫-৯৬)

কাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘটনায় যে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় জানা যায়

হে প্রিয় ভাই! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ও আপনাকে সঠিক কথা জানার এবং তার অনুসরণ করার তাওফীক দিন। জেনে রাখুন! কা'ব বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘটনা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা যায়-

- মুসলমানের গীবত করা হলে গীবতকারীর প্রতিবাদ করা মুস্তাহাব। যেমন করেছিলেন মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)
- পরিস্থিতি যতই জটিল হোক, সদা সত্য বলা জরুরী। কেননা এর পরিণতি ভাল হয়।
- সফর হতে আগমণ করে সর্বপ্রথম মাসজিদে গিয়ে দুই রাকআত সলাত পড়া মুস্তাহাব।
- সফর থেকে ফেরত এসে প্রয়োজন বশতঃ মানুষের সাথে মুলাকাত করার জন্য খোলা জায়গায় বসা মুস্তাহাব। চাই সে জায়গা মাসজিদ হোক বা অন্য কোন জায়গা।
- মানুষের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি খেয়াল করেই দুনিয়ার হুকুম-আহকাম প্রয়োগ করা হবে। অন্তরের অবস্থা আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দিতে হবে।
- প্রকাশ্যে পাপ কাজে লিপ্ত এবং বিদআতীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং সালাম-কালাম বন্ধ করে দেয়া জায়েয আছে। যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে তিরস্কার করা যায় এবং অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় হয়।
- কোন গুনাহ্-এর কাজ হয়ে গেলে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করা শুধু মুস্তাহাবই নয়; বরং ক্রন্দন করাই উচিত।
- যেই কাগজে ও পত্রে আল্লাহর যিকির ও নাম লিখা আছে, বিশেষ স্বার্থে তা আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলা জায়েয আছে। যেমনটি করেছিলেন কা'ব বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

- তালাকে কিনায়া তথা নিয়ত ব্যতীত ইঙ্গিত সূচক শব্দে তালাক কার্যকর হয়না। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল- তোমার পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে যাও। এ ধরণের বাক্য ব্যবহারের সময় তালাকের নিয়ত না করলে তালাক কার্যকর হবেনা।
- মহিলার জন্য তার স্বামীর খেদমত করা বৈধ। তবে এটি ওয়াজিব ও আবশ্যক নয়।
- কোন নিয়ামাত অর্জিত হলে সিজদায়ে শুকরিয়া আদায় করা মুস্তাহাব। এমনি কোন প্রকাশ্য কোন বালা-মসীবত দূর হয়ে গেলেও সিজদায়ে শুকরিয়া আদায় করা এবং দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব।
- কাউকে সুখবর দেয়া এবং মোবারকবাদ জানানো মুস্তাহাব। এমনি সুসংবাদ দানকারীকে কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে সম্মান করাও মুস্তাহাব।
- সম্মানিত ব্যক্তির আগমণে দাঁড়িয়ে সম্মান করা মুস্তাহাব। এর মাধ্যমে কেউ খুশী হলে তাও জায়েয। যেমন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তালহা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর দাঁড়ানোর মাধ্যমে খুশী হয়েছিলেন। এটি রসূল ﷺ এর সেই হাদীছের বিরোধী নয়, যেখানে তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি চায় যে, মানুষেরা তার সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়। কেননা এই ধমকি অহংকারীদের জন্য এবং যারা না দাঁড়ালে রসূান্বিত হয় তাদের জন্য। নাবী ﷺ ফাতেমার আগমণে খুশী হয়ে দাঁড়াতেন এবং ফাতেমাও নাবী ﷺ এর সম্মানে দাঁড়াতেন। এমনি ঐ সমস্ত কিয়ামের একই হুকুম, যা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ভালবাসা পয়দা করে এবং যা আল্লাহর অনুগ্রহে কোন মুসলমান ভাইয়ের অন্তরে আনন্দ দেয়। আমলসমূহ নিয়তের উপরই হয়ে থাকে। (আল্লাহই ভাল জানেন)
- মানুষ নিজেই নিজের প্রশংসা করতে পারে। তবে শর্ত হল তা যেন অহংকার বশত না হয়।
- আকাবার ঘটনা তথা বায়আতে আকাবা ছিল ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম একটি ফযীলতপূর্ণ ঘটনা।
- রসূল ﷺ এর বরকতময় যামানায় সৈনিকদের নাম লিখে রাখার জন্য কোন দফতর ও রেজিষ্টারের ব্যবস্থা ছিলনা। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগ থেকেই সেনাবাহিনীর জন্য আলাদা বিভাগ ও দফতর প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- কোন মানুষের যখন কোন ইবাদত করার এবং আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার সুযোগ আসে, তখন প্রচুর আগ্রহ ও উদ্যোমসহ সেই সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করা দরকার। কেননা ইবাদত-বন্দেগীর ইচ্ছা ও দৃঢ়তা দ্রুত গতিতে দুর্বল হয়ে যায়। খুব কম সংখ্যক লোকই দ্বীনের উপর সর্বদা কায়েম থাকার সুযোগ পায়। কারও যদি নেকীর কাজ করার সুযোগ হয়, আর সে যদি সেই সুযোগ কাজে না লাগায়, তাহলে শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ তার অন্তর এবং তার ইচ্ছার মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। ফলে সে আর উক্ত ভাল কাজটি করার সুযোগ পায়না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ

الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

" হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ্ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তারই নিকট সমবেত হবে"।[২৯১] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

"প্রথম বারে যেমন তারা এর প্রতি ঈমান আনেনি ঠিক তেমনিভাবেই আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিচ্ছি"।[২৯২] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

"অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না"।[২৯৩] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন-

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আর আল্লাহ্ কোন জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না, যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সে সব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব বিষয়ে ওয়াকেফহাল"।[২৯৪]

- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধের সফরে বের হতে কেবল মুনাফেক, অসুস্থ কিংবা তাঁর পক্ষ হতে কোন কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত লোকেরাই পিছিয়ে থাকত।

- ইমামুল মুসলিমীনের উচিত নয় যে, তিনি যুদ্ধে যাওয়া থেকে পিছিয়ে থাকা লোকদের কোন খোঁজ-খবর নিবেন না; বরং তাঁর উচিত পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং কৈফিয়ত তলব করবেন। যাতে সেই সাথী আনুগত্যের কাজে উৎসাহ পায়। কেননা তাবুকের পথে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে না দেখে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন- কা'বের কি হয়েছে? তাকে সংশোধনের নিয়তেই তিনি এভাবে খোঁজ-খবর নিলেন। ঐদিকে যে সমস্ত মুনাফেক তাবুক যুদ্ধে আসেনি, তাদের প্রতি অবহেলার কারণে তাদের কারও নামটি পর্যন্ত তিনি উচ্চারণ করেন নি।

- আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের খাতিরে ইজতেহাদের ভিত্তিতে কারও দোষ বর্ণনা করা জায়েয আছে। এর উপর ভিত্তি করেই মুহাদ্দিছীনে কেরাম হাদীছের রাবীদের দোষ বর্ণনা করেছেন বা তাদের ন্যায়পরায়নতার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং সুন্নী আলেমগণ বিদআতীদের প্রতিবাদ করেছেন।

---

২৯১. সূরা আনফাল-৮:২৪
২৯২. সূরা আনআম-৬:১১০
২৯৩. সূরা সাফ-৬১:৫
২৯৪. সূরা তাওবা-৯: ১১৫

- যদি যান্নে গালেব (প্রবল ধারণা) দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করেই কাউকে দোষারোপ করা হয়েছে, তাহলে দোষারোপকারীর জবাব দেয়া এবং তার প্রতিবাদ করাও জায়েয আছে। বিশেষ করে যখন জানা যাবে যে, দোষারোপকারী কোন মূলনীতির উপর ভিত্তি না করেই দোষারোপ করেছে এবং সে এ ক্ষেত্রে ভুল করেছে। যেমন মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মজলিসে দোষারোপ কারীর প্রতিবাদ করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা শুনেছেন এবং চুপ থেকেছেন। মুআযের এই কাজকে তিনি অপছন্দ করেন নি।

- সফর থেকে ফেরত আসার সময় ওযূ করে পবিত্র হয়ে নিজ মহল্লায় প্রবেশ করা সুন্নাত। সেই সাথে নিজ গৃহে প্রবেশের পূর্বে আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত সলাত পড়বে।

- মুসলিমদের শাসকের জন্য জায়েয আছে যে, কোন লোক ইসলামের মধ্যে বিদআত রচনা করলে শাসক তার সালামের জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকবেন। যাতে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

  শাসকের জন্য জায়েয আছে যে, তিনি তার সাথী ও প্রিয়জনদেরকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে দোষারোপ করতে পারবেন। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ তিনজনকে দোষারোপ করেছেন। বাকীদেরকে দোষারোপ করেন নি। মানব ইতিহাসে প্রিয়জনকে দোষারোপের বহু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

- আল্লাহ্ তা'আলা কাব বিন মালেক এবং তাঁর সাথীদ্বয়কে সত্য বলার তাওফীক দিয়েছেন এবং মিথ্যা ওজর পেশ করা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তারা যদি মিথ্যা বলতেন, তাহলে অল্প সময় তারা আরামে থাকতে পারতেন; কিন্তু আখিরাত সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেত। সত্যবাদীগণ দুনিয়াতে সামান্য সময় কষ্ট ভোগ করেন। কিন্তু তাদের আখিরাত খুব ভাল হয়। এর উপরই দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয় কায়েম রয়েছে। প্রথমে দুঃখ, পরে সুখ এবং প্রথমে অশান্তি, পরে শান্তি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু তাদের তিনজনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, তারা তিনজন বাদে বাকীরা মিথ্যুক ছিলেন। সুতরাং কথা-বার্তা বন্ধের মাধ্যমে তিনি সত্যবাদীদেরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আর এই ঔষধ মুনাফেকদের কোন কাজে আসবেনা বলেই তাদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কারণ তাদের অপরাধ এত বড় যে, শুধু কথা বলা বর্জনের মাধ্যমে তার বিনিময় দেয়া সম্ভব নয়।

- আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে গুনাহ্-এর শাস্তি এ জন্যই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর যেই বান্দাকে ভালবাসেন, তাকে সামান্য অপরাধের কারণেই পাকড়াও করেন ও শাস্তি দেন। যাতে পরবর্তীতে সাবধান ও সতর্ক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যেই বান্দা আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার কারণে তাঁর ভালাবাসা হারায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অবকাশ দেন। ফলে সে নির্ভয়ে গুনাহ্-এর কাজে লিপ্ত হয়। যখনই সে একটি গুনাহ্ করে, তখনই আল্লাহ্ তার জন্য নতুন একটি নিয়ামাত বৃদ্ধি করেন। এই বিভ্রান্ত লোকটি মনে করে, এটি তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কারামত ও সম্মান স্বরূপ। সে জানে না যে, এই নিয়ামাতই তার অপদস্তের কারণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এর মাধ্যমে কঠিন শাস্তি দিতে চান। হাদীছে এসেছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

  «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى

يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দেন। আর কোন বান্দার অকল্যাণ চাইলে পাপের কারণেও তার উপর থেকে দুনিয়ার শাস্তি উঠিয়ে নেন। যাতে করে পরকালে তাঁকে পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদান করেন"।[২৯৫]

- কাব বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আমি আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল বেয়ে উঠে বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন লোক তার সাথী ও প্রতিবেশীর ঘরে বিনা অনুমতিতেই প্রবেশ করতে পারে। বিশেষ করে যখন জানা যাবে যে, সাথী বা প্রতিবেশী এতে অসন্তুষ্ট হবেনা।
- সুসংবাদ দানকারী যখন কাব বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাওবা কবুল হওয়ার খবর নিয়ে আসল, তখন তিনি তা শুনে সিজদায়ে শুকরিয়া আদায় করলেন। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এটিই ছিল সাহাবীদের পবিত্র সুন্নাত। নতুন কোন নিয়ামাত প্রাপ্ত হলে অথবা কোন অকল্যাণ দূর হলে তারা সিজদায়ে শুকরিয়া আদায় করতেন। জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম) যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এই খবর নিয়ে আসলেন যে, কোন মুমিন তাঁর উপর একবার সালাত পেশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই মুমিনের উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায়ে শুকর আদায় করেছেন। এমনি যখন তিনি জানতে পেরেছেন যে, উম্মাতের জন্য তাঁর শাফাআত কবুল হবে, তখনও তিনি সিজদায়ে শুকরিয়া আদায় করেছেন। উম্মাতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তিনবার তাঁর শাফাআত কবুল করেছেন। মিথ্যুক নাবী মুসায়লামা কাজ্জাব নিহত হওয়ার খবর আসার পর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সিজদায়ে শুকরিয়া আদায় করেছেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন জানতে পারলেন যে, খারেজীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে নিহতদের মধ্যে যুল-ছাদইয়াকেও পাওয়া গেছে, তখন তিনিও সিজদায়ে শুকরিয়া আদায় করেছেন।
- একজন সাহাবী ঘোড়া ছুটিয়ে এবং অন্য একজন 'সালা' নামক পাহাড়ের উপর উঠে কা'ব বিন মালেকের তাওবা কবুল হওয়ার সংবাদটি ঘোষণা করে সুসংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, তখন মুসলমানদের পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত গাঢ় ছিল, তারা নেকীর কাজে খুব অগ্রগামী ছিলেন, একে অন্যের কল্যাণ কামণা করতেন এবং অন্যের সুখে সুখী হতেন ও দুঃখের অংশীদার হতেন।
- সু-সংবাদ দানকারীকে উপহার দেয়া উত্তম চরিত্রের আলামত। এটিও জানা যাচ্ছে, শরীরের সমস্ত কাপড় খুলে সু-সংবাদ দানকারীকে দিয়ে দেয়াও জায়েয আছে। এই ঘটনা থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, দ্বীন-দুনিয়ার যে কোন নিয়ামাত আসলে বন্ধুদেরকে মোবারকবাদ জানানো মুস্তাহাব। নেয়ামতপ্রাপ্ত লোকের জন্য দাঁড়ানো এবং তার সাথে মুসাফাহা করাও সুন্নাত। শুধু দ্বীনি ক্ষেত্রেই নয়; বরং পার্থিব কোন নিয়ামাত আসলেও নিয়ামাতপ্রাপ্ত লোককে মোবারকবাদ দেয়া জায়েয। এ ক্ষেত্রে এ ধরণের বাক্য উচ্চারণ করা উত্তম যে, আল্লাহ্ আপনাকে যা দিয়েছেন, তা বরকতময় হোক, আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামাত আপনার জন্য স্থায়ী হোক ইত্যাদি। এতে এক দিকে যেমন

---

২৯৫. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ মুসীবতে সবর করা। ইমাম আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, সিলসিলাহ সহীহা, হা/১২২০

আল্লাহর কাছ থেকেই নিয়ামাত আসার কথা স্বীকার করা হল, অন্যদিকে নিয়ামাত অর্জনকারীর জন্য দু'আও করা হল।

- একজন মানুষের কাছে সর্বোত্তম দিন সেটিই, যেদিন সে তাওবা করে এবং আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। কা'ব ও তাঁর সাথীদের তাওবা কবুলে নাবী ﷺ অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর উম্মাতের উপর অত্যন্ত দয়াশীল ছিলেন।

- তাওবা করার সময় ও তা কবুল হওয়ার সময় শুকরিয়া স্বরূপ সাধ্যানুযায়ী সাদকাহ করা মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি তার সমস্ত মাল সাদকাহ করে দেয়ার মানত করল, তার সকল সম্পদ দিয়ে দেয়া আবশ্যক নয়। সেখান থেকে কিছু মাল রেখে দেয়াতে অসুবিধা নেই।

- কাব বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘটনা থেকে সত্য কথা বলার ফযীলত জানা যায়। শুধু তাই নয়; দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সত্য বলার মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক শ্রেণী হচ্ছেন সৌভাগ্যশীল। তারা হলেন সত্যবাদী এবং সত্যকে সত্যায়নকারী। আরেক শ্রেণী হচ্ছে হতভাগ্য। তারা হল, মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার পথ অবলম্বনকারী। এটি হচ্ছে চূড়ান্ত শ্রেণী বিন্যাস। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"আল্লাহ্ তাঁর নাবীর এবং মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করেছেন (তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন), যারা কঠিন মুহূর্তে নাবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াবান হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়"।[২৯৬]

এই আয়াতের মাধ্যমে সহজেই তাওবার গুরুত্ব বুঝা যায়। মূলতঃ তাওবা বান্দাকে একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিনে পরিণত করে। জিহাদের ময়দানে আত্মত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে তা প্রদান করেছেন। বিশেষ করে মুসলমানেরা যখন তাদের জান, মাল এবং ঘরবাড়ি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করেছেন। এগুলোর পিছনে তাদের একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো মাফ করেন এবং তাদের তাওবা কবুল করেন। এ জন্যই নাবী ﷺ কাব বিন মালেকের তাওবা কবুলের দিন বলেছিলেন- জন্মের পর হতে আজকের দিনটিই তোমার জন্য

২৯৬. সূরা তাওবা-৯:১১৭

সর্বাধিক আনন্দময়। এই প্রকৃত সত্যটি কেবল সেই সঠিকভাবে বুঝতে পারবে, যে আল্লাহর পবিত্র যাতকে (সত্তাকে) চিনতে পেরেছে, তার উপর আল্লাহর হকসমূহ উপলব্ধি করতে পেরেছে, তিনিই যে ইবাদতের একমাত্র হকদার এটিও বুঝতে সক্ষম হয়েছে। সেই সাথে যে বান্দা তার নিজের সত্তা ও তার অবস্থাকে বুঝতে পেরেছে এবং এটি অনুভব করতে পেরেছে যে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত হক রয়েছে, সেগুলোর তুলনায় তার ইবাদত কেবল সামান্য এক বিন্দু পানির সমান, যা বিশাল সমুদ্রের মধ্যে ঢেলে দেয়া হয়। তাও আবার যখন রিয়া এবং অন্যান্য দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হয়।

সুতরাং সেই যাতে ইলাহী অতি পবিত্র, যার অনুগ্রহ ও ক্ষমা ছাড়া বান্দাদের কোন উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে তাওবার বিষয়টি দুইবার উল্লেখ করেছেন। একবার আয়াতের প্রথমে আরেকবার শেষের দিকে। প্রথমে তাদেরকে তাওবা করার তাওফীক দিয়েছেন, আবার দ্বিতীয়বারে তারা যখন তাওবা করেছেন, তখন আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেছেন। সকল প্রকার কল্যাণ কেবল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতেই, তাঁর তাওফীকের ফলেই, তাঁর জন্যেই এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণেই। যাকে ইচ্ছা, তিনি তাকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রদান করেন এবং ন্যায়বিচারার্থে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে যাকে ইচ্ছা তা থেকে বঞ্চিত করেন।

তাবুক থেকে ফেরত এসে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হজ্জের আমীর বানিয়ে মক্কায় প্রেরণ

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুক হতে ফেরত এসে রামাযানের বাকী দিনগুলো, শাওয়াল মাস এবং যুল-কাদ মাস মদীনাতে কাটালেন। অতঃপর নবম হিজরী সালে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নের্তৃত্বে মুসলিমদেরকে মক্কায় পাঠালেন। যাতে করে তিনি মুসলিমদের হজ্জের কার্যাবলী পরিচালিত করতে পারেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনশত লোক নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। রওয়ানা দেয়ার পর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর সূরা তাওবা নাযিল হয়। এতে মদীনার মুসলিম এবং মক্কার কুরাইশদের মধ্যকার চুক্তির অবসানের ঘোষণা দেয়া হয়। তাই আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উটনীর উপর আরোহন করে বের হয়ে রাস্তায় আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে দেখে বললেন- আপনাকে কি আমীর বানিয়ে পাঠানো হয়েছে? না মামুর বানিয়ে? তিনি বললেন- বরং মামুর বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। যাতে করে আমি মক্কাবাসীদের নিকট সুরা তাওবা পাঠ করে শুনাই এবং তাদের সাথে সকল চুক্তির মেয়াদের পরিসমাপ্তির কথা জানিয়ে দেই।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) লোকদেরকে হাজ্জ করাচ্ছিলেন। যখন যুল-হাজ্জ মাসের দশ তারিখ আসল, তখন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়ালেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- তিনি আমার নিকট দাঁড়িয়ে ঐ সমস্ত বিষয় ঘোষণা করলেন, যা ঘোষণা করার জন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আদেশ দিয়েছিলেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আমাকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারটি বিষয়ে ঘোষণা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

- এ বারের পর মুসলমান এবং মুশরিক মাসজিদে হারামে একত্রিত হতে পারবেনা। অর্থাৎ কোন মুশরিক কাবায় প্রবেশ করতে পারবেনা।

- উলঙ্গ হয়ে কেউ কাবার তাওয়াফ করতে পারবেনা।

- যাদের সাথে রসূল ﷺ-এর চুক্তি রয়েছে, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি বহাল থাকবে। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি নাই, তাদেরকে মাত্র চার মাস অবকাশ দেয়া হল।

- মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইবনে ইসহাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- নাবী ﷺ মক্কা বিজয় এবং তাবুকের অভিযান থেকে ফারেগ হলেন, তখন ছাকীফ গোত্র ইসলামে প্রবেশ করল। তার পর থেকেই সকল দিক থেকে আরব গোত্রের প্রতিনিধিরা আসতে লাগল। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এখানে বনী তামীম গোত্র, বনী তাঈ, বনী আমের, আব্দুল কায়েস গোত্র, বনী হানীফা, বনী কেন্দাহ, কবীলায়ে আশআরী, আয্দ গোত্র, নাজরানবাসী, হামদান গোত্র এবং নাজরানের খৃষ্টানদের প্রতিনিধিদলসহ অন্যান্যদের আগমণের এবং রসূল ﷺ কর্তৃক বিভিন্ন রাজা-বাদশার নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লেখার বিষয় উল্লেখ করেছেন।

তিব্বে নববী বা শারীরিক চিকিৎসায় নাবী ﷺ এর হিদায়াত

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন- এ পর্যন্ত আমরা নাবী ﷺ-এর পবিত্র জীবনীর বিভিন্ন দিক, ইবাদতের মধ্যে তাঁর সুন্নাতে তাইয়্যেবা এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তাঁর জিহাদগুলোর বিবরণ পেশ করেছি। এখন আমরা কয়েকটি পর্বে নাবী ﷺ এর ঐ সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করব, যা তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন এবং অন্যদেরকে গ্রহণ করতে বলেছেন। আমরা আরও উল্লেখ করব যে, কোন রোগের জন্য তিনি কি চিকিৎসা গ্রহণ করা বৈধ করেছেন। সেই সাথে তিব্বে নববীর ঐ হিকমতগুলোও উল্লেখ করব, ডাক্তারগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম।

কেননা তিব্বে নববী হচ্ছে নাবী ﷺ এর মুজেযার অংশ। আধুনিক চিকিৎসা যতই উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করুক না কেন, তা মুজেযায়ে নববীর পর্যায়ে পৌঁছতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

সুতরাং আমরা এখানে আল্লাহর উপর ভরসা করে শুধু ঐ সমস্ত রূহানী ও কুদরতী ঔষধের বর্ণনা করব, যার দ্বারা নাবী ﷺ চিকিৎসা করেছেন এবং যা বৈধ বলে অনুমোদন করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেনঃ

«الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ»

“বদ নযর (বদ নযরের প্রভাব) সত্য। কোন জিনিষ যদি তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারত, তাহলে বদ নজর তাকে অতিক্রম করত।”[২৯৭]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلّى الله عليهِ وسلّمَ رخّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَّةِ وَالنَّملةِ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বদ নযর, বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুর কামড় এবং ফুসফুসের আচ্ছাদক আবরণের স্ফীতি ও প্রদাহ জনিত রোগের (ফোঁড়ার) চিকিৎসায় ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।[২৯৮]

নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদা আমের ইবনে রাবীয়া সাহল ইবনে হুনাইফের কাছ দিয়ে অতিক্রম করল। সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) তখন গোসল করতে ছিলেন। আমের ইবনে রাবীয়া সাহলকে দেখে বলল, আমি আজকের মত লুকায়িত সুন্দর চামড়া আর কখনো দেখিনি। এ কথা বলার কিছুক্ষণ পর সাহ্ল অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে নাবী ﷺ এর কাছে নিয়ে এসে বলা হল, সাহ্ল বদ নযরে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা কাকে সন্দেহ করছ? তারা বলল, আমের ইবনে রাবীআকে। অতঃপর নাবী ﷺ এর কাছে আমেরকে আনয়ন করা হলে তিনি বললেন- কেন তোমাদের কেউ তার ভাইকে হত্যা করতে চায়? তুমি তার জন্যে বরকতের দু'আ করলে না কেন? অতঃপর তিনি আমেরকে বললেন- তুমি তার জন্য তোমার শরীর ধৌত কর। সে তার মুখমন্ডল, কনুইসহ উভয় হাত এবং হাটু পর্যন্ত এমনকি লুঙ্গীর নীচ পর্যন্ত একটি পাত্রে ধৌত করল। অতঃপর সেই পানি সাহলের শরীরে ঢেলে দেয়া হল।[২৯৯]

আব্দুর রাজ্জাক মা'মার থেকে, মা'মার তাউস থেকে আর তাউস তার পিতা হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা

---

২৯৭. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাম, মাশা, হা/ ২১৮৮/৪২
২৯৮. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সালাম, ইবনে মাজাহ, তাও. হা/৩৫১৬
২৯৯. ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব।

করেন যে,"الْعَيْنُ حَقٌّ وَإِذَا اسْتَغْسِلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ" "বদ নযরের প্রভাব সত্য, তোমাদের কাউকে যখন গোসল করতে বলা হয়, তখন সে যেন গোসল করে"।[৩০০]

ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- বদনযর প্রয়োগকারীকে আদেশ করা হবে, সে যেন একটি পাত্র থেকে পানি উঠিয়ে কুলি করে। অতঃপর কুলির পানি সেই পাত্রে নিক্ষেপ করে। তারপর সেই পাত্রে তার মুখমন্ডল ধৌত করবে। অতঃপর সে তার বাম হাত ধৌত করবে। অতঃপর ডান হাঁটুর উপর পানি ঢালবে। তারপর ডান হাত পানির মধ্যে ডুবাবে। অতঃপর বাম হাঁটুর উপর পানি ঢেলে লুঙ্গির নীচের অংশ ধৌত করবে। আর পাত্রটি যেন যমীনের উপর না রাখা হয়।

অতঃপর এই পানি বদনযরে আক্রান্ত রোগীর শরীরে পিছন দিক থেকে এক সাথে ঢেলে দেয়া হবে।[৩০১]

والعين عينان: عين إنسيّة وعين جنيّة

বদ নযর দুই প্রকারঃ মানুষের বদনযর এবং জিনদের বদনযর।

উম্মে সালামা হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর গৃহে এমন একটি মেয়েকে দেখলেন, যার চেহারা কালো রং ধারণ করেছিল। তখন তিনি বললেন- একে ঝাড়-ফুঁক কর। কারণ এর শরীরে বদনযর লেগেছে। ইমাম বগবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- হাদীছে বর্ণিত কালো রং(سـعف) বলতে জিনের বদনযর উদ্দেশ্য। মেয়েটির শরীরে জিনের বদ নযর লেগেছিল। জিনের বদনযর বর্শার অগ্রভাগের চেয়েও অধিক ধারালো হয়ে থাকে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিন এবং মানুষের বদনযর হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। একটি ফির্কা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কম হওয়ার কারণে বদনযরের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। অথচ বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞানী ও দার্শনিকরাও বদনযরের প্রভাবকে অস্বীকার করেনি এবং তারা এগুলোকে শুধু কল্পনা ও কুসংস্কার বলেনি। যদিও তারা এগুলোর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে মতভেদ করেছে।

কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তর ও শরীরে বিভিন্ন শক্তি ও স্বভাব তৈরী করেছেন। এই অন্তর বা রূহ ও শরীরগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যেই এমন এমন স্বভাব ও বৈশিষ্ট রয়েছে, যা অপরের উপর প্রভাব ফেলে। কোন জ্ঞানীই শরীরের উপর মনের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেনা। এটি একটি জানা ও দৃশ্যমান বিষয়, যা অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই।

চোখের সরসূরি কোন প্রভাব নেই। আসলে প্রভাব পড়ে রূহ থেকে। মানুষের রূহ (অন্তর) বিভিন্ন স্বভাবের হওয়ার কারণে এর প্রভাবও হয় বিভিন্ন। অন্তরের সাথে যেহেতু চোখের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তাই 'বদনযর' নামক কর্মটিকে চোখের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। হিংসুকের অন্তর মানুষকে কষ্ট দেয়। এই কষ্ট খুবই সুস্পষ্ট। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীকে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন হিংসুকের অনিষ্ট হতে তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেন। হাসেদের (হিংসুকের) বদনযর দ্বারা মাহসুদের (যাকে হিংসা করা হয়েছে) প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট, যা কেবল

---

৩০০. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা/ ১৯৭৭০, এই হাদীছের সনদ মুত্তাসেল।

৩০১. এই পদ্ধতি আলেমদের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিক্ষিত।

ঐ ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে, যে মানুষের প্রকৃত অবস্থা, গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। হিংসুককে বিষাক্ত সাপের সাথে তুলনা করা চলে। কেননা সাপের মধ্যে বিষ লুকায়িত থাকে। আর হিংসুকের অন্তরে হিংসার বিষ লুকায়িত থাকে। সাপ যখন তার শত্রুকে দেখে, তখন তার মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠে এবং সে কষ্টদায়ক এক নিকৃষ্ট আকার ধারণ করে। কিছু সাপ আছে, যার অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ও প্রখর। এগুলো গর্ভবতী মহিলার পেটের সন্তানকে ফেলে দেয়। আরও কিছু সাপ আছে, যার উপর দৃষ্টি পড়লেই চোখের দৃষ্টি চলে যায়। নাবী ﷺ আবতার (লেজকাটা এক প্রকার ছোট সাপ) ও যুত-তুফয়াতাইন (মাথায় দু'টি বিন্দু বিশিষ্ট সাপ) সম্পর্কে বলেছেন যে, এগুলো চোখের দৃষ্টি বিলুপ্ত করে দেয় এবং গর্ভের সন্তান ফেলে দেয়।

শরীরের পারস্পরিক মিশ্রণের ফলেই কেবল এক শরীর অন্য শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করা এবং এক দেহ থেকে অন্য দেহে রেসূ চলে যাওয়ার ধারণা ঠিক নয়। যেমন ধারণা করে থাকে শরীয়ত ও প্রকৃতি সম্পর্কে কম বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা। বরং পারস্পরিক মিলনের ফলে কখনও এক দেহের প্রভাব অন্য শরীরে পতিত হয় আবার কখনও শুধু সামনাসামনি হওয়ার মাধ্যমেও হয় আবার কখনও শুধু পারস্পরিক দেখার মাধ্যমেও হয়। কখনও কখনও রূহানী তাওয়াজ্জুহের (আত্মার প্রতিক্রিয়ার) মাধ্যমে, কখনও দু'আ, ঝাড়-ফুক, তাবীজ-কবজ এবং খেয়াল ও কল্পনার মাধ্যমে একজনের প্রভাব অন্যজনের মধ্যে গিয়ে পতিত হয়। বদনযর প্রয়োগকারীর দেখার দ্বারাই কেবল বদনযর লাগেনা; বরং অন্ধরাও বদনযর প্রয়োগকারী হয়ে থাকে। অন্ধ বদনযর প্রয়োগকারীর জন্য বস্তুর বিবরণ পেশ করা হলে তার হিংসুক আত্মা তাতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। যদিও সে তা দেখেনি। অনেক বদনযর প্রয়োগকারী এমন হয় যে, না দেখে শুধু গুণাগুণ শুনেই বদনযর ফেলে। সুতরাং প্রত্যেক বদনযর দানকারীই হিংসুক। কিন্তু প্রত্যেক হিংসুক বদনযর প্রয়োগকারী নয়।

হিংসুক (হাসেদ) যেহেতু আম অর্থাৎ বদনযর প্রয়োগকারীর চেয়ে অধিকতর ব্যাপক হয়, তাই বদনযর প্রয়োগকারীর পরিবর্তে হিংসুক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এতে করে উভয় শ্রেণীর অনিষ্ট হতেই আশ্রয় প্রার্থনা হয়ে যাবে। বদনযর মূলত তীরের মতই, যা হাসেদ ও বদনযর প্রয়োগকারীর নফ্‌স ও মেজাজ থেকে বের হয়ে মাহসুদ ও বদনযরে আক্রান্ত ব্যক্তির দিকে যায়। তীরের মতই এটি আঘাত হানে।

কখনও লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে লাগে আবার কখনও ভুল করে। লক্ষ্যবস্তুটি যখন খোলা থাকে অর্থাৎ মানুষের শরীর যখন খোলা থাকে তথা যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, নাস, ফালাকসহ অন্যান্য দু'আ পাঠ করার মাধ্যমে শরীরকে বন্ধ করে রাখেনা, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তার শরীরে বদনযর পতিত হয়।

আর যেই মুসলিম বান্দা সুচতুর হয় ও সাবধানতা অবলম্বন করে এবং শরীরকে উপরোক্ত অস্ত্র দিয়ে ঢেকে রাখে, তার শরীরে বদনযর প্রয়োগকারীর তীর প্রবেশের রাস্তা খুঁজে পায়না বলে তার উপর বদনযর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। কখনও কখনও এই তীর নিক্ষেপকারীর দিকেই ফেরত আসতে পারে। যেমনটি লক্ষ্য করা যায় তীরন্দাজদের কাজ-কর্ম থেকে। অর্থাৎ বন্দুকধারী এবং তীরন্দাজরা কখনও নিজেদের তীর ও গুলিতেই আক্রান্ত এবং আহত হয়। এমনি বদনযর দানকারী কখনও নিজের বদনযরেই আক্রান্ত হয়। পার্থক্য শুধু এই যে, বদনযর বের হয় রূহ ও নফ্‌স থেকে। আর গুলি ও তীর

বের হয় বন্দুক এবং ধনুক থেকে। বদনযরের স্বরূপ এ রকম যে, প্রথমে বদনযর প্রয়োগকারী কোন জিনিষ দেখে মুগ্ধ হয়। এর পরই তার নিকৃষ্ট আত্মা হিংসাত্মক অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর ভিকটিমের (বদনযরের শিকার ব্যক্তির) উপর তার বিষযুক্ত দৃষ্টি ফেলে।

কখনও মানুষের উপর তার নিজের বদনযরই লেগে যায়। (নিজের স্ত্রী-পরিবার ও সন্তান-সন্ততির উপরও ব্যক্তির বদনযর পড়ে যাওয়ার বিষয়টি উড়িয়ে দেয়া যায়না)। কখনও তার বিনা ইচ্ছাতেই এরূপ হতে পারে। শুধু তার তবীয়ত (স্বভাব) ও মেজাজ দ্বারাও এমনটি হতে পারে। এটি হচ্ছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট বদনযর। অর্থাৎ নিজের উপর নিজের বদনযর পড়া অত্যন্ত জটিল ও নিকৃষ্ট বিষয়।

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- আমাদের অনেক বন্ধু ও অন্যান্য ফিকাহবিদগণ বলেছেন- বদনযর প্রয়োগকারী বলে যাদেরকে জানা যাবে, শাসকের উচিৎ তাদেরকে আটকিয়ে রাখা এবং মৃত্যু পর্যন্ত আবদ্ধ অবস্থায় তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। এটিই সঠিক মত।

বদনযরে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা হল

সুনানে আবু দাউদে সাহ্ল বিন হুনাইফ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা একটি বন্যাকবলিত এলাকার নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমি পানিতে নেমে গোসল করলাম। আমি সেই পানি হতে জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় উঠে আসলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সেই খবর দেয়া হলে তিনি বললেন- আবু ছাবেতকে বল, সে যেন আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করে। বর্ণনাকারী বলেন- আমি বললামঃ হে আমার অভিভাবক! (হে আল্লাহর রসূল!) ঝাড়-ফুঁক কি উপকারী? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন-

«لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْلَدْغَةٍ»

“বদনযর, বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ এবং বিচ্ছুর কামড়ের বিষ নামানোর ঝাড়-ফুঁক ব্যতীত কোন ঝাড়-ফুঁক নেই।”[৩০২]

হিংসুকের হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার ক্ষেত্রে এবং বদ নযরের কুপ্রভাব থেকে আত্ম রক্ষার ঝাড়-ফুকের মধ্যে বেশী বেশী সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা ফাতেহা এবং আয়াতুল কুরসী পড়া উচিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত দু'আ পড়েছেন, তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

«بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ»

“শুরু করছি সেই আল্লাহ্র নামে, যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তুই কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, তিনি মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী”।[৩০৩]

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

“আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্র পরিপূর্ণবাণী সমূহের মাধ্যমে, তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে”।[৩০৪]

---

৩০২. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব, আলএ.হা/৩৮৮৮, সহীহ, আলবানী।

৩০৩. আবু দাউদ,আলএ.হা/৫০৮৮, সহীহ তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৩৮৮, মিশকাত, মাশা. হা/২৩৯১, সহীহ, আলবানী।

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وهامَّةٍ ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ»

"আমি আল্লাহর কাছে তাঁর পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে প্রতিটি শয়তান এবং বিষধর বস্তু ও কষ্টদায়ক নযর হতে তোমাদের জন্য আশ্রয় চাচ্ছি"।[৩০৫]

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত কালেমার উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যেই কালেমাগুলো কোন নেককার কিংবা বদকারের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আমি আল্লাহর কাছে মাখলুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি"।[৩০৬]

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ»

"আমি আল্লাহর সম্পূর্ণ কালামের মাধ্যমে ঐ জিনিষের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং বিস্তার করেছেন। আরও আশ্রয় চাচ্ছি ঐ জিনিষের অকল্যাণ হতে, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা আকাশে আরোহন করে। আল্লাহর কাছে আরও আশ্রয় চাচ্ছি ঐ বস্তুর অনিষ্ট হতে, যা তিনি যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আরও আশ্রয় চাচ্ছি ঐ বস্তুর অনিষ্ট হতে, যা যমীন থেকে উৎপন্ন হয়। আমি আল্লাহর কাছে আরও আশ্রয় চাচ্ছি, দিন ও রাতের ফিতনা হতে এবং রাতে প্রত্যেক আগমণকারীর অনিষ্ট হতে। হে আল্লাহ্! তবে ঐ আগমণকারী হতে নয়, যে কল্যাণসহ আগমণ করে"।[৩০৭]

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ»

"আমি আল্লাহর সম্পূর্ণ কালামের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা হতে এবং আমার কাছে তাদের হাজির হওয়া থেকে"।[৩০৮]

« اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللّٰهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اللّٰهُمَّ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلاَ يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ»

---

৩০৪. মুসলিম, হাএ. হা/৬৭৭২, ইফা. হা/৬৬৩২, ইসে.হা/৬৬৮৬,আবু দাউদ,আলএ.হা/৩৮৯৮, সহীহ তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪৩৭, মিশকাত, মাশা. হা/২৪২৩, সহীহ, আলবানী।

৩০৫. বুখারী, তাও. হা/৩৩৭১, ইফা. হা/৩১২৯, আপ্র. হা/৩১২১, আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ, মিশকাত, মাশা. হা/১৫৩৫, সহীহ, আলবানী।

৩০৬. সিলসিলাতু আহাদীসুস সহীহা, মাশা. ২/৮৪০,

৩০৬. সিলসিলাতু আহাদীসুস সহীহা, মাশা. ৭/২৯৯৫, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব লিল আলবানী, মাশা. ২/১৬০২

৩০৮. সহীহ তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৫২৮, মিশকাত, মাশা. হা/২৩৯১, সহীহ, আলবানী।

“হে আল্লাহ্! তোমার সম্মানিত ও বরকতময় চেহারার উসীলায় এবং তোমার সকল বাক্যের মাধ্যমে ঐ সমস্ত বিষয়ের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলোর কপাল তুমি ধরে আছ। হে আল্লাহ্! তুমিই ঋণ ও গুনাহ্সমূহ দূর করো। হে আল্লাহ! তোমার সৈনিকরা পরাজিত হয়না। তোমার ওয়াদার পরিবর্তন হয়না। তুমি পবিত্র। প্রশংসাসহ আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি”।[৩০৯]

«أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ لاَ أُطِيْقُ شَرَّهُ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ »

“আমি আল্লাহর বরকতময় চেহারার উসীলায় আশ্রয় চাচ্ছি, যার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। আর আমি আল্লাহর কালেমাসমূহের উসীলায় আশ্রয় চাচ্ছি, যেই কালেমাগুলো কোন নেককার কিংবা বদকারের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আরও আশ্রয় চাচ্ছি, আল্লাহর ঐ সমস্ত আসমায়ে হুসনার উসীলায়, যেগুলো আমি জানি এবং যেগুলো আমার জানা নেই। আশ্রয় চাচ্ছি ঐ জিনিষের অনিষ্ট হতে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং বিস্তার করেছেন। আরও আশ্রয় চাচ্ছি প্রত্যেক ক্ষতিকারক বস্তুর ক্ষতি থেকে, যা প্রতিহত করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আরও আশ্রয় চাচ্ছি প্রত্যেক ঐ ক্ষতিকারকের ক্ষতি হতে, যার কপাল তোমার হাতে। নিশ্চয়ই আমার রব সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত”।

«اللّهُمَّ أنت رَبِّى لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبّ العَرْشِ العَظِيْمِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً اللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِيْ وشَرَّ الشَّيْطَانِ وشِرْكِهِ ومِن شَرِّ كُلِّ دابةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ»

“হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার উপর ভরসা করেছি। আপনি মহান আরশের প্রভু। আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়। যা তিনি চান না, তা হয়না। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার কোন শক্তি নেই। আমি অবগত আছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুকে ঘিরে আছেন। প্রত্যেক জিনিষের সংখ্যা তিনি অবগত আছেন। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আমার নফ্সের ও শয়তানের অকল্যাণ এবং শিরক থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রত্যেক ঐ বিচরণকারী প্রাণীর অনিষ্ট হতে, তুমি যার কপাল ধরে আছ। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সঠিক পথের উপর রয়েছেন”।[৩১০]

«تَحَصَّنْتُ بِاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إلا هُوَ إِلَهِيْ وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ وَاعْتَصمْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الْذِىْ لاَ يَمُوْتُ واستَدْفَعتُ الشَّرَّ بِلاَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكِيْلُ حَسْبِىَ الرَّبُّ

---

৩০৯. আবু দাউদ,আলএ.হা/৫০৫২, সহীহ, আলবানী

৩১০. সিলসিলাতু আহাদীসুস সহীহা, মাশা. ১৩/৬৪২০

مِنَ «الْعِبَادِ حَسْبِىَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوْقِ حَسْبِىَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوْقِ حَسْبِىَ الَّذِىْ هُوَ حَسْبِىْ حَسْبِىَ الَّذِىْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شىءٍ وهو يُجِيْرُ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ حَسْبِىَ اللهُ وَكَفَى سَمِعَ الله لمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمَى حَسْبِىَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم»

"আমি ঐ আল্লাহর হেফাজতে প্রবেশ করছি, যিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি আমার এবং সবকিছুর ইলাহ (মাবুদ)। আমি আমার এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালকের হেফাজতে প্রবেশ করছি। আমি সেই আল্লাহর উপর ভরসা করছি, যিনি চিরঞ্জীব। লা হাওলা ও লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্-এর উসীলায় অকল্যাণ প্রতিরোধ করছি। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী। আল্লাহর বান্দাদের ছাড়া আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টাই আমার জন্য যথেষ্ট। মারযুক (রিযিকপ্রাপ্ত) ছাড়া রাযেকই (রিযিক দাতা) আমার জন্য যথেষ্ট। সেই সত্তাই আমার জন্য যথেষ্ট, যিনি একাই যথেষ্ট। সেই আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, যার হাতেই সবকিছুর রাজত্ব। তিনি আশ্রয় দেন। তাঁর খেলাফে (বিপরীতে) কোন আশ্রয়দাতা নেই। আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। যে দু'আ করে, তিনি তার দু'আ শুনেন। আল্লাহ্ ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করছি। তিনি আরশে আযীমের প্রভু"।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত দু'আগুলো পাঠ করবে সে অবশ্যই ফল পাবে এবং এগুলো যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাও বুঝতে পারবে। এগুলো আল্লাহর ইচ্ছায় বদনযর পৌঁছতে বাধা প্রদান করে। বদনযর পৌঁছে গেলেও দু'আ পাঠকারীর ঈমানী শক্তি অনুযায়ী এগুলো বদনযরের প্রভাবকে প্রতিহত করে। ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ শক্তি, প্রস্তুতি, পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল, অন্তরের দৃঢ়তা অনুযায়ী এগুলোর পাঠক উপকৃত হয়ে থাকে এবং বদনযর হতে নিরাপদ থাকে। কেননা এগুলো হচ্ছে অস্ত্র। আর অস্ত্র যে চালায় তার চালানোর উপরই অস্ত্রের উপকারিতা নির্ভরশীল। অর্থাৎ শুধু অস্ত্র হাতে থাকলেই অস্ত্র দিয়ে ফায়দা হাসিল করা যায়না, যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়না এবং শত্রুর আক্রমণও প্রতিহত করা যায় না। অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার এবং তা চালানোর অভিজ্ঞতাই এখানে মূল ধর্তব্য বিষয়।

কেউ যদি মনে করে যে, তার পক্ষ হতে মানুষের উপর বদনযর লেগে যাচ্ছে তাহলে করণীয় কী?

কেউ যদি আশঙ্কা করে যে, তার চোখে দোষ আছে এবং মানুষের উপর তার বদনযর লেগে যায়, তাহলে তার উচিত হল সে নিজেই নিজের চোখের অকল্যাণ দূর করার চেষ্টা করবে। সুতরাং কারও ভাল দেখে সে যেন এই দু'আ পাঠ করে, اللَّهُمَّ بَارِكْ عليه `হে আল্লাহ! তুমি তার উপর বরকত নাযিল কর, তাকে ও তার কাজে বরকত দান কর ইত্যাদি। যেমন আমের বিন রাবীআ যখন সাহ্ল বিন হুনাইফকে বদনযর লাগিয়ে দিল, তখন নাবী ﷺ আমেরকে বলেছিলেন- তুমি اللَّهُمَّ بَارِكْ عليه (আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি) বললে না কেন?

বদনযর থেকে বাঁচার উপায়

বদনযর লাগার আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়াতে কোন দোষ নেই। এটা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থীও নয়। কারণ আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসার স্বরূপ হল বান্দা বৈধ উপকরণ অবলম্বন করে বদনযর ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে এবং সেই সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করবে। নাবী ﷺ হাসান-হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এই বাক্যগুলো দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেনঃ নাবী ﷺ বলেন, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) তাঁর পুত্র ইসহাক এবং ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) কে এই দু'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুক করতেনঃ

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التامَّةِ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ وهامَّةٍ ومِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»

"আমি আল্লাহর কাছে তাঁর পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে প্রতিটি শয়তান এবং বিষধর বস্তু ও কষ্ট দায়ক নযর হতে তোমাদের জন্য আশ্রয় চাচ্ছি"।[৩১১] বদনরের প্রভাব সত্য। মানুষের উপর বদনযর লেগে যায়। নাবী ﷺ একদা একটি বান্দীকে দেখলেন যে, তার চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। তখন তিনি বললেন-

«اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ»

"তার উপর ঝাড়-ফুঁক করো। কারণ তার উপর বদ নযর লেগেছে"।[৩১২] আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন-

«أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ»

"নাবী ﷺ বদনযর হতে ঝাড়-ফুঁক করার আদেশ দিয়েছেন"।[৩১৩]

বদ নযর থেকে বাঁচার একাধিক উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

- ما شاء الله لا قُوَّةَ إلا بالله পাঠ করা। হিশাম বিন উরওয়া বর্ণনা করেন যে, তার পিতা যখন তার কোন ঘরে প্রবেশ করতেন কিংবা মুগ্ধকর কোন জিনিষ দেখতেন, তখন 'মাশা-আল্লাহ্ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করতেন'।
- ঝাড়-ফুঁকের সেই দু'আ পাঠ করা, যা দিয়ে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) নাবী ﷺকে ঝাড়-ফুক করেছিলেন। জিবরীল (আলায়হিস সালাম) নাবী ﷺকে এই দু'আর মাধ্যমে ঝাড়তেন,

«بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ»

- "আমি আপনাকে আল্লাহর নামে ঝাড়-ফুঁক করছি প্রতিটি এমন জিনিষ হতে, যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক জীবের অমঙ্গল হতে ও হিংসুকের বদনযর হতে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। আমি আপনাকে আল্লাহর নামে ঝাড়-ফুঁক করছি।"[৩১৪]

---

৩১১. বুখারী, তাও. হা/৩৩৭১, ইফা. হা/৩১২৯, আপ্র. হা/৩১২১, মিশকাত, হাএ. হা/১৫৩৫, সহীহ, আলবানী।
৩১২. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব, তাও. হা/৫৭৩৯, মিশকাত, হাএ. হা/৪৫২৮
৩১৩. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তিব্ব, তাও. হা/৫৭৩৪, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাম।
৩১৪. মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাম মাশা,হা/ ২১৮৬/৪০

- বদনযরে আক্রান্ত রোগীর জন্য কুরআনের আয়াত লিখে পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি রোগীকে পান করানো পূর্ব যুগের আলেমদের এক জামআত হতে জায়েয হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- কুরআনের আয়াত লিখে পানিতে ভিজিয়ে রোগীকে পান করালে কোন দোষ নেই। আবু কিলাবা হতে এ রকমই বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করা হয় যে, একজন মহিলার প্রসব কষ্ট হওয়াতে তিনি কুরআনের আয়াত লিখে পানিতে ভিজিয়ে তা পান করানোর আদেশ দিয়েছেন। আইয়্যুব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- আমি আবু কিলাবাকে দেখেছি যে, তিনি একটি কাগজে কুরআনের আয়াত লিখে তা পানি দ্বারা ধৌত করেছেন। অতঃপর সেই পানি একজন রোগীকে পান করিয়েছেন।

যার বদনযর লাগছে বলে সন্দেহ করা হয়, তার অঙ্গসমূহ ধৌত করিয়ে সেই পানি রোগীর শরীরে ঢালতে হবে। যেমনভাবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমের বিন রাবীআকে গোসল করতে বলেছিলেন। সন্দেহ যুক্ত ব্যক্তির পেশাব-পায়খানা বা অন্য কোন কিছু দিয়ে চিকিৎসা করার কোন দলীল নেই। অনুরূপভাবে তার উচ্ছিষ্ট বা ওযূর পানি ইত্যাদি ব্যবহার করাও ভিত্তিহীন। হাদীছে যা পাওয়া যায় তা হল তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং লুঙ্গির নিচের অংশ ধৌত করা এবং সম্ভবতঃ মাথার টুপি, পাগড়ী বা পরিধেয় কাপড়ের নিচের অংশ ধৌত করা এবং তা ব্যবহার করাও বৈধতার অন্তর্ভূক্ত হবে।দাউদে বর্ণিত আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবু দারদা বলেন- আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ বা কারও কোন ভাই রোগে আক্রান্ত হলে সে যেন বলে-

«رَبُّنَا اللهُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ»

"হে আমাদের প্রভু! যিনি আকাশে আছেন। তোমার নাম পবিত্র। তোমার হুকুম আসমানে ও যমীনে। আসমানে যেমন তোমার রহমত তেমনি যমীনে তোমার রহমত নাযিল কর। আমাদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা কর। তুমি পবিত্রদের প্রতিপালক। তোমার নিকট হতে রহমত নাযিল কর এবং তোমার 'শিফা' হতে 'শিফা' নাযিল কর। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- যে এই দু'আ পাঠ করবে, আল্লাহর অনুমতিতে সে সুস্থ হবে ইনশা-আল্লাহ্।[৩১৫]

---

৩১৫. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তিব্ব, আলএ.হা/৩৮৯৮, ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদিছটিকে মুনকার (অশুদ্ধ) বলেছেন। মিশকাতুল মাসাবীহ, হা/১৫৫৫, **যঈফ**

ফোঁড়া ও ক্ষতের চিকিৎসা

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন- যখন কোন মানুষ অসুস্থ হবে অথবা ফোঁড়া বা জখম কিংবা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হবে তখন সে যেন মাটিতে শাহাদাত আঙ্গুল রেখে এই দু’আ পাঠ করে-

«بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا»

“আল্লাহর নামে আমাদের এই মাটিতে আমাদের কারও লালা মিলিত হচ্ছে। আমাদের প্রভুর ইচ্ছায় আমাদের রোগী ভাল হবে”।[৩১৬]

এখানে কোন্ মাটি উদ্দেশ্য, তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে দু’টি মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন এখানে মদীনার মাটি উদ্দেশ্য। আবার কেউ বলেছেন- পৃথিবীর যে কোন স্থানের মাটি উদ্দেশ্য।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন- ঝাড়-ফুঁককারী তার নিজের থুথু নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে রাখবে। অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলি মাটিতে রাখবে। সামান্য মাটি আঙ্গুলে লাগিয়ে তা দিয়ে ক্ষতস্থানে মাসাহ করবে।

মসীবতগ্রস্থের চিকিৎসায় নাবী ﷺ এর আদর্শ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

“এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তাঁরা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো”।[৩১৭]

সহীহ বুখারীতে উম্মে সালামা হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি মসীবতে আক্রান্ত হয়ে এই দু’আ পাঠ করবে

«إنَّا لله وإنَّا إليه رَاجِعُونَ اللَّهم أجرنِي فِي مُصيبَتِي وأخلف لِي خيراً منهَا»

“আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর দিকেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ্! তুমি আমার এই মুসীবতে ছাওয়াব ও বিনিময় দান কর এবং এর বদলে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান কর”।[৩১৮] তাকে আল্লাহ্ তা‘আলা সেই মসীবতে সাহায্য করবেন ও ছাওয়াব দিবেন এবং তাকে উত্তম বদলা দান করবেন।

---

৩১৬. বুখারী, কিতাবুত্ তিব্ব, তাও. হা/৫৭৪৫, মুসলিম।
৩১৭. সূরা বাকারা-২: ১৫৫-১৫৬
৩১৮. মুসলিম, হাএ.হা/২০১১, ইফা.হা/১৯৯৫, ইসে.হা/২০০২, মিশকাত, হাএ. হা/৪৫২৮

এই বাক্যটি মসীবতের সর্বোত্তম চিকিৎসা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাধিক উপকারী। কেননা এতে এমন দু'টি মৌলিক বিষয় একত্রিত হয়েছে, যা ভালভাবে অবগত হলে মসীবত ও বিপদাপদের সময় বান্দার অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি হাসিল হবে।

প্রথম মূলনীতিঃ বান্দা এবং তার জানমাল, পরিবার-পরিজন ও ধন-দৌলত মূলতঃ সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। বান্দার নিকট আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো আমানত রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তার থেকে এগুলো নিয়ে নিবেন, তখন এটি ঐ রকমই হবে, যেমন আমানত দাতা আমানত গ্রহিতার নিকট থেকে নিজ আমানত ফেরত নেয়।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ বান্দার গন্তব্যস্থল হচ্ছে আল্লাহর দিকে। সে দুনিয়ার মায়া পিছনে ছেড়ে তার প্রভুর নিকট একাই চলে যাবে। যেমন তাকে প্রথমে পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ ছাড়া দুনিয়ায় একাকী পাঠিয়েছিলেন। এই যেহেতু বান্দার শুরু ও শেষের অবস্থা, তাই কোন কিছু পেয়ে সে আনন্দিত হয় কিভাবে? আর কোন কিছু হারিয়ে ব্যথিত হয় কিভাবে? সুতরাং তার শুরু ও শেষ নিয়ে চিন্তা করাই এই রোগের সবচেয়ে বড় চিকিৎসা।

মসীবতে পতিত হয়ে পেরেশানী হতে বাঁচার অন্যতম চিকিৎসা হচ্ছে, বান্দা এই দৃঢ় বিশ্বাস করবে, যেই মসীবতে সে আক্রান্ত হয়েছে, তা কখনই তাকে ছাড়ার ছিলনা। আর যেই মসীবতে সে পড়েনি, তা তার তাকদীরে লিপিবদ্ধই ছিলনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের উপর যে বিপদ আসে তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লাসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না"।[৩১৯]

মসীবতে পড়ে কেউ যদি স্বীয় মসীবতটি নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে দেখতে পাবে যে, তার রব (প্রভু) তার জন্য ছুটে যাওয়া বস্তুর অনুরূপ বা তার চেয়ে আরও উত্তম বস্তু রেখে দিয়েছেন। মসীবতে পড়ে সে যদি সবর করে ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এমন বস্তু সঞ্চয় করে রেখেছেন, যা ঐ মসীবতের চেয়ে অনেক বড়।

মসীবতে পতিত ব্যক্তির উচিত তার ডানে-বামে তাকিয়ে অন্যান্য মসীবতগ্রস্ত লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। সে অচিরেই দেখতে পাবে যে, কোন উপত্যকাই মসীবতগ্রস্ত থেকে খালী নেই এবং প্রত্যেক গ্রাম ও শহর শুধু সুখী মানুষে ভরপুর নয়। সুতরাং ডানে ও বামে তাকালে সে দেখতে পাবে, কেউ প্রিয় বস্তুকে হারিয়েছে আবার কারও উপর বিরাট মসীবত চেপে বসেছে। দুনিয়ার আনন্দ ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের মতই অথবা পথিকের ছায়া গ্রহণের মতই। দুনিয়ার সুখ অল্প সময় হাসালেও অধিক সময়

---

৩১৯. সূরা হাদীদ-৫৭:২২-২৩

কাঁদায়, এক দিন খুশী করলে যুগ যুগ ধরে কষ্ট দেয় এবং অল্প সময় ভোগ করালেও অধিক সময় বঞ্চিত করে।

মসীবতের সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা জরুরী যে, হা-হুতাশ করে হারিয়ে যাওয়া বস্তুকে ফেরত আনা যাবে না এবং দুঃখও লাঘব হবে না; বরং পেরেশানী ও হাতাশা আরও বৃদ্ধি পাবে।

মসীবতে পড়লে বান্দা বিশ্বাস করবে যে, ধৈর্যধারণকারী এবং ইন্না লিল্লাহ্ পাঠকারীগণকে যে নিয়ামাত ও ছাওয়াব দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে, তা মসীবতের চেয়ে বহুগুণ বড়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

"সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এ সব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত"।[৩২০]

জেনে রাখা উচিৎ যে, হতাশা প্রকাশ করলে এবং ধৈর্যহারা হলে মসীবতগ্রস্ত ব্যক্তি কেবল শত্রুকেই খুশী করে, বন্ধুকে কষ্ট দেয়, তাঁর প্রভুকে ক্রোধান্বিত করে, শয়তানকে খুশী করে, প্রতিদান নষ্ট করে এবং স্বীয় নফস্কে দুর্বল করে। আর বান্দা ছাওয়াবের আশায় সবর করার মাধ্যমে শয়তানকে লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ করে, বন্ধুকে আনন্দিত করে এবং শত্রুকে কষ্ট দেয়।

বান্দার আরও জেনে রাখা উচিত যে, সবরের মাধ্যমে যে স্বাদ ও আনন্দ অর্জিত হয়, তা হারিয়ে যাওয়া জিনিষটি ফেরত পাওয়ার আনন্দের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। মসীবতের বদলে তার জন্য বাইতুল হামদই যথেষ্ট, যা মসীবতে ইন্না লিল্লাহ্ পাঠকারীর জন্য এবং মসীবতের সময় তার প্রভুর প্রশংসা করার কারণে তার জন্য বানিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং হে বন্ধু! তুমি লক্ষ্য কর। কোন মসীবতটি বেশী কষ্টকর? দুনিয়ার মসীবত? না জান্নাতুল খুলদের বাইতুল হাম্দ ছুটে যাওয়ার মসীবত?

মসীবতের সময় বান্দা তার মনকে এই ভেবে শান্তনা দিবে যে, আল্লাহ্ এর বিনিময়ে উত্তম বদলা দিবেন। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কোন জিনিষ হারালে বদলা পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহকে হারিয়ে ফেললে এর কোন বদলা পাওয়া যায়না।

বান্দার বুঝা উচিত যে, তার নসীবে যে পরিমাণ মসীবত লেখা ছিল, তা আসবেই। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট থাকবে, আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবেন, যে অসন্তুষ্ট হবে, তার উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন।

জেনে রাখা উচিত ধৈর্য হারা হওয়ার শেষ পরিণতি হল অনিচ্ছাকৃত সবর। অর্থাৎ মসীবতে পড়ে কিংবা প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তু হারিয়ে মাত্রাতিরিক্ত হাহুতাশ করলেও এক সময় তাকে সবর করতেই হবে এবং উচ্চঃস্বরে কান্নাকাটি ও বিলাপ করলে, অধৈর্য হয়ে মাথার চুল ছিড়লে, বুক ও গালে আঘাত

৩২০. সূরা বাকারা-২:১৫৬-১৫৭

করলে এক সময় তার শক্তি শেষ হয়ে যাবে এবং ক্লান্ত হয়ে সে মসীবতে বিরক্তিবোধ করা থেকে বিরত হবে। ফলে সে সবর করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তার এই সবর প্রশংসিত নয় এবং তার বিনিময়ে সে ছাওয়াবও পাবেনা।

«وَإِنَّ اللّٰهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ»

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে মসীবতে ফেলে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মসীবতের সময় সন্তুষ্ট থাকবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি"।[৩২১]

বান্দার আরও জেনে রাখা উচিত যে, মসীবতে পতিত ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক উপকারী ঔষধ হচ্ছে, সে তার প্রভুর পছন্দনীয় বিষয়কে মাথা পেতে মেনে নিবে। ভালবাসার অন্যতম বৈশিষ্ট ও রহস্য হচ্ছে মাহবুবের অনুসরণ করা। সুতরাং যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু সে তার মাহবুবের পছন্দনীয় বিষয়কে অপছন্দ করে এবং মাহবুবের অপছন্দনীয় বস্তুকে পছন্দ করে, সে নিজের নফ্সের সাথে মিথ্যাবাদী এবং অচিরেই সে তার মাহবুবের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হবে। আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন ফয়সালা করেন, তখন তিনি চান যে, তার প্রতি বান্দা সন্তুষ্ট থাকুক।

মুমিন বান্দার উচিত, দু'টি নেয়ামতের মাঝে তুলনা করা। তার দেখা উচিত কোন্ নিয়ামাতটি অধিক বড়? যেই নিয়ামাতটি ছুটে গিয়েছে সেটি? না মসীবতে ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত ছাওয়াব ও প্রতিদানের যেই নিয়ামাত রয়েছে সেটি? মসীবতে সবরের মাধ্যমে অর্জিত নিয়ামাতটিই যদি তার কাছে অধিক বড় বলে মনে হয়, তাহলে তাকে ঐটিকেই প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। কারণ আল্লাহর তাওফীকেই সে সঠিক সিদ্বান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে।

এটিও চিন্তা করা উচিত যে, মসীবতে ফেলে পরীক্ষাকারী (আল্লাহ্ তা'আলা) সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সর্বাধিক রহমতকারী। সেই যাতে পাক তাকে ধ্বংস করার জন্য কিংবা শাস্তি দেয়ার জন্য মসীবতে ফেলেন নি; বরং তার সবর, আল্লাহর প্রতি তার সন্তুষ্টি এবং তাঁর ঈমান পরীক্ষা করার জন্যই তাকে মসীবতে ফেলেছেন। যাতে করে বান্দা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে এবং তার কাছেই আত্মসমর্পন করে।

আরও জানা উচিত যে, মসীবতে পতিত হওয়া অহংকারী এবং পাষাণ হয়ে যাওয়াসহ বহুবিধ ধ্বংসাত্মক এবং বড় বড় অসুখ-বিসুখ হতে বাঁচার সর্বোত্তম একটি মাধ্যম।

আরও জানা উচিত যে, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করাই আখিরাতের সুখ অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। অনুরূপ দুনিয়ায় বিলাস বহুল জীবনই আখিরাতে দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

হে প্রিয় বন্ধু! উপরের বিষয়গুলো বুঝতে যদি তোমার অসুবিধা হয়, তাহলে সত্যবাদী ও সত্যায়িত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেই হাদিছটি নিয়ে চিন্তা কর। তিনি বলেন-

---

৩২১. সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব লিল আলবানী, মাশা.৩/৩৪০৭ , সহীহ তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৩৯৬, ইবনে মাজাহ তাও. হা/৪০৩১

«حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ»

"শাহওয়াত তথা চিত্তাকর্ষক পাপকাজ দ্বারা জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে কষ্টসাধ্য আমল দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।[৩২২] অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার জন্য সহজলভ্য ও চাকচিক্যময় হারাম কাজে লিপ্ত হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট ও শ্রম ব্যয় করে শরীয়তের কঠিন বিধানগুলো পালন করবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে স্থান দিবেন। মূলতঃ এর মাধ্যমেই বান্দার জ্ঞান-বুদ্ধির পার্থক্য করা যায় এবং মহা পুরুষদের আসল অবস্থা জানা যায়। প্রকৃত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে স্থায়ী সুখ-শান্তিকে ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তির উপর প্রাধান্য দেয় এবং সেটিকেই নিজের জন্য নির্বাচন করে।

প্রিয় বন্ধু! তুমি ঐ সমস্ত নেয়ামত, স্থায়ী সুখ-শান্তি এবং মহান সাফল্যের দিকে দৃষ্টি দাও, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধুদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। আরও দৃষ্টি দাও ঐ সমস্ত অপমান, চিরস্থায়ী হতাশা এবং শাস্তির প্রতি, যা তৈরী করে রাখা হয়েছে অপরাধী এবং আমলহীন লোকদের জন্য। অতঃপর তুমি ভেবে দেখ, তোমার নিজের জন্য উভয়টির কোন্‌টি অধিক উপযোগী হবে?

দুঃশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা ও বিপদাপদের সময় নাবী ﷺ এর হিদায়াত

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ বিপদ-মসীবতের সময় এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

"আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই। তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সঠিক ইলাহ্ নেই। তিনি বিশাল আরশের মালিক। আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই। তিনি আসমান-যমীনের এবং মহান আরশের মালিক"।[৩২৩]

তিরমিযী শরীফে আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বিপদাপদের সময় এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برحمتِكَ أستغيثُ»

"ইয়া হাইয়্যু! (চিরঞ্জীব) ইয়া কাইয়্যুমু! (সকল বস্তুর রক্ষক) আমি তোমার রহমতের উসীলায় তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি"।[৩২৪] তিরমিযী শরীফে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ যখন কোন বিপদ দেখতেন, তখন আকাশের দিকে তাঁর পবিত্র মাথা উঠাতেন এবং বলতেন-

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم

"আমি প্রশংসার সাথে মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি"।

---

৩২২. বুখারী, অধ্যায়ঃ জান্নাতের গুণাগুণের বর্ণনা, তাও. হা/৬৪৮৭, মিশকাত, হাএ. হা/৫১৬০

৩২৩. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত দাওয়াত, তাও. হা/৬৩৪৬

৩২৪. সহীহ তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৫২৪, মিশকাত, হাএ. হা/২৪৫৪, হাসান: আলবানী,

আর দু'আয় যখন বেশী পরিশ্রম করতেন, তখন বলতেন- يَا حَيُّ يَا الْقَيُّومُ 'হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী'।[৩২৫]

আবু দাউদে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- বিপদগ্রস্ত লোকের দু'আ হচ্ছেঃ

«اللّهُمَّ رَحْمَتَكَ أرجُو فَلا تَكِلْنِي إلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وأصْلِحْ لى شَأنِي كُلَّهُ لا إلَهَ إلا أنْتَ»

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার রহমতের আশা রাখি। আমাকে এক পলকের জন্যও আমার নিজের দিকে সোপর্দ করে দিওনা। তুমি আমার সকল অবস্থা সংশোধন কর। তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই।

আবু দাউদ শরীফে আসমা বিনতে উমাইস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন- আমি কি তোমাকে এমন কিছু দু'আ শিক্ষা দিবনা, যা তুমি মসীবতের সময় পড়বে? দু'আটি হচ্ছে এইঃ

«اللهُ رَبِّي لا أُشْرِكُ بِهِ شيئًا »

"আল্লাহ্ আমার প্রভু। আমি আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করিনা। অন্য এক বর্ণনায় এই দু'আটি সাত বার পাঠ করার কথা এসেছে। মুসনাদে আহমাদে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, বান্দা যখন দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানীতে পতিত হয়ে এই দু'আটি পাঠ করবেঃ

«اللّهُمَّ إنِّي عَبْدُكَ ابنُ عَبْدِكَ ابنُ أمتِكَ ناصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قضاؤكَ أَسْأَلُكَ اللّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ونُورَ صَدْرِى وجِلاءَ حُزنى وذَهَابَ هَمِّي إلا أذْهَبَ اللهُ حُزْنَه وهَمَّهُ وأبْدَلَهُ مكانَهُ فرحاً»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার এক বান্দা ও এক বান্দীর পুত্র। আমার কপাল তোমার হাতে। আমার ব্যাপারে তোমার হুকুম কার্যকর। আমার ব্যাপারে তোমার ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ। আমি তোমার সেই প্রত্যেক নামের উসীলা দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যে নামের মাধ্যমে তুমি নিজের নাম করণ করেছ বা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ বা তোমার কোন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছ অথবা যে নামগুলোকে তুমি নিজের জ্ঞান ভান্ডারে সংরক্ষিত করে রেখেছ, কুরআনকে আমার অন্তরের প্রশান্তি, বক্ষের নূর, দুঃশ্চিন্তা এবং পেরেশানী বিদূরিত হওয়ার মাধ্যমে পরিণত করে দাও। যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে আনন্দ ও খুশীর দ্বারা সেই স্থানকে পরিপূর্ণ করে দিবেন"।[৩২৬]

তিরমিযীতে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- মাছের পেটে থাকা অবস্থায় ইউনূস (আলাইহিস সালাম) যে দু'আটি করেছিলেন, কোন মুসলিম যদি সেই দু'আ পাঠ করে,

---

৩২৫. তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৫২৪, **যঈফ**, সিলসিলাতু আহাদীসুস যঈফা, মাশা. ১৩/৬৪২০

৩২৬. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সিলসিলায়ে সহীহা, হা/১/১৯৯)।

তার দু'আ (অবশ্যই) কবুল করা হবে।[৩২৭] অন্য বর্ণনায় আছে, নাবী ﷺ বলেন- আমি এমন একটি দু'আ সম্পর্কে অবগত আছি, কোন বিপদগ্রস্ত লোক তা পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সেই বিপদ দূর করে দিবেন। সেটি হচ্ছে আমার ভাই ইউনুস (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ। দু'আটি এইঃ

«لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»

"হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই; আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালেমদের অন্তর্ভূক্ত"।[৩২৮]

সুনানে আবু দাউদে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে এক বর্ণনায় এসেছে, নাবী ﷺ আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেছেন- আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিবনা, তুমি যদি তা পাঠ কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দুঃশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দিবেন? বর্ণনাকারী বলেন- আমি বললামঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে তা শিক্ষা দিন। তিনি বললেন- সকাল ও বিকালে তুমি পাঠ করবেঃ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وأعوذبك من الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأعوذبك من الْجُبْنِ الْبُخْلِ وَغلبة الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ»

"হে আল্লাহ! আমি উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অক্ষম ও আলস্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার কাছে আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা করা ও ভীরু হওয়া থেকে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ঋণের আধিক্য এবং পুরুষদের অন্যায় প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আমি এই দু'আটি পাঠ করলাম। এতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার যাবতীয় দুঃশ্চিন্তা দূর করে দিলেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিলেন।[৩২৯]

ইমাম আবু দাউদ মারফু সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তেগফার পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সকল দুঃশ্চিন্তা হতে মুক্তি করে দিবেন, তার সকল সংকীর্ণতা ও অভাব দূর করে দিবেন এবং তাকে এমন স্থান হতে রিযিক দান করবেন, যার কল্পনাও সে করতে পারেনা।[৩৩০] সুনানের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেন- তোমাদের উপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা আবশ্যক। কেননা এটি হচ্ছে জান্নাতের অন্যতম একটি দরজা। এর মাধ্যমে আল্লাহ্

---

৩২৭. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত দাওয়াত। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছকে সহীহ বলেছেন। হা/১২৩।

৩২৮. সূরা আম্বিয়া-২১:৭৮, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৫০৫, মিশকাত, মাশা. হা/২২৯২, সহীহ : আলবানী

৩২৯. সুনানে আবু দাউদ, আলএ.হা/১৫৫৫, ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। তবে উক্ত হাদীসটি ভিন্ন সনদে সামান্য ভিন্ন শব্দে সহীহ সুত্রে বণিত হয়েছে। যথা-

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»

(বুখারী, তাও. হা/৫৪২৫, ৬৩৬৯, ইফা. হা/৫৮১৬, আপ্র. হা/৫৯২৩, সহীহ আত তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪৮৪, মিশকাত, হা/২৪৫৮)

৩৩০. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সালাত। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। শাইখের তাহক্বীকসহ রিয়াযুস্ সালিহীন, হা/১৮৮২।

তা'আলা মানুষের অন্তরের দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করেন।[৩৩১]

মুসনাদে ইমাম আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ যখন কোন বিষয়ে বিপদাপদের আশঙ্কা করতেন, তখন তিনি দ্রুত সলাতের দিকে ছুটে যেতেন।[৩৩২] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"হে মুমিনগণ। তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন"। (সূরা বাকারা-২:১৫৩)

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করা হয়, যে ব্যক্তি দুঃশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়, সে যেন لاحول ولاقوة إلا بــالله পাঠ করে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, এই বাক্যটি বেহেশতের অন্যতম একটি ভান্ডার।

দুঃশ্চিন্তা, বিষণ্ণতার উপরোক্ত চিকিৎসায় পনের প্রকার (রূহানী) ঔষধের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোর উপর আমল করলেও যদি কোন ব্যক্তির দুঃশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা দূর না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, রেসূটি তার উপর মজবুত হয়েছে এবং স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং এর মূলোৎপাটন করা জরুরী।

- ১. তাওহীদে রুবুবীয়াতের উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করা।
- ২. তাওহীদে উলুহীয়াতের উপর পূর্ণ ঈমান আনয়ন করা এবং তা বাস্তবায়ন করা।
- ৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।
- ৪. আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দার উপর জুলুম করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, দৃঢ়তার সাথে এই ঘোষণা দেয়া এবং কোন কারণ ছাড়াই বান্দাকে শাস্তি দেয়া থেকে আল্লাহর যাতে পাকের পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া।
- ৫. বান্দা নিজেকে জালেম বলে স্বীকার করা।
- ৬. আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে তথা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে হুসনা ও সিফাতে কামালিয়ার উসীলা দিয়ে তাঁর নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'আলার আসমা ও সিফাতগুলো যে সমস্ত অর্থ বহন করে, তার মধ্যে সর্বাধিক ব্যাপক অর্থবোধক নাম হচ্ছে الحــي القيوم চিরঞ্জীব এবং সকল বস্তুর প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনকারী।
- ৭. কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া।
- ৮. আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই আশা করা।
- ৯. আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা করা, তাঁর কাছেই সব কিছু সোপর্দ করা এবং বান্দা কর্তৃক এই কথার স্বীকারোক্তি প্রদান করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কপাল ধরে আছেন। তিনি যেভাবে

---

৩৩১. ইমাম তাবরানী (রহিমাহুল্লাহ) তার গ্রন্থ মুজামে আওসাতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী এতে সহমত পোষণ করেছেন। সিলসিলাহ সহীহা, হা/১৯৪১।

৩৩২. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সালাত।

ইচ্ছা সেভাবেই তাকে ঘুরান। বান্দার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমই কার্যকর হয় এবং আল্লাহর ফয়সালাই ইনসাফপূর্ণ।

- ১০. জীব-জন্তু যেমন বসন্তের বাগানে বিচরণ করে, বান্দার উচিত ঠিক তেমনি কুরআনের বাগানে বিচরণ করা, শুবুহাত ও শাহওয়াতের (সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির) অন্ধকারে কুরআন থেকে হিদায়াতের আলো গ্রহণ করা, কোন কিছু হারিয়ে গেলে কিংবা বিপদে পতিত হলে কুরআনের মাধ্যমে প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে। এর মাধ্যমেই তার অন্তরের রেস্‌ থেকে আরেস্‌্য লাভ করবে, দুঃশ্চিন্তা দূর হবে, বিষণ্নতা ও হতাশা অপসারিত হবে।
- ১১. আল্লাহর দরবারে সদা ইস্তেগফার করবে।
- ১২. আল্লাহর কাছে তাওবা করবে।
- ১৩. আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।
- ১৪. গুরুত্ব ও প্রবল আগ্রহ নিয়ে সলাত কায়েম করবে।
- ১৫. বিপদাপদ ও মসীবতের সময় বান্দা নিজেকে অসহায় মনে করবে এবং বিপদাপদ সংক্রান্ত সকল বিষয় আল্লাহর দিকেই সোপর্দ করে দিবে।

ভয়-ভীতির সময় নাবী ﷺ এর আদর্শ

তিরমিযী শরীফে বুরায়দা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- একদা খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অসুস্থ হলেন। তখন তিনি বললেন- হে আল্লাহর রসূল! ভয়-ভীতির কারণে আমি রাতে ঘুমাতে পারিনা। তিনি তখন বললেন- যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নিবে, তখন এই দু'আটি পাঠ করবেঃ

«اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ»

"হে আল্লাহ্! হে সাত আসমান ও তার ছায়ায় অবস্থিত সকল বস্তুর প্রভু! হে সাত যমীন ও তাতে আচ্ছাদিত বস্তুসমূহের মালিক! হে শয়তান ও তার ধোঁকায় পড়ে পথহারাদের প্রতিপালক! সমস্ত মাখলুকের অনিষ্ট হতে তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। তাদের কেউ যেন আমার উপর জুলুম করতে না পারে কিংবা আমার উপর বাড়াবাড়ি করতে না পারে। তুমি যাকে আশ্রয় দিবে, সে অবশ্যই বিজয়ী হবে এবং তোমার প্রশংসা খুবই বড়। তুমি ছাড়া কোন সত্যউ পাস্য নেই"।[৩৩৩]

তিরমিযীতে আমর বিন শুআইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, ঘাবড়ানোর (ভয়-ভীতির) সময় নাবী ﷺ সাহাবীদেরকে এই দু'আ শিক্ষা দিতেনঃ

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وشَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون»

---

৩৩৩. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত দাওয়াত, সহীহ আত তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৫২৩, এই হাদীসের সনদে রয়েছে হাকাম বিন যহীর। তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেনঃ এই হাদীসের সনদ শক্তিশালী নয়। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসটি যঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল) বলেছেন। সিলসিলায়ে যঈফা, হা/২৪০৩।

"আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে এবং শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা থেকে এবং আমার নিকট শয়তানদের উপস্থিত হওয়া থেকে। বর্ণনাকারী বলেন- আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর বুঝবান সন্তানদেরকে এই দু'আ শিক্ষা দিতেন আর যারা ছোট ও অবুঝ ছিল, তাদের জন্য এই দু'আ লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন"।[৩৩৪]

আমর বিন শুআইব হতে মারফু সূত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- তোমরা যখন আগুন লাগতে দেখ, তখন তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ কর। কেননা তাকবীর আগুন নিভিয়ে দেয়।[৩৩৫] আগুন লাগার কারণ হচ্ছে শয়তান। কারণ শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুন লাগলে এমন ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়, যাতে শয়তান খুশী হয়। আগুনের স্বভাব হচ্ছে সে অহংকার ও বিপর্যয়কে পছন্দ করে। এই দু'টি স্বভাবই শয়তানের মধ্যে বিদ্যমান। শয়তান এই স্বভাব দু'টির দিকেই আহবান করে। এর মাধ্যমেই বনী আদম ধ্বংস হয়।

আগুন ও শয়তান পৃথিবীতে ধ্বংস-বিপর্যয় এবং অহংকারের অন্যতম বিরাট একটি কারণ। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার কিবরিয়ার (বড়ত্ব ও অহংকারের) সামনে পৃথিবীর কোন কিছুই টিকতে পারেনা। এ জন্যই মুসলিম যখন আল্লাহু আকবার পাঠ করে, তখন তাকবীরের প্রভাবে আগুন নিভে যায় এবং শয়তানকে বিতাড়িত করে। কেননা শয়তান সৃষ্টির মূল উপাদানই হচ্ছে এই আগুন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- আমরা এই বিষয়টি একাধিকবার পরীক্ষা করেছি। আমরা অনুরূপ ফল পেয়েছি।

স্বাস্থ্য রক্ষায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিদায়াত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

"হে বানী আদম! তোমরা প্রত্যেক সলাতের সময় সাজসজ্জা অবলম্বন কর, খাও, পান কর এবং অপব্যয় করোনা। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না"।[৩৩৬] মানুষের শরীর থেকে যেই পরিমাণ পানি ও মলমূত্র বের হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য-পানীয় শরীরে প্রবেশ করানোর আদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদের শরীর ও স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে। খাদ্যের পরিমাণ ও তা গ্রহণের পদ্ধতি তাই হওয়া উচিৎ, যা দ্বারা শরীর উপকৃত হবে। সুতরাং পরিমাণ মত পানাহার গ্রহণ বা না গ্রহণের মধ্যেই স্বাস্থ্য রক্ষা বা নষ্ট হওয়ার বিষয়টি নিহিত। সেই সাথে পানাহার গ্রহণের পদ্ধতি বা

---

৩৩৪. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তিব্ব। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ হাদীসটি হাসান। হাদীসের শেষাংশে উল্লেখিত, ইবনে উমার কর্তৃক তাঁর শিশু সন্তানদের গলায় দুআটি লিখে ঝুলিয়ে দেয়ার কথাটি সহীহ নয়। দেখুনঃ আলকালিমুত তায়্যিব, হা/৪৯।

৩৩৫. ইবনুস সুন্নী হাদীসটিকে দিবারাত্রির আমল নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর সনদে রয়েছে কাসেম বিন আব্দুল্লাহ্ আল-উমারী। মুহাদ্দিছগণের নিকট তার হাদীছ মাতরুক (অগ্রহণযোগ্য)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) তাকে কাজ্জাব (মিথ্যুক) বলেছেন। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুনঃ সিলসিলায়ে যঈফা, হা/২৪০৩।

৩৩৬. সূরা আরাফ-৭:৩১

ধরণটির প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা জরুরী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে, তা অপচয়ে পরিণত হবে। সুতরাং অতিরিক্ত পানাহার গ্রহণ এবং পরিমাণ মত পানাহার না গ্রহণ- উভয়টিই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং রেসূ-ব্যধির কারণ। খাও এবং অপচয় করোনা- এই দু'টি ঐশি কালেমার (শব্দের) মধ্যেই স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি জড়িত।

আল্লাহ্ তা'আলা এই দু'টি পবিত্র শব্দের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার সকল বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আর সুস্বাস্থ্য ও বিপদাপদ মুক্ত থাকা যেহেতু আল্লাহর নিয়ামাত সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি বিরাট নিয়ামাত এবং বান্দার উপর আল্লাহর এক বিশাল অনুদান; বরং এটিই সর্বাধিক বড় নিয়ামাত, তাই আল্লাহ্ তা'আলা যাকে এই নিয়ামাতটি দিয়েছেন, তার উচিত এটির পরিচর্যা করা এবং একে ক্ষতিকর বিষয় হতে হেফাজত করা। নাবী ﷺ বলেন-

«نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ»

এমন দু'টি নিয়ামত রয়েছে, যাতে অধিকাংশ লোক প্রতারিত হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে সুস্বাস্থ্য আর অপরটি হচ্ছে অবসরতা"।[৩৩৭]

তিরমিযী এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেন- যে ব্যক্তি সুস্থ ও স্বীয় বাসস্থানে নিরাপদ অবস্থায় সকালে ঘুম থেকে উঠল এবং তার কাছে এক দিনের পানাহারও বিদ্যমান রয়েছে, তাকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদই দেয়া হয়েছে।[৩৩৮] তিরমিযীতে মারফু সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ»

"কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম নিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলবেনঃ আমি কি তোমার শরীর সুস্থ রাখিনি? আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিনি?

এ জন্যই পূর্ব যামানার কোন কোন আলেম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾

"এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"।[৩৩৯] এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- এখানে নিয়ামাত বলতে সুস্বাস্থ্য উদ্দেশ্য। মুসনাদে আহমাদে মারফু সূত্রে বর্ণিত,

«سَلُوْا اللهَ الْيَقِيْنَ وَالْمُعَافَاةَ فَمَا أُوْتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْراً مِنَ الْعَافِيَةِ»

"তোমরা আল্লাহর কাছে ঈমান ও সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা কর। সুতরাং ঈমানের পর সু-স্বাস্থ্যের চেয়ে অধিক উত্তম আর কোন নিয়ামাত নেই"।[৩৪০] এই হাদীছে দ্বীন ও দুনিয়ার আফিয়াত তথা সুস্থতা ও

---

৩৩৭. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক, তাও.হা/৬৪১২, ইফা. ৫৯৭০, আপ্র. ৫৯৬৪, সহীহ আত তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৩০৪, মিশকাত, হা/ ৫১৫৫

৩৩৮. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্ যুহদ। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ এই হাদীসটি মারওয়ান বিন মুআবীয়ার সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নি। তবে হাদীসের শাহেদ থাকার কারণে অর্থাৎ অনুরূপ বিষয় অন্য সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে তা শক্তিশালী হয়েছে। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এ কারণেই হাদীসটিকে হাসান (সহীহ) বলেছেন। সিলসিলাহ সহীহা, হা/২৩১৮।

৩৩৯. সূরা তাকাছুর-১০২:৮

৩৪০. মুসনাদে আহমাদ এবং ইবনে মাজাহ। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

নিরাপত্তার বিষয়কে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবেও তাই। দুনিয়া ও আখিরাতে ঈমান ও সুস্থতা ব্যতীত কোন বান্দাই সফল হতে পারেনা। একমাত্র পরিচ্ছন্ন ঈমান ও গভীর বিশ্বাসই বান্দার উপর থেকে আখিরাতের শাস্তি দূর করতে পারে। আর দুনিয়াতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন রেসূ থেকে বাঁচার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে আফিয়াত (সুস্বাস্থ্য) বজায় রাখা।

নাসাঈ শরীফে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

«سَلُوا اللهَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ والْمُعَافَاةَ فَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْراً مِنَ الْمُعَافَاةِ»

"তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা, সুস্থতা এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। কেননা ঈমানের পর সুস্থতার চেয়ে উত্তম নেয়ামত কাউকেই প্রদান করা হয় নি"।[৩৪১] হাদীছে বর্ণিত তিনটি শব্দের দ্বারা তিন রকমের অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। ক্ষমা চাওয়া দ্বারা অতীতে কৃতকর্মের অকল্যাণ দূর করা হয়, আফিয়াত তথা সুস্বাস্থ্য চাওয়ার মাধ্যমে বর্তমানের অকল্যাণ হতে বাঁচার আবেদন করা হয়েছে এবং মুআফাত চাওয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতের অকল্যাণ হতে বাঁচানোর আবেদন করা হয়েছে।

পানাহার গ্রহণে নাবী ﷺ এর আদর্শ

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- সব সময় এক ধরণের খাদ্য গ্রহণ করা নাবী ﷺ এর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। কেননা সর্বদা একই খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যদিও তা সর্বোত্তম খাদ্য হয়। তাই তাঁর পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি যে দেশে অবস্থান করতেন, সেখানকার অধিবাসীদের সকল খাদ্যই গ্রহণ করতেন। আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন-

«مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ»

"নাবী ﷺ কখনই কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেন নি। পছন্দ ও রুচি হলে তিনি তা খেতেন। আর পছন্দ ও রুচি না হলে তা বর্জন করতেন"। সুতরাং রুচি না হলে কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয় এবং জোর করে পেটের ভিতরে কোন কিছু প্রবেশ করানো ঠিক নয়। কেননা যখন কোন লোক অরুচিকর খাদ্য খাবে, তখন উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হবে। সম্ভবতঃ এটি স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম একটি মূলনীতি।

নাবী ﷺ গোশত পছন্দ করতেন। গোশত থেকে তিনি রানের গোশত অধিক পছন্দ করতেন। তিনি ছাগলের সামনের অংশের গোশত অধিক পছন্দ করতেন। কারণ এই অংশের গোশত হালকা এবং তা দ্রুত হযম হয়।এ ছাড়া তিনি মিষ্টি ও মধুও পছন্দ করতেন। এই তিনটি খাদ্য তথা গোশত, মিষ্টি ও মধু অন্যতম একটি উপকারী খাদ্য।

নাবী ﷺ যখন কোন দেশে গমণ করতেন, তখন সেই দেশের ফল খেতেন এবং তা পরিহার করতেন না। ফল খাওয়া স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম একটি মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে প্রত্যেক দেশের লোকদের জন্য এমন ফল তৈরী করেছেন, যা তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খুবই উপযোগী ও

৩৪১. ইমাম নাসাঈ হাদীসটিকে দিবারাত্রির আমল নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন শব্দে এবং একই অর্থে হাদীসটি অন্যান্য কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও এই অর্থে বর্ণিত একাধিক হাদীছগুলোকে সহীহ বলেছেন। সিলসিলাহ সহীহা, হা/১১৩৮।

উপকারী। যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ভয়ে দেশী কোন ফল খাওয়া বর্জন করবে, সে আরও বেশী অসুস্থ হয়ে পড়বে।

নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- আমি টেক লাগিয়ে (হেলান দিয়ে) খাইনা।[৩৪২] তিনি আরও বলেন- আমি ক্রীতদাসের মতই বসি এবং ক্রীতদাসের মতই খাই। টেক লাগিয়ে বা হেলান দিয়ে বসার একাধিক ধরণ রয়েছে। (১) এক পায়ের উপর আরেক পা আড়াআড়িভাবে রেখে আসন পেতে বসা। (২) কোন বস্তুর উপর হেলান দিয়ে বসা। (৩) শরীরের এক পার্শ্বের উপর হেলান দিয়ে বসা। এই তিন প্রকার টেক লাগানোই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। রসূল ﷺ তিন আঙ্গুল দিয়ে খাবার গ্রহণ করতেন। এভাবে খাবার গ্রহণ সর্বাধিক উপকারী। নাবী ﷺ মধুর সাথে ঠান্ডা পানি মিশিয়ে পান করতেন।

দাঁড়িয়ে পান করা

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, দাঁড়িয়ে পানকারী একজন লোককে বমি করার হুকুম দিয়েছেন। তবে সহীহ সূত্রে এও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দাড়িয়ে পান করেছেন। এ জন্যই কোন কোন আলেম বলেন- দাঁড়িয়ে পান করার নিষিদ্ধতা রহিত হয়ে গেছে। আরও বলা হয় যে, নিষিদ্ধতা দ্বারা দাঁড়িয়ে পান করা হারাম বুঝা যায়নি (বরং তা ভদ্রতার খেলাফ)। আরও বলা হয়েছে যে, তিনি প্রয়োজন বশতঃ দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন।

পান করার সময় নাবী ﷺ তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন। আর তিনি বলতেন- এই পদ্ধতি হচ্ছে অধিক তৃপ্তিদায়ক, অধিক পিপাসা নিবারক এবং অধিক স্বাচ্ছন্দপূর্ণ।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেন- "তোমরা উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে পানি পান করোনা; বরং তোমরা দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পান কর। আর যখন তোমরা পান করবে, তখন বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে পান করবে এবং পান করা শেষে আলহামদুল্লিাহ্‌ বলবে"। নাবী ﷺ পাত্র ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-

«غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ»

"তোমরা পাত্র ঢেকে রাখো এবং পান পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখো। কেননা বছরে এমন একটি রাত রয়েছে, যাতে বিভিন্ন প্রকার রেসূ ও মহামারি অবতরণ করে। সেই রেসূ বা মহামারি যখনই কোন ঢাকনা বিহীন পাত্রের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে, তখনই তাতে পতিত হয়।[৩৪৩]

---

৩৪২. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আত-ইমাহ।

৩৪৩. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আশরিবাহ, মিশকাত হাএ. হা/৪২৯৮

এই হাদীছের অন্যতম রাবী লাইছ বিন সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- আমাদের সমাজে বসবাসকারী অনারব লোকেরা বছরের একটি রাতে সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। সেটি হচ্ছে ডিসেম্বর মাসের একটি রাত। সহী সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্রের মুখ ঢেকে রাখার আদেশ করেছেন। এমনকি এক খন্ড কাঠ দিয়ে হলেও।

সহীহ সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্র ঢাকা বা পাত্রের মুখ বন্ধ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলার (আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার) আদেশ দিয়েছেন। তিনি কলসীতে-ড্রামে (বড় পান পাত্রে) সরসূরি মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। পাত্রে শ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে এবং ভাঙ্গা পান পাত্রে এবং ছিদ্র বিশিষ্ট পাত্রের ছিদ্র হতে পান করতেও তিনি নিষেধ করেছেন।

সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র আদর্শ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুগন্ধি পছন্দ করতেন এবং কেউ তাঁকে সুগন্ধি উপহার দিলে তিনি তা ফেরত দিতেন না। তিনি বলেছেন-

«مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَان فَلَا يَرُدّهُ فَإِنَّهُ خَفِيف الْمَحْمَل طَيِّب الرِّيح»

"যার কাছে রায়হান (সুগন্ধি) পেশ করা হবে, সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে, এর ঘ্রাণ খুব ভাল, তা বহন করা খুবই সহজ"।[৩৪৪] আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফে ريحان-এর স্থলে طيب শব্দটি এসেছে। উভয় ক্ষেত্রে অর্থ একই।

মুসনাদে বায্‌যারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্রকে ভালবাসেন, তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কাার-পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন, তিনি ক্ষমাশীল-দয়ালু, ক্ষমা করাকে ভালবাসেন, তিনি দানশীল, দান করাকে ভালবাসেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের ঘর ও ঘরের আঙ্গিনাকে পরিস্কার রাখো। তোমরা ইহুদীদের মত নিজেদের ঘরে ময়লা-আবর্জনা রাখবেনা।

সুগন্ধির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে, যা ফিরিস্তাগণ পছন্দ করেন। শয়তান তা থেকে পলায়ন করে। সুতরাং পবিত্র আত্মা পবিত্র ও সুঘ্রাণকে পছন্দ করে। আর অপবিত্র আত্মাই অপবিত্র বস্তুকে ভালবাসে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

---

৩৪৪. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ সুগন্ধি ব্যবহার প্রসঙ্গে।

"দুঃশ্চরিত্র (অপবিত্র) নারীরা দুশ্চরিত্র (অপবিত্র) পুরুষদের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র (অপবিত্র) পুরুষরা দুশ্চরিত্র (অপবিত্র) নারীদের জন্যে। সচ্চরিত্র (পবিত্র) নারীগণ সচ্চরিত্র (পবিত্র) পুরুষদের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষগণ সচ্চরিত্রা নারীদের জন্যে। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা"।[৩৪৫] এই আয়াতটি যদিও পবিত্র এবং অপবিত্র নারী পুরুষদের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে, তথাপিও এর দ্বারা পবিত্র-অপবিত্র কথা, কাজ, খাদ্য, পানীয়, পোশাকাদি, সুঘ্রাণ ইত্যাদি সবকিছুকেই অন্তর্ভূক্ত করে। طيب (পবিত্র) এবং خبيث (অপবিত্র) শব্দ দু'টি আম অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক। তাই এর দ্বারা সকল পবিত্র বস্তু এবং সকল অপবিত্র বস্তুই উদ্দেশ্য। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, শব্দ দু'টি দ্বারা কেবল পবিত্র নারী-পুরুষই বুঝানো হয়েছে, তারপরও বলা যায়, অর্থের মধ্যে যে ব্যাপকতা রয়েছে, তা সকল বস্তুকেই অন্তর্ভূক্ত করে।

নাবী ﷺ এর পবিত্র ফয়সালাসমূহ

এই অধ্যায়ে আমরা শরীয়তের সকল আইন-কানুনের বিবরণ দিবোনা; বরং নাবী ﷺ এর কতিপয় নির্দিষ্ট বিচার-ফয়সালার কথা তুলে ধরব। যদিও নাবী ﷺ এর খাস (নির্দিষ্ট) ফয়সালাগুলোও আম (সাধারণ) ফয়সালার পর্যায়েই গণ্য করা হয়। তাই আমরা এখানে কেবল সে সব হুকুম-আহকামের কথাই বলব, যার মাধ্যমে নাবী ﷺ বিবাদমান লোকদের মধ্যে ফয়সালা করেছেন। সেগুলোর সাথে আমরা কিছু কিছু মৌলিক হুকুম-আহকামের কথাও উল্লেখ করব।

নাবী ﷺ হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি অভিযুক্তকে বন্দী করে রেখেছেন। আমর বিন শুআইব তার পিতার সূত্রে দাদার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি জেনে-বুঝে এবং ইচ্ছাকৃত তার ক্রীতদাসকে হত্যা করে ফেলল। নাবী ﷺ তখন খুনীকে একশ দুর্‌রা লাগিয়েছেন এবং এক বছর দেশান্তর করেছেন। সেই সাথে একটি গোলাম (ক্রীতদাস) মুক্ত করার হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু গোলাম হত্যার বিনিময়ে তাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করেন নি।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে সামুরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে, আমরা তাকেও হত্যা করব। এই বর্ণনাটি যদি সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলব যে, বিশেষ প্রয়োজনে এবং তা'যীর (শাস্তি) হিসাবে এই বিধান প্রয়োগ হবে।

তিনি এক ব্যক্তিকে হুকুম দিয়েছিলেন যে, সে যেন তার কর্জদারকে আটকিয়ে রাখে। ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবু উবাইদ বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ অন্যায়ভাবে (অস্ত্র দিয়ে) হত্যাকারীকে হত্যা করার এবং (বেঁধে রেখে) হত্যাকারীকে মৃত্যু পর্যন্ত বেঁধে রাখার আদেশ দিয়েছেন।

---

৩৪৫. সূরা নূর-২৪:২৬

মুহাদ্দিছ আব্দুর রাজ্জাক স্বীয় মুসান্নাফে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করে বলেন- অন্যায়ভাবে বেঁধে রেখে হত্যাকারীকে মৃত্যু পর্যন্ত বেঁধে রাখা হবে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উরায়না গোত্রের লোকদের হাত-পা কেটে ফেলা এবং তাদের চোখে লোহার কাঠি গরম করে ঢুকিয়ে চোখ উপড়ে ফেলার ফয়সালা করেছিলেন। কেননা তারাও এভাবে রাখালকে হত্যা করেছিল। অতঃপর তাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে ফেলে রাখলেন। তারা ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হয়ে মারা গেল। কারণ তারা রাখালের সাথে এরূপ আচরণই করেছিল।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, এক লোক অন্য লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তার ভাইকে হত্যা করেছে। অপরাধীকে পাকড়াও করা হলে সে অপরাধ স্বীকার করল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের কাছে হাওলা করে দিলেন। সে হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন- সে যদি এই লোকটিকে (হত্যাকারীকে) হত্যা করে, তাহলে সেও অনুরূপ হবে। এই কথা শুনে সে ফেরত এসে বলল- আমি তো আপনার হুকুমেই তাকে পাকড়াও করেছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন- তুমি কি চাও না যে, সে তার ও তোমার ভাইয়ের গুনাহ্-এর বোঝাসহ আল্লাহর দরবারে হাজির হোক? সে বলল- হ্যাঁ অবশ্যই চাই। অতঃপর সে তাকে ছেড়ে দিল।[৩৪৬]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মুখের বাণীঃ সে যদি এই লোকটিকে (হত্যাকারীকে) হত্যা করে, তাহলে সেও হত্যাকারীর অনুরূপ হবে। এই কথার ব্যাখ্যায় আলেমদের দু'টি কথা রয়েছে। (১) হত্যাকারী থেকে যখন কিসাস নেওয়া হবে, তখন হত্যাকারীর সকল গুনাহ্ মা'ফ হয়ে যাবে। তাই হত্যাকারী এবং কিসাস গ্রহণকারী এক রকম হয়ে যাবে। এরূপ নয় যে, কিসাস নেওয়ার পূর্বে হত্যাকারী যেমন গুনাহ্গার ছিল, কিসাস গ্রহণকারীও অনুরূপ গুনাহ্গার হবে। এতে কিসাস নেওয়ার বদলে ক্ষমা করে দেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। (২) হত্যাকারী যদি তার ভাইকে ইচ্ছাকৃত হত্যা না করে থাকে, তাহলে এই অবস্থায় হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হলে বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে উভয়েই সমান হবে। হত্যাকারী অন্যায়ভাবে হত্যা করে বাড়াবাড়ি করেছে আর প্রতিশোধ গ্রহণকারী এই কারণে বাড়াবাড়ি করার অপরাধে অপরাধী হবে যে, সে একজন অনিচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে হত্যা করে ফেলেছে।

এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফু সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তা এই ব্যাখ্যার উপরই প্রমাণ বহন করে। হাদীসটিতে রয়েছে, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে হত্যার ইচ্ছা করিনি। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছকে বললেন- সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তারপরও যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তাহলে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এই কথা শুনে সে তাকে ছেড়ে দিল।

এক ইহুদী একটি বালিকার মাথাকে দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে চাপ দিয়ে হত্যা করেছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ব্যাপারে এই হুকুম দিয়েছিলেন যে, একই পদ্ধতি সেই ইহুদীর মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে চাপা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হবে।

---

৩৪৬. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কাসামাহ।

এই ঘটনায় দলীল পাওয়া যায় যে, কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে হত্যা করে, তাহলে সেই হত্যাকারী পুরুষকেও হত্যা করা হবে। আরও জানা গেল যে, অপরাধীর সাথেও সে রূপ আচরণই করা হবে, যে রূপ সে করেছিল।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, বিশ্বাসঘাতকতা করে যেই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়, তাতে কিসাস নেওয়ার জন্য নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছের অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেননা নাবী ﷺ এই নিহত বালিকার ওয়ারিছদের কাছে হত্যাকারী ইহুদীকে সোপর্দ করে দেন নি। তিনি এটিও বলেন নি যে, তোমরা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা কর আর ইচ্ছা করলে তাকে ছেড়ে দাও; বরং তাকে সরসূরি হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। এটিই ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজহাব। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ মতকেই সমর্থন করেছেন। যারা বলে অঙ্গিকার ভঙ্গ করার কারণে নাবী ﷺ তাকে এইভাবে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন, তাদের কথা ঠিক নয়। কেননা অঙ্গিকার ভঙ্গকারীর শাস্তি হচ্ছে তলোয়ার দিয়ে তার মাথা উড়িয়ে দেয়া; দুই পাথরের মাঝখানে মাথা রেখে ভেঙ্গে ফেলা নয়।

এক মহিলা অন্য এক মহিলার উপর পাথর নিক্ষেপ করার কারণে মহিলাটি মারা গেল। মৃত মহিলাটির পেটে সন্তান ছিল। সন্তানটিও মারা গেল। এই ক্ষেত্রে নাবী ﷺ ফয়সালা করলেন যে, নিহত শিশু সন্তানের বদলে একটি দাস বা দাসী প্রদান করতে হবে এবং নিহত মহিলার দিয়ত পরিশোধ করবে হত্যাকারীনীর আসাবাগণ (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক মহিলার পেটের বাচ্চা নিহত করার বদলে একটি দাস বা দাসী প্রদান করার ফয়সালা করেছেন। অতঃপর যেই মহিলার বিরুদ্ধে নাবী ﷺ ফয়সালা করেছিলেন, সেই মহিলাটি মৃত্যু বরণ করল। এইবার তিনি ফয়সালা দিলেন যে, তার মিরাছ (পরিত্যক্ত সম্পদ) পাবে তার স্বামী ও সন্তানেরা। আর দিয়ত আদায় করবে তার ওয়ারিছগণ।[৩৪৭]

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হল যে, কত্লে শিবহে আম্দ অর্থাৎ যেই হত্যা সম্পূর্ণ ইচ্ছাতে হয়নি; বরং যাতে ইচ্ছাকৃত হত্যার সামঞ্জস্য রয়েছে, তাতে কিসাস নেই। আর এ ক্ষেত্রে হত্যাকারীনী মহিলার আসাবাগণ (হত্যাকারীর পুরুষ আত্মীয়গণ) নিহত শিশুর দিয়ত পরিশোধ করবে। তবে মহিলার স্বামী ও সন্তানদের উপর দিয়ত পরিশোধের দায় বর্তাবেনা।

এক ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে (সৎ মাকে) বিবাহ করলে তিনি তাকে হত্যা করার এবং তার সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দিয়েছিলেন। এটিই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের মাজহাব এবং এটিই সঠিক। বাকী তিন ইমাম বলেন- যেনার শাস্তিই হচ্ছে তার শাস্তি। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- রসূল ﷺ-এর ফয়সালাই অনুসরণের অধিক হকদার এবং অধিক উত্তম।

যে ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে কারও ঘরে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে, তার চোখে পাথর নিক্ষেপ করে কিংবা কাঠি দিয়ে চোখ ফুঁড়ে দেয়, তাহলে তার কোন কিসাস নেই।

৩৪৭. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত দিয়াত।

নাবী ﷺ হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক দাসী নাবী ﷺ কে গালি দিত। এতে রসূান্বিত হয়ে তাঁর এক আযাদকৃত গোলাম সেই দাসীকে হত্যা করে ফেললে তিনি নিহত দাসীর রক্তকে মূল্যহীন হওয়ার ফয়সালা দিয়েছেন।

একদল ইহুদী যখন নাবী ﷺ কে গালি ও কষ্ট দিয়েছিল, তখন তিনি তাদের সকলকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন।

এক লোক আবু বারযা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে গালি দেয়ার কারণে তিনি যখন গালি দাতাকে হত্যা করতে চাইলেন, তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- রসূল ﷺ এর পর আর কারও জন্য গালি দাতাকে হত্যা করা বৈধ নয়। এ বিষয়ে সহীহ, হাসান ও মাশহুর মিলে দশাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করে বলেন- যেই মুসলিম আল্লাহ্ অথবা আল্লাহর কোন নাবী-রসূলকে গালি দিল, সে আল্লাহর রসূলকে অস্বীকার করল। গালি দাতা মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা করে ফিরে আসলে তো ভাল। অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ এর জন্য বিষ মিশ্রিত খাদ্য পেশকারী মহিলাকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। যে তাঁকে যাদু করেছিল, তাকেও তিনি হত্যা করেন নি। উমার, হাফসা এবং জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে যাদুকরকে হত্যা করার কথা বর্ণিত হয়েছে। নাবী ﷺ হতে সহীহ সূত্রে এও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যুদ্ধবন্দীদের কাউকে হত্যা করেছেন আবার কাউকে ফিদয়া তথা মুক্তিপন গ্রহণ করে ছেড়ে দিয়েছেন। আবার কাউকে মুক্তিপন গ্রহণ না করেই ছেড়ে দিয়েছেন। আবার কখনও কখনও কতককে ক্রীতদাসে পরিণত করেছেন। তবে তিনি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক লোককে গোলাম বানিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। এ সমস্ত হুকুম-আহকামের কোনটিই রহিত হয়নি। মুসলমানদের শাসক প্রয়োজন অনুপাতে এগুলো প্রয়োগ করবেন।

ইহুদীদের সাথে নাবী একাধিক ফয়সালা করেছেন। মদীনায় আগমণ করেই তিনি তাদের সাথে চুক্তি করেছেন। এর পর বনু কায়নুকার লোকেরা তাঁর সাথে যুদ্ধ করল। এই যুদ্ধে নাবী ﷺ জয়লাভ করলেন এবং তাদেরকে দয়া বশতঃ ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর বনু নযীরের লোকেরা যুদ্ধ করলে তাদেরকে দেশান্তর করলেন। অতঃপর বনী কুরায়যার ইহুদীরা অঙ্গিকার ভঙ্গ ও যুদ্ধ করলে তিনি তাদের সকলকে হত্যা করলেন। পরিশেষে খায়বারের ইহুদীরা রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করলেন। তিনি খায়বার বাসীদেরকে সেখানে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন এবং কতিপয় লোককে হত্যা করার ফয়সালা দিয়েছেন।

গণীমতের মাল বন্টনে নাবী ﷺ এর তরীকা

নাবী ﷺ মালে গণীমত থেকে অশ্বারোহী যোদ্ধাকে তিন অংশ এবং পদাতিক সৈন্যকে এক অংশ প্রদান করার হুকুম দিয়েছেন। যে মুজাহিদ কোন শত্রুকে হত্যা করবে, সেই নিহত শত্রুর সাথে প্রাপ্ত সকল বস্তু হত্যাকারীকে দেয়ার ফয়সালা করেছেন।

তালহা এবং সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে গণীমতের মাল থেকে ভাগ দিয়েছেন। তখন তারা উভয়েই বললেন- আমাদের জন্য কি আখিরাতে ছাওয়াবও রয়েছে? নাবী ﷺ তখন বললেন- তোমরা ছাওয়াব থেকেও বঞ্চিত হবেনা।

রসূল ﷺ এর কন্যা রুকাইয়া উছমান বিন আফফান (রাঃ) এর বিবাহাধীনে ছিলেন। সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, রুকাইয়া অসুস্থ থাকার কারণে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। রসূল ﷺ থেকে অনুমতি নিয়েই তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি উছমান (রাঃ) কে বদরের যুদ্ধের মালে গণীমত থেকে অংশ দিয়েছেন। তিনিও তখন বললেন- পরকালেও আমার জন্য কি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ছাওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন- তোমার জন্য ছাওয়াবও নির্ধারিত হয়েছে।

ইবনে হাবীব বলেন- এটি (অনুপস্থিতকে গণীমতের মাল দেয়া) শুধু নাবী ﷺ এর জন্য খাস ছিল। পরবর্তীতে যুদ্ধে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে গণীমতের মাল থেকে কোন অংশ না দেয়ার ব্যাপারে আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম মালেক এবং পূর্ব ও পরবর্তী যামানার এক দল আলেমের মতে মুসলিমদের শাসক যদি কাউকে যুদ্ধে না পাঠিয়ে মুসলমানদের অন্য কোন কাজে প্রেরণ করে, তাহলে তার জন্যও গণীমতের মালের অংশ নির্ধারণ করা হবে। নাবী ﷺ সাল্‌ব তথা নিহত শত্রুর সাথে প্রাপ্ত সম্পদ পাঁচ ভাগের আওতায় আনেন নি; বরং এটিকে গণীমতের মূল সম্পদের অন্তর্ভূক্ত হিসাবে নির্ধারণ করে একজন সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে হত্যাকারীকেই দিয়ে দিতেন।

হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করার ব্যাপারে নাবী ﷺ এর হিদায়াত

সাহাবায়ে কেরামগণ নাবী ﷺ কে হাদীয়া দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। এমনি রাজা-বাদশাদের পক্ষ হতেও উপঢৌকন আসলে তিনি তাও গ্রহণ করতেন। রাজা-বাদশাদের পক্ষ হতে আগত হাদীয়া কখনও তিনি সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন।

একবার আবু সুফিয়ান নাবী ﷺকে হাদীয়া দিলে তিনি তা কবুল করেছেন। আবু উবাইদ (রহঃ) বলেন- আমের বিন মালেক নাবী ﷺ-এর নিকট হাদীয়া পাঠালে তিনি তা ফেরত দিয়েছেন। তিনি তখন বলেছিলেন- আমরা মুশরিকদের হাদীয়া গ্রহণ করিনা। আবু উবাইদ আরও বলেন- মুশরিক আবু

সুফিয়ানের হাদীয়া কবুল করার কারণ হল, তখন নাবী ﷺ ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি বলবৎ ছিল।

ঐদিকে মিশরের শাসক মুকাওকিসের হাদীয়াও তিনি কবুল করেছিলেন। কারণ মুকাওকিস নাবী ﷺ-এর দূত হাতেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে খুব সম্মান করেছিল। সে নাবী ﷺ এর নবুওয়াত ও রেসালাতের স্বীকারোক্তিও প্রদান করেছিল। তাই তিনি তাকে ইসলাম থেকে নিরাশ করেন নি।

সুতরাং তিনি তাঁর সাথে যুদ্ধরত কোন কাফের-মুশরিকের হাদীয়া কখনই কবুল করেন নি।

ইমাম সাহনুন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- রোমের বাদশাহ যদি মুসলমানদের ইমামের (শাসকের) জন্য কোন হাদীয়া পাঠায়, তাহলে তা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। এটিকে ইমামের জন্য পার্সনাল (ব্যক্তিগত) হাদীয়া হিসাবে ধরা হবে। ইমাম আওযায়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- এতে সকল মুসলমানের হক সাব্যস্ত হবে। মুসলমানদের ইমাম বাইতুল মাল হতে সেই হাদীয়ার বিনিময় দান করবেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- এটিকে গণীমতের মাল হিসাবে গণ্য করা হবে।

মুসলিমদের মধ্যে ধন-সম্পদ বণ্টন করার ব্যাপারে নাবী ﷺ এর আদর্শ

নাবী ﷺ এর কাছে তিন প্রকারের মাল ছিল।

- ১. সাদকাহ ও যাকাতের মাল।
- ২. গণীমতের মাল।
- ৩. ফাঈ (বিনা যুদ্ধে দুশমনদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদ)।

গণীমত ও যাকাতের মাল বন্টনের তরীকা (পদ্ধতি) পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা সেখানে বর্ণনা করেছি যে, আট প্রকার লোকদেরকেই যে যাকাত দিতে হবে, নাবী ﷺ তা বলেন নি। কখনও কখনও এ রকম হত যে, তিনি এক প্রকার লোককেই যাকাত দিয়ে দিতেন।

আর হুনাইন যুদ্ধের দিন তিনি মালে ফাঈকে মুআল্লাফাতুল কুলুব অর্থাৎ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এক শ্রেণীর লোককেই দান করেছেন। আনসারদেরকে তা থেকে কিছুই দেন নি। এতে আনসারদের মধ্যে অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হলে তিনি বললেন- তোমরা কি এটি পছন্দ করনা যে, লোকেরা উট ও ছাগল (সম্পদ) নিয়ে ঘরে ফিরবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে সাথে নিয়ে তাঁবুতে যাবে? আল্লাহর শপথ! তোমরা যা নিয়ে ফিরছ, তা ঐ সমস্ত বস্তু হতে অনেক ভাল।

একদা আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইয়ামান থেকে কিছু স্বর্ণ পাঠালে রসূল ﷺ তা চার জন লোকের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। সুনানের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ-এর আত্মীয়দের জন্য নির্ধারিত অংশ তিনি বনী হাশেম ও বনী মুত্তালেবকে দিয়েছেন। নাওফাল ও আবদে শামস্ গোত্রকে কিছুই দেন নি। তিনি বলেন- আমরা এবং বনী মুত্তালেব আইয়্যামে জাহেলিয়াত ও ইসলামের কোন যুগেই পৃথক হয়নি। আমরা এবং তারা একই। এই বলে তিনি এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ফাঁকায় প্রবেশ করিয়ে জালের মত বানালেন। তিনি তাদের ধনী ও গরীবদের মাঝে সমান করে ভাগ করেন নি। মিরাছী সম্পদ বন্টনের ন্যায় কোন পুরুষকে মহিলার দ্বিগুণও দেন নি। বরং প্রয়োজন ও অবস্থার প্রতি খেয়াল রেখে তিনি কাউকে কম আবার কাউকে বেশী দান করতেন। এই সম্পদ দ্বারা তিনি কোন

অবিবাহিত যুবককে বিয়ে করিয়ে দিতেন, কারও ঋণ পরিশোধ করতেন আবার কখনও শুধু তাদের মধ্যে থেকে অভাবীদেরকেই দিতেন।

নাবী ﷺ এর পবিত্র জীবনী ও হিদায়াত গভীরভাবে পাঠ করলে দেখা যায়, তিনি খুমুস তথা গণীমতের মাল থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত অংশ তিনি যাকাত বন্টনের খাতেই ব্যয় করতেন। যাকাত বন্টনের খাতসমূহের (আট শ্রেণীর) বাইরে তিনি কখনও অন্য কাউকে খুমুস থেকে দান করতেন না। মিরাছী সম্পদের মত করেও তা বণ্টন করতেন না। যে ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনী পাঠ করবে, সে এতে কোন প্রকার সন্দেহ করতে পারেনা।

ফাঈ (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) কি নাবী ﷺ এর মালিকানাধীন ছিল যে তিনি যেভাবে ও যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করবেন? না কি এরূপ ছিলনা? এ ব্যাপারে আলেমদের থেকে দু'টি মত পাওয়া যায়। তবে তাঁর পবিত্র হাদীস পাঠ করলে জানা যায় যে, তা তাঁর ইচ্ছা ও মালিকানার অধীন ছিলনা। বরং তিনি কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় তা বণ্টন করতেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রসূল কিংবা আল্লাহর রসূল ও বাদশাহ হওয়ার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রসূল হওয়ার পাশাপাশি বান্দা হওয়াকেই পছন্দ করেছেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ইবাদতকারী রসূল সব সময় তার মালিক ও প্রেরকের হুকুমেই চলেন। আর বাদশাহী ওয়ালা রসূলের স্বাধীনতা থাকে। তিনি স্বীয় ইচ্ছায় কাউকে দেন আবার কাউকে বঞ্চিত করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সুলায়মান (আলায়হিস সালাম) কে রাজত্ব ও রিসালাত উভয়ই দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ﴾

"এটা আমার দান। তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে। যাকে চাও তাকে দাও অথবা যাকে চাও তাকে দেয়া থেকে বিরত থাকো। এর কোন হিসেব দিতে হবেনা"।[৩৪৮]

অর্থাৎ আপনি যাকে ইচ্ছা দান করুন আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করুন। আমি আপনার কোন হিসাব নিবনা। আমাদের নাবী ﷺ-এর কাছেও এই মর্যাদা পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এর প্রতি আগ্রহ দেখান নি। রসূল ﷺ বলেন- আল্লাহর শপথ! আমি কাউকেই দেইনা কিংবা মাহরুম করিনা। আমি কেবল বণ্টনকারী। আমাকে যেখানে বা যাকে যা দেয়ার আদেশ করা হয় আমি তাকেই তা দেই। তাই তিনি ফাঈ (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত মাল) থেকে নিজের ও পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণের জন্য এক বছরের খরচ বের করে নিতেন। আর বাকী সম্পদ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য হাতিয়ার ও প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করায় ব্যয় করতেন। এই প্রকার সম্পদ তথা খুমুসের বিষয়ে মতভেদ শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত চলছে।

যাকাত, গণীমত এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করার মাসআলা খুবই সহজ। কারণ এতে হকদারগণ এবং তাদের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। হকদারগণ ব্যতীত অন্য কারও জন্য কোন প্রকার অংশ নেই। তাই রসূল ﷺ এর পর ফাঈ-এর সম্পদ ব্যয় করতে গিয়ে মুসলিম শাসকগণ যে সমস্যায় পড়েছেন যাকাত, গণীমত ও মিরাছী সম্পদ বণ্টন করতে গিয়ে ততটা সমস্যায় পড়েন নি।

---

৩৪৮. সূরা সোয়াদ-৩৮:৩৯

ফাঈ-এর সম্পদ বন্টনের বিষয়টি কষ্টকর এবং মতভেদপূর্ণ না হলে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ হতে অংশ দাবী করতেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জিভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি দাতা"।[৩৪৯]

আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর রসূলকে ফাঈ হিসাবে যেই সম্পদ দিয়েছেন, তার পুরোটাই উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত ব্যক্তিদের জন্যই। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য নির্ধারিত খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) উল্লেখিত লোকদের জন্য খাস নয়; বরং এখানে সকল প্রকার লোকদের বিবরণ এসেছে। তাই এখানে নির্দিষ্ট খাত তথা খুমুসের হকদার এবং সাধারণ খাত তথা আনসার, মুহাজির এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমণকারী সকল মুসলমানের জন্য খরচ করা হবে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন এই আয়াত মুতাবেক আমল করেছেন। তাদের আমলই এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা। এ জন্যই উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন- এই সম্পদে একজনের চেয়ে অন্যজন অধিক হকদার নয়। এমন কি আমিও অন্যজনের চেয়ে অধিক হকদার নই। আল্লাহর শপথ! প্রত্যেক মুসলিমেরই এতে হক রয়েছে। তবে ক্রীতদাসদের এতে কোন অধিকার নেই। আল্লাহর কিতাবে আমাদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে। আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় আমল দ্বারা তা বণ্টন করেছেন। সুতরাং ইসলামে কোন ব্যক্তির ত্যাগ, বিপদাপদ ও কষ্ট বরদাশত, বীরত্ব প্রদর্শন, কারও ধনাঢ্যতা, কারও অভাব এ জাতীয় প্রতিটি বিষয়েরই আলাদা আলাদা মূল্যায়ন হবে। প্রতেক্যেই নিজ নিজ হক বুঝে পাবে। আল্লাহর শপথ! আমি বেঁচে থাকলে ইয়ামানের সানআর পাহাড়ে যে রাখাল ছাগল চরাচ্ছে, তারও যদি এই সম্পদে কোন অংশ থাকে, তাহলে তাও তার কাছে পৌঁছে যাবে। সে নিজ স্থানে অবস্থান কালেই তার হক বুঝে পাবে। তাকে আমার কাছে এসে তার হক বুঝে নিতে হবেনা। সুতরাং ফাঈ-এর আয়াতে যে সমস্ত মুসলিমগণের উল্লেখ করা হয়েছে, খুমুসের আয়াতেও তারাই উদ্দেশ্য। খুমুসের আয়াতে আনসার ও মুহাজিরগণের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা তাদেরকে ফাঈ-এর হকদার বানানো হয়েছে। খুমুসের হকদারগণের জন্য দু'টি হক রয়েছে। একটি হচ্ছে খুমুস থেকে তাদের জন্য একটি খাস (নির্দিষ্ট) হক, আর অন্যটি হচ্ছে ফাঈ থেকে তাদের আম তথা সাধারণ হক। সুতরাং উভয় প্রকার সম্পদেই তাদের হক রয়েছে।

---

৩৪৯. সূরা হাশর-৫৯: ৭

নাবী ﷺ যে সমস্ত লোকের মধ্যে ফাঈ-এর সম্পদ ভাগ করেছেন, তাদের প্রয়োজন ও অভাব-অনটনের দিকে খেয়াল রেখেই ভাগ করেছেন। এতে অন্যান্য সম্পদ যেমন মীরাছ, ওসীয়ত ইত্যাদির সম্পদ বন্টনের নিয়ম অনুসরণ করেন নি। এমনি খুমুসের সম্পদও তার হকদারদের মধ্যেই বণ্টন করতে হবে। কেননা আল্লাহর কিতাবে উভয় শ্রেণীর সম্পদ ব্যয়ের খাত একটিই। সুতরাং খুমুসের সম্পদ কেবল তার হকদারকেই দেয়া হবে। খুমুসের হকদারগণ ফাঈ-এর মধ্যেও প্রবেশ করবে। আর খুমুসের সম্পদ শুধু খুমুসের হকদারদেরকেই দেয়া হবে। যেমন সূরা হাশরের আয়াতে বর্ণিত লোকদের মধ্যেই ফাঈ-এর সম্পদ ভাগ করতে হবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ এ থেকে কোন অংশ পাবেনা। ইমাম মালেক এবং আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মতে রাফেজীদের (শিয়াদের একটি গ্রুপ) জন্য ফাঈ-এর সম্পদে কোন অংশ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা এক শ্রেণীর লোককেই ফাঈ এবং খুমুসের হকদার বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। গণীমতের সম্পদ শুধু এর হকদারদের (মুজাহিদদের) জন্য। অন্যদের এতে কোন অংশ নেই। খুমুসের সম্পদ শুধু এর হকদারদের জন্যই। আর ফাঈ-এর সম্পদ যেহেতু বিশেষ করে কারও জন্য নির্দিষ্ট নয়, তাই এর হকদারদের সাথে মুহাজির, আনসার এবং তাদের অনুগামীদেরকেও এর হকদার সাব্যস্ত করা হবে। একইভাবে তারা ফাঈ এবং খুমুসের খাত হিসাবে গণ্য হবে।

রসূল ﷺ তাঁর নিজের অংশ ইসলামের স্বার্থে খরচ করতেন। আর খুমুসের পাঁচ অংশ হতে চার অংশ প্রয়োজন অনুসারে তার হকদারদের মধ্যে ভাগ করতেন।

অমুসলিমদের দূত ও প্রতিনিধিদের সাথে নাবী ﷺ এর আচরণ

ভন্ড ও মিথ্যুক মুসায়লামা কাজ্জাবের পক্ষ হতে দু'জন দূত রসূল ﷺ এর নিকট আগমণ করে বলতে লাগল, আমরা বলি যে, মুসায়লামা আল্লাহর রসূল, তখন রসূল ﷺ বললেন- দূত হত্যা করা যদি নীতি বহির্ভূত না হত, তাহলে আমি তোমাদের উভয়কে হত্যা করতাম। নাবী ﷺ হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরাইশরা যখন আবু রাফেকে তাঁর নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করল, তখন আবু রাফে রসূল ﷺ-এর কাছেই থেকে যেতে চাইল এবং কুরাইশদের কাছে ফেরত যেতে অস্বীকার করল। তিনি তখন বললেন- আমি চুক্তি ও অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে চাইনা এবং দূত ও প্রতিনিধিদেরকে আটকিয়েও রাখিনা। তুমি ফেরত যাও। ইসলামের প্রতি তোমার অন্তরে এখন যে ভালবাসা আছে, তা যদি স্থায়ী থাকে, তাহলে পুনরায় চলে এসো।

সহীহ হাদীছে আরও বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মোতাবেক তিনি আবু জান্দালকে কুরাইশদের নিকট ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কোন মহিলাকে তিনি কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠান নি। সুবাইআ আসলামী নামক একজন মহিলা যখন মুসলমান হয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট আগমণ করল, তখন তার স্বামী তাকে ফেরত নেওয়ার জন্য আগমণ করল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিওনা। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবেনা। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখোনা। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়"।[৩৫০] অতঃপর রসূল ﷺ তার কাছ থেকে শপথ নিলেন যে, ইসলামের প্রতি ভালবাসার কারণেই তিনি ঘর ছেড়ে চলে এসেছেন। এমনটি নয় যে, তার গোত্রে কোন অপরাধ করে কিংবা স্বামীর সাথে ঝগড়া করে এবং তাকে ঘৃণা করার কারণেই চলে এসেছেন। তিনি এই মর্মে শপথ করলেন। তাই রসূল ﷺ ঐ মহিলার স্বামীকে বিবাহের সময় প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দিলেন। কিন্তু মহিলাকে তার নিকট ফেরত দেন নি।

অমুসলিমদেরকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়দানের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর পবিত্র সুন্নাত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾

"আর যদি কখনও কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে খেয়ানতের আশঙ্কা থাকে তাহলে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও, যাতে তারা এবং তোমরা সমান হয়ে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না খেয়ানতকারীদেরকে"।[৩৫১] নাবী ﷺ বলেন- যার মধ্যে এবং অন্য কোন গোত্রের মধ্যে কোন চুক্তি রয়েছে, সে যেন চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ না হওয়ার পূর্বে কিংবা তাদেরকে না জানিয়ে সেই চুক্তির কোন অংশ ভঙ্গ না করে এবং সেই চুক্তিকে পরিবর্তনও না করে।[৩৫২] নাবী ﷺ হতে সহীহ সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন-

﴿الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ﴾

"সকল মুসলিমের রক্তের মূল্য সমান। মুসলমানদের সবচেয়ে কম মর্যাদাবান লোকও যদি কোন ব্যক্তিকে (অমুসলিমকে) নিরাপত্তা প্রদান করে, তাহলে সকল মুসলিমের উপর সেই নিরাপত্তাপ্রাপ্ত লোকের রক্ত হারাম"।[৩৫৩] নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ঐ দুই ব্যক্তিকে

---

৩৫০. সূরা মুমতাহানা-৬০:১০

৩৫১. সূরা আনফাল-৮: ৫৮

৩৫২. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ। ইমাম আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন,সিলসিলাহ সহীহা, হা/২৩৫৭

৩৫৩. আবু দাউদ, আলএ. হা/২৭৫১

নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, যাদেরকে তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। রসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর কন্যা যায়নাব যখন আবুল আসকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, তখন তিনি সেই নিরাপত্তা দানকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেন-

«وَيُجِيرُ عَلَى المسلمين أدناهم و يُرَدُّ عَلَيهِم أَقْصَاهُمْ»

"মুসলিমদের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির আশ্রয় দানও সকলের উপর কার্যকর হবে এবং তাদের দূরতম ব্যক্তি তাদের অংশীদার হবে"।[৩৫৪]

উপরের তিনটি বিষয়ের সাথে আরেকটি বিষয় হল, মুসলমানদের সকলেই শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে তারা সকলে মিলে একই দেহের ন্যায় হবে । চতুর্থ মাসআলাটি থেকে জানা যাচ্ছে যে, কাফেরদেরকে কোন প্রকার কর্তৃত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গিকার দেয়া যাবেনা। আর নাবী ﷺ-এর বাণীঃ তাদের দূরতম ব্যক্তি তাদের অংশীদার হবে-এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানদের কোন মুজাহিদ বাহিনী যদি তাদের ক্ষমতা ও শক্তি বলে কোন দেশ বা অঞ্চল জয় করে গণীমত অর্জন করতে সক্ষম হয়, তাদের থেকে দূরে অবস্থানকারী সৈন্যরাও অংশ পাবে। কেননা তাতে কোন না কোন ভাবে তাদেরও ত্যাগ ও শ্রম রয়েছে। এমনি ফাঈ (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) থেকে যা কিছু এসে বাইতুল মালে জমা হবে, তাদের দূরের ও কাছের সকল সৈনিকদেরই অংশ রয়েছে। যদিও তা কাছের লোকদের প্রচেষ্টার ফলেই অর্জিত হয়েছে।

অমুসলিমদের থেকে জিযিয়া (কর) গ্রহণের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর তরীকা

নাবী ﷺ নাজরান ও আয়লার অধিবাসীদের থেকে জিযিয়া আদায় করেছেন। তারা আরব ও খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিল। দাওমাতুল জান্দালের নাগরিকদের থেকেও তিনি জিযিয়া গ্রহণ করেছেন। তাদের অধিকাংশই ছিল আরব গোত্রের লোক। তিনি ইয়ামানের লোকদের থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করেছিলেন। তারা ছিল ইহুদী। অগ্নি পূজকদের থেকেও তিনি কর আদায় করেছেন। তবে আরবের মুশরিকদের থেকে কর আদায় করার কথা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়নি। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মতে আহলে কিতাব ও অগ্নিপূজক ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে কর আদায় করা যাবেনা।

অন্য এক দল আলেম বলেন- জিযিয়া প্রদানে সম্মতি প্রকাশকারী সকল জাতির লোকদের নিকট হতেই তা আদায় করা হবে। আহলে কিতাবদের থেকে আদায় করার বিষয়টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, অগ্নিপূজকদের থেকে আদায় করার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আর বাকীদেরকে উপরোক্ত দুই শ্রেনীর লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে তাদের কাছ থেকেও আদায় করা হবে। কেননা অগ্নিপূজকরাও মুশরিক। তাদের কোন আসমানী কিতাব নেই। আরবের মুশরিকদের থেকে জিযিয়া না গ্রহণ করার কারণ হল, জিযিয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। কাফেরদের এক গোষ্ঠির কুফুরীকে অন্য গোষ্ঠির কুফুরীর তুলনায় অধিক ভয়াবহ মনে করার কোন অর্থ নেই। সকল কুফুরী ধর্ম একই। সুতরাং আমরা এটি মনে করিনা যে, মূর্তিপূজকদের কুফুরী অগ্নিপূজকদের কুফুরীর

৩৫৪. সহীহ ইবনে মাজাহ, তাও. হা/২৬৭৫

চেয়ে অধিক ভয়াবহ। গভীরভাবে চিন্তা করলে অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজকদের কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বলতে গেলে অগ্নিপূজকদের কুফুরীই অধিক ভয়াবহ ও নিকৃষ্ট। কারণ মক্কার মুশরিকরা মূর্তিপূজার সাথে সাথে তাওহীদে রুবুবীয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত। তারা বিশ্বাস করত, পৃথিবী এবং এর সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নয়। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়তেই তারা মূর্তিপূজা করত। তারা তাদের মূর্তিগুলোকে সৃষ্টিকর্তা মনে করতনা। তারা এও বিশ্বাস করতনা যে, বিশ্বজগতে যা আছে, তার স্রষ্টা দুইজন। তারা মনে করত না যে, কল্যাণের স্রষ্টা একজন আর অকল্যাণের স্রষ্টা অন্যজন। যেমন বিশ্বাস করে অগ্নিপূজকরা।

এমনি আরবের মুশরিকরা নিজের মা, কন্যা এবং বোনকে বিবাহ করা হালাল মনে করতনা। তাদের মধ্যে দ্বীনে ইবরাহীমের বেশ কিছু বিষয় বিদ্যমান ছিল। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর সহীফা (পুস্তিকা) এবং শরীয়ত ছিল। আর অগ্নিপূজকদের নিকট কোন আসমানী কিতাব নেই। তারা কোন নাবী-রসূলের শরীয়তসমূহের কোন কিছু মানত বলে জানা যায়নি। তাদের আকীদাহ ও আমলে এমন কিছু পাওয়া যায়না, যাতে বুঝা যায় তাদের কাছে আসমানী কিতাব অথবা শরীয়তে ইলাহী ছিল, যা পরে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজারের অধিবাসী এবং অন্যান্য এলাকার বাদশাহদের নিকট পত্র লিখে তাদেরকে ইসলাম কবুল করার অথবা জিযিয়া প্রদান করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি আরবের মুশরিক এবং অন্যান্য মুশরিকদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করেন নি।

জিযিয়া (করের) পরিমাণ ও সংখ্যা

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় আদেশ করলেন যে, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোক থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানী চাদর গ্রহণ করবেন। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উহার পরিমাণ বাড়িয়ে স্বর্ণের মালিকদের চার দীনার এবং রৌপ্যের অধিকারীদের উপর চল্লিশ দিরহাম বাৎসরিক কর ধার্য্য করেন। এই পার্থক্যের কারণ হল, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামান বাসীদের অভাবের কথা জানতেন। তাই তিনি কম নির্ধারণ করেছিলেন। আর উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সিরিয়ার ধণাঢ্য লোকদের সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুক্তির অবসানের ঘোষণা না দিয়েই কিংবা এ সম্পর্কে না জানিয়েই কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। কেননা তারা নিজেরাই অঙ্গিকার করে তাদের বন্ধু গোত্রের সাথে যোগ দিয়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বন্ধু গোত্রের উপর হামলা করেছিল এবং তাদের উপর জুলুম করেছিল। কুরাইশরা এতে খুশী হয়েছিল। এই অবস্থায় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শত্রুদেরকে সাহায্য করার কারণে কুরাইশদেরকে যুদ্ধকারী ভেবে তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছেন এবং যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেছেন।

বিয়েসাদী এবং এর আনুসাঙ্গিক বিষয়ে নাবী ﷺ এর আদর্শ

সহী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ বৈবাহিক জীবন যাপনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন-

«النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ»

"বিবাহসাদী আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবেনা, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। সুতরাং তোমরা বিবাহ কর। কেননা কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মাতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মাতের উপর গর্ব করব। যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ রাখে, সে যেন বিবাহ করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ না রাখে, সে যেন সিয়াম রাখে। কেননা সিয়াম হচ্ছে যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রনকারী।[৩৫৫] নাবী ﷺ বলেন-

«يا معشر الشباب مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

"হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে সে যেন তা করে নেয়। কারণ বিয়ে চোখ অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে না সে যেন সিয়াম রাখে। কেননা সিয়াম যৌন উত্তেজনাকে কমিয়ে দেয়"। তিনি আরও বলেন- দুনিয়ার সব কিছুই ভোগের বস্তু। এর মধ্যে সবচেয়ে অধিক উপভোগের বিষয় হচ্ছে, সৎ নারী। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

"মাল, বংশ, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারী এই চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। সুতরাং তুমি দ্বীনদার মহিলাকে বিয়ে করো। (তা না করলে) তোমার দুই হাত ধুলোমলিন হোক। নাবী ﷺকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচেয়ে উত্তম মহিলা কোন্‌টি? তিনি বললেন-

«الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»

"যেই মহিলার প্রতি তার স্বামী যখন দৃষ্টি দেয়, তখন স্বামীকে খুশী করে দেয়, স্বামী তাকে হুকুম করলে তার হুকুম তামীল করে এবং স্বীয় নফ্‌স ও মালে স্বামীর মর্জীর খেলাফ কিছুই করেনা।[৩৫৬]

নাবী ﷺ-এর পবিত্র সুন্নাত ছিল, তিনি বেশী বেশী সন্তান প্রসবকারীনী মহিলাকে বিবাহ করার উৎসাহ দিতেন। তিনি বলতেন-

«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم»

"তোমরা এমন মহিলাকে বিবাহ কর, যে তার স্বামীকে খুব ভালবাসে এবং বেশী বেশী সন্তান প্রসব করে।[৩৫৭]

---

৩৫৫. সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ বিবাহ করার ফজীলত। ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ এই হাদীছকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ সিলসিলায়ে সহীহা, হা/ ২৩৮৩।

৩৫৬. সুনানে নাসাঈ, অধ্যায়ঃ কোন্ মহিলা উত্তম।

৩৫৭. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি বেশী বেশী সন্তান প্রসবকারীনীকে বিবাহ করল। ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ এই হাদীছকে সহীহ বলেছেন। সিলসিলায়ে সহীহা, হা/ ২৩৮৩।

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি

নাবী ﷺ হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ঐ অকুমারী মহিলার বিবাহ বাতিল করেছেন, যার মর্জী ব্যতীত তার পিতা তাকে বিবাহ দিয়েছিল।[৩৫৮] সুনানের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, এক কুমারী মহিলার পিতা তার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ দিয়েছিল। বালিকাটি নাবী ﷺ এর কাছে আগমণ করে অভিযোগ পেশ করলে তিনি মহিলাকে বিবাহ বন্ধন ঠিক রাখা বা না রাখার অধিকার প্রদান করলেন। হাদীছে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন- কুমারী মহিলার অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দেয়া যাবেনা। চুপ থাকাই তার অনুমতি। অন্য এক হাদীছে এসেছে, নাবী ﷺ এর ফয়সালা হচ্ছে ইয়াতীম বালিকার মর্জীর বাইরে তাকে বিবাহ দেয়া যাবেনা। নাবী ﷺ বলেছেন- বালেগ হওয়ার পর কেউ ইয়াতীম থাকেনা। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াতীম নারীর বিবাহ জায়েয আছে। এ বিষয়টি কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে।

বিবাহে অলী (অভিভাবকের) প্রয়োজনীয়তা

সুনানের কিতাবসমূহে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ»

অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয়না।[৩৫৯] আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে আরও বর্ণিত হয়েছে, যেই মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজেই বিবাহ করল, তার বিবাহ বাতিল। সুনানের কিতাবসমূহে আরও বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেন-

«لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»

“কোন মহিলা (অভিভাবক সেজে) অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ দিবেনা। আর কোন মহিলা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করবেনা। কেননা যেই মহিলা নিজেই নিজের বিবাহ সম্পাদন করবে, সে ব্যভিচারীনীতে পরিণত হবে।[৩৬০]

নাবী ﷺ আরও বলেছেন- দুই জন অভিভাবক যদি পৃথকভাবে কোন মহিলার বিবাহ সম্পাদন করে, সে ক্ষেত্রে যার সাথে আগে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে মহিলাটি তার স্ত্রী হিসাবে গণ্য হবে।

বিবাহের মোহরানা নির্ধারণ

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এক লোক মোহরানা নির্ধারণ না করেই বিবাহ করল। তার সাথে বাসর করার পূর্বেই লোকটি মারা গেল। এই ক্ষেত্রে নাবী ﷺ ফয়সালা করলেন যে, এই মহিলার জন্য তার (আত্মীয়দের মধ্য হতে) তার সমমানের মহিলার মোহরানাই নির্ধারণ করা হবে। কমও করা হবেনা, বেশীও করা হবেনা। তার জন্য মিরাছও নির্ধারিত হবে। সে চার মাস দশ দিন ইদ্দতও পালন করবে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি চাও যে, উমুক মহিলার সাথে তোমার বিবাহ সম্পাদন করে দেই। লোকটি বলল- হ্যাঁ (তাই করা হোক)।

---

৩৫৮. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ।

৩৫৯. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ নয়।

৩৬০. ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ নয়। ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইরওয়াউল গালীল, হা/১৮৪১।

Contents

অতঃপর মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি চাও যে, উমুক পুরুষের সাথে তোমার বিবাহ সম্পাদন করে দেই? মহিলাটিও বলল- হ্যাঁ। এরপর তিনি তাদের উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। তারা উভয়ে বাসর করল। কিন্তু কোন মোহরানা নির্ধারণ করা হয়নি। পুরুষটি মহিলাকে কোন কিছুই দেয়নি। সেই লোকটির যখন মৃত্যু হল, তখন নাবী ﷺ এর খায়বারের সম্পদ হতে সেই মহিলাকে একটি অংশ প্রদান করলেন।[৩৬১] উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস থেকে নিম্নলিখিত আহকাম ও মাসায়েল জানা যাচ্ছেঃ

❖ মোহরানা নির্ধারণ না করেও বিবাহ সম্পাদন করা জায়েয আছে।

- ➢ মোহরানা নির্ধারণ না করে বিবাহ করলে স্ত্রীর সাথে নির্জনে মিলিত হওয়া এবং সহবাস করা জায়েয।
- ➢ মোহরানা নির্ধারণ না করে বিবাহ সম্পাদন করা হলে এবং এই অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হলে মহরে মিছ্‌ল (মহিলার বোন বা ফুফু কিংবা তার বংশের অন্যান্য মহিলার মহর) নির্ধারিত হবে। স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হোক বা না হোক।
- ➢ স্ত্রী বেঁচে থাকা অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা জরুরী। চাই স্ত্রীর সাথে বাসর হোক বা না হোক। এটিই আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং ইরাকের আলেমদের মত।
- ➢ একই ব্যক্তি বর ও কনের অভিভাবক হয়ে বিয়ের কাজ সম্পাদন করতে পারে। এখানে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমি উমুক পুরুষকে উমুক মহিলার সাথে বিবাহ দিলাম।
- ➢ যে অমুসলিম চারের অধিক স্ত্রীসহ ইসলাম গ্রহণ করবে, তাকে চারটি রেখে বাকীগুলোকে তালাক দেয়ার হুকুম করা হবে। এক লোক ইসলাম গ্রহণ করল। এমতাবস্থায় তার বিবাহাধীন দুই বোন একসাথে ছিল। নাবী ﷺ তাকে বললেন- তুমি দুইজনের যে কোন একজনকে রেখে অন্যজনকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। এতে বুঝা যাচ্ছে, কুফুরীর হালতে কাফের-মুশরিকদের বিবাহ-সাদীও বিশুদ্ধ। মুসলমান হওয়ার পর তার স্বাধীনতা রয়েছে। সে তার পুরাতন ও নতুন স্ত্রীদের মধ্য হতে যে কোন চারজনকে রেখে বাকীদেরকে বিদায় করে দিতে পারবে। এটিই অধিকাংশ আলেমদের মত।
- ➢ ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন, যে ক্রীতদাস স্বীয় মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করল, সে ব্যভিচারী হিসাবে গণ্য হবে।

হে আল্লাহই অধিক জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহু রাব্বুল আলামীনের জন্য। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। আমীন

৩৬১. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মোহরানা নির্ধারণ না করেই বিবাহ করল এবং মৃত্যুর পূর্বে তা পরিশোধ করল না। এই হাদীসের সনদটি হাসান।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, মাদরাসা (মার্কেটের সামনে), রাজশাহী

ওয়েব: http://wahidiyalibrary.blogspot.com

wahidiyalibrary@gmail.com ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

আমাদের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/ সম্পাদক	মূল্য
০১	তাজবীদসহ সহজ পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার মুহাম্মাদী কায়দা ও ১২১ টি	সম্পা: আব্দুল খালেক সালাফী	৩০
০২	তাফসীর ইবনে কাসীর (১-১৮ খণ্ড)		৩৮০০
০৩	ফিরিশ্‌তা জগৎ	-অনুবাদ ও সম্পাদনায়: আব্দুল হামীদ ফাইযী	৫০
০৪	**"মুখতাসার যাদুল মা'আদ"** মূল: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী, অনুবাদ: আবদুল্লাহ শাহেদ আল		২৫৫
০৫	**"অনূদিত সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ" (১ ও ২)** আধুনিক ফিক্বহী পর্যালোচনায়:	- নাসিরুদ্দীন আলবানী, আব্দুল্লাহ বিন বায, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন	১৬০
০৬	ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	-আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	৫০
০৭	স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস	-প্রফেসর এ. এইচ. এম শামসুর রহমান	১০০
০৮	**"সলাত পরিত্যাগ কারীর বিধান"**	- মূল: মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন -অনুবাদ ও সম্পাদনায়: শায়খ মতিউর রহমান	১৫
০৯	সহীহুল বুখারী (১-৬ খণ্ড)		৩৮০০
১০	সহীহ মুসলিম (১-৬ খণ্ড)		৩৬০০
১১	সহীহ আবু দাউদ (১-৫ খণ্ড)		৩০০০
১২	সুনান আন-নাসায়ী, ১ম খণ্ড		৭০০
১৩	সহীহ আত-তিরমিযী (১-৬ খণ্ড)		১৬০০
১৪	তাহক্বীক ইবনে মাজাহ (১-৩ খণ্ড)		২০০০
১৫	তাহক্বীক মিশকাতুল মাসাবীহ (১-২ খণ্ড)		১৩০০
১৬	তাহক্বীক রিয়াযুস্ব-স্বলেহীন একত্রে		৮০০
১৭	বলগুল মারাম		৫০০
১৮	আর-রাহীকুল মাখতুম		৫০০
১৯	জাল যঈফ হাদীস সিরিজ (১-৪ খণ্ড)		১০০০
	মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা,	-আবু আব্দুল্লাহ শহীদুল্লাহ খান মাদানী	১০০
২০	"সহীহ ফাযায়িলে আমল"	-আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ	৫০০
২১	আদর্শ পরিবার, আইনে রাসূল দু'আ অধ্যায়, আদর্শ নারী, আদর্শ পুরুষ, কে বড় লাভ- বান, কে বড় ক্ষতিগ্রস্থ, মরণ একদিন আসবেই, উপদেশ, বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়, তাফসীর কি মিথ্যা হতে পারে ?	**-আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ**	
২২	জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহর সালাত, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামাতে দ্বীন, শরঈ মানদণ্ডে মুনাজাত, তারাবীর রাকাআত সংখ্যা, ঈদের তাকবীর,	**-মুযাফ্ফর বিন মহসিন**	
২৩	আইনে তুহফা সালাতে মুস্তফা (১-২)	-আইনুল বারী আলীয়াভী	২২০
২৪	ডা. জাকির নায়েকের লেকচারে **মাযহাব প্রসঙ্গ,**	-সম্পাদনায়: আব্দুল খালেক সালাফী	
২৫	মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ	-আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
২৬	মরণকে স্মরণ	-আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
২৭	সহীহ নামায ও দু'আ শিক্ষা (৩ খণ্ড একত্রে)	-আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল	১০০
২৮	পীরতন্ত্রের আজবলীলা	-আবু তাহের বর্দ্ধমানী	৫০
২৯	ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত যুদ্ধ-বিদ্রহের ঘটনা ও শিক্ষাবলী	- যায়নুল আবেদীন বিন নুমান	

এছাড়াও কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ্র আলোকে রচিত সকল বই-পুস্তক পাওয়া যায়।
বি.দ্র. পার্সেলের মাধ্যমে বই পাঠানোর সুব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাপ্তিস্থান

তাওহীদ পাবলিকেশন্স,বংশাল, ঢাকা। ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬	আহলে হাদীস লাইব্রেরী, বংশাল, ঢাকা। ০১১৯১-৬৮৬১৪০
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, বংশাল, ঢাকা। ০১৯১৫-৭০৬৩২৩	ইলমা প্রকাশনী, সুরিটোলা, ঢাকা। ০১৮৫৫৫৬৬৬২৫
সালাফি লাইব্রেরী, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, বাংলাবাজার, ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭	আতিফা পাবলিকেশন্স,বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৪৫-৬৩৯৫৮৮
মাসিক আত-তাহরীক অফিস, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯	আস-সিরাত প্রকাশনী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ০১৭৩০-৬৩৩৪০৩
	আটমুল সালাফিয়া মাদরাসা, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
হামিদিয়া লাইব্রেরী,রেলগেট,ছাতাপক্টি,বগুড়া ০১৭১১-২৩৫২৫৮	যায়েদ লাইব্রেরী, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা। ০১১৯৮-১৮০৬১৫
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বানেশ্বর কলেজ মসজিদ (সিঁড়ির নিচে) ০১৭৩৯১০৩৫৫৪	আব্দুল্লাহ লাইব্রেরী দিঘির হাট, সাপাহার, নওগাঁ ০১৭৪৮-৯২২৭৯৬
দারুসা আত-তাওহীদ পাঠাগার,দারুসা বাজার, রাজশাহী ০১৭২৭-০৫৭৪৭৭	বালিজুড়ি কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস মসজিদ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর। ০১৭২০-৩৯১৪০২
যুবসংঘ লাইব্রেরী, হাট গাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী। ০১৭৪০-৩৮৩৯০৪	চরবাগডাঙ্গা ইসলামী পাঠাগার চাঁপাই নবাবগঞ্জ
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বোনার পাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা। ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮	আদর্শ বই বিতান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ। ০১৭২৪-৪৬৩৭১৩
আল-ফুরকান লাইব্রেরী, বনগাঁও, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও, ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪	কুরআন-সুন্নাহ্ রিসার্চ সেন্টার, সিলেট ০১৭৪৩-৯৪২৭৪৫, ০১৯৬৭-৪২০৫৩২
আনন্দ বুক স্টল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ। ০১৭১২-৫৩৮৮৩৮	সরোবর লাইব্রেরী, মডার্ণ মোড়, দিনাজপুর। ০১৭১৭-০১৭৬৪৫

এছাড়াও দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে পাওয়া যাচ্ছে।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, মাদরাসা (মার্কেটের সামনে), রাজশাহী

এখানে ক্বাওমী, আলিয়া ও কুরআন-সহীহ হাদীসের আলোকে রচিত সকল ধর্মীয় বইসমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও বিখ্যাত ক্বারীদের কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী গান ও সঠিক আক্বীদা পোষণকারী আলোচকদের বক্তৃতা ডাউনলোড দেওয়া হয় ও সিডি, ডিভিডি ও মেমোরী কার্ড বিক্রয় করা হয়।